ভালোবাসার অমল দিগন্ত

নিউ এজ পাবলিকেশন্স

আমাদের অপেক্ষারা এক এক সময়
আকাশের চেয়ে বড়,
রক্তপাত কাকে বলে আমরা কেউ তা জানি না
যেন একই বৃত্ত ঘিরে
এইসব গণ্ডিবদ্ধ খেলা।

অমল আলোয়

প্রায় ৩৫ বছর আগে অমল মুখোপাধ্যায়কে প্রথম দেখেছিলাম আকাশবাণী ভবনে। চরকির মতো সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এ-ঘর থেকে ও-ঘর। প্রথম আলাপেই তার সৌজন্য, শিষ্টাচার, স্মিত মুগ্ধ করেছিল। অমল তখন একটি ছোট পত্রিকা সম্পাদনা করত। সেই পত্রিকা নিয়ে তার চিন্তাভাবনা ছিল চমকপ্রদ। সেই চিন্তাভাবনাকে আজীবন সে পরম মমতায় লালন করেছে, ফলপ্রসূ করেছে।

নানা গুণের অধিকারী অমলকে ঘিরে বৌবাজারের একটি ছোট্ট অফিসঘর সর্বদা গমগম করত। দূরদূরান্তের কত কবি-লেখক যে এখানে আসতেন। সকলের জন্যই অমলের বুকের দরজা খোলা। তার আতিথেয়তা আর বন্ধুবাৎসল্যও ছিল প্রবাদতুল্য। কত বরেণ্য মানুষ, যাঁদের একডাকে চেনা যায়, তাঁরাও অমলের টানে এখানে মাঝে মাঝেই চলে আসতেন। সকলের জন্যই অমল দরাজ, উদারহস্ত আর অকৃপণ।

সাহিত্য ছিল অমলের প্রাণ। সাহিত্যের জন্য সে সয়েছে! হেলায় সুখের জীবন ছেড়ে সে যে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে, তা শতমুখে বলবার মতো। নানা ধরনের পত্রপত্রিকা সম্পাদনার পর 'ভালোবাসার দুই নাম' একটি সাহিত্যসংকলন সম্পাদনার ভার নিয়েছিল। একটি প্রকাশন-সংস্থাও গড়ে তুলেছিল কন্যার নামে। প্রবীণ, নতুন ও প্রতিশ্রুতিমান লেখকদের ধরাই ছিল এই প্রকাশন-সংস্থার লক্ষ্য। অমলের স্বপ্ন যখন আস্তে আস্তে একটা বাস্তবরূপ পাচ্ছে, তখনই অমলকে সংসার থেকে বিদায় নিতে হল। অমল ছিল সংসারে এক সন্ন্যাসী। নির্লোভ, নিরহং, নিজের প্রতি উদাসীন। অমলের অকালবিয়োগ আমাদের কাছে একটা মস্ত আঘাত। এই ক্ষত সহজে শুকোবার নয়।

শ্রীমতী বেলা দাস ছিলেন 'ভালোবাসার দুই দিগন্ত' দপ্তরের অক্লান্ত কর্মী। অমলকে সম্পাদনার কাজে সহায়তা করতেন। অমল যখন দপ্তরে থাকতেন না, বেলাই তখন বহু কাজ একা সামলাতেন। প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও আরও নানাবিধ দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠা ও দক্ষতার ...। অমলের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্রীমতী ব্রতী হয়েছেন, প্রকাশ করেছেন 'ভালোবাসার অমল দিগন্ত'। অমলের আরব্ধ কাজ যদি এই প্রকাশনের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণতা পায়, তা হলে অমলের অসংখ্য অনুরাগী হিতৈষী স্বজন-বান্ধব সুখী হবেন। অমল আলোয় আমাদের চিত্ত ভরে উঠবে।

শ্রীমতী বেলাকে এই সৎ উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।

স/ [illegible] দাশ

সম্পাদকীয়

"যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রঙ, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার, তাহার আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি— সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহা রূপান্তর অবস্থান্তর করা চলে না; তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় সেখানে সাহিত্য অংশে তাহা হেয়"—

কবিগুরুর এই বক্তব্যকে পাথেয় করে তাঁরই সার্ধশতবর্ষের শেষ লগ্নে "ভালোবাসার অমল দিগন্ত'-এর কবি-লেখকদের বিনম্র শ্রদ্ধায় প্রকাশিত হল বইমেলা সংখ্যাটি। আশা করি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

কবিতা

গুচ্ছ কবিতা

গল্প

উপন্যাস

বহির্বঙ্গ

বিদেশ ও অনুবাদ

বাংলাদেশ

গল্প

কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পথ চিনতে না-পেরে

চেনা ছবিগুলি ক্রমেই এখন অচেনা হয়ে যাচ্ছে, আর
তার জায়গায়
একটু-একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে
অচেনা সব ছবি।
অচেনা মানুষ, অচেনা ঘরবাড়ি, অচেনা নদী,
অচেনা গাছ আর অচেনা ফুল।

রোজকার মতো
আজ সকালেও ঘুম ভাঙবার পরে আমি
বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম।
তখন যে আকাশটা আমার
চোখে পড়েছিল,
ঠিক তেমন আকাশ এর আগে আর
কোনোদিনই আমি দেখিনি।
মেঘে-মেঘে যে-সব রঙের খেলা দেখলুম, তার
একটাও আমার চেনা নয়।

এইসব মানুষ, নদী, ঘরবাড়ি, গাছ, ফুল
আকাশ আর মেঘ সাধারণত
স্বপ্নের মধ্যেই দেখা যায়।
কে জানে,
আমাদের স্বপ্ন যেখানে
বাস্তব হয়ে ওঠে,
ঠিকমতো পথ চিনতে না-পেরে হয়তো
সেইদিকেই আমি আমার পা বাড়িয়ে দিয়েছি।

কৃষ্ণ ধর

মানুষের ঘরবাড়ি

অনেকেই আর বাড়ি ফেরে না
পথের কুকুরটাও তা লক্ষ করে
ঘরের মানুষজন রাতভর আশায় আশায়
জেগে থাকে পাথরের মতো ঠাণ্ডা
কারও মুখে আর রা নেই।

সব কটি বাড়িতেই একই দৃশ্য
কারও মুখে কোনও কথা নেই
কেন এমন দুঃস্বপ্ন ঘরে ঘরে
কী দোষ ওদের?
উত্তরের জন্য ওরা বাইরে এসে দাঁড়ায়।

কীটপতঙ্গ পাখিরাও খুঁজে পায়
ওদের আশ্রয়, ওদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে
অক্ষয় বট তার ডালপালা মেলে
শুধু মার খাওয়া মানুষের জন্যই
কোনও ত্রাণ শিবির নেই।

গল্পকথার শেষটাও কেমন গোঁজামিল
হারানো ঘরবাড়ির হদিশ কি মেলে?
সব তো কবেই আগুনের পেটে গেছে
গাছপালারাই শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
মানুষজনের দুঃখ তো ওরা ভুলতে পারে না।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নতুন উপগ্রহ

সব জানালা খুলে এবার তোমার বাড়িটাকে
নীল অনন্তে ভাসিয়ে দাও, ঢের হয়েছে বেলা,
দিন কেটেছে রাজদ্রোহে কিংবা সমর্পণে,
এখন তোমার যাবার পালা রাত্রির নিদাঘে।

রিকশাওয়ালা তার টায়ারে ভরে নিচ্ছে হাওয়া,
আজকে কোনো আরোহী নেই, এসে যায় না কিছু
নক্ষত্রের শিশির ঝরে উষ্ণীষকমলে,
তুলসীদাসের গান গাইছে, শিরদাঁড়াটা ঋজু।

এই ভবনের ময়ূরগুলো বিলিয়ে দিয়ে তবে
মহাশূন্যে মিলিয়ে যাও, নতুন উপগ্রহ
তোমার নামে নির্মিত হোক, সেই চ্যানেলে তুমি
কথা বলবে, শুনবে শুধু রাতের বনভূমি।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

দু-টুকরো

১

ভাষার নেশায় আমি ফুরিয়েছি জীবন,
কবিতাকে অভিধান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ে
মাথার কেশর চুল বিলাস এখন!
একটি নির্জন পঙ্‌ক্তির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বানিয়ে
মল্লিনাথ করছে বহু শ্রেণী-আলোচনা।
এখন বিস্ময়ে চেয়ে দেখি
শব্দের প্রকৃত অর্থ থেকে গেছে বাকি।

২

জীবন সত্যিই খুব ছোট
এত অল্পে শেষ হয়ে যায়।
মানুষ, প্রকৃতি, প্রেম,—হায়
শেষ অবধি ভাল করে চেনাই হয় না!
এই অসম্পূর্ণতাই দেয় শব্দকে মন্ত্রণা
সাধ থাকে, সাধনাও থাকে
তবু শব্দ এক অপরিশোধ্য দেনা
যা কখনো শোধই হয় না।

দেবী রায়

বিষাদের কবিতা

ঢাকের বোল শুনে তার ঘুম ভাঙে
সে কি তবে ফিরে যেতে চায়
সেই সুদূর-ধূসর-কৈশোরে!

আলোর রোশনাই, ভেপারে ভেপারে
ছত্রখান এই শহরে।
রৌরব, মন-কে এক ঝলক বিষণ্ণ
কাতর করে তোলে

গেটের তালা খুলে কে নেমে আসে
রাস্তায়।

'কোথায় চল্লেন, স্যার? মর্নিং-ওয়াকে?
রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটুন, চোখ-কান খুলে
ট্রা-ড্রাইভারগুলি পাজির পা-ঝাড়া...।'

প্রতিবার ভূ-কম্পনের আগেভাগে
ভয়ঙ্কর আতঙ্কে...
দলবদ্ধ কাকেরা প্রাণান্তক ওঠে ডেকে।

এই বৈভব, এই আলোর আরেক অর্থ
কি তবে প্রগাঢ় অন্ধকার!

আলোক সরকার

হাঁউ মাঁউ

চলতে চলতে কখন বুঝি আর চলা নেই
বেশ সকাল হয়েছে
শীত আর তেমন দাঁত বার করা নয়
শীতে অনেক কষ্ট পেয়েছিলুম। এমন সময়
যার বলার কথা সে বলল
আমাদের যাত্রা এবার শুরু হতে পারে।
যাত্রা তো কবেই শুরু হয়েছে
এবার কিসের শুরু, এমন কী থামার শুরু
তাও কতবার হল। যার বলার কথা
সে বলল একটা শুরু তো কর
শুরু করাটা কখনো শেষ হয় না—
দুজনেই বেশ হাঁউ মাঁউ করে
হেসে উঠলাম।

তরুণ সান্যাল

সামুহিক উচ্চাশা

ঘুরতেছে উড়তেছে বটে সামুহিক উচ্চাশা শিমূল
আঁশে আঁশে ভরে আছে ভ্রমণের সহায় পেটিকা।
গুঞ্জরণে মৌ-বালিকা মাঝে মধ্যে ফুটাতেছে হুল
ইহারা নিদাঘ কয় বসন্তের আশিক-আশিকা
গম্ভীর আকাশ মাঝে মধ্যে দেয় মেঘধ্বনি ধমক
উহারে বৈশাখী কয় স্বেদজলে আর্দ্র করে মাটি
গমক হৈ হৈ বায়ু বেণুকুঞ্জে কম্পন চমক
উচানে চৌ-চালা যায় খড়পালা চলন ক আটি।

কহিয়ো বন্দিশ উহা ঝালা দিবেন রৌদ্রেই প্রাবৃট
উঠতেছে উঠতেছে রাঙা তপন হকন জ্বালা লয়ে
তাপ বিমোচনে বালা গ্রস্ত নীতি মুক্তবেণী গিঁঠ
মধ্যাহ্নে নিদ্রালু নদী বালুরেখায় শীর্ণস্তনী বয়
উহারে প্রপঞ্চ কয়ো এই নীর ভূঞ্জিবেন প্রেত
খট্টার খোলে না বৃখস্ত বরং মৃৎকলসে
পিচ্ছিল উদ্গত রস যা উরস যোনিদীঘল দেশ
বরাহকুলের দাঁতে নদীখাতে দিং ভামিনীসমা।

দ্যাখ দ্যাখ কর্দমেও শৈবালে যে নদীর মোহানা
শুকায়ে ঝরিয়া আছে কাশ-কুশ-ব্যানা গচ্ছগতি
উহারে প্রশ্রয় দিও সদ্যতন বৃষ্টি দিলে হানা
দেখিবে ফেনায় ফুল দেখিবে সে বালাসরস্বতী
নাচিতেছে হাসিতেছে মুদ্রাতালে বিরল প্রতিভা
অবশ্য না দেখিলেও তাতে কি প্রতীক হয় মৃত
ঘুরতেছে উড়তেছে আঁশ ওই ওই উর্বশীর বিভা
শত খণ্ড পিণ্ড করে কুম্ভভর দিয়া, রাখো ঘৃত

অবশ্যই শত পুত্র এক কন্যা জন্মে কুরুকুলে
ভাবিও তোমারও শরাসন আছে শমী বৃক্ষমূলে।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

পথরেখা

তখন মধ্যাহ্নকাল
সময়ে উষ্ণতা ছিল
উষ্ণতা বাড়ছিল নিজ মহিমায়
সুদূর পথরেখা দিগন্তে হারায়
সময় ছুঁয়ে থাকে আগামী সময়
আমরাও সময়ের সমর্পণে
আছি সমান্তরালে আছি
দুঃখ-প্রেম উদ্ধারে আছি
পথরেখা বদলে যায়
নতুন পথ জেগে ওঠে
গ্রাম থেকে পথ অন্যপথে
পদচিহ্ন চলতে থাকে
নতুন ভাতের গন্ধ আসতে থাকে
ভাতের গন্ধ আসতে থাকে
ভাতের শরীরে পথ লেগে থাকে
ধারাবাহিক ধারাপাতে পথ
যেমন চলতে থাকে।

জয় গোস্বামী

প্রেমে পড়া মেয়ে

ভোরবেলা এল মেয়ে, মুখে তার প্রেমে-পড়া দাগ
ভোরবেলা ভিজে এল, এই বৃষ্টি জীবনে দেখেনি
রাতে তো ঘুমোয়নি মেয়ে, সারারাত সেই নিশীথিনী
ভোরে উঠে বেরিয়েছে, সকালটি গায়ের চাদরে
লেগে আছে রোদ হয়ে, বোঝাচ্ছে ও বাবা-বাছা করে
'খেয়ে যা, খেয়ে যা দুটো, 'মেয়ের' সেদিকে নেই মন
কারণ সে ভোরের মেয়ে, দিনের আলোর সঙ্গে আসে
সঙ্গে কেউ নেই তার, বই নেই, খাতা নেই, বন্ধু না, সখী না
শুধু প্রেম সঙ্গে করে একান্ত গাছের কাছে গিয়ে
সে বলে সমস্ত ভেঙে—আর পড়া ধোরো না আমায়
আজ এই সকালবেলা, 'বাবুল, নৈহার ছুটে যায়...'

পঙ্কজ সাহা

পতাকা উড়ে বেড়াবে

আমি একটা পতাকা নিয়ে
টিলার মাথায় উঠছি,
ট্রাকের উপরে,
সাঁকোর মাঝখানে ছুটে যাচ্ছি,
বাড়ির মাথায় উঠে যাওয়া
রোদের দিকে হাত বাড়াচ্ছি,
ঝকঝক করে ছুটে যাচ্ছে যে ট্রেন
তার হাওয়ায় আমার পতাকা উড়ছে আরো,
পুড়ছে নানা রঙের শার্ট,
সীমান্তরেখাগুলো মুছে যাচ্ছে দ্রুত,
পতাকা হাতে আমি
আমার চেয়েও বড়ো,
আমার আগে যারা জন্মেছে
আমার পরে যারা জন্মাবে
আমার সঙ্গে যারা বেঁচে আছে
তাদের সবার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
পতাকার মধ্যে ফুটে উঠছে।

এখুনি আমাকে খুলে বলতে হবে
এই পতাকার কোন দেশ নেই
সমস্ত পৃথিবীরই এই পতাকা
কিন্তু আমার হাত থেকে এই পতাকা
নিশ্চিত কেড়ে নেওয়া হবে,
তার আগে উড়িয়ে দিতে চাই
এই পতাকা হাওয়ায়,
সীমান্ত পেরিয়ে পেরিয়ে
পতাকা উড়ে বেড়াবে
এক দেশ থেকে অন্য দেশে।

অমৃত মাইতি

রাত্রির কড়চা

বৃষ্টি নামবে ঝাপটা মারবে পর্দা
মোমবাতি জ্বালাও
বিজলি খাবে অন্ধকার
ভয় ভীষণ—ওরা বাড়ি নেই
হাড্ডিসার খসখসে রাত
শকুনের পুকুরপাড়
জোনাকির নারকেল গাছ
ভোরের পালক উড়ছে
এবার দরজা খোল
ভয় পলাতক—বুক আশমান।

শংকর চক্রবর্তী

স্বপ্ন

একঘুমে চলে যাই নিমন্ত্রিত হয়ে ওই বাড়িটার কাছে
ভিতরে তখন স্বপ্ন তোলপাড় করে তোলে বর্ণহীন ছাতাপড়া চারটি দেয়াল
ধ্বংসের সীমায় আমি বসে আছি বাঁশি হাতে একা
আমার চোখের পাতা আব্রুহীন, শিশিরেই ভিজে থাকে ঘুমের ভিতর
আমি ভ্রমণকারীর মতো এ-ঘর সে-ঘর ঘুরি
ঘুরতে ঘুরতে যাই কাকতাড়ুয়ার কাছে, ছুঁড়ি লোকান্তরিত ফোঁপানি
ঘুমের পরেও ঘুম নিয়ে হাঁটি বহুদূর—স্তব্ধ পাতা নড়ে না কখনো
এ জীবনব্যাপী আরো দৃশ্য বাকি আছে—
খিলহীন ঘর থেকে আলো ছিটকে তার আঁচলের মিশকালো রং?
ওই ঘরে আমি এক পথভ্রষ্ট সারাদিন শুধু বসে থাকি
রবীন্দ্রগানের কাছে, কৃতাভিষেকের পর স্বপ্ন বুঝে নিই,
পালতোলা নৌকো করে ভাসতে ভাসতে ভাঙা ফেরিঘাট পেরোই তখন
একঘুমে যতখানি যাই নানা ঝোপঝাড় পেরিয়ে কিছুটা নির্জনতা,
তারও ঢের আগে ছিল ঘরের দরজা খোলা স্খলিত স্বপ্নের মতো সব
আমি উচ্ছ্বসিত হাত পাতি সে-নবীন বাড়ি আর বিষণ্ণ রূপের কাছে
এই একফালি ঘুম যেন আমি পুনর্বার হারাতে না দিই।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সবুজ ধানের শিস

জানালার পাশে এসে শুয়ে আছে শীতের দুপুর
বুকের নিয়ে অর্কিডের লাল
দেখা যায় অনন্ত আকাশ যেখানে স্তব্ধতার গুঞ্জন বারে বারে
উড়ে আসে ধীরে
শুনি তার মৃদুল গানের কলি যেন শতজল ঝর্ণার ধ্বনি হয়ে
কোনদিকে কতদূরে গড়িয়ে যাবে বাতাসকে গলাগলি করে এত সব
আমিও জানি না তা তুমিও কি জানো
অথচ আমি তো জানি রোদ্দুরের নিজস্ব সোহাগ আছে যে সোহাগে
শীতের দুপুর তার ভালোবাসা পায়
যাও না জানালা ছেড়ে কোনো সবজির খেতে আলস্যে গড়ানো
বাদামি গমের দানা সবুজের সাথে দুলে ওঠে যেন
ধানের শিস থেকে ঝরে দুধে ভরা কাঁচা ধান আর আলের ধারে
নুয়ে পড়া উচ্ছে লতা ও ঝিঙে লতা থেকে উড়ে যায় সোনালি ফড়িং

একটি গোপন কথা আজ প্রশ্নময় হয়ে ওঠে অযাচিত শীতের দুপুরে

শ্যামলকান্তি দাশ

মলিন মর্ম মুছায়ে

অন্ধকার হয়ে আছে মাঠঘাট.
অনেক অনেকদিন ঘরে কোনো মানুষ নেই,
কোথাও কোনো প্রদীপ জ্বলছে না।
গুমোট হয়ে আছে চারদিক,
কঙ্কালসার শরীর হাঁসফাঁস করছে,
দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রাণ।
কতদিন জল নেই,
শুশ্রূষা নেই,
সকালবেলার হাওয়ায় কোনো নতুনদিনের আভাস
ফুটে উঠছে না, দরজায় জানলায় ধাক্কা খেতে খেতে
বাতাস ফিরে যাচ্ছে।
বাগানে একটাও ফুল নেই, কুঁড়ি শুকিয়ে কাঠ,
জনমানবহীন সরু রাস্তায় গভীর হয়ে উঠছে
হাজার হাজার কাঁটাগাছ।
দূরে কোথাও ক্লান্ত ঝিমোনো গলায়
কতদিনের না-চেনা পাখি ডাকছে,
সঙ্গিনীর জন্য হাহাকার করছে,
সন্তানের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে প্রান্তর,
ছিঁড়ে ভেঙে যাচ্ছে আমাদের তাপিত বুক।
অনেক অনেকদিন ধরে কোনো চলাচল নেই,
স্পন্দন নেই, দরজা জানলা বন্ধ,
স্থির হয়ে আছে বাতাস আর গাছপালা,
একটু আলোর জন্য আমরা ছটফট করছি—
আলো চাইছি ঘরে বাইরে মাঠে প্রান্তরে,
আলোয় আলোয় আমাদের মলিন মর্ম বেজে উঠুক।
আমরা আবার কথা বলব গানের ভাষায়,
আমাদের সুর ছুঁয়ে যাবে জল কাদা ঘাস মাটি,
ধুলোয় ধুলোয় রোমাঞ্চ লাগবে,
শুকনো খটখটে মরা খাল আলোয় আলোয় সেজে উঠবে,
স্রোতস্বিনী হয়ে উঠবে!
আমরা আবার তোমার চোখে চোখ রেখে,
মাগো, নিজেদের খুঁজে পাব,
নতুনভাবে বেঁচে উঠব।

সুবোধ সরকার

আমাকে বোঝোনি তুমি

পুরোটা শরীর যেন পদ্মপাতা পুষ্করের যোনি
ঘাসে ঘাসে পথে পথে পায়ে পায়ে নক্ষত্র ফাল্গুন
আমার কপালদোষে আগুন জ্বালাতে গিয়ে তুমি আজ একা
আমার কপালদোষে ঘুঘু-ডাকা নির্জন দুপুরে
কী আশ্চর্য! তুমি হায় তুমি ভুলে গেছ আমি কোন
জেলা পরগনা থেকে, কোন ভূমিহীন কৃষকের অন্ন ছুঁয়ে
তোমাকে বলেছি, আমি ভালোবাসি। তুমি তার কতটুকু বোঝো?
তোমার অতল জলে, পুষ্করিণী, কতটুকু নীল দিঘি ছিল
কতটুকু উপত্যকা তোমার নাভির মতো ভেজা বসুন্ধরা?

আমি পরাজয় নিতে পারি না কখনো। আমি শুরু করি পাশা
শুরু করি মদ আমি, ধরি চুল, ডাকি ঝড়, নিজস্ব মৈথুন
তুমি যাকে ছেড়ে গেছ, সে তোমার কানা কৃষ্ণচুড়া
সে তোমার পরমাণু, সে তোমার জাতীয় সড়ক।

আমাকে বোঝোনি তুমি, পুষ্করিণী, আমি চেয়েছি ডুবতে।

কল্যাণ মৈত্র

ব্রহ্ম পথ

কি যেন শির শির করে, তাল সুপারি বুকে থরথর।
একটি নিশ্চিহ্ন পথের বাঁকে আমলকী পাতার মতো
সবুজ স্মৃতি কে যেন ডাকে, কে যেন ডাকে—এই যে
এখানে আয়! আমি দেখি নীল হাওয়ার সমুদ্রে মেঘের
মধ্যে অসংখ্য হারানো মুহূর্তের ভেতর আমার সেই পরিচিত
মুখ কখনও অন্ধকারে গভীর ঘুমের মধ্যে তার দুটি চোখ
হয়ে ওঠে 'নয়নতারা' জোনাকির মতো এক বুক আলো
নিয়ে সে তার উপস্থিতি আমায় জানিয়ে দেয়—এই যে
এখানে চলে আয়!
একতাল মৃত্তিকার মধ্যে ভস্ম ভরে—আমি আমার নাড়ির
যাবতীয় ভাষা ভাসিয়ে দিলাম জলে। তাকিয়ে দেখি
মধ্যরাতে আমার গভীর ছায়া আমায় পথ দেখিয়ে
নিয়ে চলেছে উজান অজানায়, দূরে, আরও দূরে
নৈঋতে অজানিত এক তারার কোলে একটি মুখ
আমায় হাত নেড়ে ডাকে ভোরের শিশিরের শব্দের
মধ্যে ডুবে রইল আমার সেই রাতের কান্না—
দে ঘাটের ঢেউ তখন পাড় ভাঙছে, আর সরে
যাচ্ছে উষালগ্নে নতুন কোনও উৎসবে জল ভরে
নিচ্ছে কলসি—
এই মাত্র আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছি।

অপূর্ব দত্ত

জোনাকি

কেবল জোনাকি দিয়ে যদি আলো জ্বালানো যেত তবে
এক লক্ষ জোনাকি দিয়ে আমি
ভরিয়ে দিতাম কলকাতার ফুটপাত।
আগামী রোববার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জোনাকিদের
সভা ডেকেছি ব্রিগেড ময়দানে।
দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে লাল পতাকা হাতে নিয়ে
মিছিল করে আসবে জোনাকিরা।
এর মধ্যেই জেনে নেব
বাবুইপাখি কেমন করে আলো জ্বালায়
নিরন্তর জোনাকি সংহারে।
তারপর ঈশ্বরের কাছে নতশির নতজানু প্রার্থনা—
আসন্ন নির্বাচনের আগে
কলকাতার সিঁথি থেকে মুছে যাক
আলকাতরামাখা এই প্রগাঢ় অন্ধকার।

সিদ্ধার্থ সিংহ

আমি ও আমার খোগু ২৫

কিছুদিন আগে আমার বোনঝির একটা ফোটোসেশন হয়েছিল
বাড়ির মধ্যেই
খোগুও ছিল
তার পরেই সেই প্রোফাইল দেখিয়ে
একটার পর একটা সিরিয়ালে ও মধ্যমণি
রোজই শ্যুটিং লেগে থাকে।
বাড়িতে আর থাকাই হয় না ওর।
লোকেরা যতই বাহবা দিক
আমরা যতই বড়াই করে বলি—ও আমাদের মেয়ে
কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরাও জানি কত মিস করছি ওকে।
সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয়
আশপাশে বসে সেই কথাগুলি খোগু হাঁ করে গেলে।

'অণু কবিতা'-র মতোই আমার আর একটি বই বেরুচ্ছে
লিমেরিকের—'একাই একশো'।
বইটি উৎসর্গ করেছি—
'আমার সবচে য়ে প্রিয় খরগোশ
যে আমার অনেক পাণ্ডুলিপি
কেটে কুটিকুটি করে দিয়েছে
সেই খোগুশোনাকে'।

বইটিতে দশজন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা থাকছে
উৎসর্গের পাতায় খোগুর একটা ছবি দিলে কেমন হয়!
এর সামনে ক্যামেরা তাক করতে গেলেই ও পালিয়ে যাচ্ছে
জোর করে বসালে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে
কিছুতেই ওর ছবি তুলতে দিচ্ছে না ও।

তব কি ও ভেবেছে ওরও ফোটোসেশন হচ্ছে!
এর পরেই একের পর এক সিরিয়ালে ডাক!
ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যাবে ও!
আর আমরা আমাদের ওই বোনঝির মতোই মিস করব ওকে!
মনে মনে গুমরাবো!
সেই কষ্ট যাতে না-পাই সেই জন্যই কি ও ছবি তুলতে দিচ্ছে না!

রাখাল বিশ্বাস

দুই হাতে কাঁপে

নিঃসঙ্গ মুখচ্ছবি দুই হাতে কাঁপে
তাকে তুমি ছেড়ে যাবে দেখেছি সন্তাপে
বেদনার এই দীন নিবিড় নিবিড়ে
মর্মমূলে জ্বলে ওঠে বিস্মরণে ফিরে
ব্যাকুল মায়াবী আলো অশ্রুজলে দেখা
পাহাড়ে পাথরে শুধু অগ্নি, জলরেখা
মুগ্ধতায় ভেসে গেছে প্রণম্য আঁধারে
তাকে তুমি ছেড়ে যাবে? যাও, দীর্ঘতারে..

আবদুস শুকুর খান

গন্ধ

আঘাত দেব না
আনন্দও না—
সমস্ত রাগ সমর্পণ করেছি অক্ষর প্রতিমায়

যদি কখনো দৈবাৎ এসে শান্ত বসো—
গভীর শূন্যতায় তোমার গন্ধ পাবে।

যদি, কোনো কিছু না পাও, জেনো—
তোমার মৃত্যু হয়েছে আমার ভিতর
আমাকেও পাবে না খুঁজে
এ পৃথিবীর কোথাও কোনোদিন।

দুজনের শূন্যতায় জেগে আছে কবিতার সুপ্ত অক্ষর।

ঈশিতা ভাদুড়ী

উপস্থিতি, অনুপস্থিতি

একটি উপস্থিতি
বর্গফুটের আয়তন ভরাট করে দিতে পারে কতখানি,
একটি অনুপস্থিতি
বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি
তুমি যাওয়ার পর জেনেছি আমি

একটি উপস্থিতি
সোনামেঘ আকাশ এনে দিতে পারে কেমন
একটি অনুপস্থিতি
আকাশ কালো করে দিতে পারে যেমন
তুমি যাওয়ার পর জেনেছি আমি

একটি উপস্থিতি
উঠোনে বৃষ্টি এনে দিতে পারে
একটি অনুপস্থিতি দেয় খরা ভীষণ
তুমি যাওয়ার পর জেনেছি আমি

একটি উপস্থিতি, একটি অনুপস্থিতি।

কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়

অধুনা অর্জুন

এখনও বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে
প্রতিপক্ষ নিজেকে গুটোবে
এখনও ছিলায় টান দিলে
রণভূমি নিমেষে জনশূন্য হয়ে যাবে

তবু তোলা থাক গোপন গাণ্ডীব
কঠিন বৃক্ষের শাখে।
বৃহন্নলার সাজে থাক
লুকোনো পৌরুষ।

তাকে চিনে নেবে কোন্ নারী
দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে যে নাকি
অনায়াসে তুলে দিতে পারে
তীক্ষ্ণ তরবারি।

জ্যোতির্ময় দাশ

ঈশ্বরের ঠিকানা

একটি জীবনমুখী কবিতা লেখার জন্য ইদানীং আমি
খোঁজ করছিলাম ঈশ্বরের বসতবাড়ির ঠিকানা
প্রবীণ মণীষীরা আমাদের শিখিয়েছিলেন—
শুধু মন্দিরের বিগ্রহে নয়
তিনি থাকেন প্রতিটি মানুষের ধর্মে এবং হৃদয়ে
আবিশ্ব এই চরাচরের প্রতিটি কর্মের মধ্যেই
থাকে তাঁর অনিবার্য প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি—

তিনি কি তাহলে লুকিয়ে ছিলেন আইলার বিধ্বংসী বন্যায়
তিনি কি রয়েছেন লালগড়ের প্রতিটি সন্ত্রাসের মৃত্যুতেও?
এর উত্তর সকলের জানা নেই—উত্তর যারা দিতে পারতেন
মধ্যমেধার এই অরণ্যে তেমন মণীষীও কেউ নেই আজ

অথচ একদিন তিনি ছিলেন গীতাঞ্জলির গানে
বঞ্চিত মূক অপমানিত সর্বহারাদের সঙ্গে

বৈভবের নৈবেদ্যে নয়, আজও হয়ত তিনি রয়েছেন
ফুটপাথে শুয়ে থাকা স্তন্যদাত্রী মাতৃত্বের মমতায়
গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের অন্য এক অমলিন দীনতায়...

অসীমকুমার বসু

ভাস্কর্য

অবতলের এই আশ্চর্য উড়ান
আমাকে বহুক্ষণ মুগ্ধ করে রাখে
নীরব গতিবেগের অসামান্য ঝংকারের রেশ
এখন ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে
মনে হচ্ছে ঘরের চারটি দেওয়ালই
ক্রমশ খুলে যাচ্ছে
অরণ্য ও নিসর্গের হালকা নীল আলো
এসে ঢুকছে ঘরে
আর সেই বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যিখানে
পাথরের অপরূপ বিভঙ্গ
ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে রহস্যময় বিভায়

আশিস মিশ্র

অঙ্কের গল্প

অঙ্কের ইতিহাস জানার
জন্য তোমার কাছে যাই না;
অঙ্কের শস্য কীভাবে ফুল
দেবে, ফল দেবে
সেই সব আজ বলো তুমি—

তুমি বলো, অঙ্ক শুধু সত্য—
অষ্টের মুদ্রায়
তাকে তুমি সহজ করেছো।

আমি তারপর
অঙ্কগুলি আঁকি
অঙ্ক আঁকতে আঁকতে মুখ
হয়ে যায়; মুখ
আঁকতে আঁকতে
অন্য ছবি—যেন মানচিত্র
সারা শরীরের।

তুমি বলো, শরীরের মধ্যে
সব অঙ্ক কী গোপন—সেই
অঙ্ক ভুল হয়ে গেলে মিথ্যে
হয়ে যায় জীবন-যাপন।

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষেপি আমার

শাওন গেল, ভাদর গেল, পুজো যখন দোরে
হঠাৎ দেখি অভিমানী নাচছে সে এক ভোরে।
উড়িয়ে আঁচল কালচে ধূসর, একটু অবশেষে—
ঝপুত করে বর্ষা আমার, নামলো কাছে এসে

মনটা কাঁদে, মনটা হাসে, মনে ওড়ে কাব্য
তোকে ছাড়া বল না ক্ষেপি, কাকে নিয়ে ভাববো?
মানিনী তুই কোথায় ছিলি? বল না ওরে মেয়ে?
জানিস না তুই ছড়িয়ে আমার সুপ্ত হৃদয় ছেয়ে?

ফুঁপিয়ে ওঠে অভিমানী, বাঁধ মানে না কান্না
দুচোখ বেয়ে উপছে নামে হরিৎবোনা পান্না।
যত পারো পুড়িয়ে মারো, উষ্ণায়নের ঠেলায়
ক'দিন পরে দেখবে আমায় যাদুঘরের মেলায়।

গণেশ ভট্টাচার্য

শব্দ

সকালবেলা ওখান দিয়ে গিয়েছিলাম
তুমি আমার সেই যাওয়াটা দেখতে পাওনি

একটি ফ্ল্যাটবাড়ির
গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল তোমার মুখ
বাইরে তখন হাওয়ারা সব কৌতূহলী
বৃষ্টি নামে কি না

বৃষ্টি একটু পরেই নামল
ধুয়ে নিল আমার পায়ের শব্দ
ঐ রাস্তা থেকে
আমার ওই যাওয়াটি
আর কখনো দেখতে পাবে না
তোমার জন্য রাখছি
তার পরের যাওয়ার শব্দ।

চন্দ্রা মজুমদার

ভাঙা দেশ

একটা জমি টুকরো হল
রইলে তুমি ওপার
এপারেতে একলা আমি
কেমনে হব পার?

একটা রুটি দু-আধখানা
পেট ভরে না কারও,
কপালদোষে হলাম পৃথক
দুঃখ বাড়ে আরও।

এতদিনে সুযোগ এল
এপার থেকে ওপার
মাটির টানে রক্ত টানে
হলাম ঘরের বার।

জ্বলল আগুন পুড়ল এ মন
তবু থামায় কে?
ওপারেতে ভাইটি আমার
হাত বাড়িয়েছে!

কালিদাস ভদ্র

বাহার

যে সব রং দিয়ে গাছ এত ফুল ফোটায়
তার বাইরে আমাকে ওড়ায়
ঋতুতে ঋতুতে নানান গন্ধ
আমাকে প্রেমিক করে।

ফুলের এত না বলা কথা
প্রজাপতি, মৌমাছি সব জানে,
গাছের শাখাপ্রশাখায়, কোটরে
এত যে পাখি বাসা বাঁধে
তারা জানে গাছের ভালোবাসা।

প্রজাপতি, মৌমাছি, পাখিদের কা[illegible]
আমি গাছের অব্যক্ত ভা[illegible] শিখছি,
সেই ভাষায় মাটিতে
আজ কবিতা লি[illegible]
ফুলের পাপ[illegible] মতো স্বরবৃত্তে।

অমিত কাশ্যপ

সহাবস্থান

রাত শুয়ে আছে রাস্তার ওপর
চমৎকার চিৎ তার শোয়া
উপরে তার আকাশ
আকাশভরা মৃদু আলো, মায়ালোক

এই আমি মায়ালোকে ভেসে যাব
রাতেই শুধু, তোমায় সঙ্গে নিয়ে রাস্তা
রাস্তা তুমি খুলে ফেলছ অনন্ত শরীর
শরীর জুড়ে, শরীর ছুঁয়ে এ কি প্রগলভতা

আমি আচমন সেরে নি
আমি ব্রাহ্মমুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করব
কোন এক সন্ধিক্ষণে তিনি এসে দাঁড়াবেন
রাত-রাস্তার বুকে, নির্মল হাতের স্পর্শ দিতে

আমরা অপারগ এক শোভা থেকে
তিনি ডাকছেন, তিনি শোনাচ্ছেন
এক মন্ত্র খুলে খুলে যাবার, হৃদয়ের দরজা
যা খোলাই তো ছিল, অহোরাত্র, অনির্বাণ

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

অলৌকিক সেতু

মানুষের হৃদয়ে রেখে যাব জমি
আগামীর জন্য অতলান্ত গভীর বিশ্বাস
সে অমল বিশ্বাস নিয়েই মানুষ
ফোটাবে নতুন ফুল
গাঁথবে আলোর মালা...

মানুষের ভেতরেই আছে নন্দিত কানন
মোহময় জ্যোৎস্না
আত্মিক উদ্ভাসে মানুষই গড়ে
বিশ্বময় অলৌকিক সেতু

যা কিছু অন্ধকার, পরিপন্থী সভ্যতার
তার বিনাশ শুধু সময় অপেক্ষা
মানুষ রয়েছে জেগে বুকে নিয়ে স্বপ্ন অফুরান...

আলোকিত মানুষই বয়ে নিয়ে চলে
স্রোতস্বিনীর প্রাকৃত ধারা
উষালগ্নের প্রথম গীতিকা...

মানুষের হৃদয়ে রেখে যাব জমি
আগামীর জন্য অতলান্ত গভীর বিশ্বাস।

দেবাশিস প্রধান

বেলদায় আড্ডাবাজ

রেলপাতে পা ছড়িয়ে বসে আছি
অক্ষরজীবীরা
তাদের তুমুল আড্ডার বৃষ্টিতে ভিজে
ভিজে সপসপে হচ্ছে রেলকলোনির গাছপালা...
টিউশন ফেরত বর্ণোজ্জ্বল পোশাকি পরীরা
পুবদিকের গড় ভাঙতে ভাঙতে শহরের
লালধুলোর সরণি ফাটিয়ে
দু-দশটা বক হিসহিস শব্দে উড়ে যাচ্ছে দিকচক্রবালে

ওদিকে ডুলুং-এর ঠোঁটে
অক্ষর যাপনের অপাপবিদ্ধ মুখগুলি
ঢুকে পড়ছে সুবোধ মল্লিকা মায় জয় কীর্তনে
কাটাছেঁড়া চলছে চলুক। তারপর তড়িঘড়ি
পাছা ঝেড়ে, চোরকাঁটা ছাড়িয়ে উঠে পড়ি
খড়্গপুর লোকালের পেটে
এসব দেখছে খুব তারিয়ে তারিয়ে আর
আমাদের অশ্রুলিপি নদী ডানা সংস্কৃতির হাড়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, দান্তে বা গ্যেটে...

জয়ন্ত রসিক

চলমানের ডাক

ঘুম ভাঙলো মিষ্টিমধুর আবেশ নিয়ে.
পাহাড়ের গায়ে সকালের সোনা ঝরছে...
কথা দিয়েছ তুমি আসবে চলমানে,
আসবেই বিশ্বাসে প্রতীক্ষা আমার
সুরের আবেশ ছড়িয়ে নড়ে উঠল চলমান
আগ্রহভরে সংযোগ করলাম...
ওপারে অন্য কণ্ঠস্বর ...
উষ্ণতায় বরফ পড়ল যেন।

উৎকণ্ঠায় সকাল গড়াল দুপুরে।
বহুবার কেঁপে উঠল চলমান
অফিসের বড়বাবু থেকে পাওনাদার।
প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল না একবারও
তবুও প্রতীক্ষা...
হয়তো আসবে তুমি
হয়তো নয়. আসবেই তুমি।

দুপুর গড়াল সন্ধ্যায়
দিনের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে
মনের রোশনাই থিতিয়ে বরফ
হতাশা আর অবসাদে
বিবর্ণ প্রাণহীন শঙ্কিত আমি—
হয়তো ভুলে গেছো
তবুও প্রত্যাশা পল গুনছি।

শ্যামলকুমার সরকার

শুভেচ্ছা

পরিবর্তনের ঢেউয়ে
আমরা ভেসে চলেছি
আমাদের অভীষ্ট পথে,
লক্ষ্য স্থির,
উচ্চাশা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব
সব বাধা কাটিয়ে
হয়তো সফলও হব
তবু সাবধান!
বিপদ আমাদের পিছু ধাওয়া করছে
'শুভেচ্ছা'-বার্তাও কখনো কখনো বিপদ ডেকে আনে।

গুরুদাস রায়

নীরেন্দ্রনাথের উলঙ্গ রাজা

গাণ্ডু, গবেট, শিয়াল প্রজা, শোন্‌রে ভেড়ার পাল,
রাজার সমুখে তোদের প্রাণ হয় কেন উত্তাল?
সর্বকালে রাজাই তোদের করেছে নিঃশেষ,
তবুও কি রাজার প্রতি, নেই কোন বিদ্বেষ?
গ্রাসিল রাজা সুকৌশলে, জমিজমা অর্থ গোলা,
তোরা পাষাণ নিথর সম, কভু কি লাগে বিষম দোলা?
রাজার ভরা দরাজ গলা, ভয়ে তোরা কুঁকড়ে থাকিস,
ছোট বড় পুরুষ নারী তাকে সবে মাথায় রাখিস।
তোদের ধনে পোদ্দারি তার, শৌখিন বস্ত্র জুতা জামা,
নোংরা বস্ত্রে কাটাস জীবন, কেবল তাতে লাগছে সামা।
রাজার দেখি নধর দেহ, উৎকৃষ্ট সব খাবার খেয়ে,
শাকান্ন তাও জোটে নাকো, রুগ্‌ণ, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত দেহে।
শিক্ষা অর্থে বঞ্চিত হয়ে, তোরা গেলি রসাতলে,
রাজ, আদেশ পালতে যেয়ে, মরলি পিষে জাঁতাকলে।
আ-তু করে ডাকলে খেতে, আসিস সরে একই পথে,
বিপদে তার একটি ডাকে, দেখি তোদের সামিল হতে।
রাজা তোদের "মহাজাতক", মানিস তাকে, অন্ধ স্তাবক,
দোষ নহেকো তাহার কোনো, তোরা যে সব প্রজা-শাবক!
বিদ্রোহ সব দমন করে নিপুণ হাতে দেয় সে সাজা,
পশার সহ বিপুল খ্যাতি, "নীরেন্দ্রনাথের উলঙ্গ রাজা"।

শান্তনু ঘোষ

মাওবাদী

একদিন ইনক্লাব জিন্দাবাদ এই স্লোগানে
ফাটিয়েছি আকাশ,
বামপন্থী সেনা হিসেবে পেয়েছিলাম সাংগঠনিক সমর্থন,
লালবাড়িকে ভেবেছিলাম নিজের বাড়ি।

ভাবিনি একদিন আমারও দেওয়ালে ঠেকে যাবে পিঠ
ওরা এখন দালালের পক্ষে
ওরা এখন প্রমোটারের পক্ষে
এখন ওরা হার্মাদবাহিনী
ওরা নীতিহীন—মিথ্যাচারে ভরা
বাংলার অবক্ষয় ওদেরই হাতে,
শোষিত-বঞ্চিত মানুষের তাই ঘৃণায় ভরা চোখ।

আর একত্রিত হয়ে যখন গর্জে উঠেছি
যৌথবাহিনীর গুলি খেয়ে মরার আগে বলছি,
ওদের জিজ্ঞেস করো, মাওবাদী কারা বানালো?

বিবেক চৌধুরী

অভিমানের সঙ্কেত

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সচকিত চাহনি
তবুও বলার তাগিদে কিছুটা সপ্রতিভ,
বেশ বোঝা যায় কোন এক অজ্ঞাত কারণে
অতীত তোমার কাছে মূল্যহীন।
ভালবাসার দলিলে ঋদ্ধ সেই সব পত্রাবলী
মূল্যবোধের সীমা ছাড়িয়ে অর্থহীন,
জীবনস্মৃতি মন্থনে উঠে আসে
আনন্দঘন মুহূর্তের পরম্পরা
আবার কখনো বিষাদের কালোমেঘ।
কাউকে ভালবাসতে হলে সম্পূর্ণভাবে জানা
তার গতিপ্রকৃতির ধারাবাহিকতার রেশ
প্রাসঙ্গিকতার আওতায় পড়ে না।
বাস্তবের ভয়াল রক্তচক্ষুর প্রক্ষেপ,
সাময়িক ছেদ পড়ে দানা বাঁধতে
ব্যতিক্রমী মনোভাবের স্ফুরণ
প্রতিশ্রুতিগুলো সঠিকভাবে ডানা মেলে
স্বচ্ছভাবে জেগে ওঠে ভালোবাসার অনুরণন
আর তখনই বুকভরা নিঃশ্বাসের আশ্বাস
চোখের সামনে ভেসে ওঠে বেঁচে থাকার রংরূপ।

বিহঙ্গ নন্দী

পরম্পরা

সেই ত্রেতা যুগ থেকেই তো
ভুলের শুরু।
সীতা কেন অগ্নী পরীক্ষা
মেনে নিলো!
কেন তর্জনী তুলে বললো না—
সমাজ আর পুরুষের
এই বর্বরতা বন্ধ হোক!
না হলে অযোধ্যাপতি
রামকে আমিই করবো ত্যাগ—
তারপর দ্বাপরে,
বিবস্ত্রা হতে গিয়ে পাঞ্চালী কেন
কাঁদতে কাঁদতে
সখা কৃষ্ণকে ডাকতে গেল!
সপাটে চপেটাঘাত
করলো না কেন
ধৃতরাষ্ট্র আর পঞ্চ স্বামীর গালে!
যাজ্ঞসেনী, দুহাতে অনাবৃত বক্ষ ঢেকে
শুধু কাঁদলোই।
কর্ণ, দুঃশাসন সহ একদল মত্ত জুয়াড়ী
উপভোগ করলো!

কলিতে হবেনা কেন,
কন্যাসন্তান গর্ভে নেয়ার অপরাধে
ভ্রুণহত্যা! বধূ-হত্যা! নির্যাতন!
অন্যায়ের পরম্পরা তো চলবেই—
কলির দ্রোপদী আর সীতা
এমনি করেই মেনে নেবে
পুরুষের সব স্বেচ্ছাচারীতা।
কাব্যে বিকশিত হবে নারী স্বাধীনতা!

সুদীপ বিশ্বাস

জীবনের রং-তুলি

গোপনে গোপনে ভেঙে যায় প্রেম
নিজের সম্পর্কে নিজেরিই তৈরি করা
মিথ ভেঙে জন্ম নেয় অন্য এক মিথ
রূপান্তর ঘটে অগোচরে নিভৃতে
জীবনের রং তুলি শেড বদলায়,
প্রবল আকর্ষণে পুরুষ হয়ে উঠি একদিন।

ভুরু কোঁচকানো জীবনে রং খুঁজে পেতে
আত্মপ্রেমের মহার্ঘ পারিতোষিকে
সাজাই নিজেকে অপরাহ্ণে আমি, মহানির্বাণের
আলোকোজ্জ্বল পথে, অদ্ভুত জেসচারে,
মিথ ভেঙে জন্ম দিই আত্মজন স্পৃহা।

আমার মন খারাপগুলো ঝেড়ে ফেলে
বৃষ্টির সোঁদাগন্ধ মেখে সমস্ত শরীর সাজাই—
সম্পর্কের ভ্যাকুয়ামগুলো মুছে ফেলি
সংগোপন শ্মশান নিয়ে জেগে উঠি আবার
নিষেধের চৌকাঠ ডিঙিয়ে পথ চলি
নতুন জীবনে গন্ধের ইরোটিসিজমে।।

রঞ্জন ব্যানার্জি

রীতি

তুই তো মা যাবি চলে
লাল টুকটুকে শাড়ি পরে
ফুলের মালা, গয়নাগাঁটি
বরের সাথে গাড়ি চড়ে।।

তুই তো মা যাবি চলে
আমার ঘর ফাঁকা করে
কার সাথে খেলব মাগো?
কে হবে আর ঘোড়সওয়ারে।।

দৌড়ঝাঁপ—হই হুল্লোড়
সবাই করবে মজা
এরই মাঝে লুকিয়ে আছে
কন্যাদানের সাজা।।

তুই তো মা যাবি চলে
হব আমরা পর
বুঝতে এবার পাচ্ছি মাগো
সইছে না তোর তর।।

সুখে থাক ভালো থাক
করিস বাবাকে দেখভাল
ব্যাটার ব্যাথা? ও কিছু নয়
এটাই যে তার কপাল।।

আবার যেন পাই মাগো!
জনম জনম ফিরে
দু-হাত বাড়িয়ে রাখব তোকে
বুকে জাপটে ধরে।।

তপন পাল

পোড়া মন

আগুনকে সাক্ষী রেখে
ছিল তোমার অঙ্গীকার
সাত-পাকে বাঁধা
পথ চলার
পথ ফুরাবে না কখনো
সাথে থাকবে চিরকাল
সঙ্গী হয়ে
জীবন হয়ে
মিথ্যে সব,--
অশান্ত চেতনার স্বার্থভরা গান
কেবলই মিছে আহ্বান
এখন ভাঙা মাস্তুলের মতো
বয়ে যায় মন,
জীবনের অন্ধকার খোঁজে চোরাগলি
অভিশাপ লাগে পায়ে পায়ে
হেরে যাওয়া বুকের যন্ত্রণার সুখে
সে আগুন আমাকে পোড়ায়
মিথ্যে জ্বালে,—
সুখ ছিল না কখনো
চাইনি তারে
শুধু চেয়েছিলাম মনের অধিকার
আকাঙ্ক্ষার আবিষ্কারে
এখন মুক্তির পায়ে পরাধীন শৃঙ্খল
জল—জল—সবই জল
সবই মাটি
সবই ছাই
সবই ধোঁয়া
বেপরোয়া ....

শাশ্বত হাজরা

সীমাবদ্ধতা

নীলনদের জলে তোমার কঠিন অবয়ব
মন-ফল্গুইয়ের কানা ঘেঁষে ঘেঁষে
বারবার শুধু পিছলে যায়,
আলগা বাঁধনে হাঁপিয়ে ওঠে
বুকের ভিতর নিশ্বাসের গোপন বসবাস।

আয়োজনের ঘাটতি ছিল, ছিল ভয়
তবু ঘুঁটে কুড়োনির রাজকীয় স্বপ্নে
জাগিয়ে রেখেছি রূপকথা-রাত।

তোমার লোভী আঙুল আকাশ ছুঁতে চায়
তাই সমস্ত চর্বি-রস নিংড়ে নিংড়ে সারারাত
মঙ্গলকামনায় নিষ্পেষিত আলপথে—
জ্বালি দীপ পাতি বুক।
আমার ছোট্ট আঁচলে চিকচিক করে
ভালোবাসার নবদিগন্ত।

বৃন্তছেঁড়া প্রভাত, আগুন উৎসবে পিপীলিকা
নিস্পন্দ জ্যোৎস্না, বেদনা-মেশা ভয়
নতুন ফুরিয়ে দিগন্তের ওপারে হাতছানি
মুছে যাওয়া কালপুরুষে সু-রঞ্জন নিরুদ্দেশ।

ফুরিয়েছে দহনবেলা, রিক্ত আগামীতে কসাইয়ের কোপ
তবু পড়ে আছে শূন্য হাত, সীমাবদ্ধ দিগন্ত
শেষ রাতের হিম, চুমকি খষা আঁচল।।

ঈপ্সিতা দত্ত

ভাষা শহিদ স্মরণ

আমরা বাঙালি ভুলতে না পারি
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
জীবনের ছন্দে চলে পথ সঙ্গে
ভাষা মাধুরীতে সে বিশ্বে প্রথমা।
সিক্ত নয়নে স্মরণ করি
বহু শহিদের প্রাণ হারানো একুশে ফেব্রুয়ারি
জীবন দিয়েছে কত তাজা জান
রক্ষা করেছে বাংলার সম্মান।
শত্রু বুলেটে ঝরেছে রক্ত
মায়ের কোল হয়েছে রিক্ত
হয়নি শির তবু যে নত
সেলাম রফিক-সেলিম-জব্বর-বরকত।
আমরা বাঙালি, ভুলতে না পারি
ভাষা শহিদের বীর জওয়ান
ধন্য তোমরা, ধন্য আত্মা
ধন্য শহিদ অমর প্রাণ।

অমর্ত্য ভট্টাচার্য্য

কনীনিকা

দেখতে চাইছি আমি,
তোমার মুখটা নীলচে চাঁদের আলোয়।
অন্ধ হয়ে জন্মেছি পৃথিবীতে,
নিরপেক্ষ ভাবে জীবন দেখব বলে।
পশ্চিমমুখী হাওয়ায় উড়ুক চুল,
অন্ধকারকে ভয় পাই না আমি।
সম্মুখে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ স্থির,
আর প্রতিক্রিয়াতে আমি যে অস্থির—
নিষ্ঠুর ক্রীড়াঙ্গনে।
তুমি কি চাও না জোয়ারে ভেসে যেতে,
নীল নীলিমায়, সবুজ স্বাধীন ক্ষেতে?
আমার মতই চাবি-হারা সিন্দুকে,
ভ্যাপসা আবহে ভেপসে যেতে চাও?
তখনই আমি চিনতে পারব তোমায়,
যখন তুমি উজাড় করবে বক্ষ।
তখনই আমি স্পর্শ করব তোমায়,
চাহিদায় যখন আর্দ্র হবে ওষ্ঠ।
আমায় বলতে পারো কেমন লাগে,
নতুন দিনে ভোরের প্রথম আলো?
আমার কাছে তো রাত দিন এক,
নয়নে শুধুই অসীম অতল কালো।
কি করে দেখব আমি?
কিরণ সইতে পারে না কনীনিকা।

দিলীপ রক্ষিত

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প

আছি এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে
যেখানে রক্ত ও বিভীষিকা খেলা করে
একে অপরের সাথে!
যেখানে মেঘেদের গুঞ্জন নেই
নদীগুলো সব হারিয়ে গেছে
মরুভূমির বুকে—
সেখানে ফুলে ফুলে সংঘাত
হানাদার সন্ত্রাস রাত!
সেখানে হারিয়ে গেছে
সমস্ত পথ—
হাতে হাত ধরে আছে যন্ত্রণা
দুঃখ ঢুকে আছে কোষে কোষে
চারিদিকে কত নক্ষত্রদের উৎসব।
তবু পড়ে আছি শ্বাসরুদ্ধ এই
বদ্ধ স্যাঁতসাঁতে বিবর্ণ
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

রীতা মণ্ডল

তোমার ঠোঁট

ঋতু পরিবর্তনের সাথে রঙ বদলায়
বসন্ত কড়া নাড়ে গোপন দরজায়
তখন তোমার ঠোঁটে ছিল নতুন প্রেম
নাভিমূল থেকে শরীরের অলিগলি
রাতভোর আঁকিবুঁকি খেলে যাও,
কবিতার দেওয়ালে।
তুমি মেঘভাঙা রোদ শরীর জুড়ে—
অপেক্ষায় থাকো।
স্বাধীনতা পেয়েছ বলেই উন্মুক্ত আকাশে
উড়তে পার, তবে স্বেচ্ছাচারী সীমারেখা
থাকা দরকার।
জীবনের চাকা, গণ্ডীর দেওয়াল ভেদ করে
গড়তে চাও গোধূলির ম্লান আলোর সেতু,
স্বপ্নেরাও ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে, মাঝনদীতে।
তোমার অরূপ হাতের ছন্দগুলো মৃদু মৃদু
সুবাস ছড়ায়, তীব্র বাতাসে,
গোপন দরজায় কড়া নাড়ে, প্রাপ্তবয়স্ক।
কবিতার নাট্যমঞ্চে স্বপ্নজাল বুনতে থাকো —
আর ফাঁস হয়ে আমাকে জড়াও,
তখন তোমার ঠোঁটে নতুন প্রেম।

সুমি দে

উত্তরহীন জিজ্ঞাসা

তোমরা কি কেউ জানো,
তাকিয়ে দেখো। আমাকে চিনতে পারছ?
এই সেই গ্রাম, যেখানে মাটিতে আমি
খেলা করেছি, বড় হয়েছি সবার সাথে।
একরাশ কালো চুল মেলে ঝাঁপিয়ে
পড়েছি পানাপুকুরে। কলমিলতা, শালুক
তুলেছি কোঁচ ভরে। কখনো বিনুনি দুলিয়ে
ছুটেছি সন্ধ্যাপাড়ার মাঠে।
তোমরা কেন চিনতে পারছ না?
আমি যে তোমাদের!
শুধু মাঝখানে ছাপা কাগজের ব্যবধান।
এর জন্য কি আমি দায়ী?
তোমরাই তো, তোমরা এই ভদ্র মুখোশ পরা
সমাজ, গান্ধীমার্কা কাগজের সাথে
মূল্য দিয়েছ। মনের সাথে নয়।
এ জীবন চাই না। আমি তোমাদের হতে চাই।
তোমরা কি আমার কথা শুনতে পারছ?
দিনের আলোতেও কেন চিনতে পারো না?
আমি মানুষ, আমারও একটা মন আছে।
নিরুত্তর দমকা হাওয়া, একঝাক মেঘ
নিয়ে ঢেকে দিল সূর্যের আলো।
এক পশলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিল।
পায়ের তলার মাটি।

বিপুলকুমার ঘোষ

কোজাগরীর চাঁদে লেগেছে কলঙ্ক

কোজাগরীর চাঁদে লেগেছে কলঙ্ক;
যেন শ্রাবণের শেষ বর্ষণে গাঁয়েগঞ্জে বানভাসি
নদীর কলহাসে ভয়ার্ত অগুনতি জায়াজীব।
জলমগ্ন ধানক্ষেতে প্রহর গড়িয়ে যায়
কবন্ধ মোষের পিঠের মতো চামচিকে অন্ধকার
ছড়িয়েছিল পিতৃপক্ষে বোধনকালে।

কোজাগরীর রাতে আসে না লক্ষ্মীপেঁচা
জলে ভাসা বেহুলার ভেলার মতো বেওয়ারিশ
শবগুলোর খোঁজে শকুন ওড়ে দিনভর।
জীবনানন্দ, তোমার রূপসী বাংলায় আজ
জল টই-টম্বুর হাহাকার ...
শঙ্খচিল উড়ে উড়ে কাঁদে অন্নহীন দেশে।

নজরুল, তোমার সোনার বাংলায় গহীন
জলের নদীর বুক জুড়ে হাহাকার
পদ্মার ঢেউ নিয়ে গেছে কত শূন্য হৃদয়পদ্ম
হংসমিথুনের দৃশ্য আপাতত অদৃশ্য;
কোজাগরীর জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে বৈপথু হওয়া
আর সাজে না তোমাদের দুজনের একটা শতক
পেরিয়ে। দুজনের কবিতার বানভাসি আমাদের
হৃদয়ে।...কোজাগরী চাঁদে বুঝি লেগেছে কলঙ্ক।।

সুশান্তকুমার কীর্তনিয়া

ইচ্ছে ছিল

তুমি ঘুমিয়েছিলে আনমনে,
পাশবালিশ ছড়িয়ে ডানকাতে,
ক্লান্ত হয়ে বিছানায়;
মোহময় লাগছিল তোমাকে।
ভাবছিলাম তোমার ডানপাশে
শুয়ে আদর করি তোমাকে !
ইচ্ছে ছিল,
যায় না ছোঁয়া সবসময়
এ পৃথিবীতে।
বুকভরা ভালবাসায়, মালা—
গাঁথব তোমার—প্রতিদিন।
এ আশায় কাটাই জীবন :
তোমায় ভালবেসে
পেয়েছি ভুল প্রতিশ্রুতি—অঙ্গীকার
ব্যথাবেদনার সমাহার।

শুভময় চট্টোপাধ্যায়

শরতের সোনা রোদ

সারি-সারি সাদা বক
দেয় উঁকি-ঝুঁকি।
শরতের সোনা রোদ
আনে অনুভূতি।

মেঘে-মেঘে আলপনা
ঢাকে কাঠি পড়ে।
মাঠে-মাঠে কাশফুল
সোনা রোদ ঝরে।

লোকমুখে আনন্দ
হাসি-খুশি লেখা।
সাতরঙা রামধনু
শিশিরের রেখা।

ঢেউ জাগে নদীজলে
পূর্ণিমা আলো।
পুজো-পুজো কলরোল
ধূপ-দীপ জ্বালো।

নবীন চক্রবর্তী

শুদ্ধেন্দুলোকে

(সুচিকিৎসক ডাঃ শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তীর প্রতি,
স্নায়ু ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

শুদ্ধ ইন্দু সমগৌর দেহ অনুপম।
আলো বিকিরণ জালে অপসৃত তম।।
সুভাষিত-সুভাষণে মোহিত মানব।
চিকিৎসাবিজ্ঞানে সুবিদিত গৌরব।।
আরোগ্যলাভে কৃপা করুণা সুবান্ধব।
দুঃস্থজনে সেবা নির্ণয় অভিনব।।
বদন কমলভালে সৌম্য-শান্ত ছাপ।
সুলভ-প্রাঞ্জলে হয় কি সে পরিমাপ!!
সুস্নিগ্ধ লোচন—বিগলিত মন-প্রাণ।
অবিস্মৃত রবে—অতি প্রিয় অবদান।।
সুভাব-সুকণ্ঠ-সুললিত ব্যবহার।
মুহূর্তে ভেঙে দাও অন্ধ-তামস দ্বার।।
দুর্বল দেহতরী ঢেলে সাজ ভুবনে।
রূপশ্রী-রূপরেখা নব ছবি অঙ্কনে।।

অরূপ দাস

মেয়েলি তরুণদের আড্ডায়

শুধু চুল ছেঁড়াটাই বাকি ছিল,

একের পর এক সূত্র বিফল—
কিছুতেই মিলছে না অঙ্কটা,
একে একে সবাই চেষ্টা করল।

না, সমাধানের ছিটেফোঁটা আশা নেই।

কি করা যায়, ভাবনাচিন্তা তো আর
কম হল না! সবার মুখে হতাশার ছায়া।

একজন গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, আলোচ্য সঙ্গীকে,
তুই তো দেখলি, আমরা সব্বাই মিলে
চেষ্টা করেও সমাধান বের করতে পারলাম না।
তুই তাকে ভুলে যা, লক্ষ্মীটি...

আলোচ্য সঙ্গীর চোখে তখন মেঘ গভীর।
চোখ দিয়ে পড়ছে এক-এক করে জলের বিন্দু,
এক-একটি বিন্দুতে ফুটেছিল
মধ্যবয়স্ক লোকটিকে নিয়ে দেখা এক-এক স্বপ্ন।

আশুতোষ মণ্ডল

একমুঠো আলো

আকাশে যখন অন্ধকার নেমে আসে
পাখিরা সব বাসায় ফেরে
পথচলতি মানুষ অতি ব্যস্ত
বাসে ট্রেনে ঠাসা ভিড়।

তখনও আমি ঘটনার সাক্ষী
গোনা সময়ের নিপুণ দৃষ্টিতে।
যদিও—
খসে পড়া পাপড়ির মত কত ঘটনা হারায়
সব পিছনে ফেলে চলে সময়।

পাওয়া না পাওয়া সব ভুলে
আবার সেই কাকভোরে
একমুঠো আলো এসে দরজায় কড়া নাড়ে
নিঃস্তব্ধ রাত্রির পর।

প্রদীপ দেবনাথ

কবিশ্রেষ্ঠ

কবিগুরু বাঙালির কাছে তুমি পূজনীয়
তাই ২৫শে বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ স্মরণীয়
বছরের বাকি দিনগুলি
সত্যি কথাটিই বলি
তোমার ছবিতে যদিও পড়ে ধূলি
তাই বলে তুমি পেও না কষ্ট
সবার কাছে তুমিই কবিশ্রেষ্ঠ।

অশোক কুমার সাস্তারা

স্বার্থপর

দীনেশ্বর নামটি রাজার!
দানধ্যানে তাঁর মতি নাই,
নিজের ভালো কীসে হবে
সেই ভাবনায় দিন যে যায়।

অন্ধজনে ভিক্ষা মাগে
সেদিকে দৃষ্টি না ফিরায়,
বিগ্রহের মাঝে ঈশ্বর আছে
এ ভাবনা প্রাণে বায়।

সার অসারের বিভেদটুকু
যে না জানে অন্তরে,
মাথা ঠুকে মরলে পরে
পাবে না খুঁজে ঈশ্বরে।

সাধের দেহ ধরলে ঘুণে
প্রাণভোমরা যাবে উড়ে,
থাকবে পড়ে দেহখানি
যাবে মিশে ধূলার 'পরে।

স্মৃতিখানি থাকবে পড়ে
ভালমন্দের কর্মফলে,
কীর্তি মাঝে থাকবে বেঁচে
পৃথিবী লয় না হলে।

প্রীতম পাল

তোমাকে, নির্জরা

নির্জরা, পদস্খলন হতে পারে
আমিও জানি
তবু ভালবাসার মানচিত্রে
দিগ্বিজয়ের চিহ্ন ছিল না কোথাও

ব্যবহারের পকেট থেকে
ভালবাসা ধার নিচ্ছ আজ?
উপাখ্যান খুঁজে চলেছে
পিরামিডের গভীরে ঢোকার পথ
মমি হয়ে যাওয়া দুপুরগুলো
টুকরো চিঠি বুকে বেঁধে
চিৎকার করে—‘‘অশ্বত্থামা হত’’

যাহোক, এবার উড়িয়ে দেবে ঘুড়ি
এবার বাড়ি ফিরব অন্ধকারে
বৃষ্টি হয় ... বৃষ্টি হচ্ছে ... বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও
ভালবাসার মানচিত্রে মুছে যায় সংকেত
স্পষ্ট হচ্ছে সাপ-লুডোর ছক
খেলতে বসেছে স্বপ্নে-দেখা প্রেত।

অনুপম বিশ্বাস

সমাজের ময়নাতদন্ত

লাশকাটা ঘরের দরজায় মাথায়
হাত দিয়ে, মুখ চুন করে বসে
থাকে হীরা ডোম।
চেনা পৃথিবীটা কেমন যেন
অচেনা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে!
সকাল থেকে একটিও শবদেহ
আসেনি। এমন দুঃস্বপ্ন তো
কোনোদিন স্বপ্নেও দেখেনি।
ছোটবেলা থেকেই দেখে
এসেছে দুর্গন্ধে ম ম করছে
এই চত্বর। শয়ে শয়ে মাছি
ভন্‌ভন্...উহুঃ! ভাবতেই শিহরন।
পৃথিবীতে অকালমৃত্যু কি
হারিয়ে যাচ্ছে!
মড়ার গন্ধ বাড়ির দুটি পাকস্থলীর
মুখে ফোটায় হাসি।
একমাত্র ছেলে বলে, "উসব
ছোটোলোকের কাজ।" তাই
সে ভিনু হয়ে গেছে।
...হঠাৎ হৈ হৈ। গাড়ির
আওয়াজ। হীরার চোখ আনন্দে
চক্‌চক্ করে ওঠে। জুটতে থাকে
মাছির দল। আবার জমজমাট
মহাভোজ।
"বলো হরি, হরি বোল"। মড়া
নামায় লোকজন। হীরার
নাবালক বড় নাতি নামে

গাড়ি থেকে। ঘুমন্ত খাদানে
অবৈধ কয়লার কারবার
জমেছিল ভালই। কাল রাতে
ধসে যায় ছাদ। খবরটা
দিল নাতির গাল বেয়ে
পড়া চোখের জলের শুকনো
সাদা দাগ। ছোট নাতিটার
চোখে খিদে...ঢুকে গেছে
পেট। অগত্যা দুটো সস্তা দামের
চাঁদ বিস্কুট কিনে তার হাতে দেওয়ার
জন্য, মাথা নিচু করে
হীরা ঢোকে লাশকাটা ঘরে...
"ছোটোলোকের কাজ" করতে।

অহনা মাইতি

প্রকৃত বন্ধু

আমি যখন কাদি
বৃষ্টি আমার কান্না ধুইয়ে দেয়,
আমি যখন হাসি
ঝলমলে রোদ আমার হাসির
উচ্ছলতা বাড়িয়ে দেয়।
আমার যখন খুব দুঃখ হয়,
ঝড় যেন সব দুঃখটুকু বাতাসে উড়িয়ে দেয়।
আমার যখন খুব রাগ হয়,
বজ্রের আওয়াজ যেন তা ম্লান করে দেয়।
তাই আমার যখন খুব একা লাগে,
আমার পাশে কেউ থাকুক বা না থাকুক
প্রকৃতি সব সময় থাকে
আমার সঙ্গে।
আমার পাশে।
ভাগ করে নেয় আমার সমস্ত আবেগটুকু।।

"If sometime you feel so lonely, find nobody to share your inner expressions, just look at the sky. Because, the sky is only person who is trust-worthy So you can share your any emmotions with the sky"

রবীন্দ্রনাথ বাগ

এ্যাঞ্জেল

শুনছ কি তোমরা!
এসেছে উড়ে, ছোট্ট এক "পরী"—অজানা এক দেশ থেকে
ভালবেসে থাকতে এল—এবার আমার কাছে।।
বারবার দেখেছি তাকে স্বপ্নের মাঝে—অজান্তে বাড়িয়েছে হাত, ধরতে তাকে-
হল স্বপ্নের সব অবসান—দিয়েছে ধরা ছোট্ট "পরী"—
বাড়ির মাঝে আজ।।
পড়ে মনে, সেই বর্ষণসিক্ত শ্রাবণের প্রভাত— ছোট্ট দুটি হাতের স্পর্শে—
খুলেছিল মোর, ঘরের দ্বার—উঠেছিল বেজে মঙ্গলধ্বনি চারিপাশে—
ভালবাসার দু'হাত বাড়িয়ে—শ্রীমতী আমার, করল বরণ তারে—
পরম মমতায়, নিল তাকে বুকে তুলে।
"পরী মা"—গুঁজেছে তখন মুখ নিশ্চিন্তে—শ্রীমতীর বুকের মাঝে—
পড়ল ঝরে আনন্দাশ্রু—আমার দু'চোখ বেয়ে।।
এসেছে সে সঙ্গে নিয়ে—সুখশান্তি ঝুড়ি ভরে—
ছোট্ট হাতের মুঠো খুলে—বিলিয়ে দিল তা সবার মাঝে।।
পরী আমার, আপনমনে খেলে, হাসে, কাঁদে—দেখি তাই, আমি পরম বিস্ময়ে-
জানাই ধন্যবাদ, সেই মহান স্রষ্টাকে— দিয়েছেন যিনি, শতরূপের বাহার—
আমার ছোট্ট পরীর মনের মাঝে।।
কেউ বা ডাকে, "অহনা" নামে—কেউবা তাকে শ্রাবণী বলে—
শুনেছি আবার, অনেকের মুখে—"ওবিয়া" নামে ডাকতে তাকে।।
আমি বলি, কি এসে যায় নামের ত্বরে—মানুষ তো পরিচিতি পায় নিজ কর্মগুণে-
আছে মোর বিশ্বাস—মোদের ছোট্ট পরী, হবে সে যখন বড়—
পাবে সে হাজার সম্মান, খ্যাতি— নিজ কৃতিত্বে হবে সে অনন্যা—
সমাজের বুকে, থাকবে লেখা, তার নাম—স্বর্ণাক্ষরে।।

কুন্তল মণ্ডল

হলাহল

শুনেছি, তোমার নাকি নীল রঙ ভালো লাগে।
তাই তো, তুলির টানে শুধু তোমারই ছবি আঁকি।
শুধু তোমারই।
যেমন করে, ভাগীরথীতে জলরাশি বয়ে চলে,
যুগ যুগ ধরে...।
তেমন করে, নীল রঙ টেনে নিয়ে যাই,
তোমার বুক থেকে আকাশ অবধি...।
তোমার নাকি নীল রঙ প্রিয়।
তাই তো আকাশ থেকে মুছে দিয়েছি।
সমস্ত কালো রঙ।
বিছিয়ে দিয়েছি নীল শালু।
পান করেছি হলাহল।
জানো, আমি নীল হয়ে গেছি।
তোমার না, নীল রঙ প্রিয়।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

দূরের আমি—কাছের তুমি

একটা নাম—
যেন একটা গানের পূর্ণতা
একটা স্বপ্নময় আবরণ
গভীরে যার পুলকিত বেসামাল দশা—
দেহের কোষে কোষে অমৃত-মন্থন।
একটা মুখ—
যেন পৃথিবীর বিকল্প।
বেঁচে থাকার নতুন একটা প্রতিশব্দ
ধ্বনিতে যার আমার সাদামাটা 'আমি'টাকে
চিরনবীনের রসে মজানোর সুর।
সব ফেলে ছুটে যাবার দুর্ধর্ষ আশ্বাস।
একটুকরো হাসি—
যেন একাকীত্বের শাপমোচন।
একরাশ রজনীগন্ধার অ্যাপ্যায়ন—
মৌনী তাপসের দেহে ক্লান্তিহীন পুলকশর—
ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়
নতুন করে চেনা আদিম-আহূতির দেশে।
তিলেকের চোরা-চাহনি
"আমি আর সে" যেন হয়ে যায়
"আমি অথবা সে"।
তৃষিতের দেহে বুলিয়ে দেয়
সর্বনেশে খেলার যাদুকাঠি।
সুগঠিত অধর হতে খসে পড়া
তার গানের এক কলি—
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষে যেন
মৃত্যুঞ্জয়ীর আগমনী।

সুরের ঝর্নাতলায় বাসর রচনার আয়োজন।
—এই অনুভূতিগুলোই পঞ্চইন্দ্রিয়ে জ্বালিয়েছিল
পঞ্চ-প্রদীপের শিখা।
তবু অনিয়ম হতে পারেনি—
"তাকে চাই—যে কোনো মূল্যে" গোছের নেশারু আকুতি।
শুধু বলি—যাকে চাই—অথবা পেলে নিদারুণ হত
সে ঠিক কী চায়।
যে অক্লেশে দিতে পারে একরাশ অনুভূতি—একমুঠো
স্বস্তি—
তার প্রাপ্তি কতটুকু—
অন্তত আমার তরফের!

সেজান সেন

জনারণ্যে ঈশ্বরীর মুখ

(একজন 'মা'-এর প্রতি যিনি পতিতা)

রাফায়েলের ছবির মতো চিত্রার্পিত
তোমার চোখেদুটোকে শিশুর মাথার ওপর রেখে
কি ভাবছ অমন মা?
বারাঙ্গনা, স্বৈরিণী, বাজারি যাই বলা হোক
তুমি মা
নারীচরিত্রের মহীয়সীতমা
ভাবমূর্তি তোমার সমগ্র কোমলতায়।
তোমার লজ্জা দূর কর মা,
অনুশোচনা বা পলায়নপরতার স্থান নেই তোমাতে
কেননা যীশুকে আর দোহাই পাড়তে হয় না ঈশ্বরের
ইতিমধ্যে জেগে উঠেছে মানবসমাজ
ঘাড় থেকে অনাবশ্যক চুলের মতো
কেটে ফেলেছে কু-আচারের বোঝা;
আর যে এসেছে
স্বর্গ থেকে সে তো 'ছাড়পত্র' নিয়েই এসেছে।।

স্বর্ণালী গুপ্ত

ওদেরও আছে মনের আশা

ওরা বস্তা নিয়ে হাঁক দিয়ে যায়
গলির মোড়ে মোড়ে।
ওরা শিক্ষার আলো পায়নিকো তাই
থেকেছে আঁধারঘরে।।
সকাল-সাঁঝে ছেলের দল
যখন পড়ছে দুলে-দুলে।
ওরা তখন পেটের দায়ে
চলছে যেন সব কিছুকে ভুলে।।
হয়ত বা কেউ শিশি-বোতল কিনে
সবার মুখের গ্রাস তুলবে।
হয়ত বা কারোর জীবন ভয়ানক হয়ে
ঝড়ের দাপটে তা দুলবে।।
ওরাও তো চায় শিক্ষা পেতে
ওদেরও আছে মনের গোপন আশা।
ওরাও বুঝি বাড়তে পারে
যদি পায় তেমন উষ্ণ-ভালোবাসা।।
ভালোবাসার নাম জীয়নকাঠি
স্পর্শে পায় মানুষে প্রাণ।
হে ঈশ্বর, কোর না বঞ্চিত ওদের
ওরাও পাক তোমার শতদান।।

অমিত চট্টোপাধ্যায়

দ্বৈত-পৃথিবী

আমাকে একটা বেলুন দাও
নতুন পৃথিবীর মানচিত্র আঁকব,
যার একপিঠের রঙ মানবতা
অন্য পিঠের রঙ ভালোবাসা।

অন্য বেলুনটা দিলাম তোমায়
তুমিও আঁক, তোমার মতো করে,
আর যদি ইচ্ছে না হয়
বেলুনটা দাও অথবা ফাটাও।

আমার বেলুন পৃথিবীতে চড়ে—
আমি অনেক আলোকবর্ষ দূরে,
ফেলে আসা তোমাদের পৃথিবী থেকে
দ্বিতীয় পৃথিবীর স্রষ্টা আমি!

সে পৃথিবীতে, তোমার আমার
হবে না দেখা, এ পৃথিবীর মতো,
সেখানে আমার, রুমকি মনের
ঝিনুক ভালোবাসার, রিমিক্ ছন্দ।

তোমাদের পৃথিবীতে আছে মাধ্যাকর্ষণ
আর আমার পৃথিবীতে ভালোবাসা-কর্ষণ
অথবা তোমাদের পৃথিবীতে, দুঃখ, জ্বালা
আর আমার, আনন্দ ও শান্তি।

আমার মনের উত্তপ্ত সাহাবায়
ওটা তুমি না মরীচিকা হায়!
চিরকাল মরুভূমিতে মরীচিকাই হয়—
মনের চাতক তবু জল চায়।

জীবনযুদ্ধর উত্তাল ঢেউয়ে
যে টাইটানিকের ক্যাপ্টেন আমি—
তার এস. ও. এস শুনতে পাচ্ছ?
পাচ্ছো কি দেখতে পালের লেখাটা?

আমাকে একটা কলম দাও
লিখব নতুন বিপ্লবের কথা,
তোমাদের এই বাসি পৃথিবীতে
যার রঙ হবে টাটকা।

তপতী মিস্ত্রী

তোমায় খুঁজেছি

তোমায় খুঁজেছি জীবনের বালুকাবেলায়,
কিশোরীর কাজলপরা চোখে
কিশোর প্রেমের প্রথম চঞ্চলতায়—
তোমায় খুঁজেছি আমি জীবনের পথে পথে
দুরন্ত বৈশাখী দিনে উদাসী বসন্তবেলায়
বৃষ্টিঝরা নির্জন দুপুরে, দূরে বাঁশগাছের দোলায় দোলায়
হৃদয়ের আঙিনায়
তোমায় খুঁজেছি আমি কাজলা নদীর তীরে—
নূপুরপরা পায়ে, আকাশের নীল নীলিমায়—
তোমায় খুঁজেছি আমি উত্তাল সাগর বালুচরে
শুভ্র পাহাড়ের চূড়ায়—
তোমায় চেয়েছি আমি নিবিড় গভীর
শিশিরসিক্ত শারদ জোছনায়
রিক্ত কঠোর জীবনসংগ্রামে তোমায় খুঁজেছি বন্ধু
ধূসর রাজপথে, জনতার ভিড়ে
রাতের নির্জন নীরবতায়
ভরা গাঙের জলে পাল তুলে ভেসে যাওয়া
নৌকায় তোমায় খুঁজেছি আমি
ভাদ্রের সন্ধ্যায়
ঝিকি মিকি তারাজ্বলা আকাশে, বনানির শ্যামলিমায়
তোমায় খুঁজেছি আমি
খুঁজেছি আমার সঙ্গীত সাধনায়
তোমায় খুঁজেছি—
তোমায় খুঁজেছি হয়তো বা খুঁজি নাই,
তোমায় চেয়েছি হয়তো বা চাহি নাই,
তোমায় পেয়েছি হয়তো বা পাই নাই
জীবনের সব চাওয়া শেষ হয়ে যায় আজ
মিলায় দেবতার পায়—
হলুদ জীবনপাতা যবে
ঝরে ঝরে যায়।

মীনা চক্রবর্তী

ওগো বন্ধু

ওগো বন্ধু বল তো?
আজ কি নিয়ে ভরাব তোমারে,
আজ আমার কাননে, ফোটেনি তো
কি ফুলে তুষিব তোমারে।
তার থেকে যাই চলো তো,
যেখানে নাই কোন কলতান,
সেথা আমি আর তুমি দুজনে,
গাইব বসিয়া শুধু গান।।
সে গানে ভরাব তোমারে,
ভরিবে হৃদয় আমার,
সেথা বন্ধ দুয়ার খুলে তো
মুক্ত হবে মন আবার।।
চলো যাই সেথা দুজনে
যেথা নাই কোন কাকলি
সেথা কথা হবে শুধু নয়নে
আর সব কিছু যেন ভুলি।।
সেখানে রবে শুধু ছোট নদী
সেই নদীতীরে বসে
আমি রব চেয়ে আশাপথ
তুমি রবে মোর পাশে;
সেখানে সবুজ বনের শেষে—
দেখা যাবে দূরে পাহাড়
সেই পাহাড়ের তলে রবে
অচেনা ফুলের বাহার।
সেথা পাখিদের কূজনে
দুজনে ভুলিয়া যাব
কি কথা বলিতে এলাম
কিছু তো বলা হল না গো
কিছু নাহি সেথা চাব।।
সেথা নীল আকাশের নীচে
সবুজ গালিচা পাতা
সেথা আকাশে বাতাসে রবে—
নিবিড় নীরবতা।।

দুলাল চক্রবর্তী

আত্মকলহ

একদা যেদিন দেখেছিনু হায়
দিগন্ত মরুর বুকে সিক্ত কিশলয়।
কৌতুক জাগিল মনে যেন কোন আলেয়ার প্রতিচ্ছবি,
চকিতে উদিল ক্ষীণ পিপাসা—
রাঙা শোণিতে উঠিল ঝড় ক্রমে।
সকাশে নিকটে গিয়া, কহিনু তাহারে
ওগো কোমলা নেত্রা, ওগো সুহাসিনী
মধুকণ্ঠিণী, ওগো সঞ্চয়িনী, কোমলা বক্ষেতে তব।
কীবা কতখানি করেছ সঞ্চয় মম তরে?
সুধাহাস্য জ্যোতিতে ভরে গেল তার বদন মণ্ডল।
নেত্রা যুগলে জাগিলা তাহার অন্তর কামনা,
চঞ্চলিয়া ওঠে তার অস্ফুট কোমলা কাকুলিমালা
সতত জাগিছে তার আকুলতার নিদর্শন,
কহিলা হাসিয়া মোরে তৃষিত তরে,
রেখেছি সঞ্চয়ী, স্নিগ্ধ সলিল সযতনে;
রেখেছি শীতল ছায়া অপার-আনন্দ মন্দিরে
রেখেছি স্নিগ্ধ সমীর অবনীর অকুতোভয়ে।
প্রভাতের স্নিগ্ধতা রাখিনু হরষে এ দুর্গমালয়ে
দারুণ শীতকম্পনে রাখিনু উদ্দিত আতপ।
সুন্দর ভুবনে তুমিই অপরাজিতা—
কোন মধুর স্বপ্নের গুলরাগ হতে খসিয়া
এসেছে সকাশে মোর দাঁড়ালে হাসিয়া
বৃন্ত হতে যদ্যপি যায় গো ঝরিয়া
            সহিতে পারিবে যন্ত্রণা—
কোমলা কমলসম অঙ্গে তব?
            চিত্তে জাগে নব নব আশা।
হতেও পারে সে কুহেলির ভ্রান্ত কু-আশা
            যচেও যদি পরমাদ
তেঁই জাগিবে না বিষাদ—
            মম অন্তর গভীরে
দেখেছিনু কত স্বপ্নের সৌম্য প্রতীক
কল্পাচ্ছাদিত চিতে শুধুই জাগে অলীক

আলেয়ার খেয়াল, অহরহ অন্তরে
ভাবিনি তখন ওরে অভাগা
আড়ালে যে তোর
হাসে মহাঘোর
দুষ্ট গ্রহের ছলনা।
ললাটে লিপ্ত বিধির তীব্র পরিহাস
যেন আলোকাবিরে আসিছে ছুটিয়া তিমির
মাতিছে অট্টহাসিয়া,
শুভ স্বপ্ন ভেদিয়া!
দিনব্যাপি রৌদ্রের পর, অস্তরবির—
শ্রান্ত চেতনা, মলিন অশ্রুনীরে
যায় রে ডুবিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কে হেরিছে তার আত্মবেদনা?
আশার ছলনে নিত্য চলিছে।
মর্ম্ম দহনে নিত্য ক্ষয়েছি।
তবু, তৃষিতের মিটিল না, একান্ত পিপাসা
অকস্মাৎ মেঘে লাগিল ঘর্ষণ
পলকে মন্দ্রিল গম্ভীর স্বনন
ছুটিল বিদ্যুৎজ্যোতি মেদিনীসমীপে
তরঙ্গরঙ্গে ধায় জীবনখেয়ায়,—
টলমল করে কেবল মাঝদরিয়ায়
স্বপ্নের সুরচী মোর ডুবিবে কি সমল সলিলে?
আশায় সুপ্ত যামিনী বিরত নীরবে,
তিমির প্রভাতললাটে সিন্দুরের রক্তিমাভা
সার্থক হবে না সে গুলরাগ মোর চরম দুর্দিনে?
হায়, হায় রে পরগাছা তোর ভাগ্যাকাশে শুধুই হতাশা
ফলিবে না কভু সেথা সরস নিকর।
পক্ষীকুল গড়িবে না তার সুখনীড়
চঞ্চল হবে না সমীর, রবে স্থির—
পাতাফুল পড়িবে ঝরিয়া বেদনা সহিয়া
ক্ষণিকের কিশলয় যাবে রে খসিয়া
চিতাভস্মে হইয়া বিলীন উড়িবে গগন ছেদিয়া
অবাঞ্ছিত শাসনে পালিত স্নেহহীন স্তিমিত জীবনের
মূল্য কি আছে রে?

পদলেহী কুক্কুর সম ফিরিতে হইবে তোরে
পুচ্ছ দুলাইয়া জীবিকার তরে
ধিকধিক জীবনে তোর,
কভুও কি কাটিবে তমসার ঘোর
পাষাণবেষ্টিত জীবনে শোভেনিই
ভুক্তের আকাঙ্খা।
হায় রে পথিক কত আর চলিবি—
এ কণ্টকময় জীবন কহিয়া
হদিশ কি রেখেছিস তার?
পথিক যদি নাহি থাকে পথের ধূলায়
এর চেয়ে কলঙ্ক কি তার? জানে এ সংসার?
যৌবনে যদি তোর নাহি রয় স্বপ্ন।
বার্ধক্যে করিবারে তুই প্রেমের সংলাপ
অতীতের স্মৃতিরেখা স্মরিয়া দেয় তোরে
ওরে অভিমানী কেবলই পেয়েছিস বঞ্চনা তুই
সহিবি রে প্রহেলিকার নিদারুণ উপহাস।
কেবলই হানিবে তোরে হেলার হলাহল।
কেবলই সহিবি তুই নির্বাক রহিয়া
অন্ধকারের অন্ধকারা কেবলই জিনিবে তোরে
একাকী হেরিয়া।
এই কি লভিবি লাভ জীবনব্যাপিয়া
চরম দিনেতে তোর চরম পরাজয়
ব্যর্থের গ্লানি সহিয়া
কতই ছুটিবি রে জীবন বহিয়া
কহিবে না তোর ওরে প্রভাত লহমায়
শীতল শিশির পরশ সুনীল গগনতলে
রাঙিবি না তুই ওরে রঙিন গুলালে।
রহিবি ঢাকি আধার আড়ালে?
চির়দিন তুই কিরে পড়িবি ঝরিয়া
চিরদিন তুই কিরে কাঁদিবি হাসিয়া।
চিরকাল সহিবিরে অকথ্য কুহরে
কভুও কি উঠিবি না আলোক শিখরে
ব্যর্থই কি হবে রে তোর বাস্তব জীবনে?
ফোটে কি কমল কভু তপ্ত বালুকায়?
হায় রে জীবননদে ব্যর্থতার এই কি পরিণাম!

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নামঞ্জুর

আমি হারাতে চেয়েছি
আকাশের নীলে, তারার আলোয়
চাঁদের মোহময় জোছনায়,
সূর্যের রক্তিম অস্তরাগে।
তখনি ডাক এসেছিল
হিসেবি সতর্কতার বড় বড় কাজে—
সাড়া দিতে হয়েছিল সে ডাকে।

সংগীতের মূর্ছনা, সুরের মায়াবী রেশ
মনটাকে মমতায় হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছিল
এক অসম্ভব জগতের সীমানার মাঝে ;
তখনি নিষ্ঠুর চিৎকার ভরা শব্দের বাজার
ডেকেছিল কত যে কাজে—
সাড়া দিতে হয়েছিল সেই ডাকে।

আমি দিশেহারা হতে হতে ক্রমে
নীরব নিঃস্তব্ধতাকে আশ্রয় করেছি,
প্রাণের টানটুকু কমে কমে
অনুভবও থামে,
কিছু নেই কিছু নেই হতাশায় শুধু অন্ধকার নামে।
যেদিকে চাইনি যেতে
এসেছিল ডাক সেইদিক থেকে—
সাড়া নয়, ছুটে যেতে হয়েছিল সেই ডাকে।

সৌমিত্র মজুমদার

যদি তুমি বলো

যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, সূর্যটাকে অস্ত যেতে বাধা দিতে পারি।
যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, পৃথিবীর প্রদক্ষিণ বন্ধ করে দিতে পারি।
যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, ক্ষুধার্ত সিংহের মুখ থেকে গ্রাস কেড়ে আনতে পারি।
যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, সমাজটাকে বসন্তে ভরিয়ে দিতে পারি।
যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, আরও একটা মহাভারত রচনা করতে পারি।
যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ প্রমাণ করতে পারি।
যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, সময়ের গতিকে রুদ্ধ করে দিতে পারি।
যদি তুমি বলো, তুমি আমার সাথে—
তবে, কবিদের দুঃখে ফুল ঝরাতে পারি।

সঞ্জয়কুমার ঘোড়াই

মানুষ

দুরন্ত নদী ছুটন্ত ট্রেন
আর উন্মাদ ঢেউ
শান্ত হয় আশ্রয়ে পৌঁছালে
কিন্তু মানুষ?
তারা আজ বড়ো অশান্ত
চায় না শুনতে কারোর কথা
তুষ পোড়া গনগনে আগুনের মত
যন্ত্রণায় জ্বলছে আজ তারা।
তুমি ভয় পেলে বুঝি
আমাদের আগুন আগুন খেলা দেখে
এতে তো হয় না কিছু
হব শান্ত তোমাকে পুড়ে,
ভেবেছ কি তুমি কোনদিন
কত মানুষকে করেছ নিঃস্ব
শত শত স্বপ্নে
তুমি তো ঢেলেছ জল।
ধর্মকে করেছ কলুষিত
মায়ের চোখে জল
স্বামী নিরুদ্দেশ
লজ্জায় মুখ ঢাকে মা কন্যা তার বিবস্ত্র।
শত চোখ আজ তোমার দিকে
কোথায় লুকাবে এত পাপ?
ধরা পড়ে গিয়েছ তুমি
মানুষ থাকবে না বোকা চিরকাল।

বাউরীকান্ত মাহাতো

ফুল

পোড়ো বাড়ির পেছনে
পুটুশ কাঁটার ঝোপ
তার ওপারে একটু ফাঁকা জায়গা
পুরু ঘাসে ঢাকা
মালি বেড়া দিয়েছে
বেড়ার মধ্যে নানা রঙের ফুল
নানা রূপ, নানা আকার
হরেক রকম গন্ধ।
এ কোন জগৎ
দূর থেকে দেখেই আটকে
গেল চোখ।
কাছে যেতে পারলাম না ভয়ে
যদি তার রূপ বদলে যায়।
হাজার ফুলের মাঝে ফুটে আছে
এ যেন তারার মাঝে চাঁদ
তোমার নাম জানি না
জানি না তোমার গুণ
তোমার গন্ধই বা কেমন?
জানতেও চাই না
তোমার পরশ করার অধিকার
আমার নেই।
তোমার গন্ধও নিতে চাই না।
শুধু দিও দরশন এ প্রেমিকে।
হয়তো কালকেই তুমি বিক্রি হয়ে যাবে
পুরুলিয়ার বাজারে
হয়তো কোনো মাতাল ভ্রমর
তোমায় ছিন্নভিন্ন করে দেবে
হয়তো অকালঝড়ে
তুমি ঝরে পড়ে যাবে
হয়তো সূর্যের তাপে তুমি
ফ্যাকাশে হয়ে যাবে।
তবু তুমি রয়ে যাবে
এই রূপে এই রঙে
অমলিন নিষ্পাপ
আমার হিয়ার মাঝে।

মহঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা

বেকার

বেকার মানে হাহুতাশ বয়স বেড়ে যাওয়া
বেকার মানে ভাইবোনেদের গ্রাস কেড়ে নেওয়া
বেকার মানে ফালতু বোঝা ভুলের বোঝাবুঝি
বেকার মানে দরখাস্তরাশ চাকরি খোঁজাখুঁজি
বেকার মানে বাবার ধন, মায়ের সুপারিশ
বেকার মানে দাদার চাবুক, দিদি বৌদির বিষ
বেকার মানে আড্ডা মেরে খেলার মাঠে ভিড়
সিনেমা দেখা, প্রেমচারিতা, সান্ধ্য নদীর তীর
কলেজ শেষে একঘেয়েমি চাকরি খোঁজার দায়
বেকার মানে প্রেমিকমনের স্বপ্ন নিভে যায়
বেকার মানে যন্ত্রণা এক বেকার মানে খুন
গুমরে ওঠা বারুদ থেকে জ্বলে ওঠা আগুন।

তপন দে

নির্ভয়

বন্ধু—

মগজাস্ত্রে দাও শান,
চারিদিকে দেখ ধোঁয়াধূলোর ঝড়,
খরস্রোতা নদীর বুকে ভেসে উঠছে চর,
প্লাবনে এবার ভেসে যাবে প্রতি ঘর,
সুখের দিন হবে অবসান।
বন্ধ করো ক্রূরাত্মার ক্রোধ
খোলা রাখো চোখ কান।।

পাতালে রেল
আকাশে বিমান,
বন্দরে জাহাজের আনাগোনা,
নেই কোথাও শান্তি স্বস্তি—
মুখোশের মুখ যায় না চেনা,
চোরাকারবারি, নাশকতা আগেপিছে,
মানুষ মারার ফাঁদপাতা পায়ের নীচে,
ভয়—বুলেটে বুক পেতে আছে,
আর কতকাল নিবেদন নিয়তিকে
বন্ধু জাগো, কণ্ঠে জোর আনো,
বুক পেতে, প্রাণ দিয়ে নয়—
ভাবিত মন, বাঁচনকে কর নির্ভয়
অসুরকে কর খান-খান।।

সুশান্তকুমার মণ্ডল

মাটির কাছে এসো

১.

তুমি মাটির কাছে এসো
যেথায়—
পাতাঘেরা ছাউনি ডিঙিয়ে উঠোন
রাতের দরজা খুলে উদ্বেগহীন উচ্ছলতায়
দ্যুতিখণ্ড হয়ে মাটির বুকে, আমার বুকে।

২.

তুমি মাটির কাছে এসো
যেথায়—
ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ পেরিয়ে
নগ্নপায়ে শুভাকাঙ্ক্ষার বুকের কাছে
আলো খোঁজার অঙ্ক কষা শরীর জুড়ে।

৩.

তুমি মাটির কাছে এসো
যেথায়—
উঁচু প্রাসাদ হতে চাঁদ—দেরাজ খুলে
কাঁটার 'পরে পা-ফেলা ছন্নছাড়া জীবনপাশে
আলো আশা রোদের গন্ধের দাগ মুছে ফেলে।

৪.

তুমি মাটির কাছে এসো
যেথায়—
বাতাস জলের উপর মালিকানা ছেড়ে
দাঁতাল ধারালো হাতুড়ির পাথর ভেঙে
বুকের পাথর উপড়ে ফুলেল-গাছ বাগান ভরিয়ে।

ধীমান ব্রহ্মচারী

সোনার তরী

পাষাণের তরী যায় যে ভেসে
কুলুকুলু ওই রবে।
ওই যে তোমার সোনার তরী
স্রোতে ভেঙেছে আপন গতি,
চুপি চুপি দেখি তারে,
নিয়ে যায় সে সাথে করে।
সোনার মাথা, সোনার মুখ,
শুধু কি সোনা? আছে কত সুখ,
মনের কত কথা আছে
তরী বোঝাই করা, আর যে
আছে নতুন আশা
নতুনরঙের ভাষা। কোথায় তোমার
সোনার তরী ঠেকবে গিয়ে পারে,
বসে আছি পথ চেয়ে, পথের
ধারে ধারে।
একলা বসে কত কথা
সোনার তরীর সাথে। মন ভরে যায়
তখন আমার কথা বলি তার সাথে।
এ-সংসারে সকল মুখে সোনার তরী ভরা
পার হয়ে যায়, এপার-ওপার
মাঝে ভাঙন ধরা।
সোনার তরীর কত কথা,
কত মনের ব্যথায়, বুকে করে চলছে,
বয়ে, নতুন পথের আশায়।
যে তোমার সাধের তরী
টেনে নিয়ে চলে আমায়,
যাব না আমি বলি তারে
টানে তবু সে আমায়।
পথচলা এবার বন্ধ কর,
পথের শেষ যেথায়।
চলছে সে আপন পথে,
কারও নির্দ্বিধায়।।

শ্রীপর্ণ

ভালোবাসার বীজগুলি

উচ্ছন্নে যেতে চায় মন, নষ্ট এই সময়ের দেশে
সারাটা রাত কাটে তোমার কথা ভেবে
ঘুমের মধ্যে তোমার স্বপ্নগুলি মেশে, পলকা
যতক্ষণ জেগে থাকি বাতাসের ভাষা, উদাস শূন্যের মতন
ঘিরে ধরে ঘর বিছানা আসবাবপত্র, টেলিফোন
টি. ভি. গেটে, অর্থহীন প্রলাপগুচ্ছ;
কেবল বার্তাগুলি যেখানে সেখানে খেয়ালি
অশিষ্ট মানুষের আবর্জনার মতন
যেমন নোংরা করে দেয় নদী, প্লাটফর্ম
ঘাস মাটি আর পায়রার মন;
ভাইরাস ভাইরাস, লক্ষ পায়ে এসেছে বেরিয়ে
ভালোবাসার বীজগুলি কোথায় রাখবে তুমি বল?

বন্দনা পাল

ইচ্ছে

ইচ্ছে করে হারিয়ে যাব।
হারিয়ে যাব বিদেশ বিভুঁই।।
কোনো পছন্দের দেশে।
মনে পড়ে ঘর ছাড়াদের।।
ঘরে ফেরার আকুল ইচ্ছের।
বিশেষ কটী দিন ছাড়াকি।।
মনে হয় কি বাহিরে থাকতে।
সময় শেষে ফিরব জেনে।।
মনে আসে আনন্দ ভেসে।
তাই ভেবে তো মনে আসে।।
হরেক মজা হরেক সাজে।
তাই না দেখে চলব জেনে।।
আনন্দে আজ ভরল মনে।
সবার শেষে এস তুমি।।
ফেরাও যদি মনের তুলি।
স্বেচ্ছাবসর নাও গো তুলি।।
সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলি।

ইতি রায়

হিংসুটে মানুষ

মানুষের মতন হিংসুটে
আর তো কেউ নয়
এরা একলা খাবে একলা পরবে
এটাই তারা ভাবে সকল সময়
কারোর ভালো কেউ দেখতে নাহি পারে
বোকার করবে ক্ষতি এটা অনেকেই ভাবে
ক্ষুদ্রজীব পিঁপড়েদের মতন যদি একসাথে থাকতে পারত
তবে এটা স্বর্গ হয়ে যেত।
পিঁপড়েদের থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার
একটু মিষ্টি দেখলে পরে খেতে আসে
পিঁপড়েরা যে বারে বারে
সবাই মিলেমিশে খাবে
পিঁপড়েরা ঝগড়া করে না কখনো কোন সময়।

শান্ত রায়

ভালবাসা বিশ্বাস

বিশ্বাস করত যে একদিন...কাছে নেই আর--
সেই বিশ্বাসের দাম দিয়ে যেতে হয় অবিরল
কাউকে-কাউকে—আর, যে জানে, কেবল সে-ই
জানে, বোধ-বিশ্বাস হতে পারে
কতখানি ধার!

দীর্ঘদূরে চলে যায় মানুষ বা মানুষেরা—
অথচ তাদের
ভালবাসা-বিশ্বাস থেকে যায়
কেমন সচল
কোথাও-কোথাও! কাছে-দূরে...

বেলা দাস

কথারা

যে ঘর ছিল দুজনের
যে ঘরে ছিল অঙ্গীকার,
যেখানে অভিমানই ছিল কালো
যেখানে কথারাই শুধু ভালো।

কে জানত তখন দুজনের
ভুল ছিল সব অঙ্গীকারে,
যত্নে গড়া এত গোপনতা
একনিমেষে হারাবে অন্ধকারে।

এখনো কথারা তেমনই আসে
দু-চোখে নদীর বন্যা বেয়ে,
তুমি ভাসো ছায়া ছায়া
আমি শুধু বানভাসি মেয়ে।

গুচ্ছ কবিতা

দুটি কবিতা

শেলী সিন্‌হা (গুহ রায়)

বোঝা দায়

উপরোধে ঢেঁকি গিলে
পাঠানো হাইড্রোজেন বোঝা।
চুরমার তো দূরের কথা
একটা চিড়ও ধরাতে পারল না।
সাড়াশব্দ কিছুই শোনা গেল না,
নড়ল চড়ল কিনা মালুম হল না,
অখণ্ড শিলাই হয়ে রইল।
গরজ থেকে পাঠানো গোলাপ
ছিন্নভিন্ন পাপড়ি
তপ্ত বালিতে ফুটে
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত
এক-একটা হাইড্রোজেন বোমা।

মন্দানিল

একটা শক্ত হাল
নতুন তোলা পাল
তরতাজা নিটোল কাঠামো
তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা
অথচ ... .
কখনো বেশ কয়েক কদম
কখনো বা আরো একটু এগিয়ে—
কখনো বা আরো অনেকটা এগিয়ে
অকস্মাৎ কখন কে জানে
অনিশ্চিত এক ঢেউয়ের ধাক্কায়
ফের পিছিয়ে আসা সেই শূন্যতায়,
ফের দাঁড়িয়ে যাওয়া 'স্টার্টিং পয়েন্টে'।
এক-দুই-তিন
তিন-তিন বার।
তারপর ... ...
ছ'-ফুটি আস্থার দমকা বাতাস—
স্বস্তির নিঃশ্বাসে জয়ফুলের সৌরভ;
পরিপূর্ণ ক্ষতবিক্ষত বুকের পাঁজর।

দুটি কবিতা

শ্যামলকুমার সরকার

প্রার্থনা

চারিদিকের অব্যবস্থা ও অস্বস্তিকর পরিবেশ
আমার বুকে ব্যথা দেয়
সদা সর্বদা ভয়ে ভয়ে কাটাই সময়
কি জানি কখন কি হয়!
মনের মধ্যে কত শত দুশ্চিন্তা উঁকি মারে
ভালো মানুষ সেজে কখন কে যে কি ক্ষতি করে
সদা সতর্ক থাকতে হয়
পৃথিবীটা যে আজ বড়ো অশান্ত
যেদিকে তাকাই শুধু হানাহানি আর খুনোখুনি
দুমুঠো ভাতের জন্য প্রাণান্ত
শান্তি কোথায়?
দুহাত তুলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি
তুমি একটু দয়া কর
যারা দোষী তাদের একটু সুমতি দাও
এর থেকে বেশি কিছু নাহি চাই আমি!

রাস্তায় চলতে চলতে
কত অনিয়ম বেনিয়ম চোখে পড়ে
কখনও প্রতিবাদ করি,
কখনও ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই
কেউ কেউ আমায় পিছন থেকে উৎসাহ জোগায়
ব্যস, এই পর্যন্ত
কে আর এইসব উটকো ঝামেলায় যায়
আমি যেন সবার মাঝে এক নিঃসঙ্গ পথিক !

কিন্তু ওরা যে যার কাজ করে যায় আপন খেয়ালে
ওরা জানে না যে ওরা কি করছে
ওদের কোনো ভয়ডর নেই

ভালমন্দ ওদের কাছে
সমুদ্রের ঢেউয়ের মত শুধু বয়ে যায়
নিস্তেজ তরঙ্গের মত মিশে যায়
নীল-নীলিমায়
সময়ের চক্রব্যূহে চাপা পড়ে আছে
চেতনাহীন অশান্ত জীবন...
লোকের দুর্দশা দেখে মনে মনে দুঃখ হয়
সাধ্যমত কিছু করার ইচ্ছে হয়
অদম্য উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলি
আমার অভীষ্ট পথে
পিছন ফিরে দেখি কেউ নেই সাথে
দুহাত তুলে
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি
ওদের একটু সুমতি দাও
মানুষ একটু শান্তিতে বাঁচুক
এই অশান্ত পৃথিবীতে
ধরাধূলি হোক পবিত্র তোমার আশীর্বাদে।

এ পৃথিবী বড় ক্লান্ত
ক্লান্তিতে আমি অবসন্ন...
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি
ফিরিয়ে দাও আমার সেই সুখের অতীত
যেখানে ছিল না কোনো দ্বন্দ্ব দ্বেষ
অনাবিল আনন্দে কেটে যেত দিন
সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতাম সবাই
কোথায় হারিয়ে গেল সেই সব দিন!
নিজগৃহে পরবাসী হতে নাহি চাই
ভগবান, সুখ দাও শান্তি দাও
দুমুঠো খেয়েপরে বাঁচতে দাও
এর থেকে বেশি কিছু নাহি চাই
এটাই হোক আমার শেষ অনুযোগ।

আমি

যখন জন্ম নিলাম এই পৃথিবীতে
দেখলাম শত সহস্র আগুনের গোলা
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছোটাছুটি করছে
উদভ্রান্তের মত।
তেমনি একটি গোলা হঠাৎ
পৃথিবীর মাটিতে এসে আছড়ে পড়ল।
চারিদিকের অশান্ত পরিবেশের সংস্পর্শে এসে
ঐ আলোকিত রশ্মিচ্ছটা
মুহূর্তে কলুষিত হল।

আমার মধ্যে যে আমি লুকিয়েছিল
সেই সুপ্ত সত্তাকে
গঙ্গার মত নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করতে
জনসমুদ্রে পাক খেতে খেতে
বনবন করে
ঘুরে চলেছি অনির্দিষ্টের পথে
কোথায় শেষ কে জানে!

এমনি করেই হয়তো একদিন
বিলীন হয়ে যাব এই পৃথিবীর মাটিতে।
আগুনের গোলা হয়ে হয়তো কোনোদিন
টুপ করে ঝরে পড়ব
অশান্ত পৃথিবীতে।
আবার নতুন করে শুরু হবে
এক নতুন অধ্যায়
ভবিষ্যতের সেই সুন্দর জীবনের কথা
ভাবতে ভাবতে হয়তো কেটে যাবে
আরো বহু বছর
পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীর চলমান ধারায়
নিজেকে সিক্ত করে
আবার নতুন করে শুরু করব
আমার নতুন জীবন!

দুটি কবিতা

বিষ্ণুপদ বৈদ্য

বাস্তব চিত্র

এই যুগে, বাঁদরের গলায়
মুক্তোর হার।

নেতা সেজে
হপ্তা তুলছে
ধর্মের ষাঁড়।

এই যুগে, কুত্তা থাকে
সোফার 'পরে
তাও আবার পাঁচতলায়

মানুষ থাকে
মাটির 'পরে
তাও আবার গাছতলায়।

এই যুগেই, কুকুরের পাতে
মাংস ভাত

অসহায় মানুষের সামনে
খালি পাত।

প্রশ্ন

আমি, মায়ের গর্ভ থেকে কি
চোর ছিলাম?
ডাকাত ছিলাম?
সন্ত্রাস ছিলাম?
ছিলাম কি আমি নষ্ট?
জন্মের পরেই বুঝলাম
—অভাব।
ধীরে ধীরে নষ্ট হল
—স্বভাব।
অভাবে যখন পেয়েছি কষ্ট
হয়েছি তখনই নষ্ট।

দুটি কবিতা

দীপঙ্কর রায়

জীবন, তুমি

জীবন, তুমি নষ্টরতির নৈরাজ্যে ভ্রষ্ট মদনদেব।
জীবন, তোমার কাহিনী হল শুধুই ভুল হিসেব।
জীবন, তুমি মিথ্যে ফাঁদে বন্দি আমূল কূট প্রহসন।
জীবন, তুমি মধুমাসে করুণ চাতক-ক্রন্দন।
জীবন, তোমায় দেখেছি চেখে টাটকা মাকাল ফল।
জীবন, তোমার কাছে আত্মাহুতিই সম্বল।
জীবন, তুমি শান্ত বড়ো, নিঠুর সময় চলে।
জীবন, তুমি তপস্যায় আঁধার অতলে।
জীবন, তুমি পঙ্গু যে হায়! ছটফট করে জান।
জীবন, তুমি ভুলেছ আজ ভালোবাসার গান।

জীবন, তোমায় সালাম জানাই, বাহবা বাহবা বেশ।
জীবন, তুমি দেখবে নাকি মিঠে মরণ দেশ?

তবুও

জানি।
তবুও,
অজানার মতোই সমস্ত কিছুই মেনে নিতে হয়।
মানি।
তবুও,
অন্তরের গভীরে যেন ছোট দাগ রয়ে যায়।
মেনে নিতে হয়,
সংকীর্ণ এ পৃথিবীর সার্পিল পথে পথে হৃদয়ের প্রলয়;
সব ভাঙচুর হয়ে যায়।

তবুও,
'নবীন রঙ্গে রঙ্গে
জীবনের প্রেমতরঙ্গে
ভাসছি'—বলে নাচতে হয়।
সমস্ত পরিপূর্ণতার মাঝে 'অপরিপূর্ণতা' রয়,
জীবনকে হাসায়!

চারটি কবিতা

সুশান্তকুমার মণ্ডল

জয়-পরাজয়

বৃষ্টি-ধোয়া স্নিগ্ধ চোখ দুটি
সামুদ্রিক দৃষ্টি আনে অনির্বার
সামনে পড়ে থাকে দিগন্তের ডাক—
গভীর গোপন আনন্দ উদ্বেল
দুহাত মিলে ধরি নতুন দিগন্তে
ফুটে ওঠা কুসুমকলির এক কানন।
শেষ হয় পল্লবের বেলা
ক্লিষ্ট চলাচলে অসীম প্রবাহিনী করুণা
উল্লাস, হাসিগানের যাওয়া আসার মাঝে
চড়াই-উতরাই জীবন একটুকু উজ্জ্বলতা।

নিশ্চল স্বপ্নের প্রত্যাশার মাঝে
রুদ্ধ অন্ধকার থেকে দীপ্ত আশার বান
সব কিছু বাঁধা ছকে, একের পর এক
সে যায় না হারিয়ে সুন্দর অসুন্দরের মাঝে।
একফালি মেঘ যদিও বা বৃষ্টি আনে
যষ্টি হারিয়ে অন্ধ খুঁজে ফেরে পথ
তোমার তাপে পুড়ছে তখন অন্তর
ঠিক দুপুরে মাথার উপরে যখন তুমি
সেই তাপ নিয়েও নিজেকে সামলে রাখি।

সেদিন তোমার গগনভেদী উষ্ণ পরশ
অঝোরধারায় বাতায়নে আনে
কিছুক্ষণ কিছুটা সময় অন্যভাবে
আনন্দ উদ্বেল শরীর মহোৎসবে।

এ প্রাণে মাতাল সমীরণের ধারায়
অনন্ত সঞ্জীবনী প্রেম অনির্বাণ ভালোবাসা

ক্ষীণদৃষ্টিতে যা দেখলাম তাতে
বিকিকিনির বাজারে আমি হারিয়ে গেলাম।

একঘেয়ে ক্লান্ত জীবন দুপায়ে ঠেলে
আবার অপেক্ষা, সামনে চেয়ে দেখলাম
পরিবর্তনের ঢেউয়ে ভুলতে হবে জয়-পরাজয়।

একটু শুদ্ধ হাওয়ার জন্য কেঁদে উঠেছিলাম
চোখের জল শুকিয়ে গেছে কখন
জীবনদৃষ্টিতে যা অনুভব হল
শিশিরের জল চুষে স্মৃতির রেখাপথ বেয়ে
পৃথিবীর কোল ছেড়ে কত মেঘ
ঝরে পড়ে পথে আকাশের চোখ জেগে।
তবুও একটা মিথ্যা কথা বলে দাও না
তুমি আমাকে ভালবাসো ...

এই তো জীবন

একবুক আশা নিয়ে
আজও বেঁচে আছি
মায়া-মমতাহীন, প্রকৃত স্বজনহীন
জীবন-যৌবন ক্ষয়ের দিনে।
এখনো অনেক রং মাখব দুহাতে
আভিজাত্য আর ঠুনকো প্রেমের নামে,
ধীরে ধীরে পথ চলা শুধু বেঁচে থাকা।
এই তো জীবন।

একবুক আশা নিয়ে
আজও বেঁচে আছি
সমাজ-সভ্যতা কলঙ্ক অহমিকা
আজও বেঁচে আছে তিরতিরিয়ে
আমার হাত ধরে ভীষণভাবে তাড়া করে,
লাল জবা রঙ চোখদুটিতে চেয়ে
পৃথিবী তেমনি আছে স্মৃতিকণা স্মরণেতে রেখে,

নিজস্ব আত্মবিশ্বাসে করি পরিষ্কার পথ
খুঁজে চলো নতুন পৃথিবী, শুধু বেঁচে থাকা
এই তো জীবন।

এক বুক আশা নিয়ে
আজও বেঁচে থাকা
জলছবি ধুয়েমুছে যায় দুহাতে বিলীন
থিরিথিরি নাকের ডগা কাঁপতে থাকে
কে যেন অনুচ্চারিত স্পর্শে ঢেকে দেয়
ধ্বংসখেলায় বেতসলতায় লাগবে আঁচ
জানি তুমি স্বার্থপরের মত চুপটি করে থাকবে।
সমাজ সত্যতা গরিমা আজও আছে চেয়ে
সেদিন ওর সাথে সখ্যতা হবে ভস্মপ্রলয়ে
প্রকৃতির নিয়মে পা রেখে যথার্থ সঙ্গীতে,
বিচলিত নই তবু প্রত্যুষের আলো ফোটার
সাথে সাথেই, খুঁজে চলি—এই তো জীবন।

এক বুক আশা নিয়ে
আজও জেগে থাকা
জনহীন শূন্যতায় চলে জীবনের ভাঙচুর
গভীর গভীরতম মন হীরক কাটবে কাঁচ
তোমার দেহের উঠোন ভরা রৌদ্রে
নষ্ট্যালজিয়ার ঘেরাটোপে উচ্ছ্বাসের অনুরণন
তোমার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাতে শিশুর মত দস্যিপনা
অকাল বন্যার আঘাতের মতো
সহসা বুনেছি প্রেম হাত বাড়িয়েছি নিজেকে
স্বপ্নছেঁড়া ক্ষতের মতো ছলনাময়ী হৃদয়
মুছে যাবে পৃথিবীর ধূলিঝড়ে অভিসার
ফিরব না আর কোনোদিন ওই দুচোখে
নিজেকে খুঁজব বলেই হাত ধরেছিলাম
হাজার প্রবঞ্চনায় মুড়েছি সুখ শান্তি বৈভব
শব্দহীন বেদনহীন মুক্তিহীন রংহীন
আলো আশায় জাগা এ জীবন।

শরত ডালি

নীল অঙ্গন ভরি ঝলমল করি
কার আহ্বানে আজ মন যায় ভরি,
জগৎসংসার মায়াময় অফুনরাশি
পবন মালতী জুঁই যূথিকা মাঝে অনুরাগ হাসি।
ভোর বিহগেরা করে কানাকনি
পুবদিগন্তে উদিল দিনমণি।
শিউলির ডালে কুঁড়ি ধরে থাকে
কাশফুলের মেলা শরতের ডাকে।
আকাশ গাঙে ভেলা ভাসায়ে চলে
বক-সারি সাদা মেঘের দলে।
জল থই-থই দীঘির কোলে
অজস্র ফুটেছে শালুক শতদলে।
অটবী শাখায় কচিপাতা ধরে
মন থাকতে না চায় ঘরে
শূন্যপানের স্বপ্নাবিষ্ট ভিজে মুখ
প্রশান্তি আনে ঘুচিয়ে সব দুখ।

বেহিসাবি গণ্ডি

যৌবনের প্রজ্জ্বল শিখায় ছুঁয়ে যাওয়া
আমার বন্ধ্যা সময় মথিত
কর্মসাগরের অভ্যস্ত যাত্রাপথে বিমুখ
কামুক উন্মাদনার ঢেউ আছড়ে ব্যথিত।

সবুজ সোনালি সুর ছন্দে মাথায়
খেলা করে অব্যক্ত বাধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস
চঞ্চল জীবন-ডানায় নষ্ট ভোরের ঝিনুক আলো
টেনে আনে নিঝুম হিমানী রাতের চাপা শ্বাস।

বাসনার মুকুরে জেগেছে নতুন সূর্য
কিন্তু খেয়ালি হাসি ভুলে গেছে মাতন
শরমহীন কলঙ্কিত কামিনীরা বাজায় তুর্য
বুক জুড়ে জাগে টগবগে পিশাচ-নেশার নাচন।

ব্যথার চৈত্রে ছুঁয়ে যাওয়া অফলা মাঠ
সঙ্গীহারা আগ্নেয়গিরির লাভায় পুড়ে
কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে প্রখর সূর্যের উজ্জ্বল শিখায়
দিশেহারা পথিকের বেহিসেবি গণ্ডিটা গড়ে।

দুটি কবিতা

প্রবীর চক্রবর্তী

স্মৃতির প্রলেপ

ওগো চাঁদ স্বপ্নমাখা অবগাহন খেলা
ছায়াবীথি নির্জনতা ঝোপঝাড় পথ
প্রগলভ্ নিশিরাত আবক্ষ তুফান
রাতপাখি ডাক দেয় অধরে পুণ্যস্নান।

চড়াই-উতরাই ভাঙে বেঁধে অজস্র কাঁটা
চেতনাতীত ভেসে যাওয়া কন্টকিত শরীর
ঘূর্ণাবর্ত রাতে থাকে বোধহীন ঢেউ
নিষ্পেষিত স্নায়ুপথ চঞ্চল অস্থির।

শুকনো পাতার কর্কশতা হাওয়া করে খেলা
নিশাচর অন্তরীক্ষে আকাঙ্ক্ষা সংলেপ
নিয়মিত ক্যানভাসে রঙ তুলি ছেড়ে
বিকম্পিত স্রোতে জাগে স্মৃতির প্রলেপ।

হঠাৎ আশার বৃষ্টি

হঠাৎ আশার বৃষ্টি ঝরে কল্পলোকে সাজ
হীরকদ্যুতি যাচ্ছে ভরে মরা গাঙে বান
দু-চোখ ভরা আগুন নিয়ে জমিন-আশমান।

আছড়ে পড়ে বৈশাখী ঝড়; দুর্বোধ্য ভাষা
দিকভ্রান্ত ঝরা পাতা চরম বলীয়ান
আলো-ছায়ার লুকোচুরি নরম সূর্যস্নান।

হঠাৎ আশার দৃষ্টি ঝরে চরম রসায়ন
এলোমেলো রূপকথা খায় দিন
চিলের সাজে স্বপ্নগুঁড়ো আকাশে উড্ডীন।

স্পর্শে আনে শীতল ছোঁয়া, বৃন্ত ছেঁড়া স্বর
উন্নাসিক এগিয়ে চলার অকপট রূপ
গতির সঙ্গে গতি মিশে সময় নিশ্চুপ।

আবেগঘন প্রার্থনা সব টুকরো করে রাত
স্মৃতিপটে জমা হয় দিনান্তের ঘ্রাণ
নির্লিপ্ত বাক্যালাপে জীবন চলমান।

হঠাৎ আশার বৃষ্টি ঝরে একাকীত্ব ছেড়ে
ক্ষণে ক্ষণে প্রহর গোনা ত্বরিত অনুভব
চেনা ঘ্রাণ এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

দুটি কবিতা

অম্বর গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যু

আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে দেখেছি
বড় শীতল, স্নিগ্ধ সে অনুভূতি।
ওকে সবাই ভুল বুঝেছে
আদি অনন্তকাল।
আমি মৃত্যুকে ভালোবেসেছি।
ওর দু-চোখ ভরা অভিমানের অশ্রু দেখেছি।
ওকে কেউ ভুল বুঝো না।
প্রকৃত বন্ধু বলে যদি কেউ হয়
সে মৃত্যু ছাড়া তো কেউ নয়।
জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে আলিঙ্গন করে আছো মিছে
ভুল ভাঙবে, দেখবে
সেও ছেড়ে চলে গেছে।
জীবন বিশ্বাসঘাতক।
মৃত্যু বড় বিশ্বাসী।
কাউকে ঠকায় না কোনোদিন।
সবাই যখন সরিয়ে রাখবে তোমায়
প্রবঞ্চনা, অনাদর, অবহেলায়,
মৃত্যু আসবে, তোমায় আপন করে নিতে।
বুকে টেনে নেবে অবলীলায়।
বোকার মতো জীবনের জন্য কেঁদো না
মৃত্যুকে ভুল বুঝো না কোনোদিন,
যদি পারো—
ওর জন্য দু-ফোঁটা অশ্রু রেখো।

পথিক ফিরে এসো

অনেক পথ তো হাঁটলে পথিক
ইচ্ছাশক্তি নিয়ে।
কত কিছু হল চেনা।
যাদের চিনলে দুঃখ এটাই,
ওরা কেউ চিনল না।
হিমালয় থেকে তোমার যাত্রা শুরু—
কঠিন শীতল তুষার পেরিয়ে
মরুপ্রান্তরে মরীচিকাদের
মায়াজাল ছিঁড়ে, তৃষ্ণা এড়িয়ে
দাঁড়ালে যখন সমুদ্রতটে শেষ সীমানায় এসে,
কত ঢেউ গেল ভেসে।
আছড়ে পড়ল তোমার ব্যথিত বুকে,
হে প্রান্তিক—
এমন আঘাত কি করে সইলে?
মেনে নিলে কোন সুখে?
পথিক!
এত বেহিসেবি কেন হলে তুমি?
বিয়োগের ভরা খতিয়ানে কই
যোগ কষে দেখলে না?
কত কি হারালে, তার বিনিময়ে কতটুকু পেলে?
হিসেব তো রাখলে না!
যাদের জন্য তোমার এ পথ চলা
পৃথিবীর পথে হারানো পথিক
যে কারণে পথ ভোলা,
সে পথের ছবি পরম যত্নে ইতিহাসে আছে তোলা।
তাকিয়ে দেখেছ?
তোমার মূর্তি, রাজপথে-রাজবেশে
কত শ্রম, কত বুদ্ধির জোরে
গড়া কত কায়ক্লেশে।
জানি হে পথিক জানি, তুমি বড় অভিমানী

ঘরে তুমি ফিরবে না।
যে পথ গড়েছ রক্তে ও ঘামে
ওরা কেউ চিনবে না।
পথিক!
তুমি না আসলে আকাশে আবার
জমা হয়ে গেছে অমঙ্গলের মেঘ
বেশি দেরি নেই বাড়ছে আবার
অশুভ ঝড়ের বেগ।
তুমি না আসলে—
সাহসী পথিক সব পথ হবে রুদ্ধ
তুমি না আসলে
কেই বা করবে আত্মাহুতির যুদ্ধ?
বিশ্বাস রাখি তুমি তো আবার আসবে,
অমঙ্গলের মেঘ কেটে গিয়ে নতুন সূর্য হাসবে।
জানি তুমি ঠিক ফিরে আসবে।।

দুটি কবিতা

রণজিৎ বিশ্বাস

খ্যাতি

পৃথিবীতে এখন বিজ্ঞাপনের যুগ—
বিজ্ঞাপনের ব্যাগ কাঁধে তুলে
ক্রমশ ওরা ছুটছে তো ছুটছেই,
উল্কার মতো দপ করে জ্বলে ওঠে
আর ভেঁপুর বাঁশির মতো সুর তুলে
নিজের কথা বলতে চায়।
শিক্ষার অহংকারে হাই তুলছে
স্বার্থান্বেষী কিছু কবিরা।
আর সেই সব কবিরা
খেলার পুতুলের মতো প্রতিযোগিতায় নামে।
ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আলু-কাবলি খাওয়ার মতো
বিজ্ঞাপন দেয় মুখোশের আড়ালে।
অথচ কেউ ওরা একবার ভাবে না
অনাদরে ফুটে থাকা ফুলের কথা।
স্বার্থের দাপটে
ইট-বালির মতো টেন্ডার ডাকা হয়,
এবার পুরস্কারের মালাটি কার গলায়?
টাকার বিনিময়ে মানপত্র, ফলক কিংবা মেডেল।
উদাস মনে সেই কবিরা ভাবে
আমি ক্রয় করেছি খ্যাতি,
কিনেছি প্রচারযন্ত্র।

সাথী সিম

সমস্ত রাজনীতির বিভেদ ভুলে
মা সরস্বতী এলেন মোবাইল হাতে,
বিদ্যা-বুদ্ধির হাঁড়ি খুলে
মা বসলেন তাঁর নিজের খাটে।
ছোট থেকে বুড়ো বীণাপাণীর আশীর্বাদে
দীঘির মতো চোখে ডাকছে—
বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও।
ঢলঢলে ব্লাউজ আর অগোছালো শাড়ি
দেখলেই মনে হয় ওরা আধুনিক নারী,
কেউ ভাবছে, কেউ প্রাণ খুলে হাসছে,
বিরামহীন পথ চলা, চড়ুইপাখির মতো
ধান খুঁটে খাওয়ায় ওদের মন।
ষোড়শী ব্যাকুল চোখে বাঁধভাঙা উল্লাসে,
ওরা সরস্বতীর বরকন্যা,
বারবার মায়ের কাছে চেয়েছিল—
মাগো এবারে একটা মোবাইল,
মোবাইলটা কিনে দিতে বল না বাবাকে,
সঙ্গে একটা সাথী সিম্।

এখন সরস্বতী পুজোর শব্দটা থেমে গেছে,
অত্যাধুনিক প্যান্ডেল থেকে মা জলতর্পণে,
এলোমেলো বেশ—
কাঠের কঙ্কাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে
অলি-গলি, স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটিতে।
আসছে বছর...
মাগো, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বল,
সাথী সিমটা ফ্রি-তে দিও।

দুটি কবিতা

বিজনবিহারী দলুই

জানা প্রশ্ন অজানা উত্তর

ছোট ছোট ইচ্ছেগুলো বড্ড বড় মনে হয়
অন্ধকারে আনমনে নিজেকেই হাতড়াই
কাগজের শিরোনাম পড়ে ক্লান্ত হয়ে উঠি।

বিপ্লবী মনটা কবে মরে গেছে সুখভারে
শুধু বাঁচি অবাঞ্ছিত প্রেমহীন সংসারে।
আমার যা কিছু প্রেম যত সহায় সম্বল।
যদি তা মোছাতে পারে কারুর চোখের জল।

শুধু মন থেকে চাই যেন ফুল হয়ে ফুটি
আমার প্রেরণারাশি দুহাত ভরে ছড়াই
তাহলেই হবে জানি আমরা স্বপ্নজয়।

কেন আছে অনাহার কেন আছে অত্যাচার
কেন আজও অসাম্য মৃত্যুর কারবার।
কেন সব অঙ্গীকার মিছে কিসের আক্রোশে
ভিখারি যে ভিক্ষা করে সবই কি নিজের দোষে।

জানি এই প্রশ্নগুলো দেবে না কাউকে রুটি
তবু নিজের মনের, অন্ধকারকে তাড়াই
নিজের কাছেই খুঁজি মানুষের পরিচয়।

ডেথ সার্টিফিকেট

আয়নায় কি দেখছি
আমার চিতার পাশে ওরা কারা
শুধু আমার পরিবার।
ওদেরকে তো আমি ভুলেই ছিলুম।

চিতার পাশে বন্ধুরা কোথায়।
যাদের সাথে বিদেশি মদের নেশা
যাদের সাথে নাইট ক্লাব, নারী...
তারা কোথায়!

আয়নায় কি দেখছি
স্ত্রীর হাতে আমার ডেথ সার্টিফিকেট
সেই বন্ধুগুলোর চাহনিতে কুৎসিত ইঙ্গিত
ইস, এরা আমার বন্ধু।

ঘড়িতে কখন নটার ঘণ্টা,
আয়নার কাঁচটা মুছে দিল ঘরের লক্ষ্মী।
আজ ওকে একটু আদর করি
ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বলি, চল
আজ সারাদিন শুধু তোর সাথে খেলি।

দুটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ মহাপাত্র

মহৎশিক্ষা

এ-ভূবন মাঝে আছে দাঁড়িয়ে অসংখ্য পাহাড়ের সারি,
তারই মাঝে গড়ে ওঠা অসংখ্য বনরাজিদের শোভা
সুখস্বপ্নের নীড়ে ঢাকা অসংখ্য অজানা পরিযায়ী।
ঋতুর আবর্তনে সবই ঘুরেফিরে আসে,
পথভোলা পথিকের থাকে কেবলই পথ চেনা,
অজানা পথে বাঁধে ঘর নিত্য যাযাবরেরা
পরিযায়ী সবে গড়ে নীড়, আসবেই ফিরে এ থাকে তাদের জানা।
মাথায় বোঝা নিয়ে চলে পথিক
ক্লান্ত হলে পর পথে বোঝা নামিয়ে ছায়াতলে বিশ্রাম করে,
সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝায় উঁচু শিখরচূড়া
গর্বভরে আছে দাঁড়িয়ে, তারা যে সমগ্র জীবকুলকে বাঁচিয়ে তোলে।
পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির মনোরম শোভা—
যে বনরাজি, এ-ভুবনের কাছে গর্বে আঁকা অত্যাশ্চর্য এক ছবি,
তাদের আশীর্বাদে বেঁচে আছে সমগ্র জীবকুল
প্রেম-প্রীতি ভরা যে আনন্দগীতি, এ-চির ঐতিহ্য ভরা মর্ত্যভূমি।
সহস্র যুগ ধরে পাহাড়ের নির্জন গুহাতলে
মহামুনিরা নিষ্ঠাভরে ইষ্টদেবতার কাছে নিয়েছে যে শিক্ষা,
সে বেদীতল, এ-ভুবনের কাছে মহাপীঠস্থান
এ-যুগের কাছে এক চরম নিদর্শন স্বরূপ—তথা অতীতের কাছে ছিল যে মহৎ শিক্ষা।

স্বর্গের নিকেতন

তুমি প্রকৃতি, চির যৌবনের প্রতীক
এ-ভুবনের কাছে সর্বোত্তম এক উপহার,
তোমার আশীর্বাদে গড়ে উঠেছে আজ অসংখ্য গ্রাম, নগর ও নগরী
সভ্য জগতের কাছে এ-এক চরম অহংকার!
স্নেহের আঁচলে বাঁধে জননী, নিজ শিশুকে বড় করে স্নেহের আগরে,
বিপদমুখী হয় না যেন শিশু
স্নেহময়ী মায়ের সজাগ দৃষ্টি থাকে শিশুর 'পরে।
এ-প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত
গড়ে ওঠে সবার হৃদয়ে জন্মভূমির প্রতি টান,
মমতাময়ী, মায়ের কাছে যদি শিখে শিশু, স্নেহের আদর্শ
তখনই সার্থক হবে জন্মভূমি স্নেহময়ী মায়ের সমান।
এই প্রকৃতিকে বাসলে ভাল গড়ে উঠবে নিরবচ্ছিন্ন সুন্দর ভুবন,
ফলে ফুলে আর স্নেহের জাল ভরলে ভূমি এ-ভুবন হবে সবার কাছে স্বর্গের নিকেতন।

তিনটি কবিতা

রবীন্দ্রনাথ বাগ

অঙ্গীকার

দেখেছিলাম স্বপ্ন, আমরা দুজনে—কলেজের শেষবর্ষে—
নিয়েছি বিদায় যখন—বসন্ত ঋতু শহরের বুক থেকে।।
নিয়েছিল শপথ তুমি, হাতে হাত রেখে করেছিলে—অঙ্গীকার
সুখদুঃখে চিরদিন—থাকবে তুমি পাশে আমার।
পারোনি রাখতে — তোমার সেই অঙ্গীকার
ঐশ্বর্যের লোভে করলে বিশ্বাসঘাতকতা—আমার সাথে
নিষ্ঠুরের মতন গিয়েছিলে ছেড়ে—অন্য পুরুষের হাত ধরে।।
জীবনচক্রের মায়াজালে—তারপর গেছে কেটে ; অনেকটা বছর—
আমার মায়ের স্নেহ মমতার দৌলতে—ভুলেছি আমার দুঃখ বেদনার অতীত,
হয়েছি আমি এখন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার—নাম যশ অর্থ সবই পেয়েছি একে একে
পাইনি শুধু মানসিক শান্তি আজও—থেকে গেছি একাকী, মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক।।
ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস—চিকিৎসার স্বার্থে, এসেছ ফিরে আজ আমার দরবারে—
তোমার ভালোবাসার মানুষটার প্রাণভিক্ষার তরে।।
তোমার অসহায়তার মুখচ্ছবি দেখে—আজ জাগেনি কোন করুণা মনে
উঠেছে বারবার, ঘৃণাজিঘাংসার—প্রতিরূপ মনের মাঝে
ভুলিনি কিন্তু আমি এক ডাক্তার—বললাম, রাখব না কোন ক্রুটি
তোমার মনের মানুষের চিকিৎসায়—থাকতে পারো নির্ভাবনায়।।
হঠাৎ উদভ্রান্ত হয়ে, ঢুকল ঘরে—বছর পনেরোর এক কিশোরী—
দাঁড়াল এসে সে—অসুস্থ বাবার পাশে—
চমকে উঠে রইলাম তার পানে চেয়ে—কি অদ্ভুত সাদৃশ্য আমার মৃতা মায়ের সাথে—
সেই মমতাভরা চোখ—তাকিয়ে আছে যেন—তার সন্তানের পানে—
আকুল নয়নে—চায় যেন ছেলেকে কিছু বলতে।।
বললে তুমি, ডাক্তার—এ আমাদের একমাত্র মেয়ে—"ঝিনুক"—
উঠল সে গুমরে কেঁদে—বললে কাকু, শুনেছি তুমি তো খুব বড় ডাক্তার—
পারো নাকি বাঁচাতে—বাবাকে আমার।।
কাকু! বিধাতার অভিশাপ—নেই পাশে আজ কোন প্রিয়জন, নেই কোন বন্ধু
থাকি তাই একাকী—আমরা তিনজন।।
নিঃসঙ্কোচে, নিলাম তাকে বুকের মাঝে টেনে—বললাম তুমি যে আমার মা!
পাবি কি মায়ের অবাধ্য হতে? হব আমি ছেলে তোমার—
বন্ধু হয়ে থাকব আমি—সুখদুঃখে তোমার পাশে—সুস্থ করে তুলবো তোমার বাবাকে
পারবে নাকো কেউ ছিনিয়ে নিতে তাকে— তোমার ছোট্ট হাতের স্নেহবন্ধন থেকে
ঝিনুক মা! করছি আমি অঙ্গীকার—এবার তোমার কাছে।।

অনন্ত প্রতীক্ষা

চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে, হয়ে উঠেছি বড়—একই গ্রামে "সে" আর "আমি"—
ছিলাম তো দুইজনে ডানপিটে—টো টো করে ঘুরতাম, দুপুরের রোদে—
চুরি করে পেড়ে খেতাম, আম, জাম, পেয়ারা—অন্যের বাগানে।।
ছিল সে বয়েসে বড়—মাঝে মধ্যে খেতে হতো, চড় চাপড় তার হাতে—
তাই রাগ হলে করে দিতাম আড়ি—ওর সাথে।।
'বেচারা'! পারত নাকো থাকতে—আমাকে না দেখে একদিনও—আসত আবার
পকেট ভর্তি টোপা কুল নিয়ে—খাইয়ে দিত নিজের হাতে—মুখখানি আমার তুলে
ধুয়ে যেত আমার রাগ অভিমান—ওর মুচকি হাসি দেখে।।
দুষ্টুমি করে দেখাত ভয়, বলিস না যেন কাউকে—জানিস তো খেলে পাপ হয়—
পণ্ডিতমশাই, বলেন না—"টোপাকুল, নেইকো খেতে, মা সরস্বতী পুজোর আগে"।।
বড় ভালো ছিল গো—আমাদের কৈশোরটা—সময়ের কালচক্রে, গেল সব হারিয়ে
কখন জানি এসে দাঁড়ালাম—যৌবনের দোরগোড়ায়—
ওর ঘন দাড়ি গোঁফের আড়ালে, যৌবনের ঝিলিক মারত চোখে, মুখে
এসেছে যৌবনের পদক্ষেপ—ততদিনে আমারও শরীরে।।
হঠাৎ উদভ্রান্ত হয়ে, এল সে এক ভরদুপুরে—বলল চল না—একটু আসি
—ঘুরে বাহির থেকে—
গেলাম চলে ওর সাথে—আমাদের ছেলেবেলার লুকোচুরি খেলার জায়গায়—
—সেই ভাঙা নাটমন্দিরের চত্বরে।
থমকে দাঁড়িয়ে নিল সে দুহাতে, আমায় কাছে টেনে—গাঢ় স্বরে বলল তখন—
"বড্ড ভালবাসি"রে তোকে সেই ছোটবেলা থেকে—
চলেছি আজ পড়তে বিদেশের মাটিতে
—ফিরে এসে পাই যেন তোকে নিজের করে—
করিস অপেক্ষা আমার জন্য—কথা দে—
ঘাড় নেড়ে জানালাম সম্মতি—লজ্জায় মুখটা লুকালাম—ওরই বুকে।।
হয়ত সেদিন আমার ভাগ্যদেবতা—অলক্ষে হেসেছিলেন, মনে মনে—
—সেই যে গেল বিদায় নিয়ে—এল নাতো আর ফিরে
—কোনদিন—
শুনেছি মৃত্যুর করাল গ্রাস নিয়েছে ছিনিয়ে তাকে বিদেশের মাটিতে—
হয় না বিশ্বাস, সে যে বলেছিল—করিস অপেক্ষা আমার জন্য—
তাই যে আছি বসে অনন্ত প্রতীক্ষায়—আমার ভালোবাসার মানুষটার জন্য।।

শ্যামা মা

মাগো! আমি যে তোর কাঙাল ছেলে—জানি তুই থাকিস খুশি, "রাঙাজবা" পেলে—
পারি না যে তোকে, রোজ ফুল বাতাসা দিতে—করি তোর আরাধনা, ভক্তিভরে—
সকাল-সন্ধ্যা, নিয়ম করে—
শ্যামা মা! তবু তুই থাকিস দূরে, অভিমানে—আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে।।
নুন আনতে দিন ফুরোয়, জোটে না দুবেলা অন্ন মোর—দেখিস নাতো ফিরে তুই;
আমার পানে—
করিস নাতো, দয়া মোরে—আছি তবু আশায় বসে—
মাগো—আশীর্বাদ তোর পাবো বলে।।
ধর্মীয় ছেলেমেয়ে আছে তোর অনেক—মণ্ডা মেঠাই খাস তো রোজ—
আমিও করি পুজো রোজ—তবে পাই না কেন ঠাঁই, শ্রীচরণে তোর।।
ধর্মীয় পুজো পেয়ে মাগো, দেখিস নাকো চেয়ে—কাঙাল ছেলের ঝরছে জল, দুটি
নয়ন বেয়ে—
জানি না, এ তোর কেমন বিচার—তুই তো জগৎজননী, "মা"—
তোর আদালতে, দোষীরা আজ পায় না কোন সাজা—কাঙালেরা শুধু গুমরে মরে—
তাদের পাপের সাজা—বেড়েই চলে।।
যদি দুঃখী ছেলে, না পারে দিতে, তোর চরণে জবা—মোছাবি নাকি চোখের জল—
থাকবি হয়ে বোবা? বলরে শ্যামা মা—বল।।

দুটি কবিতা

রীনা আইচ সরকার

প্রভাতসূর্য

পূর্বদিগন্তে সোনালি আলোর দীপ্তি—
প্রভাতসূর্যকে স্বাগত জানায় ধরিত্রী।
তমসাচ্ছন্ন পৃথ্বী প্রভাতকিরণে জাগরিত, আনন্দিত।
কিরণমালায় উদ্ভাসিত-উদ্দীপিত—
নগরশহর, গ্রামগঞ্জ, অরণ্যজঙ্গল।
অন্যায় অবিচার প্রতিহিংসা হানাহানির
নিরন্তর নীরব সাক্ষী রৌদ্রতপ্ত ভাস্কর—
মধ্যাহ্নের প্রখরতায় তেজদীপ্ত প্রতিবাদী।
পড়ন্ত বিকেলে উপেক্ষিত সে—
অস্তরাগে বিষণ্ণতায় জর্জরিত।
পশ্চিম-দিগন্তে লাল আবির রঙ ছড়িয়ে—
নির্মল হাসিতে 'ভালো থেকো'—
বলে বিদায়ক্ষণে গেল অস্তাচলে।
তিমির রাত্রি প্রহর গোনে আগামী প্রভাতের।

মৃত্যু

হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে, থেমে গেল—
ধিকধিক শব্দ—প্রাণের স্পন্দন।
জীবনমৃত্যু সেকেন্ডের ব্যবধান!
সযত্নে লালিত চলন্ত, জীবন্ত শরীরের রূপান্তর—
নিথর, নিঃশব্দ, নিশ্চল হিমকঠিন দেহে!
যা বিলীন হল—আগুনে কিংবা মাটিতে।
প্রিয়জনের শোক, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম—
সবই সম্পন্ন হয় বিধিনিয়মে।
শোকাতুর প্রিয়জন সময়ের সঙ্গে—
ফিরে আসে সমাজের আবর্তে।
কিন্তু যে স্পন্দন থেমেছিল—
তা সচল হয়নি—হবে না কখনও—
পুনরাগমনের আশা নেই।
'মৃত্যু'—এক ভয়ঙ্কর নির্মম সত্যি।

দুটি কবিতা

ঈশ্বর মাইতি

কবিতা

কবিতা কেবলই ভাষা আর বাচালতা,
দর্শনের যুক্তিজাল কিংবা নীতিমালা?
রাধিকার কাতরতা, অন্তরের জ্বালা,
প্রেমরসে মথি হিয়া কৃষ্ণের বারতা।
গোধূলির রঙে রাঙা যক্ষের ভণিতা,
বহিছে বিরহলিপি নবমেঘমালা।
নিশীথে নীরবে শীতে দীপ নাহি জ্বালা,
ফুটে যেথা বেদনার অজস্র মুকুতা।
অমরায় বসি লেখ, তাহাদের কথা—
হে দেবেন্দ্র! ওই মরতের অসুরকুল
উদিয়া ছুটিয়া চলে মরণের তরে?
সর্ষপ বার্তায় ফেরে পুত্রহীনা মাতা,
সুধাংশ চাহিয়া যারা করেছিল ভুল—
তুমি কি পশেছ কভু তাদের বিবরে?

শূন্য

শূন্য মানে কিছু নাই তা কেমনে হয়?
মহাশূন্য যদি মহাফাঁক হয়, তবে—
কোথা থাকে হুরি, পরী তারা তেজোময়।
শিরোপরি হাত তুলি কোন শূন্যে সবে—
কার কাছে ভিখ মাগি ভরে বাসনায়?
শূন্যময় "কালখাত" কেমনে প্রসবে,
ধাঁধাভরা ছায়াপথ, ধরা প্রাণময়?
কেবা বীজ পুঁতেছিল কোথা হতে কবে?
জ্বালামুখী শূন্য, সৃষ্টি-লয় মূলাধার,
কিংবা বিশ্বরূপে কোটি কোটি সৌরমালা,
তব শূন্যকোল হতে লভয়ে জনম।
পরিধি বাঁধনে কভু বাঁধে পারাবার?
ত্রিদেব তোমাতে মজে সবে করি হেলা,
অবাঙমনস গোচর শূণেন্যরে নমঃ।

রাজহংসী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কী একটা দরকারী কাজে যাচ্ছিলাম আগরতলায়। প্লেন দু'ঘণ্টা লেট। অত্যন্ত বিরক্তিকর সেই দু'ঘণ্টা দমদম বিমানবন্দরে অপেক্ষা করে কাটল। কলকাতা থেকে ট্যাক্সিতে আসবার পথে বেলেঘাটায় দারুণ ট্রাফিক জ্যাম ছিল, তখন ভেবেছিলাম প্লেন বুঝি আমাকে বাদ দিয়েই উড়ে চলে যাবে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌঁছবার পর এই অকারণ অপেক্ষা।

আকাশে মেঘ জমেছে। এই মেঘ কতখানি জমাট আর এর মধ্যে ঝড়বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা আছে কিনা আমি জানি না। যদি প্লেন আজ না যায়? আসাম-ত্রিপুরা ফ্লাইট প্রায়ই ক্যানসেল্ড হয়! আগরতলা বিমানবন্দরে আমার জন্য লোকজন অপেক্ষা করে থাকবে। দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে। একটা চেনাশুনো লোকও চোখে পড়ছে না। তাহলে অন্তত কথা বলে সময় কাটানো যেত। এয়ারহোস্টেস আর বিমানকর্মীরা ঘোরাঘুরি করছে ব্যস্তভাবে। ওদের সব সময়ই ব্যস্ত মনে হয়। ওদের দেখলেই অন্য যাত্রীদের চোখ উৎসুক হবে, হয়তো কোনো খবর শোনা যাবে। কিন্তু কেউ কিছুই বলছে না। আমি একটা বই খুলে বসেছিলাম, কিন্তু মন বসছে না কিছুতেই।

তারপর একসময় আমাদের বিমানের নাম ঘোষণা হল। গনগনে রোদের মধ্যে অনেকখানি সিমেন্টের মাঠ পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে লাইন দিলাম। আমার এক হাতে একখানা মোটা বই, অন্য হাতে একটা ব্যাগ। অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম।

সিঁড়ির একেবারে ওপর একজন এয়ারহোস্টেস দাঁড়িয়ে থাকে, যার কাজ মিষ্টি হেসে প্রত্যেক যাত্রীকে নমস্কার করা। প্রত্যেক দিন প্রতিটি প্লেন ছাড়ার সময় এই কাজটা করতে হয় বলে তাদের হাসিটা নিতান্ত যান্ত্রিক। একটুখানি হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে যায়।

সাধারণত সুশ্রী মেয়েদেরই এয়ারহোস্টেস করা হয়। তারাও আবার বেশি সাজগোজ করে আরও খানিকটা কৃত্রিম-সুন্দরী হয়ে থাকে। ওদের সবাইকে প্রায় একই ধরনের দেখায় বলে আমি দু-এক পলকের বেশি দেখি না।

সিঁড়ির ওপরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল সে আমাকে নমস্কার বলতেই আমি মাথা ঝুঁকিয়ে 'নমস্কার' বলে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলাম। এই সময় আবার যেন শুনলাম সে বলছে, 'নমস্কার সুনীলদা!'

ভুল শুনলাম! ফিরে তাকালাম আবার।

মেয়েটি হাসছে। এয়ারহোস্টেসের যান্ত্রিক হাসি নয়, একটি যুবতী মেয়ের চেনা হাসি।

আমি বললাম, 'খুকু।'

ততক্ষণে পেছনের লোক এসে গেছে। প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটার বেশি দুটি কথা বলার রেওয়াজ নেই। বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে আমাকে ভেতরে চলে যেতেই হল।

নিজের জায়গাটা খুঁজে পেতে বেশি দেরি হল না। যাক, জানলার ধারেই জায়গা পাওয়া গেছে। ব্যাগটা ওপরের তাকে তুলে দিয়ে আরাম করে বসলাম। সিট বেল্টটা বেঁধে নিতে হল। এখন সিগারেট ধরাবার নিয়ম নেই।

আমার বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। সত্যিই কি খুকুকে দেখেছি? ভুল করিনি তো? কিন্তু ঠিক সেই রকমই তো সরলতা আর দুষ্টুমি মেশানো হাসি।

আমার পাশের সিটে বসল একজন বিশাল চেহারার অবাঙালি ভদ্রলোক। ভারী জিনিসের ব্যবসায়ী মনে হয়।

আজ প্লেনটাতে যাত্রী বেশি নেই। কয়েকটি সিট পুরো খালি পড়ে আছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, প্লেনটা দৌড় দেবার আগে দম নিচ্ছে।

দু'জন এয়ারহোস্টেস ঘোরাঘুরি করছে। আমি চোখ দিয়ে ওদের একজনকে অনুসরণ করতে লাগলাম। না, মেয়েটি যে খুকুই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কোনো চেনা মেয়ের পক্ষে এয়ারহোস্টেস হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বস্তুত আমি আরও দু'জন এয়ারহোস্টেসকে চিনি। কিন্তু খুকুকেই যে এখানে এ অবস্থায় দেখবো, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটা যেন অতি নাটকীয়, বেশি গল্পের মতন—ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

এখন বুঝতে পারলাম, লাউঞ্জে অপেক্ষা করার সময়, আমি খুকুকে দু-একবার ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। তখন কিছুই মনে হয়নি। এয়ারহোস্টেসদের সাজগোজ আর চাকচিক্যই বেশি চোখে পড়ে। তখন যদি চিনতে পারতাম, তা হলে খুকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারতাম। বুকের মধ্যে দারুণ কৌতূহল ছটফট করছে। যেন একটা রোমাঞ্চকর কাহিনীর অর্ধেকটা পড়ার পর বইখানা হারিয়ে গিয়েছিল, আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে হাতে। কিন্তু খুকু কি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবে? বিমানের মধ্যে কি কোনো যাত্রীর সঙ্গে ওদের গল্প করার নিয়ম আছে?

প্লেন আকাশে উড়তেই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ যে

বাড়ি-ঘর মানুষ-জন একটু একটু করে ছোট হয়ে আসছে, সেই দৃশ্যটা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। এইজন্যই জানলার পাশে জায়গা না পেলে রাগ ধরে।

সিট বেল্ট খোলার অনুমতি পেয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। খুকু আরও দু-একবার চলে গেল আমার কাছ দিয়ে, আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। এখন কাজের সময়—এখন তো আর গল্প করার কথা নয়।

এয়ারহোস্টেস দু'জনেই লজেন্সের ট্রে নিয়ে বিলি করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার খুকু আমাকে দিতে এল না, এল অন্য মেয়েটি। খুকু কি এখন ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? তাহলে হঠাৎ আমার নাম ধরে ডাকল কেন! ও যদি আমার নাম না বলত, তাহলে হয়তো আমি ওকে চিনতামই না। বড়জোর আমি মনে করতাম, খুকুর সঙ্গে মেয়েটির চেহারার মিল আছে।

এবার ওরা চা কফি দিচ্ছে। খুকু জানে, আমি চা খেতে ভালোবাসি। ছাত্রবয়সে সারাদিনে অন্তত দশ-বারো কাপ চা খেতাম। এখনো সে নেশা যায়নি। খুকুর কি মনে আছে সে কথা? অনেক সময় খুকুই আমার জন্য চা বানিয়ে আনতো তিনতলা থেকে। আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির যে কোনো ফ্ল্যাটে চা হলে সে জানে আমার জন্যও এককাপ বেশি জল নেওয়া হত। একদিন দুপুর দুটোর সময় এককাপ চা এনে খুকু বলেছিল, 'ভাগ্যিস একতলার ফ্ল্যাটে গেস্ট এসেছে, তাই তুমি চা পেলে সুনীলদা।' খুকুর কি মনে আছে? এবারেও অন্য মেয়েটিই আমাকে জিজ্ঞেস করতে এল, আমি চা না কফি খাব। আমার পাশের লোকটি চা চাইলেন বলেই আমি ইচ্ছে করে বললাম, কফি!

পাশের লোকটি চা পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমার কফি আর আসেই না। আমার আসনটা প্লেনের প্রায় লেজের দিকে। সেই জন্যই বোধহয় দেরি হচ্ছে।

পাশের লোকটি একবার উঠে গেলেন। বোধহয় বাথরুম! একটু বাদে পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই লোকটির সঙ্গে খুকু কথা বলছে। খুকু কি এই লোকটিকে চেনে নাকি! কি ব্যাপার রে বাবা!

আমি আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। এখন আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু মেঘের খেলা। মেঘ বলেও ঠিক চেনা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাদা বরফের দেশ। তার ওপর এসে পড়েছে শেষ সূর্যের আলো। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন বলল, 'এই নিন, আপনার কফি নিন।'

দেখলাম দুটো কাগজের গেলাসে কফি নিয়ে খুকু দাঁড়িয়ে আছে! কফির গন্ধের চেয়েও বেশি পাচ্ছি তার গায়ের মিষ্টি সেন্টের গন্ধ।

মুচকি হেসে খুকু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বুঝি আজকাল কফি খেতে ভালোবাসেন? চায়ের নেশা চলে গেছে?'

তাহলে মনে আছে খুকুর। একটু আনন্দ হলো। খুবই সামান্য ব্যাপার, তবু কেউ আমার পুরনো দিনের কোনো কথা মনে রেখেছে, এটা জানলেই এরকম আনন্দ হয়। কারণ আমি তো অন্য কারুরই পুরনো দিনের কথা ভুলি না। আমার দুঃখই এই, আমি কিছুই ভুলি না। এমন অনেক কিছুই থাকে যা ভুলে যাওয়াই ভাল। খুকুর পুরনো দিনের কথা যদি ভুলতে পারতাম, তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলা অনেক সহজ হত।

আমার হাতে একটি গেলাস দিয়ে খুকু বলল, 'সুনীলদা, আপনার পাশে বসব?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বসে পড়লো ঝপাৎ করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে যে ভদ্রলোক ছিলেন—'

দুষ্টু হেসে খুকু উত্তর দিল, 'তাকে আর একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি জানলার ধারে।'

আমি কফিতে চুমুক দিলাম। পরের কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

খুকু জিজ্ঞেস করল—'আপনি আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে যাননি?'

—'একটু নয়, খুব!'

—'আগরতলা কেন যাচ্ছেন?'

—'একটা কাজে।'

—'ক' দিন থাকবেন?'

—'চার-পাঁচদিন।'

—'আমিও থাকব, এক সপ্তাহ।'

—'তোমাদের পরের ফ্লাইটেই ফিরে আসতে হয় না?'

—'আমি ছুটি নিয়েছি।'

—'খুকু, তুমি কতদিন এই চাকরিতে ঢুকেছ?'

খুকু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'চুপ, আমাকে খুকু খুকু বলবেন না। আমার নাম বাসবী চৌধুরী।'

—'এরকম সিনেমা অ্যাকট্রেসের মতন নাম আবার তোমার কবে থেকে হল?'

—'সত্যিই আমার ভালো নাম বাসবী। অনেকে অবশ্য আমাকে জয়শ্রী বলেও ডাকত!'

আমি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোলাম। ওর জয়শ্রী নামটা আমি আগে শুনেছি। অবনীও ওকে ডাকতো ওই নামেই। আমরা অবশ্য খুকুই বলতাম।

যখন ওকে প্রথম দেখি, তখন ও ফ্রক পরত, ক্লাস নাইনের ছাত্রী। থাকত আমাদেরই পাড়ায়। বয়সের তুলনায় চেহারাটা বেশ বড়. তখন থেকেই পাড়ার ছেলেদের নজরে পড়ে গেছে।

অত্যন্ত একটা টাইট ফ্রক, কাঁধের কাছটায় ছেঁড়া জায়গাটা ডান হাতে চেপে ধরে খুকু আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটা দিয়ে দৌড়ে আসছে, দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসে।

খুকুরা থাকত অন্য বাড়িতে। ওদের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। আমাদের বিশাল ফ্ল্যাটবাড়িতে অনেক লোকজন। এরই একটা ফ্ল্যাটে এক সময় খুকুর এক দূর সম্পর্কের কাকা থাকতেন। সেই সূত্রে খুকু আসত। তারপর খুকুর কাকারা উঠে চলে গেলেন, কিন্তু ততদিনে প্রতিটি ফ্ল্যাটের লোকজনের সঙ্গে খুকুর চেনা হয়ে গেছে—এবং সকলের সঙ্গে সে দাদা-কাকা, মাসি-পিসির সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। সব ঘরের দরজাই তার জন্য অবারিত।

পাশ ফিরে খুকুর দিকে তাকালাম। সেই খুকু এখন বাসবী চৌধুরী। ফিটফাট সেজেগুজে আছে। ঝরঝর করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। মাত্র ছ-সাত বছরের ব্যবধান। এর মধ্যেই কত রকম কাণ্ড ঘটে গেছে এই মেয়েটিকে নিয়ে।

খুকু বলল, 'এক বছর দু'মাস হল এই চাকরিতে ঢুকেছি। এবার ছেড়ে দেব বোধহয়।'

—'সে কি? কেন?'

—আর ভাল্লাগছে না। এর মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে গেছে।'

—'এরপর কি করবে?'

—'কি জানি!'

বলেই খুকু আবার সরলভাবে বসল। এটাই খুকুর খাঁটি স্বভাব। পরের দিন যে ও কি করবে, তা ও নিজেই জানে না!

খুকু ছিল যাকে বলে পাড়া-বেড়ানি মেয়ে। সব সময় এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াত। আমাদের বাড়ির কেউ খুকুকে বিশেষ পছন্দ করত না। খুকু কখনো আমার ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলে গুরুজনেরা ওকে ডেকে সরিয়ে নিতেন। খুকু অনেক সময় দুমদাম কথা বলে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিত অনেককে। আমাদের রান্নাঘরে দেশলাই ফুরিয়ে গেছে, উনুন ধরানো যাচ্ছে না, খুকু অমনি ফস করে বলে ফেলত, 'মাসিমা, সুনীলদার কাছেই তো দেশলাই আছে।' তখন আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খাই, বাড়ির লোক কেও জানে

না, সেই সময়ে পকেটে দেশলাই থাকার কথা কেউ বলে দেয়! আমি খুকুকে পরে এজন্য বকুনি দিতে যেতেই ও বলেছিল, 'বাঃ, মাসিমা তো আগেই একদিন দেখে ফেলেছেন যে আপনি সিগারেট খান। তা হলে আর দোষ কি!'

পাড়ার মধ্যে কার সঙ্গে কার ভাব, কার সঙ্গে ঝগড়া, কে কার সঙ্গে গোপনে সিনেমায় যায়—এ সবও খুকু জানত। তাই সবাই ভয়ে ভয়ে থাকত, খুকু কখন কার সামনে কি বলে ফেলে! খুকু কিন্তু কোন খারাপ উদ্দেশ্যে কারুর গোপন কথা কখনো ফাঁস করে দেয়নি। অন্যদের তুলনায় ওর সরলতা ছিল বেশি। ভাল-মন্দের ব্যবধানও ঠিক বুঝত না। গুরুজনেরা যাঁরা এক সময় খুকুবে ভালবাসতেন, বড় হয়ে ওঠার পর তাঁরাও খুকুকে অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

খুকুর উদ্ধত স্বাস্থ্য, সেটা ওর দোষ। তাছাড়া ও পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারতে শুরু করেছে। তাছাড়া ও নাকি চোর। প্রায়ই একখানা-দুখানা বই না বলে নিয়ে চলে যায়। আমার দু-একটা বই কখনো কখনো অদৃশ্য হয়ে গেলেও আমি ওকে সন্দেহ করিনি।

খুকুর স্বভাবটা ছটফটে হলেও বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ। স্কুলে পড়াশুনায় ভাল ছিল। ওদের পরিবারটা সম্মানিত হলেও হঠাৎ ভাঙন ধরেছিল। ওর বাবা মারা যান সামান্য অসুখে, এক দাদা আমেরিকায়—বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না— দিদি চাকরি করে আর খুব প্রেম করছে একজনের সঙ্গে। শিগগিরই বিয়ে হবে-- একটি ছোট ভাই অনেকটা জড়ভরত ধরনের।

ক্লাস টেনে উঠে খুকুও রীতিমত প্রেম করে বেড়াতে লাগল। তার নিন্দেয় কান পাতা যায় না। অথচ, মাঝেমধ্যে যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখনও সেই রকম সরল মুখ, বই পড়ার দারুণ আগ্রহ। কথা বলতে ভাল লাগে মেয়েটির সঙ্গে।

অন্যরা যাকে প্রেম কিংবা অসভ্যতা ভাবে, সেটা খুকুর ক্ষেত্রে ছিল মেলামেশা। গলির মোড়ে সদ্য-যুবারা আড্ডা মারে। মেয়েরা যখন সেখান দিয়ে যায়, মুখ নিচু করে থাকে, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলে না,— যেন কোনোক্রমে সেই জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারলেই হল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার নিয়ম নেই। একমাত্র খুকুই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ত। ছেলেদের নাম ধরে ডেকে কথা বলত। অনেক ছেলেই তার বাল্যকালের খেলার সাথী, তারা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুকু তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেনি। তাদের সঙ্গে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছে। ক্লাবঘরে আগে ক্যারাম খেলেছে। কি জানি, সিনেমাতেও গেছে কিনা ওদের সঙ্গে! মেয়ে হয়েও সে ছেলেদের সঙ্গে সমান সমানভাবে মিশতে চেয়েছিল। গুরুজনদের চোখে

সেটাই অন্যায়।

আমাদের বাড়িতেই ছাদের একখানা ঘর নিয়ে থাকত দুই ভাই, অবনী আর সুবীর। মফঃস্বলের গরিব ঘরের ছেলে, কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করছে। খুব কষ্ট করে থাকত ওরা। দুটি ছেলেই চমৎকার, খানিকটা আদর্শবাদী ধরনের। অবনী সদ্য বি.এসসি পরীক্ষা দিয়েছে, তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি, এরই মধ্যে নিজে কি একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছে। ছোট ভাই সুবীর তখনো কলেজে পড়ছে। ওরা দুভাই নিজেরাই রান্না করে খায়।

খুকু কখনো কখনো ওদের ঘরেও যেত গল্প করতে। ওদের চা বানিয়ে দিত কিংবা রান্নায় সাহায্য করত। শুধু ব্যাচিলরের ঘরে কোনো মেয়ের যাওয়া আসায় পাড়ার লোকেদের আরও চোখ টাটায়। সুনীতি রক্ষার নামে আসলে সেটা হিংসে।

একদিন শুনলাম, পাড়ার কয়েকটা ছেলের সঙ্গে অবনী খুব ঝগড়া করেছে। অবনী ঠাণ্ডা স্বভাবের ছেলে, পাড়ার মস্তানদের ঘাঁটাঘাঁটি করা তাকে মানায় না। কিন্তু ব্যাপারটায় নাকি খুকু জড়িত।

দেশের অবস্থা সেই সময় বদলে গিয়েছিল অনেকটা। আগে যাদের বলা হত পাড়ার ছেলে, তাদেরই নাম হল পাড়ার মস্তান। তারা কেউ হাতে লোহার বালা পরে, কেউ দাড়ি রাখে। গলার আওয়াজও হঠাৎ কর্কশ হয়ে গেছে। কিংবা ইচ্ছে করেই কর্কশভাবে কথা বলে। তাদের রীতিমত সমীহ করে চলতে হয়, তারা কাউকে অপমান করছে দেখলেও প্রতিবাদ করা যায় না। ভদ্রলোকেরা সবাই তখন এই নীতি নিয়েছে যে মাস্তানদের ঘাঁটাতে নেই।

খুকু কিন্তু তখনো মেলামেশা ছাড়েনি ওদের সঙ্গে। সেইরকমই হেসে হেসে গল্প করে। আবার কখনো ওদের ধমকাতেও দেখেছি, মাস্তানদের সঙ্গে খুকুর এই ভাব রাখাটা অবনী সহ্য করতে পারেনি। খুকুদের বাড়িতে শক্ত কোনো অভিভাবক নেই। তার মা নিরীহ মানুষ—সেখানে অবনীই হয়ে উঠল অভিভাবকের মতন। মাস্তানরা এই নিয়ে আওয়াজ দেওয়া শুরু করল অবনীকে।

তার কয়েকদিন বাদে শুনলাম, অবনী আর সুবীর খুকুদের বাড়িতেই খাবার ব্যবস্থা করেছে। বদলে টাকা দেয়। এর ফলে ওদের আর হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না, খুকুদেরও খানিকটা সাহায্য হবে। সেই সঙ্গে অবনী খুকুকে পড়াতে শুরু করেছে—সামনেই স্কুল ফাইনাল, সে যাতে ভাল রেজাল্ট করতে পারে।

কফি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, খুকু আমার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে

উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল 'আগরতলায় আপনি কোথায় থাকবেন?'

--'সার্কিট হাউসে।'

—'আমি দেখা করব আপনার সঙ্গে।'

—'নিশ্চয়ই এসো—'

—'আপনি আমাকে দেখে রাগ করেননি?'

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল এই কথাটা। আমিও হাসিমুখে বললাম, 'না।'

—'আমি এখন যাচ্ছি। যদি পারি তো আবার আসব—'

খুকুর চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। কেন বললাম, 'না!' ওর ওপরে দারুণ রাগ করাই তো উচিত!

খুব মনে পড়ছে অবনী আর সুবীরের কথা। একটা সামান্য মেয়ের জন্য ওদের জীবন কী ছন্নছাড়া হয়ে গেল! অথচ খুকুর মুখে সামান্য গ্লানির চিহ্নও নেই।

অবনী দারুণ যত্ন করে পড়াচ্ছিল খুকুকে। তার মনোভাবটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খুকু যাতে উচ্ছন্নে না যায়, সেদিকে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। খুকুকে সে লেখাপড়া শিখিয়ে তৈরি করে নিচ্ছিল, তারপর সময় মতন বিয়ের প্রস্তাব করবে।

সুবীর ছিল খুবই লাজুক। তার মনের কথা কেউ জানতে পারেনি।

খুকু আমার কাছে আসত গল্পের বই নিতে। যতক্ষণ থাকতো গলগল করে অনেক কথা বলে যেত। তখন তার বেশির ভাগ গল্প অবনী আর সুবীর সম্পর্কে। দুজনকে নিয়েই সে মজা করত সব সময়—ওদের চায়ে নুন মিশিয়ে দিত, সুবীরের অঙ্কের খাতার মলাট বদলে জব্দ করেছিল। এইসব বলতে বলতে খুকু ঝরঝর করে হাসত। শুধু সেই নির্মল হাসিটুকুর জন্যই ওর ওপর রাগ করা যেত না।

পরীক্ষার মাত্র একমাস আগে খুকু সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা করল। এখনো সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তার মাত্র কয়েকদিন আগে আমাদের পাড়ার বিমানদার বিয়ে হয়েছে খুব ধুমধামের সঙ্গে। বিমানদাব স্ত্রী আরতি দেখতেও যেমন সুন্দরী, স্বভাবটিও সেই রকম নম্র।

বিয়ে উপলক্ষে খুকু কয়েকদিন সারাক্ষণই প্রায় রয়ে গেল বিমানদার বাড়িতে। সবরকম কাজে সাহায্য করতেও সে ওস্তাদ। আরতিবৌদির সঙ্গেও তার ভাব হয়ে গেল খুব। বিমানদার আর কোনো ভাইবোন ছিল না, খুকুই যেন হয়ে গেল আরতিবৌদির ননদ।

বিমানদা অফিস যাবার পর নতুন বৌ বাড়িতে একা থাকে, তাই খুকুই হয়ে গেল তার প্রত্যেক দিনের সঙ্গী। সকালবেলা অবনীর কাছে পড়াশুনা সেরে নিয়েই খুকু চলে আসত আরতিবৌদির কাছে। আরতিবৌদি প্রায়ই তাকে খাওয়ান। এমনকি আরতিবৌদি তাঁর বাড়িতেও খুকুকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। উনি ওকে খুবই ভালবেসে ফেলেছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা আরতিবৌদি শখ করে খুকুকে তাঁর নতুন একটা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই। দাঁড়াও একটু স্নো আর পাউডার মাখিয়ে দিই।'

সেজেগুজে ফুটফুটে হয়ে উঠল খুকু। আরতিবৌদির তাতেও তৃপ্তি হল না। নিজের গয়নাগুলোও সব পরিয়ে দিলেন খুকুকে। তারপর তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'দেখাচ্ছে ঠিক যেন রাজকন্যা--ইস! তোমার দাদা বাড়িতে থাকলে এই সময় তোমার যদি একটা ছবি তুলে রাখা যেত!'

আয়নার সামনে খুকু অনেকক্ষণ নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। এত ভালো শাড়ি তো বেচারি কখনো পায়নি। এরকম গয়নাও পরেনি। ওর চেহারাটা সুন্দর, ফুটফুটে মুখ, সাজগোজ করলে ওকে তো ভাল দেখাবেই।

খুকু বলল, 'বৌদি, আমার মাকে একটু দেখিয়ে আসব?'

আরতিবৌদি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললেন, 'যাও না, দেখিয়ে এসো না—।'

এক পাড়ার মধ্যেই বাড়ি। দুপুরবেলা, ভয়ের কোনো কারণ নেই। খুকু ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল আর ফিরল না।

আরতিবৌদি বিকেলবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কারুকে কিছু বললেন না। তারপর বিমানদা বাড়ি ফিরলে শুধু বললেন, খুকুদের বাড়িতে একবার খোঁজ নিতে।

খুকুর মা আকাশ থেকে পড়লেন। খুকু দুপুরের পর একবারও বাড়িতে আসেনি। পাড়ার মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি হল। খবর নেওয়া হল বিভিন্ন হাসপাতালে এবং থানায়। কোথাও নেই, খুকু যেন সম্পূর্ণ উবে গেছে।

ব্যাপারটা প্রথম বিশ্বাসই করা যায়নি। দিন-দুপুরে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে কি করে উধাও হয়ে যাবে? তার গায়ে অত গয়না ছিল বলে প্রথমেই মনে আসে যে, কেউ হয়তো তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই বা

কি করে হয়? বিমানদার বড়ি থেকে খুকুদের বাড়ি মাত্র কুড়ি-পঁচিশখানা বাড়ি পরেই। পাড়ার মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা। সেখান থেকে কে তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

তখন স্বভাবতই মনে আসে, খুকু সোজা তার মায়ের কাছে না এসে অন্য কোথাও গিয়েছিল। চেয়েছিল আর কাউকে তার শাড়ি গয়না পরা চেহারা দেখাতে। কাকে? অবনীকে? কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটবাড়িতেও সে আসেনি। দুপুরবেলা অবনী বা সুবীর কেউ বাড়িতে থাকে না। তাহলে কি খুকু নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে? আরতিবৌদির গয়না নিয়ে? তখন ওর বয়েস কতই বা, বড়জোর আঠারো-উনিশ! সেই বয়েসের একটি মেয়ের এরকম ডাকাতে বুদ্ধি হবে, বিশ্বাস করা যায় না, কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

সেই সময় দেখেছিলাম আরতিবৌদির মহত্ত্ব। উনি দিনের পর দিন সান্ত্বনা দিতে যেতেন খুকুর মাকে। তিনি বলতেন, 'শাড়ি-গয়না গেছে যাক, সে এমন কিছু না---শুধু খুকু ফিরে এলেই হয়।'

খুকুর মায়ের চোখ থেকে অনবরত জলের ধারা গড়াত। এই দুঃসময়ে বিধবাকে সাহায্য করারও কেউ ছিল না।

দারুণ আঘাত পেয়েছিল অবনী। যেন তার সমস্ত স্বপ্ন তছনছ করে দিয়ে গেছে ওই একটি মেয়ে। অবনীর মুখের চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল, সব সময়ে ফ্যাকাসে একটা ভাব। যেন তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছোট ভাই সুবীর এমনিতে চুপচাপ, সে এ ব্যাপারেও কোনো কথা বলেনি, আরও যেন চুপচাপ হয়ে গেল এবং অল্পদিন পরেই অসুখে পড়ল।

খুকুকে ফিরে পাওয়ার আশা যখন সবাই মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময় প্রায় মাস দেড়েক পরে, খুকুর চিঠি এল কাশী থেকে। খুকু তার মা'কে লিখেছে যে গোবিন্দ নামে একটি ছেলে তাকে বিয়ে করতে চায়। গোবিন্দ জাতে তিলি---সেইজন্য এই বিয়েতে তার মায়ের আপত্তি আছে কিনা!

এত কাণ্ডের পর শুধু জাত বিষয়ে মায়ের আপত্তি আছে কিনা এইটাই যেন বড় ব্যাপার! খুকু আরও লিখেছে যে গোবিন্দ খুব ভালো ছেলে এবং সে বলেছে পরে চাকরি করে সে আরতিবৌদির গয়নাগুলো ফিরিয়ে দেবে।

চিঠি পেয়ে খুকুর মা-ই শুধু কাঁদলেন, আর সবাই রাগে ফুঁসে উঠল। সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন শাস্তি দিতেই হবে। বয়েসের দিক থেকে খুকু তখনও নাবালিকা, সুতরাং পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনা যাবে।

পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে সন্ধান পাওয়া গেল, গোবিন্দ অন্য পাড়ার

একজন মাস্তান। খুকুর সঙ্গে সঙ্গে সেও উধাও হয়ে গেছে ঠিকই, তবে যোগাযোগটা এতদিন বোঝা যায়নি।

একমাত্র আরতিবৌদিই পুলিশে খবর দেবার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, পুলিশ দিয়ে জোর করে ধরে আনতে গেলে খুকুর জীবনটাই বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত, গয়না চুরির অপবাদ তিনি কিছুতেই খুকুর নামে দিতে চান না। তিনি সবাইকে বললেন, ওই সব গয়না তিনি ইচ্ছে করে খুকুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। খুকু যদি গোবিন্দকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে, তবে তাই হোক। তিনি আশীর্বাদ করবেন।

তবু পুলিশে খবর গেল। এবং পুলিশ কিছু করার আগেই অবনী ঠিক করল সে তক্ষুনি কাশী চলে যাবে। এখন আবার মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেছে তার। এখন মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা খুকুকে সে ফিরিয়ে আনবেই। ট্রেন ধরার জন্য একটা সুটকেশ হাতে নিয়ে সন্ধেবেলায় অবনী বেরুতে যাচ্ছে, সেই সময় আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। অসুস্থ অবস্থাতেই সুবীর দাদার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে আর সুটকেশটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। পাগলের মত সে চেঁচিয়ে বলছে, 'না দাদা, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না। ও আমাদের কেউ নয়! ওর জন্য তুমি যাবে না!'

অবনী ধমকে বলল, 'তুই চুপ কর। আমি কি করব না করব, তা তুই আমাকে শেখাবি?'

সুবীর বলল, 'তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা নষ্ট মেয়ের জন্য ছুটে যাচ্ছো?'

অবনী এক চড় মারল তার ভাইকে।

চড় খেয়ে সুবীব একটুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অবনীর হাত থেকে সুটকেশটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'না, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না—'

অবনী এক-একবার ছোট ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে আবার সুবীর দৌড়ে গিয়ে তার পথ আটকাচ্ছে। শেষপর্যন্ত রাস্তার মোড়ে দুই ভাইয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল—একটা ট্যাক্সি দেখে তাতে একসময় উঠে পড়ল অবনী।

সেইদিনই ভোররাত্রে আত্মহত্যা করলো সুবীর।

ছাদের ঘরে একলা একলা শুয়ে থেকে কোন যাতনা তার মনে ছিল কেউ জানে না। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করার গ্লানি হয়তো সে সহ্য করতে পারেনি। কিংবা হয়তো গোপনে গোপনে সে খুকুকে তার দাদার চেয়েও বেশি ভালবাসত।

খুকু ওরকমভাবে চলে যাওয়ায় সেই আঘাত পেয়েছিল বেশি। ভোররাত্রে সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে।

খুকুর জন্য অনেকগুলি মানুষের জীবন বদলে গেছে। সেই খুকু এখন সেজেগুজে কি রকম ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিমানের মধ্যে! সম্পূর্ণ অনাবিল মুখ।

অবনী কাশী থেকে ফিরে এসেছিল তিনদিন পরেই। খুকু তার সঙ্গে আসেনি। একদিন একটুক্ষণের জন্য তার সঙ্গে খুকুর দেখা হয়েছিল—তারপরই তারা অন্য কোথাও চলে যায়। অবনী যখন ফিরে এল, তখন সে একটি সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষ। তার ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ তক্ষুনি তাকে জানাতে কেউ সাহস পায়নি।

এর অল্পদিন পরেই খুকুর মায়েরা চলে যায় আমাদের পাড়া থেকে। অবনীও ফিরে যায় তার দেশের বাড়িতে। এত কাণ্ড করার পরও আরতিবৌদি এবং পাড়ার অন্য দু-একটি মহিলা কখনো বলে ফেলেছেন, যা-ই বলো মেয়েটা কিন্তু এমনিতে বেশ ভাল ছিল। এত সরল মন, অথচ কেন যে এরকম একটা ব্যাপার করল!

লোকের মুখে টুকরো টুকরোভাবে আমি শুনেছিলাম খুকু ঠিক নিজের ইচ্ছেয় পালিয়ে যায়নি। আরতিবৌদির বাড়ি থেকে বেরুবার পর কোনো একটি ছেলে তাকে সিনেমা দেখাবার প্রস্তাব দেয়। খুকু লুকিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখতো। তার বাড়িতে তো এমন কেউ ছিল না যে তাকে সিনেমা দেখাবে! তার দিদি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত সব সময়।

আসলে এত দামী দামী শাড়ি-গয়না পরে মাথা ঘুরে গিয়েছিল খুকুর। মেয়েদের এরকম হয়। সে চেয়েছিল যতক্ষণ বেশি সম্ভব ওগুলো পরে থাকতে। সে জানতো, মাকে দেখাতে গেলেই তো মা বলবেন, যা, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়। তাই সে চেয়েছিল ওইগুলো পরে কিছুক্ষণ বেড়াবে, রাস্তায় ঘুরবে। সিনেমাতে যাওয়াও তো সেই জনাই—লোকে তাকে দেখবে।

সিনেমা দেখার পর হোটেলে খাওয়াবার নাম করে কয়েকটি ছেলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। মোট চারটি ছেলে। তারপর গয়না বিক্রি করে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কাশীতে। প্রথম যে ছেলেটি সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে হঠিয়ে দিয়ে খুকুর অধিকার নিয়ে নেয় গোবিন্দ। সেই গোবিন্দর সঙ্গেও খুকুর বিয়ে হয়নি শেষপর্যন্ত—এলাহাবাদের রাস্তায় হঠাৎ সে মারামারি বাধিয়ে দু-তিনটে লোকের মাথা ফাটায় এবং নিজেও আহত হয়। পুলিশ

তাকে ধরে চালান করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। খুকু তখন একা ছিল। বছরখানেক পরে খুকুকে নাকি কলকাতায় দেখা গেছে আবার। আমি আর দেখিনি।

সেখান থেকে খুকু কোথায় গেল তা আমি আর জানি না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, খুকু ক্রমশই অন্ধকার জগতে চলে যাবে। ওদিকে যারা একবার যায়, তাদের তো ফেরার রাস্তা থকে না। কিন্তু খুকু আবার একটা পদ্মফুলের মতন ফুটে উঠেছে। চাকরি পেয়েছে যখন, নিশ্চয়ই পড়াশুনো করেছে কিছুটা অন্তত। মুখে কোনোরকম পুরনো গ্লানির চিহ্ন নেই। ও কি ফিরে গেছে ওর মায়ের কাছে? আরতিবৌদির সঙ্গে আর কখনো দেখা করেছে? কিছুই জানি না। কৌতূহল হচ্ছে খুব, কিন্তু এখন তো ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। বিমানদা আর আরতিবৌদি এখন বোম্বেতে থাকেন। অবনী কোথায় আছে, খবর রাখি না।

আগরতলা এসে গেছে, সিট বেল্ট বেঁধে নেবার সঙ্কেত জ্বলে উঠেছে। খুকু এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি ওর সিঁথির দিকে তাকালাম। সিঁদুরের চিহ্ন থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিবাহিতা মেয়েরা বোধহয় এয়ারহোস্টেস হতে পারে না।

আমি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'অবনীকে মনে আছে?'

খুকু হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, বাঃ মনে থাকবে না কেন? জানেন না, অবনীদা তো বিয়ে করেছেন ওঁরই এক প্রফেসারের মেয়েকে। ইলেট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা করছেন এখন, বেশ ভাল অবস্থা!'

—'তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

—'হ্যাঁ, দু-একবার দেখা হয়েছে। ওঁর বিয়েতে তো নেমন্তন্নও খেতে গিয়েছিলাম।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাঝখানের ঘটনাগুলো কি তাহলে স্বপ্ন? গয়না চুরি, ইলোপমেন্ট, আত্মহত্যা—এতগুলো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ খুকুর মনে তার কোনো দাগই নেই? সে এমনভাবে কথা বলছে যেন তার সুদিনেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। সব কিছুই এমন স্বাভাবিক। শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ওব ওপর আমার রাগ আছে কিনা? অবনীকে সেই সময় দেখে মনে হয়েছিল, সে আর জীবনে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। জীবন এরকমভাবে বদলে যায়? বেচারা সুবীর! সে-ই শুধু হেরে গেল।

যাবার আগে খুকু বলে গেল, 'আপনার সঙ্গে সার্কিট হাউসে দেখা করব কিন্তু!'

আগরতলায় আমি তিন-চারদিন ছিলাম। এর মধ্যে খুকু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। নিশ্চয়ই সময় পায়নি। সে যে খুব ব্যস্ত, আমি তা বুঝেছিলাম। দূর থেকে তাকে একদিন দেখেছিলাম সন্ধেবেলা রাজবাড়ির সামনের রাস্তায়, তার সঙ্গে আরও তিনজন যুবক। খুকুহাসি মুখে হাত-পা নেড়ে তাদের কি যেন বলছে, তারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। খুব সাজগোজ করে থাকলেও তার মুখখানা সরল ছেলেমানুষিতে ভরা। আর যুবক তিনটির মুখ দেখলে মনে হয়, ওরা তিনজনেই খুকুকে যেন দেবীর মতন পুজো করতে প্রস্তুত।

তিনজন কেন একসঙ্গে? কোনো একজন পুরুষকে স্থিরভাবে ভালবাসার ক্ষমতাই বোধহয় নেই খুকুর। কিংবা ও এখনো ভালবাসতেই শেখেনি। ওর মনটা ঝরনার জলের মতন, কোনো আবিলতা নেই। কিংবা রাজহংসীর মতন যে কোনো জলের ওপর দিয়ে ভেসে গেলেও ওর পালকে দাগ পড়ে না! আমি দেওঘরে একটা বাগানবাড়ির পুকুরে এইরকম একটি রাজহংসী দেখেছিলাম। পুকুরে অনেকগুলো সাধারণ হাঁসের মধ্যে একটি মাত্র রাজহংসী ছিল। রাজহংসীরা সাধারণত খুব নিষ্ঠুর হয়। অন্য হাঁসগুলো তার চারপাশে ঘিরে থাকে, ঠিক যেন স্তুতি করে। আর রাজহংসীটি মাঝে মাঝে তার অহঙ্কারী গ্রীবা তুলে ঠোক্কর মারে এক-একজনকে। তখন রাগ হয় দেখে। কিন্তু আবার কোনো সময়ে, যখন অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে রাজহংসীটি অনেক দূরে চলে যায়—টলটলে জলের মধ্যে তার নিখুঁত শরীর, একটি পালকও ভিজে নয়, তখন মনে হয় ঠিক যেন একটি ছবি। কিংবা শিল্প। রাজহংসীটিও যেন দামী শাড়ি এবং গয়না পরে সেজে অহঙ্কারী হয়েছে। সেই রাজহংসীটি ছিল খুকুর মতন, কিংবা খুকুই সেই রাজহংসীর মতন।

যুবক তিনটির সঙ্গে যখন খুকুর কথা বলছিল, তখন তার শরীরে খুশির হিল্লোল। যেন ও তাদের দয়া বিলোচ্ছে। অথচ সরল নিষ্পাপ মুখ। একসঙ্গে অনেক ছেলের সঙ্গে মিশে ও নিজে আনন্দ পায়—আর সেই ছেলেরাও প্রত্যেকে অসুখী হয়। এই ছেলে তিনটিও মরবে।

হঠাৎ খুকুকে দেখে আমার শেখভের 'ডার্লিং' গল্পের নায়িকার কথা মনে পড়ল। সেই মেয়েটিও পুরুষের পর পুরুষ বদলে গেছে, অথচ তার সরলতা কখনো নষ্ট হয়নি।

দূর থেকে খুকুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির ওপর কি আমার রাগ করা উচিত? অথবা ঘৃণা? এর কোনোটাই আমার মনে এল না। আমি আপন মনে একটু হাসলাম।

পরমার পদকমলে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজি বারে বারে বলেছেন, মা ঠাকরুনকে চেনা সহজ নয়। হয়ত কোনোদিন চিনতেই পারব না। তাঁর প্রকাশ অতি ধীর, অতি শান্ত। কোনো ঘোষণা নেই। মানুষ প্রবল শীতকে জানে, অনুভব করে, আলোচনা করে। শীত একটি বিষয় হয়। কিন্তু কম্বলের উষ্ণ আলিঙ্গনের কোনো স্বতন্ত্র প্রচার থাকে না। সেটি মানুষের অনুভূতিতে চারিয়ে যায়। সেটি বোধের ব্যাপার। শীত আক্রমণকারী। কম্বল রক্ষাকারী।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে ছিল কুঠার। তিনি এসেছিলেন মানবমনের অরণ্য সাফ করে ছায়াতরু রোপণ করতে। নরেন্দ্রনাথ সেই মানব কাননের ছায়াতরু— বটবৃক্ষ। তাঁর অন্যান্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানরা সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা।

ওই বটতলার একটি বেদী চাই তো! জয়রামবাটী চল। এসো সারদা। আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হও। এবারের খেলায় তুমি ভূমি, আমি বীজ, নরেন মহাবৃক্ষ। তোমার বেদীতে তাপিত, ক্লিষ্ট, মূঢ়, বিমূঢ় মানুষ, নরেন্দ্রের ছায়াতলে এসে বসবে। সে ব্রহ্ম, তুমি শক্তি। তুমি দুইয়েরই ভেতর থাকবে। আমাতে এবং নরেন্দ্রনাথে। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে।

আদি শক্তি। শক্তির পরিমণ্ডলে সবাই আছে, সৎ, অসৎ, পাপী, পুণ্যবান। তোমার মাতৃত্বে সকলের অবস্থান। ব্রহ্মাকে ফলিত করার জন্যে তোমাকে আহ্বান। শুধু আহ্বান নয়, আবাহন। আসনে উপবিষ্ট হও জননী। ষোড়শী—'শ্বেতবরণা বামা পূর্ণকলা কামিনী। প্রেম সঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে ওইখানে রাজিছে ষোড়শী রূপিণী।'

ভূমি, বীজ, বৃক্ষ, ছায়া। ধৃতি, শক্তি, ধ্যান। আমার শক্তি তুমি দারণ করো। সেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের বীর্য। শত পুত্রের জননী হবে তুমি। তোমার বীজমন্ত্রে অসৎ সৎ হবে। দুর্বল সবল হবে। পাশবদ্ধ পাশমুক্ত হবে।

ধরিত্রী সর্বংসহা। সহ্যগুণই তার একমাত্র গুণ। ত্রিশূলের তিনটি শূল জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম। সেই ত্রিশূল সারদাভূমিতে। তুমি সরস্বতী। তোমার জ্ঞান, আমার ভক্তি, নরেন্দ্রের জ্ঞান আর ভক্তিমিশ্রিত কর্ম!

আমরা ফলিত গীতা। দশবার গীতা বল। বেরিয়ে আসবে গীতার সার— তাগী তাগী। তাগী আর ত্যাগী একই অর্থ। নরেন্দ্রনাথ আমাদের ব্যাখ্যা। এই গীতার টীকা।

গেল, গেল, গেল, হল না, হল না, হল না।

মা ডাকলেন, শোন। আমার এই দাওয়ায় বোস। গোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দে।

প্রথম প্রশ্ন, কি গেল?

মা। কি যে গেল, তা নিজেও ঠিক বুঝি না, তবে চতুর্দিকেই ওই এক রব, গেল, গেল। দেশ গেল, জীবন গেল, সততা গেল, শান্তি গেল, আদর্শ গেল, সদ্ভাব গেল। মানুষ নামধারী জাতটাই চলে গেল।

তোমাকে আমার প্রশ্ন, খবরের কাগজে দেশ দেখে, একটা ধারণা তৈরি করে কথা না বলে, নিজের দিকে তাকিয়ে বলো—তুমি কি আছ, না গেছ!

মা। আমি আছি।

কাদের মধ্যে আছ?

অনেক অনেক মানুষের মধ্যে আছি।

তারা কোথায় আছে?

প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরিবারে আছে।

পরিবার কাকে বলে?

পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদি।

তোমার পিতা আছেন?

না, তিনি প্রয়াত।

তাঁর কথা মনে পড়ে?

সদা, সর্বদা।

তুমি পিতা হয়েছ?

হ্যাঁ মা।

তুমি কি তোমার পিতার মতো পিতা হতে পেরেছ?

না মা।

কেন পারোনি?

আমার সেই ত্যাগ নেই, আদর্শনিষ্ঠ নই আমি। আমি অলস। আমি তালেগোলে তলিয়ে গেছি। আমি অর্থকেই একমাত্র সামর্থ্য বলে মনে করি।

বেশ, পিতা না হতে পারো, ভ্রাতা কি হতে পেরেছ?

সেও তো পারিনি মা?

কেন বাবা?

একটাই কারণ মা, স্বার্থ। ভাইকে ভাই বলে মনে করতে পারি না। মনে করি সে একজন ভাগীদার। মহাশত্রু আমার।

বেশ। আচ্ছা, তুমি কি স্বামী হতে পেরেছ?

বোধহয় পারিনি।

কেন?

স্ত্রীকে আমি আমার সম্পত্তি ভাবি। প্রেম নেই, সহানুভূতি নেই, শ্রদ্ধা নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু দাবি।

তাহলে বাবা, শ্মশান তো তুমি নিজেই তৈরি করেছ। কার কি গেছে জানি না তোমার তো সবই গেছে। তোমার হাতের অদৃশ্য কুঠার ফেলে দাও না কেন। পৃথিবী জুড়ে ভাঙনের খেলা, তারই মধ্যে গঠন। ভাঙতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে কজন। সব ভাঙার সেরা ভাঙা—নিজেকে চুরমার করা। যে-নদী গতি হারায় সেই নদীই মজে যায়। শরীরে যে অঙ্গে রক্তস্রোত বন্ধ হয়, সেই সঙ্গে পক্ষাঘাত হয়।

বসে আছি মায়ের দাওয়ায়। বৈশাখের ঝাঁঝাঁ দুপুর।

মা বলছেন, যাও না বাবা, কামারপুকুরে গিয়ে, হালদারপুকুরে স্নান করো। ওই জলে স্নান করতেন ঠাকুরের পিতা। সেই জল গায়ে মাখো। ঠাকুরের পিতা, আমার পিতা, নরেন্দ্রনাথের মা, এই তো সব আদর্শের স্তম্ভ। এই তো তোমার পরিবার।

গণেশের মূর্তি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মহাদেববাবু মানুষটি বড় ভালো। দোষের মধ্যে তিনি গরিব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আর সেইজন্য বাড়িতে তাঁকে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তাঁর স্ত্রী মনে করেন ভালোমানুষির জন্যই মহাদেববাবু কোনো উন্নতি করতে পারলেন না। একটা দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করেন তিনি। সামান্য যা পান তা থেকেও গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করেন। কেউ ধারটার করলে শোধ চাইতে পারেন না। দুষ্টু লোকেরা তাঁকে ঠকানোরও চেষ্টা করে। মহাদেববাবু ভালোই জানেন, এ জীবনে তিনি আর উন্নতি করতে পারবেনও না। তাঁর সেইজন্য তেমন দুঃখও নেই। তবে ছেলেপুলেরা খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট পেলে তাঁর খুব দুঃখ হয়। বেশি পয়সার লোভ তাঁর নেই। তবে আর সামান্য কিছু বেশি টাকা যদি রোজগার করতে পারতেন তাহলেই হত।

একদিন কাজ-কর্ম সেরে রাত্রিবেলা মহাদেববাবু বাড়ি ফিরছেন। পথে একটা মস্ত বটগাছ পড়ে। এই বটতলায় মাঝে মাঝে এক-আধজন সাধু এসে কয়েকদিন ধুনি জ্বালিয়ে থানা গেড়ে বসে। ধর্মভীরু মহাদেববাবু সাধু-সজ্জন দেখলেই সিকিটা- আধুলিটা যাই হোক প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে যান।

আজ দেখলেন বটতলায় বিরাট চেহারার এক প্রাচীন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিশাল জটা আর দাড়ি-গোঁফ। মহাদেববাবু চটি ছেড়ে ভক্তিভরে একখানা সিকি প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, কী চাস তুই?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না বাবা।

সাধুরা সর্বত্যাগী, তাঁদের কাছে কিছু চাইতে মহাদেববাবুর লজ্জা করে।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, কিছুই চাস না?

না বাবা, আপনার কাছে চাইব? আপনি নিজেই তো সবকিছু ত্যাগ করে এসেছেন।

সাধুর মুখভাব দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। দুই জ্বলজ্বল চোখে কিছুক্ষণ মহাদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ পাশে রাখা একটা ঝোলা থেকে একটা ছোটো গণেশমূর্তি বের করে বললেন, এটা নিয়ে যা।

মহাদেব মূর্তিটা ভক্তিভরে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। পেতলের তৈরি ছোটো সুন্দর একখানা মূর্তি।

সাধু বললেন. মাথার কাছে রেখে রাতে শুবি।

যে আজ্ঞে। কিন্তু বাবা, আমার তো আব পয়সা নেই, এর দাম দেব কি

করে?

কে কার দাম দিতে পারে রে ব্যাটা! দাম দেওয়া কি সোজা! যা বাড়ি যা।

ভারী যত্ন করে মূর্তিটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মহাদেব। তাঁর বিছানার কাছে শিয়রে একটা কুলুঙ্গিতে মূর্তিটা রেখে রাতে শুলেন।

ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ মাঝরাতে টুক করে কি যেন একটা তাঁর পেটের ওপর পড়ল। তিনি চমকে জেগে উঠে জিনিসটা হাতড়ে নিয়ে আলো জ্বেলে দেখলেন, একটা কাঁচা টাকা। তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন। টাকাটা কোত্থেকে এল তা আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারলেন না।

পরদিন কাজে যাওয়ার সময় তিনি বটতলার সাধুটিকে আর দেখতে পেলেন না। শুধু ধুনির ছাই পড়ে আছে। সাধুজী চলে গেছেন। ইচ্ছে ছিল, আজ একটা টাকা প্রণামী দিয়ে যাবেন, তা আর হল না।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রিবেলা ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমোলেন মহাদেববাবু। আর কী আশ্চর্য! আজও মধ্যরাতে তাঁর পেটের ওপর আগের রাতের মতোই একটা কাঁচা টাকা কোথা থেকে যেন এসে পড়ল। ঘুম ভেঙে মহাদেববাবু অবাক হয়ে বসে রইলেন। এটা কী হচ্ছে? এ কি গণেশঠাকুরের মহিমা? তিনি গণেশমূর্তিকে একটা প্রণাম করে বললেন, ঠাকুর তোমার কত দয়া!

তা রোজই এইভাবে একটা করে টাকা পেতে লাগলেন মহাদেববাবু।

মাসান্তে তাঁর ত্রিশটি টাকা অতিরিক্ত আয় হল। তাতে সংসারেরও সামান্য উন্নতি হল। মহাদেববাবু ত্রিশ টাকা থেকে পাঁচটি টাকা জমিয়ে ফেললেন। টানাটানির সংসারে এতকাল একটি পয়সাও সঞ্চয় হত না।

গণেশবাবার পয়েই যে এ কাণ্ড ঘটছে তাতে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা তাঁকে কী আশ্চর্য জিনিসই না দিয়ে গেলেন। কৃতজ্ঞতায় রোজ তাঁর চোখে জল আসে।

বছর ঘুরল। ক্রমে ক্রমে মহাদেববাবুর অভাবের সংসারে একটু করে লক্ষ্মীশ্রীও ফিরছে। অল্প অল্প করে টাকাও জমছে। মহাদেববাবু তাতেই খুশি। তাঁর বেশি লোভ নেই।

মহাদেবের এই সামান্য বৈষয়িক উন্নতিও দু-একজনের চোখে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন হলেন, উল্টোদিকের বাড়ির মদন চৌধুরী। মদন পয়সাওলা লোক, তবে খুব হিসেবি। সবাই জানে তিনি হাড়কেপ্পন।

একদিন মদন চৌধুরী এসে মহাদেবের সঙ্গে আলাপ জমালেন। নানা কথায় ধীরে ধীরে মহাদেবের বৈষয়িক উন্নতির প্রসঙ্গও এল।

মদন জিজ্ঞেস করলেন, তা মহাদেব, তোমার মহাজন কি তোমার বেতন-

টেতন বাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে না মদনদা।

তাহলে তোমার মুখখানায় যে আজকাল হাসি-খুশি ভাব দেখছি! বউমাও তো তেমন গঞ্জনা দিচ্ছেন না তোমাকে? বলি ব্যাপারখানা কি?

মহাদেব অতি সরল সোজা মানুষ। তিনি অকপটে সরলভাবে গণেশমূর্তির ইতিবৃত্তান্ত সব মদন চৌধুরীকে বলে ফেললেন।

মদন চৌধুরীর চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। বললেন, বাপু হে, তুমি তো মস্ত আহাম্মক দেখছি। গণেশবাবার কাছে বেশি করে চেয়ে নাও না কেন? মোটে একখানা করে টাকা—ওতে কি হয়?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, না দাদা, উনি খুশি হয়ে দিচ্ছেন, এই ঢের। তার বেশি আমার দরকার নেই।

মদন চৌধুরী খুব চিন্তিত মুখে উঠে চলে গেলেন।

তিন-চারদিন পরে মহাদেববাবু একদিন কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে ফুল-জল দিতে গিয়ে দেখেন, কুলুঙ্গিতে গণেশমূর্তিটি নেই। মহাদেববাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও গণেশমূর্তি পাওয়া গেল না। মহাদেববাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন, তাঁর দুচোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাদেববাবু মনে মনে বললেন, এত সুখ তো আমার কপালে সওয়ার কথা নয়।

ওদিকে মদন চৌধুরীর আহ্লাদ আর ধরে না। মাথার কাছে তাকের ওপর গণেশমূর্তি নিয়ে শুয়ে প্রথম রাত্রেই তিনিও একখানি কাঁচা টাকা পেয়ে গেলেন।

সকালবেলা তিনি গণেশমূর্তিকে প্রণাম করে বললেন, মহাদেবটা আহাম্মক বাবা' ও তোমার মহিমা কী বুঝবে? ও রোজ একটা করে বাতাসা ভোগ দিত, সেইজন্যই তো দুপুরবেলা চুপি চুপি আমি তোমাকে চুরি করে এনেছি। ও বাড়িতে তোমার যত্ন হচ্ছিল না। তোমাকে রোজ আমি সন্দেশ ভোগ দেব। টাকাটা দয়া করে পাঁচগুণ করে দাও।

তাই হল। পরের রাতে পর পর পাঁচটি কাঁচা টাকা এসে পড়ল মদন চৌধুরীর পেটের ওপর। তিনি আহ্লাদে ডগোমগো। গণেশ তাঁর কথা শুনেছেন। সকালবেলায় তিনি গণেশকে প্রণাম করে বললেন, তোমার হাত খুলে গেছে বাবা। তাহলে টাকাটা এবার পঞ্চাশ গুণ হোক।

তাই হল। মাঝরাতে বৃষ্টির মতো তাঁর পেটের উপর মোট আড়াইশোটা কাঁচা টাকা পড়ল। তাতে মদন চৌধুরীর পেটে বেশ ব্যথার কথা মনেই রইল না। সকালে তিনি গণেশবাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, দয়াই যদি করলে তাহলে টাকাটা এবার হাজার গুণ করে দাও।

রাত্রিবেলা যা ঘটল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না মদন চৌধুরী। মধ্যরাতে হঠাৎ যখন তাঁর পেটের ওপর টাকা পড়তে শুরু করল তখন তিনি আহ্লাদে উঠে বসলেন। ওপর থেকে টং টং টং টং করে টাকা পড়তে লাগল মাথায়, গায়ে, হাতে, পায়ে। আড়াই লাখ টাকার বৃষ্টি যখন শেষ হল তখন মদন চৌধুরীর মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে, শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। টাকার স্তূপে সম্পূর্ণ ঢাকা।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন শরীরের একশো ফোঁড়ার ব্যথা! নড়তে পারছেন না। কিন্তু লোভ বলে কথা। ফের গণেশের মূর্তির দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, প্রাণ যায় যাক, টাকাটা দু হাজার গুণ করে দাও।

তারপর দুরুদুরু বক্ষে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ যেন বজ্রনির্ঘোষের একটা শব্দ হল। তারপর বিশাল জলপ্রপাতের মতো টাকা নেমে আসতে লাগল। আহ্লাদে দুহাত তুলে চেঁচালেন মদন চৌধুরী। কিন্তু আহ্লাদটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। পঞ্চাশ কোটি টাকার বিপুল ভারে তিনি চাপা পড়ে গেলেন। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পর যখন হামাগুড়ি দিয়ে টাকার স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর শরীরে আর শক্তি বলে কিছু নেই। মাথা ঘুরছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গণেশবাবার মূর্তির দিকে চেয়ে তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলনে, আর চাই না বাবা, আমার প্রাণটা রক্ষে করো।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মাঝরাতে ফের টাকার প্রপাত নেমে আসতেই আতঙ্কিত মদন চৌধুরী বিছানা থেকে নেমে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কাঁচা টাকাগুলো তাঁর মাথায় আর গায়েই এসে পড়তে লাগল। ঘরখানা টাকায় ভরে গেল। আর এই বিপুল টাকার নীচে আবার চাপা পড়লেন মদন চৌধুরী।

পরদিন সকালে কাজে বেরনোর আগে মহাদেব চাট্টি মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে মদন চৌধুরী এসে তাঁর সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই মহাদেব, আমাকে ক্ষমা করো। এই নাও তোমার গণেশ। আমিই চুরি করেছিলুম লোভে পড়ে তার শাস্তি ভালো মতোই পেয়েছি।

গণেশমূর্তি ফিরে পেয়ে মহাদেবেরও চোখে জল এল।

মদন চৌধুরী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, বহু টাকা দিয়েছিলেন গণেশবাবা। আজ সকালে কেঁদে কেটে বললাম, বাবা তোমার টাকা ফেরত নাও। ও আমার চাই না। এ ধর্মের টাকা লোভী লোকের জন্য নয়। তা দয়া করে গণেশ সব টাকা ফেরত নিয়েছেন। আমার ঘরে আর একটাও টাকা নেই। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

মহাদেব গণেশমূর্তিকে আবার কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলেন। গণেশ যেন হাসতে লাগলেন।

কালো ছায়া, সাদা ছায়া
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দূর থেকে আওয়াজটা কানে আসছিল রাবেয়ার। তীক্ষ্ণ মেয়েলি কান্নাকে তাড়া করে বুনো চিৎকার ঘাপটে বেড়াচ্ছে ঝাঁ ঝাঁ রোদে। নিঝুম দুপুরের নেশা প্রায় ছুটে যায়। এমন ভরা বেলায় কাদের ঘরে কাজিয়া বাধল গো?

রাবেয়ার দু-চোখ পিটির পিটির। আলপথটুকু পার হয়ে থমকে দাঁড়াল, সিরাজুলদের পুকুরপাড়ে। খোঁদলে নেমে যাওয়া চৈত্রের পুকুরজলে বাসন ধুচ্ছে সিরাজুলের বউ। শুকনো গাছের বাঁকা গুঁড়িতে ঠেসান দিল রাবেয়া। হা হা শ্বাস নিল,—আ লো ও আমিনা, কার ঘরে নাগল রে?

আমিনা ফিক করে হাসল,—কানের মাথাও খেলে নাকি? নিজের বউ ছাওয়ালের গলা চিনতি পারো না?

হাই মা, বলে কি গো! রাবেয়ার চোখ বড় বড়। বুঝি শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। তবে কি অ্যাদ্দিনে বুড়ো ফকিরের শিকড়ে গুণ ধরল?

হাতের প্লাস্টিক .... আর বাদাম নামখানা বুকে চাপল রাবেয়া। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—কী নে নাগল?

—তোমার বেটার বুঝি ঘরে চাল আনার কথা ছেল। আনেনি। সেই ট্যাকা দে এডুয়া সাইরেছে। গান শুনবে বলি। বাসন হাতে তরতর উঠে আসছে আমিনা,—এক জোড়া বেটারিও কিনেছে গো।

—তারপর?

—তারপর আর কী। সে ঘরে ঢুকতেই হেই চিৎকার, হেই ঝগড়া...তোমার বউ-এর মুখ তো কম নয়, খুব চোপা করতেছেল। মুজিবর জোর ক ঘা বইসে দেছে। জয়নালচাচা, আকবর সব এসেছিল তো থামাতি, তা কে কার বাক্যি শোনে। কথার তোড়ে হাঁপাচ্ছে আমিনা। গুঁড়িটা ধরে দাঁড়াল,—তা তুমি কোত্থিকে? হাঁসপাতাল?

—আমার আর কোথায় যাওয়ার আছে। মরণ যদ্দিন না আসতিছে, শুধু বড়ি গেলো, আর বড়ি গেলো...

—ক্যানো, তোমার কাশি তো নরম হয়ে গেছে।

—দূর দূর, গুলি পরেই বুক এখনও ছিঁড়ি যায়। আতভোর জেগি বসি থাকি।

—কোমবে, কোমবে! বড় ওগ কি ওমনি বলালিই সারে!...যাও, গে জিইরে

নাও।

সিরাজুলের বউ কোমর দুলিয়ে চলে গেল।

সামনেই, ঝাল মরিচের ক্ষেতের ধারে সিরাজুলের ঘর। তার ওপারে রাবেয়ার ভিটে। চালা এখন দু ভাগ, এক ভাগে চলছে দাপাদাপি। হঠাৎ হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ে মুজিবর, ওমনি বউ-এর নাকী সুর খনখন করে ওঠে।

টুকুনখানিক খেজুর গাছের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রাবেয়া। কান খাড়া করে পালাগান শুনছে। লাগ্ লাগ্ লাগ্, আরও জোর লাগ্, হাড়ে এট্টু বাতাস লাগুক বারোয়ার। মিএগা বিবি মিলে কম জ্বালান জ্বালাচ্ছে তাকে! পেটের ছাওয়াল যদি মা ভুলে বউ সোহাগী হয়ে যায়, তার বাড়া দুঃখ আর কী আছে।

তা রাবেয়া সর্দারের কপালটাই বুঝি এরকম। আঁধার রাত চলছে তো চলছেই, দিন বুঝি আর ফুটবে না। তাও একরকম চলছিল সময়, নিত্যি দুখ, নিত্যি অভাব নিয়ে। আজিজুল সর্দার মাটি নেওয়ার পর থেকে চারদিক শুধু মিশমিশ কালো। গেল বছরের আগের বছর দিব্যি টগবগে মানুষটা মহরমের জুলুসে গেল, ফিরল গায়ে তাতল আঁচ নিয়ে। ডাক্তারবদ্যি করার অবসরটুকু দিল না, রাত পোহানোর আগেই চোখ বুজল জন্মের মতো। তাকে গোর দিতে ঘরের সঞ্চয় শেষ, মৌলবীকে তুষ্ট করতে ছাগল দুটোকে পর্যন্ত বেচে দিতে হল। মুজিবরের তখন সবে শাদি হয়েছে। শেয়ালদায় মাছের ঝোড়া বয়ে কোনদিন দশ টাকা ফেলে সংসারে, কোনদিন বিশ। ওদিকে ঘরে চারখানা পেট হাঁ হাঁ করে সর্বসময়। শেষে কলকাতায় বাবুদের বাড়ি কাজ নিল রাবেয়া, ঠিকে কাজ। নাম ভাঁড়িয়ে রাবেয়া থেকে সীতা হল। কুলসম বলেছিল, হিঁদুর বাড়ি মোচলমানের মেয়ে রাখতি কোনো সমিস্যে নেই রে, শুধু ডাকার সময়ে গিন্নিমা-রা হিঁদু নামটাই চায়। তা সে কাজ ছিল উদয় অস্ত। আঁধার থাকতে থাকতে কারখানার চক থেকে হাঁটা দাও। দু ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে ঘুটিয়ারি থেকে ট্রেন ধরো, ফেরো আবার সেই আঁধারে। তাও দু মুঠো জুটছিল তখন, আল্লাতালার সেটাই সইল না। বছর না ঘুরতে কাশরোগে ধরল রাবেয়াকে। সারাক্ষণ গায়ে ঘুসঘুসে জ্বর লেগে থাকে, বুকের ভেতর চাপা কাশি ঝিলিক মেরে বেড়ায়। সেই কাশিই দ্যাখ না দ্যাখ বুকছেঁড়া রক্ত হয়ে গেল।

রক্তকাশি চলকে ওঠে যখন তখন, আঁশটে স্বাদে গাল ভরিয়ে দেয়।

মুজিবর তখনও এমনটা ছিল না, মার জন্য খুব করেছিল সে সময়ে। শেয়ালদার কোন্ বন্ধু তাকে খবর দিয়েছিল, পার্কসার্কাস হাসপাতালে নাকি বিনি পয়সায় কাশরোগের ওষুধ দেয়। মাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল মুজিবর, কার্ড করিয়ে দিয়েছিল, বুকের ফটো তুলিয়ে দিয়েছিল। ফি জুম্মাবারে নিজেই গিয়ে

ওষুধ এনে দিত মাকে। আপেলটা আঙুরটাও আনত মাঝে মাঝে।

এরই মধ্যে আবার অঘটন। পরী ফিরে এল শ্বশুরঘর থেকে। ব্যস, সেও এল, ছেলেও পর হয়ে গেল। এমনই পর যে মায়ের পেটের ভাইবোন দুটোও তার দু-চোখের বিষ।

ওই হারামির বেটি হারামজাদিই তো পর করল মুজিবরকে। খা, মার খা, মর্ মর্। বুড়ো ফকিরের শেকড় কি মিথ্যে হয় রে! দেখি,তোরে কুস্তে পেটা করে বার করলে কোন শউর এসে এখন বাঁচায়।

বউকে প্রাণ ভরে গাল পাড়তে পাড়তে ভিটেয় পা দিল রাবেয়া। ভিন্ন হওয়ার পর নিজের ভাগের দাওয়া উঠোন আড়াল করতে তালাপাতার বেড়া তুলে নিয়েছে মুজিবর। সেই বেড়া টপকে একটানা কান্নার সুর সাঁতার কাটছে এপারে, পাক খাচ্ছে। মুজিবরের কোনো সাড়াশব্দ নেই। আজও কি খানিক মদ গিলে এসেছিল ছেলে? ইদানীং মুজিবর খুব নেশা করা শিখেছে। আয় উপায় যা হয় বোতলের গর্ভে ঢেলে দেয়। যদ্দিন রাবেয়ার সংসারে ছিল এমনটি তো ছিল না। ন-মাসে ছ-মাসে একদিন দলে পড়ে...ব্যস। কেন এমন হয় রে বাছা? পিরিত কি শুকিয়ে গেল?

নিজের দাওয়ায় চোখ পড়তেই রাবেয়ার খুশি খুশি মন ভারি আবার। দাওয়ার কোণটিতে চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে তার ছোট ছেলে মুনাবর। মুড়ো। ইয়া সাজোয়ান দেহ ছেতরে আছে প্রকাণ্ড এক মরা ব্যাঙের মতো, মুখের হাঁ বেয়ে লালা টপটপ। জন্ম থেকেই ছেলেটা এরকম, হাবাগোবা। থপথপে কালো শরীর, বিশাল এক মাথা, ঘাড়ে গর্দানে একাকার, উঁচু কপালের নিচে এতখানি ড্যাবড্যাব চোখ। অন্ধকারে ভুতের চোখের মতো জ্বলে চোখ দুটো। কপাল, কপাল, এও তো রাবেয়ার কপালেরই দোষ। দুটো মাত্র ছেলে, দুজনে দু'ধরন। ছোটটা যদি জন্মহাবা, জড়বুদ্ধি, বড় উল্টো। যেমন মতলবি, তেমনই বুদ্ধিধর। আকৃতিতেও তফাত কত। মুজিবর রোগাসোগা, গেঁড়েপানা। মুড়োর দেহে দানোর শক্তি, সেই ছোট্টটি থেকে ধাঁই ধাঁই বেড়ে চলেছে। তবে যা বাড় সব ওই দেহেই, মনের বাড় নেই এতটুকু। এক সময়ে ওই ছেলের জন্য অনেক ওষুধপালা করেছিল আজিজুল রাবেয়া। তাবিজ কবজ জলপড়া কত কী। আজিজুল কলকাতার হাসপাতালে নিয়েও গিয়েছিল ছেলেকে, বড় ডাক্তারও আশা দেয়নি। এ রোগ নাকি মায়ের পেটে থাকার কালেই বাসা বেঁধেছে মুড়োর দেহে, রাবেয়ার গর্ভদোষেই মুড়ো নাকি এরকম। শুনে অনেক ভেবেছে আজিজুল আর রাবেয়া। দোষটা ঠিক কার ছিল? রাবেয়ারই, নাকি আজিজুলের? কূল পায়নি। কূল পাওয়া যায়ও না বোধহয়। গর্ভদোষই যদি থাকে তবে মুজিবর আর পরীও তো...। কপাল,

কপাল, এর পিছনেও সেই রাবেয়ারই কপাল।

দাওয়ায় উঠে মুড়োকে ঠেলল রাবেয়া,—অ্যাই ওট্। ওট্ দিকি।

মুড়োর নড়াচড়ার লক্ষণ নেই।

রাবেয়া জোরে জোরে ঝাঁকাল ছেলেকে,—উঠে পড় বাবা মানিক আমার। বেলা যে দুপুর গইড়ে বিকেল হল বাপ।

মুড়ো পাশ ফিরে শুল। নিঃশ্বাস যেন অনিয়মিত কয়েক পল, আবার স্বাভাবিক। ফরর ফরর নাক ডাকছে।

নিচু হয়ে ছেলের পেটে আলগা হাত বোলাল রাবেয়া। না, যা ভেবেছে তা নয়, মুড়ো খেয়েই শুয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রাবেয়ার শরীর ছেড়ে গেল। ভেবেছিল মায়ে বেটায় ভাগাভাগি করে খাবে পাতে, মুড়ো যখন খেয়ে নিয়েছে তার মানে সব শেষ। কী যন্ত্রণা কী যন্ত্রণা, আবার চুলো ধরাও, ভাত ফোটাও...ভাবতেই পেটে খিদে খলবল, গা গুলিয়ে উঠল রাবেয়ার। সেই কোন সকালে চাট্টি পান্তা খেয়ে হাসপাতালে ছুটেছিল, মাঝে দুগাল মুড়ি-ঘুগনি মাত্র পড়েছে খোলে, ট্রেন উজিয়ে এতখানি পথ ফিরতে সব কখন হজম। এখন আর নতুন করে ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে।

পা টেনে টেনে রাবেয়া ঘরে ঢুকল। বড়ি, ক্যাপসুলের প্যাকেট আর হলুদবরণ খাম রেখেছে তক্তপোষে। নিচে চালের বস্তা, কমে কমে তলানি, বড়জোর আর হপ্তাখানেক চলবে। পরী মাইনে পেলে প্রথমেই কিছু চাল কিনতে হবে।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে ঢকঢক ঢালল রাবেয়া, মুখে ঘাড়ে ছিটোল। বড় তাপ, বড় তাপ, একটু বুঝি শীতল হল তাও। মাটিই যখন ফুটিফাটা, দেহের আর দোষ কী! আঁচল লেপে লেপে রাবেয়া গা কপাল মুছল ভালো করে। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসবে নাকি? থাক বাবা, ডাক্তারের বারণ, অবেলায় আর চান নাই করল। মুখে আমিনাকে যাই বলুক রোগের তেজ নরম হয়েছে তো বটেই। আরও কটা মাস নিয়ম মেনে চললে...

উঠোনে শুকনো কাঠিকুঠি, ক-টুকরো রেঁড়ির কাঠও। মুড়ো আর কিছু না পারুক ডালপালা জুটিয়ে আনে বেশ। উনুনে কাঠকুটো গুঁজল রাবেয়া, বোতল থেকে মেপে কেরোসিন ঢালল। তেলও প্রায় বাড়ন্ত, পরীকে বলতে হবে আবার লিটার পাঁচেক জোগাড় করতে। ছকুর দোকানে বড় বেশি দাম নেয়, শহর থেকে পরী কমে আনে।

দেশলাই মারতেই আগুন লকলক। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে দাওয়া উঠোন, মুড়োর হুঁশটি নেই। বেড়া টপকে ওপারেও ছুটছে ধোঁয়া, গুলগুল ঘুরছে। অন্যদিন

হলে ঘুমের ব্যাঘাত হত জাহানারার, শির ফুলিয়ে ঝগড়া বাধাত। আজ রা কাড়ছে না, খুনখুন কেঁদে চলেছে। কাঁদ্ কাঁদ্।

চারদিক ভারি নিশুত এখন। গনগনে সূর্য একটু আগেও বাদায় আগুন ছড়াচ্ছিল, গড়াতে গড়াতে সে কখন হিন্দুপাড়ার গাছগাছালি মাথায়। ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে থেকে থেকে, কুটোকাটা নাচছে। কাদের যেন ছাগল পথ হারিয়েছে, পথে পথে কেঁদে মরছে বেচারা। পেঁপেডালের ডগায় ঝুপ করে একটা কাক এসে বসল, ডাকছে কা কা।

চুলো ধরে উঠেছে। চাল ধুয়ে ভাত বসাল রাবেয়া। বগবগ ফুটছ ভাত, ফ্যান লাফাচ্ছে।

রাবেয়া খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে নাক টানল। আহ্ কী সুবাস।

—সাঁঝের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস যে বড়? টেমিখান পর্যন্ত জ্বালতি পারিসনি?

আমানির সুখনিদ্রা ভেঙে গেল রাবেয়ার। ধড়মড় করে উঠে বসল। এত আঁধার নামল কখন।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে রাবেয়া দেশলাই হাতড়াল,—আজ মনে হয় তাড়াতাড়ি ফিরি এলি?

—এলাম, ক্যানো আসতে নি?

—তা নয়। রাবেয়া কোমর চেপে উঠে দাঁড়াল—ওজই তো আত হয়।

—কাজ থাকলিই হয়।

গাঁ-ঘর থেকে আর যেন কেউ কাজে যায় না! কথাটা বলতে গিয়েও বলল না রাবেয়া। বললেই এক্ষুনি খরখরিয়ে উঠবে পরী। কেউব সঙ্গে আমার তুলনা দিস নি। আমি বাবুগার ঘরে ঝি খাটতি যাই না! পেলাস্টিক কারখানায় লেবার আমি. আমার ওভারটাইম থাকে।

কী থাকে কে জানে! রাবেয়ার মেয়েকে ঘাটতে বেশি সাহস হয় না। যে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বেঁচে থাকা, তার গায়ে কি বাড়ি মারা চলে।

রাবেয়া টেমি ধরাল। হ্যারিকেনটাও! ঘরের ম্লান আলোয় যতখানি উজ্জ্বলতা, ততখানিই অন্ধকার।

কাপড় ছাড়ছে পরী। ইদানীং নাইলনের শাড়ি পরে মেয়ে, খোঁপায় বাহারি ক্লিপ লাগায়, কপালে লাল নীল টিপ। বাইরের সাজ খুলে সবুজে ডুরে শাড়িখানা জড়িয়ে নিল গায়ে। পুকুরধারে যেতে যেতে বলল—মুড়ো ইস্টিশনে গে বসে

আছে।

—ওমা সি কী কথা। এই তো দাওয়ায় শুয়েছেল।

—বাবুরা সব তারে নে সেখেনে মজা করতিছে। কত করে ডাকলাম, এলুনি। অবোদটারে টুকুন চোখে রাখতে পারিস না? কোনোদিন নাইনে ক্যাটা পড়বে, তখন বুঝবি।

রাবেয়ার বুক ধড়াস করে উঠল,—তো এখুন কী হবে? কারে ডাকতি পাঠাই?

—সিরাজুলচাচা ইস্টিশনে ছেল। তারে বলে, এইছি। আসার সময়ে নে আসবে।

রাবেয়ার প্রাণ শান্ত হল। মেয়ে ঘর থেকে বেরোতেই, মেয়ের থলি উপুড় করল মেঝেতে। কুমড়োর ফালি আছে একখানা, গোটা দুয়েক ছোট বেগুন, আলু, কাঁচালঙ্কা, আর কটা কাদা চিংড়ি। রাবেয়ার চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল। যাক, মেয়ে আজ তাও মনে করে দুটো মাছ এনেছে।

হ্যারিকেন এনে দাওয়ায় রাখল রাবেয়া। চিংড়ির খোসা ছাড়াচ্ছে। মেয়ে ফিরতেই চাপা স্বরে বলল—খপর আছে রে পরী।

পরী ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—বুড়ো ফকিরের শেকড় অ্যাদ্দিনে ধরেছে রে। মাগীরে আজ গোবেড়েন দেছে মুজিবর। খুব পিটেছে।

পরী থামল। বুঝি ওপারের বাতাস শুঁকে নিল একটু। চোখ ঘুরিয়ে বলল—হঠাৎ?

—তোর বাপের ওই এড়ুয়াটা নিয়েই গোল। চাল না এনে বুঝি বেটারি কিনেছে মুজিবর...

—কই, এখুন তো সাড়া পাই না! পরী মায়ের সামনে উবু হয়ে বসল।

—এই তো রে, এই বিকেলেও চলতেছেল। খুব কান্‌ছিল মাগী।

—কান্নার হইয়েছে কী? ও মাগীর আরও কত সব্বোনাশ হবে দ্যাখো। মিএগ বিবি এক্কেরে জ্বলেপুড়ে মরবে।

—আহা, এর মদ্যি তোর ভাইজানরে টানিস ক্যানো?

—বকু নি। তোমার বেটাও এমন কিছু পীরপয়গম্বর নয়। দুটোই সমান। আমারে কম পোড়ান পুইড়েছে।

রাবেয়া আর ছেলের হয়ে ওকালতি করতে ভরসা পেল না। মুজিবরের ওপর পরীর রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ এককালে এই মুজিবর আর পরীতে কী ভাবটাই না ছিল। যে বোনকে চোখে হারাত মুজিবর, সেই হল কিনা

তার জনমশত্রু! বোনটাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল তার কোনো প্রতিকার নেই, আবার এই ভিটেতেও তাকে ঠাঁই দিবি না, মেয়েটা তবে যায় কোথায়! যুক্তি কী ছেলের! পরীর যখন একবার সাঙা হয়ে গেছে, আর তার বাপের ভিটেয় ভাগ নেই!

রাবেয়া বলেছিল—এ কেমন ধারার কথা হল বাপু? তোর বোনটারে তেইড়ে দেছে কে?

—কে আবার! তার ভাতার আর শউড় শাউড়ি।

—সেই শউড় শাউড়ি তোর কে হয়?

—আম্মরও তারা শউড় শাউড়ি।

—তবে? তবে?

—কী তবে?

—তোর বাপজানের সঙ্গে শউড় শউড়ের কী কথা হয়েছেল? আমগার মেয়ে তারা নিলি পর তাদের মেয়ে আমরা নেব, ঠিক কি না?

—তা সে মেয়ে যদি বাজা হয় তবু তারে নে ঘর করতি হবে? কথার মাঝে কালনাগিনীর মতো ছোবল মেরেছিল জাহানারা, —মোর ভাইজান যদি ফের সাঙা করি থাকে তো বেশ করেছে। আরেট্টা বিবি আনার তার হক আছে।

—সে হক তো তবে আমার বেটারও আছে। আম্মোও ফের তার শাদি দুব।

—গায়ের জোর নিকি? দেখি তোর বেটার কত বড় কলজে, ফের নিকে বসুক দিনি।

রাবেয়ার খুব আশা ছিল, ছেলে তার পক্ষ নেবে। পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেছে, একটা কেন চারটে বউ এনে দেখিয়ে দেবে। জাহানারাকে তালাক দিতে চাইলে কানে জল ঢুকবে তার শ্বশুর শাশুড়ির, রাবেয়ার পায়ে ধরে সুড়সুড় ফেরত নিয়ে যাবে পরীকে। হায় আল্লা ভেড়ামুখো ছেলে দিব্যি মাগের আঁচল ধরে বসে রইল, রা-টি কাড়ল না।

পরী ঝাপটে উঠেছিল—তোর ওই গুমোর থাকবে নি রে ভাবী! এই আমি বলে দিলাম।

বউ-এর ঝটপট উত্তর—আটকুড়ি মাগীর শাপ বাতাসে উপে যায়। তুই আমার কচু করবি।

সব মনে আছে রাবেয়ার। পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি সব কথায় কথা বাড়ল, বিবাদে বিবাদ। গাঁয়ের পাঁচজন প্রথমটা মজা চেটে নিল খুব। তারপর বিচারসভা বসল। একদিন নয়, দুদিন নয়, তিনদিন। পরীর শ্বশুরঘর থেকে কেউ এল না,

রাবেয়ার জামাইও না। শেষমেশ সবাই মিলে রায় দিল, পরী যদি ফের নিকে না বসে তবে সে এখানেই থাকবে, আজীবন তাকে সমান দিতে হবে সব কিছুই। জমিজিরেত বাস্তুভিটে সবেরই চারআনা শুধু মুজিবরের। ব্যস, ওমনি দানোয় পাওয়া মানুষ বনে গেল মুজিবর। বাসন কোসন থালা কম্বলেরও ভাগ চাই তার, এমনকি ছেঁড়া কাঁথাকানিরও। ভাতের হাঁড়ি ছিল তিনখানা, বউ তার একটা নিল। কলাই করা থালা বাটি নিল দুটো, জামবাটি একখানা। শেষ লড়াই বাধল আজিজুলের রেডিওখানা নিয়ে। মুজিবর সেটা নেবেই, রাবেয়াও দেবে না। একগলা তাড়ি গিলে মাকে কাটতে এল মুজিবর, রাবেয়াও আঁচল পেতে শাপমন্যি করল ছেলেকে। পরীই বুঝি শেষে রেডিওটা দিয়ে দিল ভাইকে। রাতারাতি তালপাতার বেড়া উঠে গেল উঠোনে, দাওয়ায়। ওপার থেকে উড়ে এসে পড়ল রাবেয়ার হাসপাতালের কার্ড, বুকের ফটো, এপার থেকে ভেসে গেল ঝাঁঝ। ওপারে নেচে নেচে খেউড় পাড়ছে বউ বেটা, এপারে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে মা মেয়ে।

রাবেয়ার সব মনে আছে। রাবেয়া কিছুই ভোলেনি। আনাজ কাটতে কাটতে টুকরো টুকরো গাল ছুঁড়ছে পরী, শুনতে শুনতে চোয়াল কঠিন হল রাবেয়ার। বাতাসে কান পাতল, না বউ-এর কান্নার সুর একেবারেই থেমে গেছে। ব্যাপার কী, অমন ঘর কাঁপানো গান ফুরিয়ে গেল? নাকি খালি পেটে আর গলা খুলছে না? বোঝ্ রে বোঝ, উপোসী থাকার কত জ্বালা। দ্যাখ এবার, চার ভাগের একভাগ ধান খেয়ে কত গলার তেজ থাকে।

মুজিবরের গলা শোনা গেল। কী যেন হুকুম ছুঁড়ছে। জড়ানো গলা, চুল্লু টেনে ঘুমোচ্ছিল বোধহয়, জাগল বুঝি। রেডিওটা বেজে উঠল হঠাৎ। ঘোড়ে জেইসে চাল, হাতি জেইচে দুম...। উদ্দাম সুর, উত্তেজিত বাজনা। ঝুপ করে বন্ধ হয়ে গেল গান। আবার বেজে উঠল। আবার বন্ধ হল, আবার বাজছে। ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে ওপারে। কী যেন একটা ভারী কিছু ছিটকে পড়ল উঠোনে, কঁকিয়ে উঠল জাহানারা। লাথি খাওয়া কুকুরছানার মতো। রেডিও কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মুজিবর, দাপাতে দাপাতে। হিন্দি গানের কলি ক্রমশ আবছা হয়ে এল।

রাবেয়ার ঠোঁটের কোনে মিটমিট হাসি—..........

পরীর বাদামি মুখে আলো ছড়িয়ে পড়েছে,—আর একদিন যা না রে মা ফকিরের দোরে। তারে গে বল্ কাজিয়া ঝোগড়া নয়, এক্কেরে তালাক চাই। শিকড় আমি ঠিক নিজে হাতে ভাইজানের বালিশির মধ্যি ঢুইকে দে আসব।

রাবেয়া মাথা দোলাল—যাব। যাব।

কাশতে কাশতে দম ছিঁড়ে যাচ্ছিল রাবেয়ার। ভোরের মুখে এমনটাই হয়। প্রতিদিনই। বুকের ভেতর হঠাৎ যেন পিঁপড়ে বাইতে থাকে, বিষ পিঁপড়ে। গলায় এসে আঁচড় কাটে। ঘুম তো দূরস্থান, রাবেয়ার তখন শুয়ে থাকারও জো নেই। তক্তপোষে বসে বসে কাশে আর হাঁপায়, হাঁপায় আর কাশে। আঁচল মুখে চেপে দেখে মাঝে মাঝে, আবার সেই মারণ-ছিটে আসছে কিনা।

আজ যেন কাশতে কাশতে পিঠটাই নুয়ে এল। দমক একটু জিরেনদিতেই বিছানা ছাড়ল রাবেয়া, কলসি থেকে গড়িয়ে ঢকঢক জল খাচ্ছে। মাগো মা, শ্বাসবায়ু বুঝি বেরিয়ে যায়। পাশে পরী মুড়ো ঘুমোচ্ছে অঘোরে, অভ্যস্ত শব্দে তাদের আর আজকাল ঘুম ভাঙে না।

একটু বুঝি বাতাস নিতেই রাবেয়া ঝাঁপ খুলে দাওয়ায় এল। নতুন ভোর ফুটছে, ফ্যাকাসে হচ্ছে আকাশ। শিরশির হাওয়া বয়। রাবেয়া গলায় আঁচল জড়াল। ধানবাদার ওপার থেকে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল ট্রেনের, মিলিয়েও গেল।

ঘরে আর ফিরতে ইচ্ছে করছিল না রাবেয়ার। শুয়ে থাকা বড় কষ্টের এখন, বসে আছে ঠায়। ঢুলতে ঢুলতে আলোর অপেক্ষা করছে।

সহসা এক আওয়াজে ঢুলুনি ছিঁড়ে গেল। বেড়ার ওপারে ওয়াক ওয়াক করে কে! মুজিবর নাকি।

পায়ে পায়ে উঠল রাবেয়া। উঠোন টপকে বেড়ার ওপারে গেছে। মুজিবর নয়, জাহানারা। মাইলো গাছের নিচে উবু হয়ে বসে বমি করছে।

ফিরে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল রাবেয়া। ঘড়ঘড়ে গলায় প্রশ্ন করল—বমি করিস ক্যানো?

জাহানারা মুখ তুলে দেখল শাশুড়িকে, মুখ নামিয়ে নিল। ছায়া ছায়া আঁধারেও জাহানারার দৃষ্টি যেন পড়তে পারল না রাবেয়া। অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করল—পেটে ছাওয়াল আসতিছে?

ঢিপ করে মাথা নাড়ল জাহানারা, পরক্ষণে আবার ওয়াক্ ওয়াক। থেবড়ে বসে পড়ল মাটিতে, গোঙাচ্ছে। চোখের জল আর নাকের জলে মুখ একাকার।

রাবেয়ার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—কাল দুপুর থিকে তো কিছু পেটে পড়েনি। খালি পেটে থাকলি...কটা মুড়ি গালে ফ্যাল্ গিয়ে।

জাহানারা হাঁপাচ্ছে। দু-দিকে মাথা নাড়ল,—এক দানা কিচ্ছু নি।

—মরণ। রাবেয়া ঝুপ ঝুপ করে ঘরে ফিরে এল। ঢাকা খুলে বার করেছে পান্তার বাটি। কাঁপা হাতে বাটি ধরে আবার বেড়ার ওপারে। শুকনো গলায় বলল—খেইয়ে নে। কাউরে কিছু বলতি হবে নি. কেউ যেন না জানে।

গোগ্রাসে খাচ্ছে জাহানারা, পলকে বাটি চেটেপুটে সাফ।

শূন্য বাটি হাতে ফিরতে ফিরতে টনক নড়ল রাবেয়ার। ঝোঁকের মাথায় এ কী করে বসল। ওই পান্তাকটা খেয়েই না পরীর কাজে বেরনোর কথা! কোত্থেকে এত দরদ এল আবাগীর বেটির জন্য? কেন এল? তার মেয়ের ছাওয়াল হয় না বলে তাড়িয়ে দিয়েছে জাহানারার বাপ-মা, আর তাদের মেয়ে পোয়াতি দেখে রাবেয়ার প্রাণ উথলে উঠল? নিজের ছেলের ছাওয়াল বলে কী? ওই বউকে তাড়িয়ে অন্য বউ-এর পেটেও তো তার নাতি আনতে পারত মুজিবর! তবে? পরীর সঙ্গে কি ঘোর শত্রুতা করা হল না? রাবেয়া কি তাহলে মনে মনে চায়, ওই মাগীটা বহাল তবিয়তে টিকে থাকুক ওপারে, পরীও আর শ্বশুরঘরে না ফিরুক? কেন চায়? পরী চলে গেলেও মুজিবর যদি ভিন্ন হয়েই তাকে, সেই ভয়ে?

রাবেয়ার চিন্তাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভেতর এত খেলাও চলে। হায় রে বুক। ঘর থেকে হলুদ খামখানা নিয়ে এল রাবেয়া, কাঁপা কাঁপা পায়ে দাওয়ায় এসে বসেছে। বুকের ফটোগুলো বার করল একটা একটা করে, ফুটন্ত আলোয় ধরছে চোখের সামনে। জমাট কালো রঙের মাঝে তেড়াবেঁকা কিছু সাদাটে ছায়া। ওই বুঝি তার হৃদয়?

হৃদয় মানে তবে ঘন কালো অন্ধকারে ছোপ ছোপ কিছু ছায়া! সাদা সাদা! রাবেয়া বুঝতে পারছিল না!

মায়াবন্দরের ফুল

আশিস সান্যাল

মোহনা অতিক্রম করে যখন জাহাজ সমুদ্রে পড়ল, তখন প্রায় সন্ধে। শেষ বেলার সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। অদ্ভুত শিহরন জাগানো সে পরিবেশ। সমুদ্রের সে এক আশ্চর্য রূপ। তার দেহের চূড়ায় চূড়ায় বিলীয়মান রোদের সে কী নিবিড় চুম্বন।

আকাশ-সাঁতার কেটে যে-সব সমুদ্র পাখি এতক্ষণ জাহাজের পেছন পেছন উড়ে আসছিলো এবং মাঝে মাঝে জলে ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরে খাচ্ছিলো অসীম আনন্দে, এখন তারা সব উধাও।

দেখতে দেখতে অন্ধকার ঢেকে দিল চারিদিক। আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটতে লাগল। ক্রমে সমস্ত আকাশ জুড়ে তারাদের সে কি ঝিক্‌মিক্। চাঁদ উঠল অনেক পরে। কিন্তু তার পূর্ণ অবয়ব নিয়ে নয়। অন্ধকার কিছুটা ফিকে হল বটে। কিন্তু সেই তরল অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি বেশিদূর প্রসারিত হতে পারছিল না।

এদিকে জাহাজের আলো ঝলমল ডেকে যাত্রীদের তখন বেশ ভিড়। রেলিংয়ের পাশ বরাবর চেয়ারে বসে অনেকেই শরীর জুড়িয়ে নিচ্ছিল সমুদ্রের ঠাণ্ডা লোনা বাতাসে। মাইকে শোনা যাচ্ছিলো জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকাদের গান।

শান্তনুর সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না। সে কিছুটা নির্জনে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলো সমুদ্রের সেই চঞ্চলা রূপ। এর আগে সে কখনো সমুদ্রের গভীরে আসেনি। তাই তার সামনে প্রতিমুহূর্তে উন্মোচিত হচ্ছিল এক একটা বিস্ময়। সমুদ্র জলের অবিশ্রান্ত গর্জন তাকে কেমন যেন উতলা করে তুলেছিল। অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে ঢাকা সমুদ্রের বিশালতাকে সে তখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছিলো না। মনে মনে ভাবছিল, কখন সেই অবগুণ্ঠনবতী আবরণ খুলে তার সামনে তুলে ধরবে উন্মোচিত রূপের বাহার। ভাবতে ভাবতে তার মন একটা অজানা বেদনায় ছট্‌ফট্ করতে থাকল।

আটটা বাজতেই জাহাজের বৈদ্যুতিন ঘণ্টা ক্রিং-ক্রিং শব্দে বেজে উঠল। রাতের খাবারের ঘন্টা। একে একে সবাই উঠে গেল কিচেনের দিকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক সময় উঠতে হল শান্তনুকে। নইলে সারা রাত না খেয়ে কাটাতে হবে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা চেয়ার খালি পেয়ে তাতেই বসে পড়ল। খাওয়া দাওয়ার পর আবার সে চলে এল ডেকে।

এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করছিল শান্তনু। কিন্তু নিচের বাঙ্কে গিয়ে শরীর

এলিয়ে দেবার কোনও প্রবণতা বোধ করছিলো না সে। কাল থেকেই মনটা কেমন যেন তার টকে ছিল। কাল বিকেল তিনটা নাগাদ সে উঠেছিল জাহাজে। কেবিনের কোনও টিকিট ছিল না। তাই কোনোক্রমে বাঙ্কের একটা টিকিট সংগ্রহ করেছে। পোর্টব্লেয়ার তাকে যেতে হবেই—সেখানে তার এক নিকট-আত্মীয় গুরুতর অসুস্থ। তাকে দেখতে।

যে কম্পার্টমেন্টে তার স্থান হয়েছে, সেখানে একদল কুলি সম্প্রদায়ের লোক উঠেছিল। বোধহয়, কোনও কারখানায় কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছে কোনও ব্যবসায়ী। এ-নিয়ে শান্তনুর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু গত রাতে কেমন যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছিলো ওরা। মদ খেয়ে সারা রাত হৈ-হৈ করেছে। নেচেছে, কুঁদেছে। যতক্ষণ চলে, তারস্বরে ট্রানজিস্টর চালিয়েছে। শান্তনুর ঠিক উল্টোদিকের বাঙ্কে ছিল একটি নব-বিবাহিত দম্পতি। ভয়ে বৌটি সারারাত জড়োসড়ো হয়ে কাটিয়েছে।

ওদের হৈ-হৈ আর চিৎকারে শান্তনুর সারা রাত একদম ঘুম হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ লেগেছিল সকালে বাথরুমে ঢুকে। প্রায় বমি এসে গিয়েছিল তার। কোনোক্রমে হাতমুখ ধুয়ে প্রাত্যহিক কাজ-কাম সেরে সেই যে উঠে এসেছিল ডেকে, তারপর আর একবারও সেখানে যায়নি। মনে মনে ভাবছিল শান্তনু, যদি কালকের মতো আজও হয়? তাই যতক্ষণ এখানে কাটানো যায়, ততক্ষণই ভালো।

ক্রমে নির্জন হয়ে গেল ডেকটা। প্রায় সকলেই চলে গেছে যে যার কেবিনে বা কম্পার্টমেন্টে। দুই-একজন ক্রু শুধু মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করছে। হঠাৎ শান্তনুর চোখে পড়ল, এক কোণে একজন মহিলা তখনো বসে। কেমন যেন কৌতূহল হল তার। মহিলাটির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কেমন যেন একটা উন্মাদনা দাপাদাপি করতে লাগল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে।

'বসে আছেন যে?' হঠাৎ চকিত প্রশ্নে মহিলাটি বেশ ঘাবড়ে গেলেন। কিছু ভাববার আগেই মহিলাটি খল্ খল্ হেসে বলে উঠল—'আপনিই বা বসে আছেন কেন?'

'আমি?' আমতা আমতা করতে লাগল শান্তনু। নিজেকে কিছুটা সংযত করে নিয়ে বলল—'আসলে, ভালো লাগছে, তাই।'

'মনে করুন, আমারও ভালো লাগছে তাই বসে আছি।' বলে আবার খল্ খল্ হেসে উঠলো মহিলাটি। তারপর শান্তনুকে লক্ষ করে বলল—'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

ঠিক এভাবে মহিলাটি তাকে বসতে আমন্ত্রণ জানাবে, তা ভাবতে পারেনি শান্তনু। তাই কেমন যেন হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মহিলাটির দিকে। এবার

শান্তনুর অসহায় অবস্থা লক্ষ করে মহিলাটি বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল—'বসুন'।

কোনও উত্তর না দিয়ে শান্তনু এবার বসে পড়ল পাশের একটি চেয়ার টেনে। সোজাসুজি তাকাল মহিলাটির দিকে। না, ঠিক মহিলা বলতে যা বোঝায়, তা নয়। বরং যুবতী বলাই ভালো। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। টানা টানা দীঘল চোখ। হাওয়ায় কানের পাশে একরাশ চুল এলোমেলো উড়ছে। কপালে একটা ছোট টিপ। গায়ে লাল রঙের ব্লাউজ আর পরনে লালপেড়ে সাদা শাড়ি। আবছা আলোয় বেশ লাগছিল ওকে। শান্তনু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। মহিলাটির সেদিকে খুব খেয়াল ছিল না। সহজ, সরল ভাবেই জিজ্ঞেস করল—'এই প্রথম যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'পোর্টব্লেয়ার। অতুল স্মৃতি পাঠাগারে।'

'অতুল স্মৃতি পাঠাগারে!' একটু বিস্মিত হল মহিলাটি। একটু থেকে আবার জিজ্ঞেস করল—'সাহিত্য সম্মেলনে?'

'হ্যাঁ।' উত্তর দিল শান্তনু।

'আপনার নাম?'

নাম শুনে বেশ পুলকিত হল মহিলাটি। এক মুহূর্তে অপরিচয়ের সব বাধা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির রেখা টেনে বলল—'আপনার অনেক লেখাই কিন্তু আমি পড়েছি।'

শান্তনু বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। মহিলাটি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল—'আমিও সাহিত্য সম্মেলন দেখে তারপর বাড়িতে যাব।'

'মানে'?

'মানে আবার কি? পোর্টব্লেয়ার থেকে পুরো একদিন। ছোট জাহাজে যেতে হয়।'

'কে কে আছেন আপনার বাড়িতে?'

'এখানে একাই থাকি আমি। কাজ করি একটা স্কুলে। আসলে বাড়ি আমার কলকাতাতেই। দক্ষিণ শহরতলিতে। চাকরি নিয়ে চলে এসেছি এখানে। বাড়িতে বাবা, মা আর ছোট দুই ভাই ও একটি বোন থাকে।'

'একা থাকতে অসুবিধা হয় না?'

'প্রথম প্রথম খুবই খারাপ লাগত। এখন মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছি।'

ক্রমে আলাপ আলোচনায় জানতে পারল শান্তনু, মহিলাটির নাম সরস্বতী মিত্র। সরস্বতী? নামটা অদ্ভুত লাগল শান্তনুর কাছে। মনে মনে কি যেন ভাবতে লাগল। এমন সময় সরস্বতী মিত্রের প্রশ্নেই ভাবনার ছেদ পড়ল তার। সরস্বতী মিত্র জিজ্ঞেস করল—'কত নম্বর কেবিনে আছেন?'

'কেবিন আর পেলাম কোথায়? বাঙ্কে আছি। কাল সারা রাত্ত ঘুম হয়নি।'

'সে কি ?' সহানুভূতির স্বর বেরিয়ে এল সরস্বতী মিত্রের কণ্ঠে। শান্তনু বলে চলল—'আজও ঘুম হবে কিনা, কে জানে?'

'কেন বলুন তো?'

'বোধহয়, কোন কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে একটা দল। তাদের হৈ-চৈ আর নাচ-গান চলেছে কাল সারা রাত। যদি আজও চলে।'

'ইস!' বেশ আবেগজড়ানো কণ্ঠে বলল সরস্বতী মিত্র। একটু ভেবে তারপর হঠাৎই বলে উঠল—'চলে আসুন না আমাদের কেবিনে? আমরা তিনজন আছি। একটি বার্থ ফাঁকাই আছে। আমাদেরই একজন আসতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ওর টিকিটটা আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'অন্যরা কিছু ভাববেন না তো?'

'না-না। এরা আমারই সহকর্মী। আপনার সঙ্গে পরিচিত হলে খুশিই হবে।'

'যদি টিকিট চেক করতে আসে?'

'সে সব ভয় নেই। ওঠার সময় ছাড়া এই জাহাজে আর টিকিট চেকিং হয় না। তাছাড়া বার্থটা তো আমাদেরই একজনের নামে রিজার্ভ করা। অন্য কোনও যাত্রীরও আসার সম্ভাবনা নেই।

'তবুও ... ...।'

'তবু-টবু নয়। চলুন আমার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আপনার।'

শান্তনু প্রস্তাবটা একেবারে নাকচ করতে পারল না। বিশেষ করে গতরাতের ঘটনা এবং বাথরুমের কথা মনে হতেই কেবিনে চলে যাবার আবেগটা টগবগ করে উঠল। তবে সহজভাবেই বলল—'চলুন। আগে আপনার সঙ্গীদের সঙ্গে একটু কথা বলা যাক।'

'চলুন।'

সরস্বতী মিত্রকে অনুসরণ করে শান্তনু গিয়ে হাজির হল সেখানে। দুটি বার্থে তখন শুয়েছিল দুজন। সরস্বতী মিত্রের ডাকে উঠে বসল তারা। অপরিচিত অতিথিকে দেখে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করছে দেখে সরস্বতী মিত্রই ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল শান্তনুর।

'এদের কোনো পরিচয় দিলেন না তো?' প্রশ্ন করল শান্তনু। উত্তরে বলল সরস্বতী মিত্র—'উপরের বার্থে যাকে দেখছেন, তার নাম ভারতী মেহতা। গুজরাটি হলেও ভালো বাংলা জানে। আর ওর নাম রাজিয়া জাহীর। আমরা তিনজন একই স্কুলে পড়াই। সুতরাং এখানে আপনার সঙ্কোচের বিশেষ কারণ নেই।' এরপর ওদের লক্ষ করে বলতে থাকল সরস্বতী মিত্র—'উনি খুব অসুবিধায়

পড়েছেন রে? নিচের কম্পার্টমেন্টে বাঙ্কের টিকিট পেয়েছেন। খুব অসুবিধা হচ্ছে ওখানে। কাল রাতে তো ঘুমোতেই পারেননি। আমাদের কেবিনে তো একটা বার্থ ফাঁকা যাচ্ছে। তাই ওনাকে এখানে চলে আসতে বললাম। তোদের আপত্তি নেই তো?'

'এতে আবার আপত্তি কি আছে?' জানাল ভারতী মেহতা। রাজিয়া জাহীরও ঘাড় নেড়ে ওই বক্তব্যে সায় জানাল। আর কি? এবার শান্তনু নিচের কম্পার্টমেন্টে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো কেবিনে। মনে একটু দ্বিধা যে ছিলো না, তা নয়। তিনজন মহিলার মধ্যে একা থাকতে হবে। কিন্তু থাকবে তো শুধু রাতটুকু। সারাদিন তো ডেকেই কাটাবে। সুতরাং মনের সব দ্বিধাকে সরিয়ে ফেলে স্বাভাবিক হতে চাইল শান্তনু। সরস্বতী মিত্রই চাদর-টাদর বিছিয়ে বার্থটা ঠিকঠাক করে দিল। শান্তনু উপরে উঠে বার্থে শরীর এলিয়ে দেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল শান্তনুর। হয়তো আরো দেরি হতো যদি-না সরস্বতী মিত্র গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিত। থতমত খেয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসল শান্তনু। সরস্বতী মিত্র কিছুটা তাগিদের সুরে বলে উঠল—'এবার উঠে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন। প্রায় নটা বাজে। এরপর আর ব্রেকফাস্ট মিলবে না।'

'আমাকে তো নিচের ক্যান্টিনে যেতে হব।'

'কেন?'

'আমার যে বাঙ্কের টিকিট।'

'তাতে কি হল? আপনি উপরের ক্যান্টিনের জন্য একশো টাকা জমা দিয়ে দিন। এতেই কদিনের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব হয়ে যাবে। যদি টাকা না লাগে, তাহলে নামার আগে ফেরত দিয়ে দেবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন।'

হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হল শান্তনু। তারপর সরস্বতী মিত্রের সঙ্গে গেল ক্যান্টিনে। সব ব্যবস্থা সেই করে দিল। একটা টেবিলের সামনে পাশাপাশি বসল তারা। ব্রেকফাস্ট সেরে গেল জাহাজের সামনের দিকে।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, চারদিকে অসীম অশান্ত কালো জলের উচ্ছ্বাস। মাঝে মাঝে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিল তারা। আকাশে দু-এক ফালি সাদা মেঘ। যতদূর চোখ যায়, আর সব অনন্ত শূন্য। কি আশ্চর্য! এই শূন্যতার মধ্যে এই জাহাজে চলছে প্রাণের খেলা।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তারা সামনে একটি ছোট টেবিল পাতা দেখে সেখানে গিয়ে বসল। পাশাপাশি। সমুদ্রের লোনা হাওয়া এসে ঝাপটে পড়ছিল

তাদের শরীরে। কথায় কথায় সরস্বতী মিত্র তার জীবনের কয়েকটি অধ্যায় খুলে ধরল শান্তনুর সামনে।

।। সরস্বতী মিত্রর গল্প।।

কলেজে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, তখনই পরিচয় হয়েছিল মৃন্ময়ের সঙ্গে। সাহিত্যচর্চায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তখন ওর বেশ নাম-ডাক ছিলো। প্রথম পরিচয়ের দিনটি এখনো স্পষ্ট মনে আছে আমার।

সেদিন ক্লাসরুম থেকে সবে বেরিয়েছি, অমনি দেখি ও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে।

'এ্যাই শোনো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

কেন জানি না, আমি সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। প্রথম পরিচয়ে 'তুমি' বলে সম্বোধনটা বেশ ভালোই লেগেছিল আমার। কিছুটা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেছিলাম—'বলুন'।

'এখানে হবে না। ইউনিয়ন অফিসে চল।'

সেদিন কেমন যেন একটা আবেগেতাড়িত হচ্ছিলাম আমি। আপত্তি করতে পারলাম না। ওর পেছন পেছন ইউনিয়ন অফিসে গেলাম। আরো কয়েকজন তখন সেখানে বসেছিল। মৃণ্ময় একটা চেয়ার এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি তাতে বসে পড়লাম। ও আমার মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসল। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে শুরু করেছিল—'জান তো, এবার কলেজে খুব বড় করে রবীন্দ্রজয়ন্তী হচ্ছে?'

'তাই বুঝি?'

'শোননি?' খুব বিস্মিত হয়েছিল মৃণ্ময়। আমি ওর বিস্মিত ভাবটাকে আরো উসকে দেবার জন্য বলেছিলাম—'না তো?'

'তা-হলে?'

'ব্যাপারটা কি বলুন না?

'না মানে, আমরা একটা নাটক করব বলে স্থির করেছি।'

'সে তো খুব ভালো কথা।'

'নায়িকা পাচ্ছি না।'

'পেয়ে যাবেন।'

'হ্যাঁ, যদি তুমি রাজি হও।' বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলেছিল মৃণ্ময়।

আমি অসহায়ের মতো তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। বলেছিলাম—'জীবনে কোনদিন অভিনয়ের ধারে-কাছে যাইনি। আমাকে...।'

কথা শেষ হতে না দিয়েই বলে উঠেছিল মৃণ্ময়—'সে ভাবতে হবে না তোমাকে। আমরা সব ঠিক করে নেব।'

'কিন্তু?'

'কিন্তু-টিন্তু নয়। তোমাকে করতেই হবে।' বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলছিল মৃণ্ময়। মনে দ্বিধা নিয়ে সেদিনের মতো উঠে গিয়েছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত পড়ার টেবিলের সামনে বসে ভাবছিলাম, করব কি করব না! শেষপর্যন্ত করার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম।

পরদিন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল রিহার্সাল। মৃণ্ময়ই পরিচালক। প্রথম দিন খুব বেশি একটা কিছু হল না। রিহার্সাল শেষ হবার পর বাড়ি ফেরার জন্য আমি বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন ছিল বাসে ভীষণ ভিড়। দু-তিনটা বাস ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, কেমন করে ফিরব! এমন সময় দেখি, মৃণ্ময় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসেছিল। একটু যেন অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছিল—'এখনো দাঁড়িয়ে?'

'বাসে ভীষণ ভিড়। উঠতে পারছি না!'

'কোথায় থাকো তুমি?'

'নাকতলায়।'

'আমিও তো সেদিকেই থাকি। যদি...।'

এমন সয়ে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখে মৃণ্ময় প্রায় ছুটে গিয়ে থামাল ট্যাক্সিটা। আমাকে ইঙ্গিতে ডাকলো। কেন জানিনা, কোন দ্বিধা না করে আমি উঠে পড়েছিলাম ট্যাক্সিটায়। মৃণ্ময় একেবারে আমার শরীর ঘেঁষে বসেছিল। মাঝে মাঝে ট্যাক্সিটা বাঁক নেবার সময় ওর শরীর লাগছিল আমার গায়ে।

ইচ্ছে করলে একটু সরে বসতে পারতাম। কিন্তু সেদিন ওর স্পর্শ আমার ভালোই লাগছিলো। একসময় ট্যাক্সিটা এত জোরে ব্রেক কষল যে, আমি টাল সামলাতে না পেরে আছড়ে পড়েছিলাম ওর শরীরে। একটু লজ্জা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু মৃণ্ময় বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলেছিল—'লেগেছে?'

'না!' উত্তর দিয়েছিলাম আমি।

'রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, যে-কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।' মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল মৃণ্ময়।

আমাকে সেদিন নাকতলায় নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল মৃণ্ময়। অবশ্য সে চেয়েছিল, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। আমিই আপত্তি করেছিলাম। বাড়ি ফিরেও আমার শরীর অদ্ভুত রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। মনে দাপাদাপি করছিল একটা অদ্ভুত চিন্তা। একটা অজানা স্বপ্নের ভেতরে সাঁতার কেটে ভেসে চলেছিলাম দূর-দিগন্তে। অনেকদিন পর হারমোনিয়ম নিয়ে গান গাইতে বসেছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে গাইলাম সেদিন।

পরদিন থেকে আমার কলেজে যাওয়ার আগ্রহটা খুব বেড়ে গিয়েছিল।

অবশ্য ক্লাশের জন্য নয়। অপেক্ষা করে বসে থাকতাম, কখন রিহার্সাল শুরু হবে। দু-তিনদিন পর থেকেই মৃণ্ময় আমার গায়ে হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত ঠিক করে দিতে আরম্ভ করেছিল। আমারও কেমন যেন হয়েছিল তখন। ইচ্ছে করেই মাঝে-মধ্যে ভুল করে বসতাম। শুধু ওর একটু স্পর্শ পাবার জন্য। এভাবেই নিজের অজান্তে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম মৃণ্ময়ের সঙ্গে। কলেজে, পাড়ায়, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল আমাদের সম্পর্কটা।

মৃণ্ময়দের বাড়ি গিয়েছিলাম একদিন। বিশাল সেই বাড়ি। মনে মনে লজ্জিত হয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে তুলনা করে। আমার বাবা ছিলেন স্কুলমাস্টার। পূর্ববঙ্গ থেকে দেশভাগের পর এপারে এসে কোনোরকমে একটা কুঁড়ে তৈরি করেছিলেন। সেখানে কোনোমতে আমরা থাকতাম। মৃণ্ময়কে সেকথা একদিন বলেছিলাম। সে বলেছিল—'অর্থ দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়?'

সত্যি, চিনতে পারিনি আমি। তিন-চার বছর মৃণ্ময়ের সঙ্গে ঘুরেও সঠিক চিনতে পারিনি ওকে। আমি তখন ওর সঙ্গে সিনেমায়, ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় নিয়মিত যেতে আরম্ভ করেছিলাম। লক্ষ করেছিলাম, মদ পেটে পড়লেই ও যেন কেমন হয়ে যায়। তখন ওকে ভীষণ অচেনা মনে হত আমার।

আমার মনে ক্রমশঃ সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করল। মৃণ্ময় কি আমায় সত্যি ভালোবাসে? নাকি আমার দেহটাই ওর একমাত্র আকর্ষণ? রোজির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? মৃণ্ময় বলত, রোজি তাদের অফিসে কাজ করে। কিন্তু অফিসের পর কেন রোজি প্রায়ই হোটেলে আসে। মাঝে মাঝে হোটেলের কিচেনে খাওয়া-দাওয়া সেরে ও আমাকে বিদায় দিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার আগ্রহ থাকত না।

আমার কৌতূহল বেড়েই চলল। একদিন হোটেলের বারে বসে প্রচুর মদ গিলল মৃণ্ময়। একেবারে টাল-মাটাল অবস্থা। আমি বসে বসে দেখছিলাম। রাত তখন প্রায় এগারোটা। মৃণ্ময় ওর ড্রাইভারকে ডেকে বললো, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। ও একটু পরে যাবে।

আমি বলেছিলাম—'গাড়ি লাগবে না। আমিই ট্যাক্সি ধরে চলে যাব।'

'না-না। রাস্তাঘাট মোটেই ভালো নয়। একা ট্যাক্সিতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'সে আমি দেখব।'

এই বলে আমি বেরিয়ে এলাম বার থেকে। ড্রাইভারকে বাইরে যেতে বলে আমি লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হোটেলেরই একজন পরিচিত ওয়েটার আমাকে দেখে এগিয়ে এল।

'ম্যাডাম! আপনি এখনো বসে?'

'সাহেব কি করছেন?'

'উনি তো কখন চলে গেছেন রুমে। আপনি জানেন না? মাঝে মাঝেই তো উনি এখানে রাত কাটান।'

'কত নম্বরে?'

'দাঁড়ান, দেখে এসে বলছি।'

একটু পরেই ওয়েটার ফিরে এসে জানাল, দুইশ-এক নম্বরে। মুহূর্তে আমার চিন্তার জগৎ ছারখার হয়ে গিয়েছিল। রক্তের ভেতরে চলছিল জোর তুফান। পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে কাঁপতে শুরু করেছিল। তবু নরকের শেষ দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখবার জন্য প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলো আমার মন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম লিফটের দিকে। উপরে উঠে দুইশ-এক নম্বরের সামনে দাঁড়ালাম। একবার ভেবেছিলাম, ফিরে যাই। আবার মনে হল, সবটা না-দেখে ফিরব? ইতস্তত করতে করতে এক সময় কলিংবেলের সুইচ টিপে ধরলাম।

দরজা খুলে গেল। আমাকে দেখে আঁতকে উঠেছিলো মৃণ্ময়। দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইছিল। কিন্তু আমিই জোর করে ঢুকে পড়লাম ঘরে। দেখি, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় তখন বিছানায় পড়ে আছে রোজি। আমাকে দেখে কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু মৃণ্ময়ের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় আমার শরীর ও মনে তখন চলছিল সংঘাত। দ্রুত সেই নরক ছেড়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

কয়েক মাস পর খবর পেয়েছিলাম, মৃণ্ময়ের বিয়ে হচ্ছে। তবে রোজির সঙ্গে নয়। দেখেশুনে প্রচুর পণ নিয়ে কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিলো মৃণ্ময়। আর তার এক বছর পর সেই মেয়েটির হয়েছিল অস্বাভাবিক মৃত্যু। সেও আরেক ইতিহাস। আসলে প্রেম ব্যাপারটা ছিল ওর কাছে পুতুলখেলার মতো।

তখন থেকেই প্রেমের কথা শুনলে আমার হাসি পায়। কয়েক বছর কলকাতাতেই ছিলাম। শেষে একটা চাকরি পেয়ে চলে এসেছি এখানে মানে মায়াবন্দরে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কেটে যায় দিন।

মাঝে মাঝেই চিঠি পাই বাবা-মার কাছ থেকে। বিয়ের জন্য অনুরোধ করে। বাড়িতে গেলেও চাপ দেওয়া হয় বিয়ের জন্য। কিন্তু না, আমার বিশ্বাসই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অবিশ্বাসের অন্ধকারে কি সঠিক পথ চেনা যায়?

আত্মহত্যা করে মনের জ্বালা মেটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই বিনাশ করতে পারলাম না নিজেকে। অতৃপ্ত বেদনা নিয়েই এখনো বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে।

কথাগুলো শেষ করে সরস্বতী মিত্র ফিরে তাকাল শান্তনুর দিকে। তার দুচোখ

বেয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রের লোনা হওয়ার ঝাপটায় ওর বুকের আঁচলটা খসে পড়ল। কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিলো না তার। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে চললো। লাঞ্চের জন্য বৈদ্যুতিন ঘণ্টা বেজে উঠল। শান্তনু জিজ্ঞেস করলো—'যাবেন না?'

'যেতে তো হবেই। শরীরটাকে তো অকারণে কষ্ট দেওয়া যায় না।'

তারা এগিয়ে চলল ক্যান্টিনের দিকে।

।। শান্তনুর ডাইরি থেকে।।

পোর্টব্লেয়ারে কয়েকদিন কাটিয়ে সরস্বতী মিত্রের অনুরোধে গেলাম মায়াবন্দরে। থাকার ব্যবস্থা হল সরস্বতী মিত্রের কোয়ার্টারে। সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরটি। বেশ হৈ-চৈ করে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি।

মায়াবন্দর। নামটি যেমন সুন্দর, দ্বীপটিও তেমনি। কালো জলের মাঝে সবুজ শ্যামল দ্বীপটি। অসংখ্য অচেনা সমুদ্র-পাখির কিচির-মিচির শব্দে প্রতিদিন ঘুম ভাঙে আমার। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই চা নিয়ে হাজির হয় সরস্বতী মিত্র।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। কালো জলের বুকে লেপটে পড়ে চাঁদের আলো ঝিলমিল করছিল। মৃদু বাতাসে ভেসে আসছিল লোনা জলের গন্ধ। বারান্দায় একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসেছিলাম আমি। সরস্বতী মিত্র বসেছিলো আমার পাশে। হঠাৎ আমার হাত পড়ল ওর গায়ে। সরস্বতী মিত্র আরও ঘেঁষে বসলো, আমার বাঁ হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে বলল—'চলুন ঘরে।'

আপত্তি না করে আমি ঘরে গেলাম। সরস্বতী মিত্র আমার পেছন পেছন। তারপর হঠাৎ আমার গায়ে আছড়ে পড়লো সে। আমি ইতস্তত করছিলাম দেখে সে বলল—'কেন জানিনা আপনাকে সব দিতে ইচ্ছে করছে!'

সে রাতে সরস্বতী মিত্র তার সবকিছু উন্মোচিত করে দিয়েছিল আমার সামনে। সকাল হলে আমি আঁতকে উঠলাম। আমি তো কখনো তাকে সর্বস্ব দিতে পারব না। তাহলে? একবার যার স্বপ্নের সৌধ ভেঙে গেছে, তাকে দ্বিতীয়বার সৌধ গড়ে আবার ভাঙবার সুযোগ দিতে আমার মন সায় দিল না। একটা বেদনাময় স্মৃতির মধ্যে আচ্ছন্নভাবে এখনো হাতড়াচ্ছে সরস্বতী মিত্র। জানি তা কোনোদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে না। তবু যা আমি পারব না, তাকে কেন পল্লবিত হতে দেবো? বরং মায়াবন্দরের এই নির্বাসনে যে ফুল রক্তাক্ত ফুটে আছে, তার সুরভি সন্ধ্যার বাতাসে ছড়াতে থাকুক। একটি আর্ত হৃদয়ের বেদনা ধ্বনিত হোক আকাশে-বাতাসে। যে বেদনায় কোন প্রলেপ আমি দিতে পারব না, তাকে কেন অকারণে উসকে দিয়ে প্রতারণা করব। সরস্বতী মিত্রের প্রতি একটা অদ্ভুত সহানুভূতি অনুভব করলাম আমি। এবং সে কারণেই পরের দিন সকালের জাহাজে পোর্টব্লেয়ার রওনা হলাম।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত শূন্য দৃষ্টিতে সরস্বতী মিত্র আমার দিকে তাকিয়েছিল।

ফ্ল্যাশব্যাক

প্রচেত গুপ্ত

আজ শেষদিন। কালই চলে যাওয়া। টেনশন বাড়ছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টেনশন হয় ঝগড়া নিয়ে। সৃজার টেনশন বেড়েছে ঝগড়া না হওয়া নিয়ে। বান্ধবীর সামান্য ঠাট্টা যে এভাবে ঝামেলায় ফেলবে সৃজা ভাবতেও পারেনি। এটা অবশ্যই একটা বোকামি। এখনই উচিত বোকামি থেকে ঝেড়ে বেরিয়ে আসা। কিন্তু গত পাঁচদিন সে পারেনি। আজ শেষদিনে পারবে বলে মনে হয় না। সমস্যা হল টেনশনের সঙ্গে সঙ্গে সৃজার ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে! মনে হচ্ছে যে কোনও মুহূর্তে কেঁদে ফেলতে পারে। কী বিপদ!

কান্না আটকানোর একটাই উপায়। প্রীতিশের সঙ্গে ঝগড়া করা। সৃজা খুব চেষ্টা করছে যাতে প্রীতিশের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। বড় কোনও ঝগড়া নয়, হালকা ধরনের ঝগড়া। ঝগড়ার কারণে খানিকটা সময় দুজনের কথা বন্ধ থাকবে। এই ঘণ্টখানেকের মতো। না না, অত দরকার নেই, মিনিট পনেরো কুড়ি কথা বন্ধ হলেই চলবে। বিয়ের সবে পনেরো দিন হয়েছে। এখন ঘণ্টাখানেক কথা বন্ধ করে থাকা অসম্ভব।

যদিও সৃজার এখন একেবারেই ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না। তার ইচ্ছে করছে খাটে উঠে গিয়ে প্রীতিশকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে। পাশ থেকে জড়িয়ে ধরবে। মাথা থাকবে প্রীতিশের থুতনির কাছে। প্রীতিশ হাত দিয়ে তার চুলে বিলি কেটে দেবে আর টুকুস টুকুস করে কথা বলবে। জরুরি কিছু কথা নয়। হাবিজাবি কথা। যার বেশিরভাগেরই কোনও উত্তর হয় না। সৃজা তবু উত্তর দেবে। হাবিজাবি সব উত্তর।

'সৃজা, তুমি কি জানতে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

'কবে জানলে? যেদিন আমার বাবা-মা তোমাকে দেখতে গিয়েছিল সেদিন?'

'না। তার আগে।'

'তার আগে! তার আগে মানে? যখন আমি বন্ধুদের নিয়ে তোমায় দেখতে গেলাম?

'তারও আগে।'

'তারও আগে! বাপরে! যখন মেজোমাসি তোমার বাবাকে চিঠি লিখেছিল—আপনার মেয়ের ফটো আমাদের পছন্দ হয়েছে। এবার আমরা একদিন...তখন?'

'উঁহু, তার থেকেও।'

'দূর সৃজা, তুমি যে কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। তার আগে হবে কী করে? সে তো আমরা কাগজে পাত্রী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।'

সৃজা এবার খিলখিল করে হাসবে। বলবে, 'সেই ছোটোবেলা থেকেই জানতাম। তখন আমি ফ্রক পরি।'

'যাঃ, বাজে কথা বলছ। ওই বয়েসে কেউ বিয়ের কথা ভাবে?'

'ভাবে না। আমিও ভাবতাম না। একদিন মনে মনে জানলাম, তেইশ বছর বয়েসে প্রীতিশ নামে একটা সুন্দর দেখতে সুন্দর মনের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। যে অন্য কোনও মেয়ের দিকে না তাকিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তখন ভাবতে শুরু করলাম।'

'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'ওমা, ঠাট্টা করব কেন! বানিয়ে বলছি।'

'সেকি, বানিয়ে বলছ! বানিয়ে বলছ কেন!'

'বানিয়ে বলতে খুব ভালো লাগছে তাই বলছি। জীবনে একেকটা সময় এরকম হয়। সত্যির থেকে বানানো জিনিসে বেশি ভালো লাগে।

'পাগলি কোথাকার।'

'তুমি একটা পাগল।'

এইসব কথার মাঝখানে প্রীতিশ তাকে একটু একটু আদর করবে। আলগা আদর। গায়ে হালকা করে হাত দেবে। ঘাড়ে, কানের লতিতে ঠোঁট, নাক ছোঁয়াবে। শরীর শিরশির করে উঠবে। এসব প্রস্তুতিপর্ব। রাগের আগে যেমন আলাপ, ঝড়ের আগে যেমন ঠাণ্ডা বাতাস। এটাও তেমন। ঝড় উঠবে রাতে। ডিনারের পর।

কিন্তু এই মুহূর্তে এসবে মন দিলে চলবে না সৃজার। তাকে ঝগড়া করতে হবে। পাঁচদিন ধরে কম চেষ্টা করছে না সে। লাভ হচ্ছে না। ঝগড়ার প্রথম শর্ত হল কোনও একটা বিষয়ে দুজনকে দুমত হতে হবে। সেটাই হচ্ছে না। সৃজা যা বলছে, প্রীতিশ মেনে নিচ্ছে। শুধু মেনে নিচ্ছে না, হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে। যেমন, পরশু ভোরে সৃজা ইচ্ছে করে বলল, 'আজ আর সকালে বেরোব না। বেলা পর্যন্ত হোটেলের ঘরেই থাকব। খাটে শুয়ে গড়াব।' প্রীতিশ তখন বেরোনোর জন্য জামা, জুতো, সোটেয়ার পরে তৈরি। বেড়াতে এসে ভোরবেলা হোটেলের ঘরে বসে থাকার সে একেবারেই পক্ষপাতী নয়। সৃজা নিশ্চিত ছিল, তার এই সিদ্ধান্তে প্রীতিশ অবশ্যই আপত্তি করবে। প্রথমে নরম ভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। ভোরবেলা পাহাড়ি দৃশ্য কত চমৎকার। গত দুদিন, বেরিয়ে কত ভালো লেগেছে—এই সব। সৃজা তখনও রাজি হবে না। গায়ে

লেপ চাপা দেবে। এতে প্রীতিশ নিশ্চয় খানিকটা বিরক্ত হবে। গলায় কঠিন ভাব আসবে।

'তোমার কি শরীর খারাপ সৃজা?'

'না শরীর ভালো।'

'সে কী! শরীর ভালো হলে ঘরে শুয়ে থাকবে কেন? আর তো মোটে দুটো দিন আছি।'

'দুটো দশটা যটা দিনই থাকি, এখন আমি বেরোব না। তুমি যদি চাও একা ঘুরে আসতে পারো।'

'এটা কী বলছ সৃজা! তুমি হোটেলের ঘরে শুয়ে থাকবে আর আমি বেড়াতে যাব? নাও, উঠে পড়ো।'

এরপরই সৃজা গলায় জোর আনবে। বলবে, 'আমাকে কি সব সময় তোমার ইচ্ছে মতো চলতে হবে?'

প্রীতিশ বলবে, 'এসব কী বলছ সৃজা!'

'কী বলছি তুমি বুঝতে পারছ না? না পারলে আর বুঝতে হবে না। প্লিজ লিভ মি অ্যালোন।'

এইকথা বলে সৃজা পাশ ফিরবে। ব্যস, ঝগড়া শুরু।

হায় রে! এসব কিছুই হল না। সৃজা যেই বলল, 'আজ আর সকালে বেরোব না। বেলা পর্যন্ত হোটেলের ঘরেই থাকব। খাটে শুয়ে গড়াব।' প্রীতিশ অমনি জুতোটুতো খুলে খাটের ওপর উঠে এল। বলল, 'খুব ভালো হবে। আজ সারাদিন তুমি আর আমি ঘরেই থাকব। বাইরে এসেছি বলে রোজ রোজ বেরোতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। জানলা খুলে পাহাড় দেখব। জানলা খুলে পাহাড় দেখার মজা আছে। নইলে জানলাগুলো পাহাড়ের দিকে মুখ করা কেন? দেয়ালের দিকে মুখ করা হতে পারত। হা হা।'

সৃজার গোটা পরিকল্পনাটাই গেল ভেস্তে। পরিকল্পনা করল পরদিন রাতেও। প্রীতিশ ঠিক করেছিল ডিনার হবে হোটেলে। তিনদিন ওরা এখানে এসেছে। তিনদিনই হোটেলের বাইরের রেস্তোরাঁয় খেয়েছে। হোটেলের পেছনে চমৎকার একটা রেস্তোরাঁ আছে। পাহাড়ি পথে মিনিট দশ হাঁটতে হয়। পথটাও চমৎকার। বুনো, কেমন যেন ভেজা ভেজা। রেস্তোরাঁর নাম সামসি। একটুখানি রেস্তোরাঁ। জানলার দিকে টেবিল পেলে পাহাড়ের নিচে একফালি নদী দেখা যায়। নদীর নামও সামসি। অল্প অল্প আলো জ্বলে। টেবিলে দুজন করে বসার ব্যবস্থা। একেবারে হই চই নেই। সৃজা, প্রীতিশ দুজনেরই খুব পছন্দ হয়েছে। প্রীতিশের বেশি পছন্দ। সেই প্রীতিশই বলল, 'আজ এই হোটেলেই খাব।'

সৃজা বলল, 'কেন?'

প্রীতিশ হেসে বলল, 'হোটেলের ছেলেগুলো খুব ধরেছে। বলছে, সাব, আমাদের এখানকার ফুড খুব ভালো। একদিন টেস্ট করে দেখুন। আমি বললাম, ঠিক আছে তাই হবে।'

সৃজা একমুহূর্ত ভাবল। এই চান্স নিতে হবে। ঝগড়ার একটা ছুতো পাওয়া গেছে। সে বলল, 'না, ঠিক নেই। আমি বাইরেই খাব।'

প্রীতিশ অনুরোধের ঢঙে বলল, 'আসলেছেলেগুলো এত করে বলল।'

সৃজা ঠান্ডা গলায় বলল, 'বলল তো কী হয়েছে? আমি বাইরেই খাব। সামসির স্যুপটা দারুন।'

প্রীতিশ একগাল হেসে বলল, 'ঠিকই বলেছ। ওরা বলল তো কী হয়েছে? ওরা তো খাবে না, খাব আমরা। সুতরাং আমরাই ঠিক করব কোথায় খাব। সামসিতেই যাব এবং সেখানে স্যুপ খাব।'

সৃজা ভেঙে পড়ল। এবারও হল না! তাহলে কি আর হবে না? এছাড়াও টুকটাক আরও চেষ্টা চালিয়েছে সে। প্রীতিশ যখন আবদারের ভঙ্গিতে তাকে পায়জামা কুর্তা পরতে বলেছে, তখন লঙ স্কার্ট পরেছে। অন্য যে কোনও স্বামী হলে মুখ গোমড়া করত। প্রীতিশের হয়েছে উল্টো কাণ্ড। সৃজার ড্রেস করা হলে সে বলল, 'ঠিক ডিশিসান নিয়েছ। আজ লঙ স্কার্টে তোমাকে বেশি সুন্দর লাগছে। মনে হয় বিকেলের দিকের আলো বলেই এটা হচ্ছে।' এখানেই শেষ নয়। আরও চেষ্টা আছে। সেটা অবশ্য খানিকটা 'অ্যাডাল্ট' চেষ্টা। প্রথমদিন দুপুরে সৃজা স্নানের জন্য সবে হোটেলের বাথরুমে ঢুকেছে। মিনিট পাঁচ পরে প্রীতিশ দরজায় নক করল। সৃজা তখন শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সাবান মাখছে। জোর গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

প্রীতিশ নিচু গলায় বলল, 'একবার দরজাটা খুলবে?'

সৃজা সাবান হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন?'

প্রীতিশ গাঢ় গলায় বলল, 'অ্যাই, খোল না।'

সৃজার ঠোঁটে একটু হাসির রেখা। সে দরজার কাছে সরে গিয়ে বলল, 'আগে কেন বলো।'

'কিছু না, এমনি। উঁ উঁ।

মুহূর্তখানেক ভাবল সৃজা। এটাই সুযোগ। ঝগড়ার মোক্ষম সুযোগ। গলা তুলে কড়া গলায় বলল, 'ছিঃ।'

প্রীতিশ কাতর গলায় বলল, 'প্লিজ সৃজা...একটিবার খোল।'

সৃজার খুব ইচ্ছে করল দরজাটা খোলে। খোলার আগে বুকের ওপর

তোয়ালেটা এমনভাবে জড়িয়ে নেয় যাতে প্রীতিশের সামান্য টানেই সেটা সরে যায়। দাঁতে দাঁত কামড়ে নিজেকে সামলাল সে। দারুণ সুযোগ এসেছে। কিছুতেই দরজাটা খুলবে না। পুরুষমানুষ 'ইচ্ছে'র সময় না পেলে ভীষণ রেগে যায়। প্রীতিশও যাবে।

না, প্রীতিশ রেগে গেল না। সৃজা স্নান সেরে বেরোনোর পর উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আজ বিকেলে একটা দারুণ জায়গা দেখতে যাব সৃজা। সানসেটের সময় ওখান থেকে তিনটে পিক্ গোলাপি দেখায়।'

প্রীতিশের গলা শুনে মনেই হল না একটু আগে সে সৃজাকে বাথরুমের দরজা খোলার জন্য কাকুতিমিনতি করছিল। যেন এমন কিছু হয়নি। সৃজা মনে মনে ভেঙে পড়ল। তাহলে কি মালার কথাই সত্যি?

কলকাতা ছাড়ার দিন সকালে মালা তাকে ফোন করেছিল। মালা সেই কলেজ জীবনের বন্ধু। খুব বকবক করে। কলেজে নাম ছিল মিস্ বকবকানি। সেই এখনও স্বভাব যায়নি। সৃজার বিয়েতে আসতে পারেনি বলে হুড়মুড় করে আরও বেশি কথা বলে বসল।

'কীরে হানিমুন কবে যাচ্ছিস?'

'কাল।'

'একেবারে কাল! বাবা, বিয়ের ফুল বাসি না হতে হতেই হাত ধরে ছুটছিস? ভেরি গুড। ওসব জিনিসে দেরি না করাই শুভ।'

সৃজা লজ্জা পেয়ে বলল, 'ভ্যাট, খালি অসভ্যতামি।'

'উনি বিরাট সভ্য এসেছেন রে। যাক, একেবারে ঠিক টাইমে ফোন করেছি। নইলে অ্যাডভাইজ দেওয়া হত না। তুই ভেগে যেতিস।'

সৃজা হেসে বলল, 'খারাপ কথা বলবি না মালা। মার খাবি।'

'খারাপ কথা নয়, কাজের কথা। হানিমুনে গিয়ে অবশ্যই প্রীতিশের সঙ্গে খানিকটা ঝগড়া করবি।'

'ঝগড়া!'

'হ্যাঁ, ঝগড়া। এমনি ঝগড়া না হলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করবি।'

সৃজা অবাক গলায় বলল, 'কী বলছিস আবোল-তাবোল? হানিমুন কি কেউ ঝগড়া করার জন্য যায়? যায় তো ভাব করতে।'

মালা চাপা গলায় ধমক দেয়। বলে, 'চুপ কর বোকা। হানিমুনের তুই কী বুঝেছিস? এমনভাবে বলছিস যেন দশটা হানিমুন করেছিস। হানিমুনে গিয়ে ঝগড়া না করলে হানিমুনের দেবতা বিরাট রাগ করবেন। হানিমুনের দেবতার নাম জানিস?'

সৃজা থতমত খেয়ে বলল, 'হানিমুনের দেবতা! ঠাট্টা করছিস?'

'ওমা ঠাট্টা করব কেন? হানিমুনের দেবতা হলেন...যাক, নাম জেনে তোর লাভ নেই। তুই দেবতার অভিশাপের কথাটা শুধু জেনে রাখ।'

'অভিশাপ! কী অভিশাপ?'

মালা ফোনে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হেসে বলে, 'কী আবার, ঝগড়া না করলে বরের আদরের পুরো টেস্ট পাবি না। কোনোদিন মনে হবে নুন দিতে ভুলে গেছে, কোনোদিন মনে হবে আরও একটু ঝাল হলে ভাল হত, কোনোদিন মনে হবে মিষ্টির হাতটা বেশি। হি হি।'

সৃজার কান লাল হয়ে গেল। মোবাইলের কান বদল করে বলল, 'আবার খারাপ কথা?'

মালা এবার গলা সিরিয়াস করে বলল, 'না খারাপ কথা নয়, আসলে কি জানিস স্বামীকে পরীক্ষা করার এটা একটা টেকনিক। যে সব মেয়ের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় তারা এই পরীক্ষায় দারুণ উপকার পেয়েছে। যদিও ঘটনা আমি বিশ্বাস করি না। তমালিকে মনে আছে? হিস্ট্রি অনার্স? মনে নেই তো...ওর খুব উপকার হয়েছিল। বেচারি কিছু জানতই না। হানিমুন গিয়ে টেকনিক অ্যাপ্লাই করল। সন্দেহ হল। পরে ঘটনা মিলে গেল। ওর বরের সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই একটা মেয়ের অ্যাফেয়ারস চলছে। অফিসে কাজ করে। বোঝ কাণ্ড। তমালি পুলিশে যাওয়ার ভয় দেখাতেই সেই ছেলে একেবারে কেঁচো।'

মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সৃজার। মালা এসব কী বলছে। সে শান্ত গলায় বলল, 'কী বলছিস মালা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দূর, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? প্রীতিশ নিশ্চয় খুব ভালো ছেলে। ওর ওসব অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার থাকবে কোন দুঃখে। আসলে কী জানিস নিজে থেকে বুঝে নিতে তো কোন দোষ নেই। যার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটবে তার আগেটুকু দেখে নিলে অনেক সুবিধে। সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক।'

'কীভাবে বুঝব?' ফিসফিস করে বলল সৃজা। তার গলা কাঁপছে। কাঁপারই কথা। মাত্র চারদিন আগে যে পুরুষ মানুষটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে তার পূর্ব প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে তো গলা কাঁপবেই।

'ভেরি সিম্পল। এটা একটা সাইকো অ্যানালিসিস বলতে পারিস। মনের বিশ্লেষণ। হানিমুনে গিয়ে ঝগড়া বাঁধাতে হবে। বড় কোনো ঝগড়া নয়, ছোটোখাটো ঝগড়া। হালকা-পলকা ধরনের। দেখতে হবে স্বামী দেবতাটি ঝগড়া করছে কিনা। যদি করে তাহলে বুঝতে হবে কোনো সমস্যা নেই। মানুষ নিখাদ। বউ যতই নতুন হোক, তার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে।

তার মধ্যে দ্বিতীয় কোনো মেয়ের জায়গা নেই। সেই কারণেই বুক ফুলিয়ে ঝগড়া করার সাহস পাচ্ছে। হানিমুনে এসেও গলে যায়নি, বা বানিয়ে বানিয়ে গলে যাওয়ার ভান করছে না?'

এত পর্যন্ত বলে মালা চুপ করে গেল। সৃজা ঢোঁক গিলে বলল, 'আর যদি ঝগড়া না করে?'

মালা গলা গম্ভীর করে বলল, 'চিন্তা করিস না, প্রীতিশ নিশ্চয় ঝগড়া করবে। ওই ছেলে সম্পর্কে তোর কাছ থেকে যতটা শুনলাম, তাতে আমি সিওর ও ঝগড়া করবেই। ওর কোন প্রেম-ট্রেম ছিল না! খুবই ভালো ছেলে।'

সৃজা দমবন্ধ করে বলল, 'তাও তুই বল। যদি ঝগড়া না করে তাহলে কী বুঝব?'

মালা হাসল। বলল, 'বললাম তো বাপু তোর চিন্তা নেই।'

সৃজা বিরক্ত হল। বলল, 'আঃ, তাও বল।'

মালা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হানিমুনে স্বামী যদি ঝগড়া না করে তাহলে বুজতে হবে সমস্যা আছে। সেই পুরুষ মানুষের ফ্ল্যাশব্যাকে কোনও নটঘট আছে। সেই কারণেই বউকে তোয়াজ করছে। লুকোতে চাইছে কিছু।'

সৃজা বলল, 'রাবিশ। তুই ঠাট্টা করছিস।'

মালা হেসে ফেলল। বলল, 'ঠিক বলেছিস। আমি ঠাট্টা করছি। ওসব কথা বাদ দে। হানিমুনে কোথায় যাচ্ছিস? পাহাড় না সমুদ্র?'

সৃজা বিরক্ত গলায় বলল, 'পাহাড়।'

'বিউটিফুল। হানিমুনে পাহাড় মানে ঠাণ্ডা, মানে ইয়ে খুব জমবে। লেপ থেকে দুজনে বেরোবি-ই না। ছেলের নাম কী দিবি ঠিক করেছিস? হিমালয় দিতে পারিস। পছন্দ? হি হি।'

সৃজাও হেসে ফেলল। বলল, 'বাপরে, পারিসও বটে। একেবারে ছেলের নাম! এবার ছাড়। অনেক ঠাট্টা হয়েছে।'

কলকাতাতে ঠাট্টা বলে এলেও এখানে এসে ঝুঁকি নিতে পারল না সৃজা। মালার কথাটা গলার কাঁটার মতো মাথার ভেতর খচখচ্ করছে। গত পাঁচদিন ধরে সে চেষ্টা চালাচ্ছে। গোটা হানিমুন পর্বে একবারের জন্য প্রীতিশ তার সঙ্গে ঝগড়া করেনি। পায়ে পা দিয়ে অনেক চেষ্টা করল, লাভ হল না। কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি। টেনশন বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। যাতে আর সময় নেই। কালই হানিমুন শেষ। দুপুরে লাঞ্চের পরই জিপ নিয়ে এন জে পি নেবে যাবে। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা। তাহলে কি মালার কথাই ঠিক? আগে প্রীতিশের আরও কোনও...দূর দূর, তা কী করে হবে? এই

কদিনেই সৃজা বুঝতে পেরেছে, প্রীতিশের মতো স্বামী পাওয়া ভাগ্যের। খুব কেয়ারিং। দশদিনেই স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসে ফেলেছে। মেয়েরা অনেক কিছু ভুল বুঝতে পারে। স্বামীর ভালোবাসা নিয়ে কখনও ভুল বোঝে না। মিস্ বকবকানি এমনিতেই একটা ঠাট্টাবাজ মেয়ে। সে কী একটা ফালতু হানিমুন পরীক্ষা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল...। আচ্ছা, আসানসোলের ছোড়দি ও এরকম হয়েছিল না? হালকা হালকা যেন মনে পড়ছে। বিকাশদা অসম্ভব কেয়ারিং ছিল। বিয়ের পর পর এসে ছোড়দি খুব গল্প করত। হানিমুনের সময় পায়ে কাঁটা ফুটেছিল বলে ছোড়দিকে দার্জিলিঙের ম্যাল থেকে পিঠে চাপিয়ে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে জানা গেল, ওই লোকের আর একটা সংসার আছে। বউ মেয়ে সব! ছোড়দিকে ছেড়ে চলেও গেল তার কাছে...ইস এখনই ঘটনা মনে পড়ল!

বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সৃজা। তার কেন জানি কান্না কান্না পাচ্ছে। লোকটা কী, একটু ঝগড়া করলেই তো সব সমস্যা মিটে যায়। একটা চান্স নিতে হবে। শেষ সুযোগ।

প্রীতিশ খানিকটা দূরে খাটের ওপর বসে। কোমর পর্যন্ত লেপ ঢাকা। আজ রাতে আর 'সামসি' নয়। হোটেলেই ডিনারের অর্ডার হয়েছে। প্রীতিশ বলল, 'দূর পাঁচদিন বড্ড কম। হানিমুন করা উচিত মিনিয়াম মাসখানেক ধরে।'

ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে আছে সৃজা। সামনে সাজগোজের জিনিস ছড়ানো। কাল সকালে উঠে এগুলো বাক্সে ভরে নিতে হবে। এখন সে লম্বা নখের পরিচর্যা করছে। ঠিক পরিচর্যা নয়, একটা কিছু নিয়ে অন্যমনস্ক থাকতে হয় তাই থাকা।

প্রীতিশ হাসি হাসি মুখে বলল, 'কী বললে না, হানিমুন একমাস হওয়া উচিত কিনা?'

সামনের আয়নায় প্রীতিশকে দেখা যাচ্ছে। সৃজা একবার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। কী সুন্দর! অসম্ভব। এই ছেলে খারাপ কিছু করতেই পারে না।

'করলেই পারতে। আপত্তি করেছিল কে?'

'দূর, অফিসে সাতদিন ছুটি দিতেই বেগোড়বাই করছিল। তবে এই জায়গাটা ফাইন। পাহাড়ে এলেই অন্যরকম লাগে। মনে হয় আমার মনটাও পাহাড়ের মতো।'

বিছানায় বসে কায়দা করে দুহাত পাশে ছড়িয়ে দিল প্রীতিশ।

সৃজা গলায় ঝাঁঝ এনে বলল, 'একেবারেই নয়, পাহাড়ের থেকে সমুদ্র আমার অনেক বেশি ভালো লাগে।'

প্রীতিশ থতমত খেয়ে বলল, 'সে কী সৃজা! কাল যে বললে, পাহাড়ে তুমি দারুণ মজা পাও! বললে না?

সৃজা থমথমে গলায় বলল, 'না বলে উপায় কী? আমাকে জিজ্ঞেস করে তো আর তুমি হানিমুনের টিকিট কাটোনি।'

প্রীতিশ মাথা চুলকে বলে, 'আসলে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে...।'

'একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। হানিমুন তো একজনের নয়, দুজনের।' সৃজার গলায় ঝগড়া ঝগড়া ভাব।

প্রীতিশ এবার হেসে ফেলল।

সৃজা মুখ ঘুরিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'হাসছ কেন? এর মধ্যে হাসির কী পেলে? ভাগ্যিস কাল চলে যাচ্ছি, পাহাড়ে বেশিক্ষণ থাকলে আমার দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে।'

প্রীতিশ খাট থেকে নামল। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে সৃজাকে জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক বলেছ, আমারও পাহাড়ের থেকে সমুদ্র অনেক বেশি ভালো লাগে। তবে তুমি থাকলে সব জায়গাই চমৎকার।'

সৃজা আর পারল না। প্রীতিশকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

প্রীতিশ অবাক হয়ে বলল, 'একি সৃজা! তুমি কাঁদছো কেন?'

'বেশ করছি। একশোবার কাঁদব। মালা একটা মিথ্যেবাদী। বলো মিথ্যেবাদী কিনা, বলো, বলো...।'

প্রীতিশ আরও অবাক হয়ে বলল, 'মালা! সে কে?'

'একটা পাজি মেয়ে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওকে আমি খুন করব।'

শরীরে গভীর তৃপ্তি নিয়ে দুজনেই শুয়ে আছে লেপের তলায়। ঘরে হালকা সবুজ আলো। ছায়া ছায়া। সৃজা লেপের ভেতর থেকে হাত বের করে নাইটি খুঁজতে যায়। প্রীতিশ তাকে জড়িয়ে ধরল।

সৃজা হেসে বলল, 'অ্যাই ছেলে, আবার দুষ্টমি?'

প্রীতিশ ফিসফিস করে বলল, 'জানো সৃজা, ভেবেছিলাম সারাজীবন লুকিয়ে রাখব, কিছুতেই তোমাকে বলব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা অন্যায় হবে। তোমার মতো একটা সুন্দর মেয়েকে ঠকানো ঠিক না...তাই ঠিক করেছি বলেই ফেলব...। তখন আমি চাকরি খুঁজছি, ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াই..।'

সৃজা প্রীতিশের হাতটা নিজের বুকের ওপর টেনে বলল, 'চুপ করো।'

বকুলবাড়ি দেখা
গৌতম ভট্টাচার্য

এই মুহূর্তে শূন্যতাবোধটা ছেড়ে যেতেই অদেখা কোনো বালিয়াড়ির একমাত্র ওভাল অংশটি তৃষ্ণার মগজে ছবি হয়ে গেল। এবং ভাবল সে—ভদ্রলোকের কটি ছেলের সঙ্গে একটা দিন পিকনিকের হই-হুল্লোড়ে কাটানো কতখানি অনাবিল আনন্দ দিতে পারে—এমন কৌতূহলেই কি চলে আসা তার? একদিনেই কয়েকশো টাকা রোজগারের লোভও কি কাজ করেনি? হয়তো সে না এলেই পারত। কলকাতা ছেড়ে হাইওয়ে ধরার পরই কে যেন বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠেছিল—"নাউ, লেট আস হ্যাভ দ্যাট নাইস প্লে!" তারপর গাড়ির ভেতরেই খেলাটি শুরু হয়েছিল এবং খেলাটির মধ্যেকার আপাদমস্তক তাচ্ছিল্য আর অপরিচ্ছন্নতা তৃষ্ণাকে তখনই রীতিমত আহত করেছিল।

কিছুক্ষণ আগে শরীরের জায়গায় চোখ বুলোতে বুলোতে ভেবেছিল—ওদের তো কারো কারো নিশ্চয় লাভার-টাভার আছে। তাদের সঙ্গেও কি এইরকম ব্যবহার করতে পারে? সমাজ-সংসারের নজর থেকে একটু বেরোলেই মানুষের মুখোশগুলো কি সহজেই খুলে যায়?

তৃষ্ণা পাশ ফিরলে এই সময় গুঁড়ো গুঁড়ো ক্লেশ ওর ঠোঁটের ফালিতে ঝুলে গেল।

বেলার দিকে বিরাট শালপাতার ওপর ঢেলে রাখা মাংসের দিকে চোখ পড়তেই ভাইটা এসে গেল আচমকা। ভাইটার চোখদুটো দেখলেই কেন জানে না, মনে হয়, ও কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই কোনো বাছুরখানা হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবে নিশ্চিত। বকুলবাড়ির কাছে বাছুরটা এখন নির্ঘাত উঁকিঝুঁকি মারছে!

গাড়ি থেকে নামার পর একটা বিষমিষাবোধ মৃদুভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল তৃষ্ণার মধ্যে। দুপুরে সামান্যই মুখে দিয়েছিল। মাংসটা না ছুঁতে ডলি মুচকি হেসেছে—"কদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভোরের স্বপ্নে ব্যাঙ্কের লকারও দেখবি। তোর যা দারুণ মুখচোখ না!" তৃষ্ণা নিরুত্তর থাকায় ডলির ঠোঁটদুটো কুঁচকে গিয়েছিল—"কলেজেই না হয় বছর দুই পড়েছিস!..." এখানে আসার পর থেকেই ভোলাপচুয়াস একটা গন্ধ ছড়িয়ে সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল ডলি। দুপুরে খাওয়ার পাট চুকতেই দু-তিনজনের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। যাবার আগে চোখের ইঙ্গিতে তৃষ্ণাকে একটা ইশারাও করে গেল। তৃষ্ণার মনে হয়েছিল মাংসটা হয়ত ডলির সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

ভয়াবহ আরতি

বিকেল পর্যন্ত দুজন এসে এ-ঘরের নির্জনতাকে ফালাফালা করে গেছে। প্রথম যুবকটির কাছে তৃষ্ণা দরজা-জানাগুলো বন্ধ করার সময়টুকু মাত্র চেয়েছিল। পায়নি। সে চলে যাবার পর তৃষ্ণা আবিষ্কার করেছিল শাড়িটা অনেকখানি রিপু কি বাতিল করে দিতে হবে। আর ব্রেশিয়ারের একটি হুক নিখোঁজ। দ্বিতীয়জনের কাছে তৃষ্ণা সামান্যক্ষণের বিশ্রাম চাইতেই সে হিসহিস করে উঠেছিল, "স্রেফ একটা দিনের জন্যেই তোমাকে চারশো টাকা পে করা হয়েছে...!" তৃষ্ণা তবু বোকার মত রেহাই পেতে দেয়ালের দিকে সরে গিয়েছিল। তারপর টানা-হ্যাঁচড়াতেই দেওয়ালে ওর পিঠটা ঘষে-ছড়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে যুবকটির মুখচোখের অবস্থা দেখেই নিজেকে মৃতদেহ-প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। বিপরীত দিক থেকে একটুও সক্রিয়তা না পেয়ে যুবকটি প্রচণ্ড রাগ ও আনাড়ি হিংস্রতায় যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে গেছে।

হঠাৎ কী মনে হতে তৃষ্ণা কপালে হাত ঠেকাল। কিন্তু কোন উত্তাপ ঠেকল না। ভাইটা এখন কি করছে কে জানে! স্বপ্নে একবার বকুলবাড়ি দেখছিল— আসুমার মাঠে ছোট্ট একতলা সাদা বাড়ি। অনেক পেছনে তিরতিরে নদী। বাড়ির সামনে বাঁশ-কঞ্চির বেড়াঘেরা ফুলের বাগান। বাগানের মাঝখান দিয়ে বাড়িটা থেকে বেরোনোর একফালি রাস্তা। বাগানের সীমানায় রাস্তার ওপর কাঠের ছোট্ট গেট। গেটের মাথায় একটুকরো আকাশ-লতানে গাছালিতে ঢাকা। আর পাশেই একটা বকুলগাছ। ভাইয়ের মুখে একদিন স্বপ্নটার কথা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যাওয়া তৃষ্ণা বলে উঠেছিল—"বকুলবাড়ি!" তারপর কতদিন মনে মনে বাড়িটার ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু বকুলবাড়ি কোনদিন আর তার দেখা হয়ে ওঠেনি। শুধু দেখেছে একটি মেয়েকে। একটি ছোট্ট স্টেশন। মোরাম প্ল্যাটফর্মের ধারে একটা বকুলগাছ। গাছটা রোজ কত ফুল ছড়িয়ে দেয়। কেউ তা কুড়োয় না! মেয়েটা প্রতিদিন কলকাতা যাবার সময় এই গাছটার তলাতেই এসে দাঁড়ায়। গাছটার সোজাসুজি ট্রেনের যে কামরাটা পড়ে, লেডিস না হলেও তাতেই উঠে বসে। মেয়েটার, কেন জানে না, মনে হয় গাছটা ছাড়িয়ে এগিয়ে-পিছিয়ে গেলেই দুঃখী গাছটা আরও দুঃখ পাবে।

তৃষ্ণা এখন তৃতীয়জনের প্রতীক্ষায়।

এবং এই মুহূর্তেই, এ-ঘরের দম-আটকানো শূন্যতাটা কাটিয়ে এক দমকা বাতাসের মতোই তার প্রবেশ ঘটল। রুনু!—ওই নামেই তো সবাই ওকে ডাকছিল। গাড়ির জানলার ধারে বসে ঠায় বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে তৃষ্ণা মাঝে মাঝেই চোরাচাহনিতে ওকে লক্ষ করে গেছে।

মুখে একটা মেয়েলি কমনীয়তা, চোখের দৃষ্টিতে ভারি আনমনা ভাব। পাতলা শরীর, একমাথা চুল খানিকটা কপাল ঢেকে ফেলেছে। বারকয়েক তৃষ্ণার চোখে চোখ পড়তেই মুখ নামিয়ে নিয়েছে। তারই মধ্যে তৃষ্ণা ছেলেটার চোখে একই সঙ্গে স্পষ্ট লজ্জা আর বিস্ময় দেখেছে। ওর বন্ধুদের সঙ্গে ওকে কিছুতেই মেলাতে পারেনি। সূক্ষ্ম এক সংশয়বোধের মধ্যেও তৃষ্ণার ভেতরে ভেতরে আশ্চর্য একটুকরো সবুজ জমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই তৃষ্ণার চোখের সামনে ঝাপসা এক পর্দা দুলে গেল। না দেখেও বুঝতে পারল তার মুখটা লাল হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে মোচড় পড়ায় মুখময় প্রগলভ হাসি এবং আমন্ত্রণ মাখামাখি হয়ে গেল। শাড়িটা খুলে ফেলতে ফেলতেই অস্ফুটে বলল—"রুনু দেখো, আমি কত্তো ভাল মেয়ে। তোমায় একটুও পরিশ্রম করতে হবে না!"

কোথায় লুকালে ডানা

"ওরকম করবেন না!"—তৃষ্ণা দেখে রুনুর নরম চোখদুটোয় সামান্য উত্তপ্ত কৌতূহল মেশানো আহত হওয়ার ছাপ স্পষ্ট। রুনু একরাশ লাজুক জড়তা নিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়ায়। তৃষ্ণা ব্লাউজের বোতামে হাত রাখে এবং রুনুর চোখে চোখ। রুনুর চোখে উত্তাপ ভিজে ভিজে যায় অসহায় অনুনয়ে। তৃষ্ণার আঙুল মুহূর্তে স্থির। তারপরই দ্বিতীয় বোতামে এসে পড়ে। নিজেকে নির্যাতনের উন্মাদনা তাকে গ্রাস করে আকস্মিক। তৃতীয় বোতাম এবং চতুর্থ। চরম লজ্জাহীনতায় তার রক্তমজ্জারাও বিচিত্র গভীর এক আশ্রয় প্রার্থনা করে। ঠিক সেই সময়ই ক্ষিপ্রতায় তার হাতদুটো চেপে ধরে রুনু। তার গলাটা চিরে যায়—"কি ভীষণ খারাপ লাগছে আমার!" রুনুর কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে ভয় আর শিশুর কান্না মিশে যায়। তৃষ্ণা টের পায় তার ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে হাসিরা ফসিল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ এবং তার মুখটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে। তৃষ্ণা বিছানায় বসে পড়ে। দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে দেয়। মেরুপ্রদেশের হিমশীতলতা তার অর্ধনগ্ন শরীরে ছোবল মারতে থাকে। রুনু বিমূঢ়। বিমূঢ় রুনু। কত সময় কেটে যায়। এ সময়টা যেন ওদের দুজনেরই বাইরে, তৃতীয় কারো জীবন থেকে টুকরো হয়ে আসা অসংখ্য পল অনুপল। রুনু তৃষ্ণার কাঁধে আলতো হাত রাখে—"আমি কেন যে এখানে এলাম! জাস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করার ইচ্ছা ছিল। এসব ভাবিনি! এখন কি যাচ্ছেতাই লাগছে! চলো, এ ঘরটায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাইরে গিয়ে বসি। এ বাড়িটার পেছনদিকে একটা বড় পুকুর আছে। চারপাশে বাগান। সকালে এসেই দেখেছি। ভালো লাগবে।" টুকুস টুকুস করে জমাট নীরবতা ভেঙে দেয় রুনু। তৃষ্ণার মনে হল কোথায় যেন মুষলধারে বৃষ্টি

হচ্ছে। অন্ধকার অন্ধকার সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো এক বালক কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো বলে গেল। তৃষ্ণা মুখ তুলে রুনুর দিকে তাকাল এবং হঠাৎই ভাবল—রুনুর বাচ্চা বয়সের ঢলঢলে হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা ট্রাই সাইকেলে চড়া কোন ফটো আছে কি? রুনু যদি তার কেউ হত, তবে বাজে ছেলেদের সঙ্গে একেবারেই মিশতে দিত না। আচ্ছা রুনু কি স্বপ্নে বকুলবাড়ি দেখে! ব্লাউজটা তুলে নেয় তৃষ্ণা। শাড়িটাও। নিজেকে ঢাকতে ঢাকতে রুনুর চোখে চোখ রাখে!—রুনুর কি দুটো ডানা আছে! কোথাও লুকিয়ে রেখেছে!

রুনু কিছুটা এগিয়ে গেছে! তৃষ্ণা একটু দ্রুত পা চালায়। রুনুর লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটা দেখে কেমন যেন মজায় তার ভেতরটা চিরে যেতেই ভাবল তৃষ্ণা—রুনু তুমি নিশ্চয়ই বকুলবাড়ি দেখতে পাও। আমি যে পাই না। আমার মত মেয়ে তো দেখতে পায় না। তাই।

ছোটখাটো একটা দিঘিই। মগ্ন দিঘির জলে একটা চাঁদ ভাসছে। পক্ষের দিনক্ষণ তৃষ্ণা একেবারেই বুঝতে পারে না। তবু মনে হয় ত্রয়োদশী কি চতুর্দশী হতে পারে। চারদিকের গাছগাছালি এবং চরাচর হলুদ-সাদা আলোয় ভিজে ভিজে যায়। রুনুর মুখের একপাশটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তৃষ্ণা। রুনু এতক্ষণ দিঘির ওপারের আলোছায়া মাখামাখি ঝুপসি অন্ধকারগুলোর দিকে শূন্যগর্ভ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এবং তৃষ্ণা আনমনা হয়ে গিয়েছে। কথা খুঁজতে গিয়ে যখন টের পেল, কথার কি দমবন্ধ করা অভাব—তখন।

তৃষ্ণার পিঠের নীচের দিকে আঙুল ছোঁয়াতেই রুনু চমকে উঠল—"একি! এসব আঁচড় ঘষটানির দাগ কি করে লাগল!" তৃষ্ণার অস্ফুট ভেজা কণ্ঠস্বর—"ও কিছু না!" "ও কিছু না মানে!"—রুনু এবার সোজাসুজি তৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাতেই তৃষ্ণা মুখ নামিয়ে নিল।—"আপনার দুই বন্ধুর আদরের। তাছাড়া দেওয়াল টেওয়ালেও কোথাও ছড়েটরে গেছে।" রুনুর ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নির্মিমেষ ক-পলক। তারপর সে দেশলাই কাঠি জ্বেলে আবিষ্কার করে তৃষ্ণার ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে গালের দু-জায়গায়, পেলব সাদা কাঁধের ওপর, বুকের ওপর দিকে জায়গায় জায়গায় জমাটবাঁধা রক্তের দাগগুলোকেও। তৃষ্ণা ম্লান হাসে। "আমায় তো অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে—বলতে গেলে কোনোদিন এত টাকা একসঙ্গে আমি হাতে পাইনি। অথচ আমিই ঠিকমত আনন্দ দিতে পারিনি। দোষটা তো আমার, আপনিই বলুন!" রুনুর গাঢ় কণ্ঠস্বর—"থাক ওসব কথা। আমার শুনতে খারাপ লাগছে।" তৃষ্ণার গালের কাটা জায়গাটায় আঙুল রাখে রুনু—"ডেটল-টেটল কিছু পেলে ভালো হত। সেপটিক হয়ে যেতে পারে।" একটু ভেবে আবার বলে—"দাঁড়ান, এক জাতের বুনো ওষুধি গাছ আছে। এই পুকুর পাড়-টাড়েই হয়। তার পাতা থেঁতলে রসটা লাগালে কাজ হয়।"

"ব্যস্ত হতে হবে না। মাসখানেক আগে একবার টিটেনাস নিয়েছি।" তৃষ্ণার কথায় কান না দিয়ে উঠে দাঁড়াল রুনু। দিঘির পাড় ধরে এগিয়ে গেল। তৃষ্ণার গলা উদ্বেগে খানিক উচ্চগ্রাম আশ্রয় করে—"এই কি হচ্ছে! শুনুন। এখন গরমকাল, এসব জায়গায় সাপখোপ থাকতে পারে।" রুনু একবার ঘুরে দাঁড়ায়—"বসে থাকুন। এখুনি এসে পড়ব। ভয়টয় পাবেন না তো?"

—"ভয়! কিসের ভয়?"

—"ভূত-টুতের।"

তৃষ্ণার হাসি পায়। রুনু কি ওকে খুকি ভেবেছে? ফ্রক পরে, বেণী দুলিয়ে ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যায়? সন্ধেবেলায় একা থাকলেই ভূত দেখে? আচ্ছা ভূত-প্রেত, সাপখোপেরা কি মানুষের থেকে বেশি ভয়ের?

দিঘির ওপারে, খানিক অন্ধকার মেখে উড়ুক পাখির মত শরীরটা একটু ঝুঁকে ওষুধি গাছ খুঁজছে। তৃষ্ণার ভেতরটা বারকয়েক স্যাঁতস্যাঁত করে ওঠে, আবার ভরেও যায়। মজার এক খেলা। ছেলেটা তো অশ্চর্য পাগল। তৃষ্ণা চেঁচিয়ে বলে ওঠে—"শুনছেন, আমার ভয় করছে!" রুনুর আশ্বাস ভেসে আসে—"ভয়ের কি আছে! আমি তো আছি।" তৃষ্ণা আলতো হেসে ফেলে—এমনভাবে কথা বলছে যেন আদ্যিকালের ঠাকুর্দা রে!

রুনু ফিরে আসে একমুঠো পাতা নিয়ে। ছেলেমানুষি সাফল্যে মুখটা উজ্জ্বল—"রাবণলতা! ছোটবেলায় যখন দেশের বাড়িতে থাকতাম, খেলতে গিয়ে কেটে ছড়ে গেলে এই পাতার রস লাগাতাম। ম্যাজিকের মত কাজ করে।" তারপর পাতাগুলো চটকাতে চটকাতে ভীষণ সরল আর দ্বিধাহীন কণ্ঠে আবার বলে ওঠে রুনু—"সব খুলে টুলে একটু শুয়ে পড়ুন। রসটা লাগিয়ে দিচ্ছি।" আশ্বাস দেয়—"একটু জ্বালা করবে হয়তো, তবে এমন কিছু না।" তৃষ্ণার ইতস্তত ভাবটা কাটে না দেখে তাড়া দেয়—"কি হল? আশ্চর্য তো!" অধৈর্য রুনু তৃষ্ণার কাঁধে আলতো চড় মারে। রাগ রাগ শাসনের গলায় আবার তাড়া দেয়।

এবার কী সহজেই না তৃষ্ণা নিজেকে নগ্ন করে ঘাটের চাতালে শুয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত ধরে কাঁধে, বুকের দুপাশে, পিঠে কটা আঙুলের মধ্যে পাপ খোঁজে। এবং মনে মনে বলে ওঠে—"রুনু, তোমায় কি কেউ বর্ষার রাতে লালকমল-নীলকমলের গল্প শোনায় আর তা শুনতে শুনতে তুমি অবাক হয়ে যাও?" চিকিৎসা পর্বের মধ্যে সিরিয়াস গলায় রুনু সমানতালে নির্দেশ দিয়ে যায়, "এদিক ফিরুন। সোজা হন..." তৃষ্ণা অস্ফুটস্বরে বলল—"রুনু, একটু নষ্ট হলেই বা...।" রুনু সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলল—"যন্ত্রণা হচ্ছে! গিয়েই একটা টিটেনাস নিয়ে নেবেন।" হাসতে গিয়েও তৃষ্ণার চোখদুটো জলে ভরে যায়।

অবশেষে লক্ষ করে সে, আচ্ছন্নের মত রুনু আলোকিত এক পুষ্পবনে

খেলায় মেতে ওঠে। তার আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় আবিষ্ট আঁখিদ্বয়, মায়াময় গ্রীবা...। এক সুগন্ধী উত্তাপের মধ্যে রুনুর মুখ নেমে আসে সিক্ত শঙ্খ যুগলের মধ্যযামে। কোথায় যেন কি একটা ফুলের গন্ধ আরও গাঢ় গোপন হয়ে গেল।

বকুলবাড়ি দেখা

ওদের উপস্থিতি টের পেতেই দুজনে উঠে দাঁড়ায়। তৃষ্ণা রুনুর একটা হাত ধরে রাখে। ওদের একজন চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল—"রুনু, তুই না একবার কি একটা ম্যাগাজিনে স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন দেখে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলিস জিনিসটা কি? মনে পড়ে?" তৃষ্ণা দেখে বিকেলে তার ঘরে আসা দ্বিতীয় ছেলেটা খিক খিক হেসে দিল। সরু চোখে ডলি সায় দেয়। তৃষ্ণা কুঁকড়ে গেল। খানিক বিস্ময় মেশানো গলায় রুনু ফুঁসে ওঠে—"তাতে কি হয়েছে?" রুনুর কথা শেষ হবার আগেই কে যেন এক ঝটকায় তৃষ্ণাকে ছিনতাই করে নেয়। উৎকট উল্লাসে ছিঁড়ে গেল যাবতীয় মগ্নতা—"তৃষ্ণা আমাদের সবার শেয়ারের মাল। পুরো রাতটা পড়ে আছে! আ-উউ!" সম্মিলিত ঠা ঠা হাসির মধ্যে তৃষ্ণা ডুকরে ওঠে। রুনু বেহেড মাতালের মত কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমটা হতভম্ব, সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। তারপর প্রায় একই সঙ্গে এগিয়ে গেল।

খুব রুগ্ন গলায় রুনুই প্রথম কথা বলে—"ওরা জানোয়ার, জানোয়ার সব। এত খারাপ ওরা আমি জানতাম না...।" তৃষ্ণা এতক্ষণ দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছিল। এবার মুখ তোলে। কয়েক মুহূর্ত রুনুর চোখে বিহ্বল দৃষ্টি রাখে। দু-আঙুলে তার ঠোঁট ছোঁয়, তার চুল ধরে আলতোভাবে একবার ঝাঁকুনি দেয়। পরক্ষণেই রুনুর মুখটাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

এবং এসময়, এই সময়ই অতীব আশ্চর্য হয়ে দেখল তৃষ্ণা—আসুমার মাঠে ছোট্ট একতলা সাদা বাড়ি। অনেক পেছনে তিরতিরে নদী। বাড়ির সামনে বাঁশকঞ্চির বেড়াঘেরা ফুলের বাগান। বাগানের মাঝখান দিয়ে বাড়িটা থেকে বেরোনোর একফালি রাস্তা। বাগানের সীমানায় রাস্তার ওপর কাঠের ছোট্ট গেট। গেটের মাথা একটুকরো আকাশ-লতানে গাছালিতে ঢাকা। আর পাশেই একটা বকুল গাছ।...

বৃষ্টির সঙ্গে আর একদিন
অজন্তা সিন্‌হা

দার্জিলিং-এ গাড়ি স্টার্ট করার সময়ই কুয়াশা আর মেঘে মাখামাখি একটা মন খারাপ করা দুপুরের মুখোমুখি হয়েছিল আকাশ।

তারপর অনেকটা পথ সেভাবেই কাটল। মন খারাপটা কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না তার। জানালার কাঁচ তুলে গাড়ি চালাতে ভাল লাগে না আকাশের— কিন্তু এখন নিরুপায়—জানলা খুললেই বাতাস এসে ভিজিয়ে দেবে ঠাণ্ডা করে দেবে, গাড়ির ভিতরটা। মনকে কিছুটা অন্যদিকে ফেরাতেই মিউজিক সিস্টেম অন করে আকাশ। এদিক-ওদিক করে যে গানটা ঝট করে তার কানে লেগে যায়, সব সময় সেটাই চালায় আকাশ, আজও গুলজারের পুরনো ছবির গান. সঙ্গে আকাশ নিজেও গুনগুন করে...।

গান শুনতে শুনতে নির্জন পথে চলতে চলতে, গানের সুরে নিজেকে মেলাতে মেলাতে হঠাৎই অদ্ভুত এক স্মৃতি ঘিরে ধরে আকাশকে। কুয়াশা আর মেঘের আস্তরণ সরিয়ে আকাশে তখন একটু একটু করে সূর্যদেব উঁকি মারতে শুরু করেছেন। ঠিক সেভাবেই আকাশের মন থেকে স্মৃতির আস্তরণ সরিয়ে উঠে আসে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া এক মুখ—এই পথেই বৃষ্টিকে নিয়ে গিয়েছিল সে। এই পথেই বৃষ্টিকে ছাড়া একা একা ফিরেছিল আকাশ।

কুড়ি বছর আগের কথা! এর মাঝে আরও অনেকবার এদিক দিয়ে যাতায়াত করেছে সে। কখনও একা, কখনও অফিস টিম নিয়ে। বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও মনে পড়েনি বৃষ্টিকে। আজ এই মেঘ আর কুয়াশা, সঙ্গে নিঃসীম একাকীত্বই বোধহয় পৌঁছে দিল তাকে এক ঝটকায়, বৃষ্টির স্মৃতির দিনে।

এই রাস্তায় গাড়ি থামাবার উপায় নেই, মানে যেখানে-সেখানে। পিছন থেকে গাড়ি আসছে, সামনে থেকেও—এখানকার সেই যাতায়াতের নিয়ম মেনেই গাড়ি চালানো ও থামা। অথচ এই মুহূর্তে খুব আলস্যি লাগছিল, গাড়ি চালাতে তো মোটেই ইচ্ছে করছিল না। নিরুপায় আকাশ অতিকষ্টে স্টিয়ারিং-এ হাত রাখে— গতি স্লো হলে পিছন থেকে হর্ন, তারপর আবার একটু চলা। এইভাবে সে যে জায়গাটায় পৌঁছয় সেখানে থামাটা ঘটে এখানকার নিয়মেই। জায়গাটা অনেকটা ছড়ানো, চা-খাবারের জন্য সকলেই থামে এখানে। আর আজ তো আকাশ যেন বেঁচে যায়। গাড়ি লক করে নিচে নামে। হাত-পা ছাড়ায়। হঠাৎই গাড়ির কাঁচে চোখ পড়ে। নিজেকে দেখে। আর তারপরই মনে হয় সে কত বদলে গেছে। বৃষ্টি কি তাকে দেখলে এখন চিনতে পারবে?

সামনের বাসটায় কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। লোকজনের জটলা। সকলেই বেশ উত্তেজিত। ভিড়টাকে পাশে রেখে সামনের চা আর স্ন্যাকস-এর দোকানটায়

যেতে যেতে কানে আসে মানুষজনের কথা—'গাড়ি ছাড়ার আগে চেক করবেন না আপনারা? এখন কি হবে? দেরি হলে, যদি ট্রেন মিস করি!' এঁদের সকলেরই কলকাতা ফেরার তাড়া স্বাভাবিক ভাবেই। কনডাক্টর জানায়, 'দেখেই গাড়ি বের করা হয়েছে, হঠাৎ করে টায়ার গেলে কি করব? একটু অপেক্ষা করুন, দশ মিনিটে রেডি হয়ে যাবে। আপনারা চা-টা খান না?' কিছু করার নেই, অগত্যা লোকজন এগিয়ে যায় চা-এর দোকানে। তাদের থেকে একটু তফাতে আকাশ। হঠাৎই চোখে পড়ে কিছুটা দূরে এক মহিলা একা দাঁড়িয়ে। কালো পাড়ের ঘিয়ে রঙের সিল্ক, কালো কার্ডিগানের সঙ্গে মাথা ও গলাকে ঘিরে একটা কাল স্কার্ফ মতন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। দোহারা গড়নের মহিলা ব্যতিক্রমী ভাবেই একা দাঁড়িয়ে—সেইজন্যই চোখে পড়ে তাঁকে, আকাশ দেখতে দেখতেই সামনের রেস্তোরাঁটায় ঢোকে। সেখানে তখন লোকের ভিড় গিজগিজ করছে। তারই মধ্যে কোণের একটা টেবিলে জায়গা পায় আকাশ। কোণ বলেই ভাল লাগে তার। সামনে আবার একটা জানালা, সেখান থেকে নিচে তাকালেই পাহাড়ি খরস্রোতা নদী। কফি আর পকোড়ার অর্ডার দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মৃদু মহিলাকণ্ঠের কিছু এক জিজ্ঞাসায় চোখ ফেরায় সে।

—বসতে পারি?—সেই ভদ্রমহিলা—ঘিয়ে আর কালোয় অন্যরকম।

—নিশ্চয়ই।

এই টেবিলে দুদিকে দুটো মাত্র চেয়ার। এছাড়া পুরো রেস্তোরাঁয় একটাও টেবিল খালি নেই।

একটি ছেলে এসে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে কফির অর্ডার নিয়ে যায়। আকাশ এক নজরে ওঁর দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের হাসি হেসে আবার বাইরে মুখ ফেরায়।

তারপর দুজনেরই কফি আসে আর তার পকোড়া। এর মধ্যে কখন ভদ্রমহিলা চশমা খুলে সামনে রেখেছেন। বিন্যস্ত করছেন উড়ো চুল। তারপর রুমাল বের করে মুখ মুছে তার দিকে তাকিয়ে চশমাটা পড়তে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে অবাক আকাশ। তার অবাক হওয়াটা বেরিয়ে আসে সশব্দ উচ্ছ্বাসে—

—আরে বৃষ্টি!!

—আকাশ!

—আমি তো প্রথমেই চিনতে পেরেছিলাম কিন্তু তুমি চিনতে পারবে কিনা, সেটা ভেবেই—

—চশমা না খুললে হয়তো চিনতে পারতাম না।

কিছুক্ষণ চুপ দুজনেই।

হঠাৎ করে কুড়ি বছর আগের সময় তাদের সামনে। যেন টাইম মেশিনে করে পৌঁছে যাওয়া, আকাশের মনে থাকে না তার মাথার পঁচাত্তর ভাগ চুল

এখন সাদা, মনে থাকে না মাঝখানের কোনও কথা, খুব আবেগ আর অভিমান নিয়ে সে বলে ওঠে—সেদিন এভাবে না বলে চলে গেলে কেন?

—এখনও ভোলনি?

—কেমন করে ভুলব বৃষ্টি? তোমাকে কি ভোলা যায়?

আকাশের কথায় মাথা নিচু করে বৃষ্টি। গলার কাছে কিছু একটা আটকায়। সে নিজেও তো ভোলেনি। পুরনো দিনগুলো। মাত্রই তো সাতদিন. ভিড় করে আসে রঙিন ফুলের বাহার নিয়ে—

ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে। বৃষ্টিকে পকোড়ায় হাত লাগাতেই হয় আকাশের জোরাজুরিতে। বাসটাকেও ছেড়ে দিতে হয়।

—এখন কিছুক্ষণ কোনও কথা বলবে না। কোথাও যাবে না। চুপ করে বসে থাক। অনেক ঝগড়া আছে তোমার সঙ্গে।

—আচ্ছা যাচ্ছি না কোথাও। তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি—আকাশের কথার জবাবে হেসে জানায় বৃষ্টি।

—আগে বলো, কেমন আছ? কোথায় রয়েছ? ইস! তোমাকে কত খুঁজেছি জানো? ঠিকানাটাও তো দিলে না? কিন্তু দেখছ তো. ঠিক দেখা হয়ে গেল আবার?

—দেখছি তো? হাসে বৃষ্টি।

বৃষ্টির হাসিটা একইরকম আছে—ভাবে আকাশ। মাথার কাঁচাপাকা চুল বা চোখের নিচে হালকা বলিরেখা সেই হাসিকে ম্লান করতে পারেনি। আর একটুও বদলায়নি বৃষ্টির চোখ দুটো—অদ্ভুত—একই সঙ্গে হাসি আর বেদনায় মাখামাখি।

আকাশ যখন এইসব ভাবছে, তখন বৃষ্টির উদাস দৃষ্টিও ছুঁয়ে যাচ্ছে আকাশকে।

আর একপ্রস্ত কফি খেয়ে উঠে দাঁড়ায় ওরা। গাড়ির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। আকাশের খুব ফেরার তাড়া নেই। কলকাতা থেকে তার এক কলিগ আসবে, তাকে তুলে নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পঙের দিকে যাবে ওরা, সেখানে একটা প্রজেক্টের কথা চলছে। বৃষ্টির প্রশ্নে চমক ভাঙে—

—তোমার বাড়ির খবর বলো?

—বাড়ির খবর ভালই। ছেলে ডাক্তারি পড়ছে। মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি দেবে।

—আর ছেলেমেয়ের মা? তিনি কি এখনও তোমাকে রাগিয়ে দিয়ে সারা পৃথিবীর সব মানুষের দুঃখ দূর করতে মেতে আছেন?—হাসতে হাসতে প্রশ্ন' করে বৃষ্টি।

—তুমি ভোলনি দেখছি।—আকাশও হাসে।। তারপর বলে—না বদলায়নি একটুও। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম করার ক্ষমতা তো কমেছে! তাই কিছুটা কাজও কমেছে, মানে ওই বাইরে যাওয়াটা আর কি! ঘরে বসে চলছে,

যতটা পারে। যাক ছাড়ো। তোমার কথা বলো!

—আমার আর কি কথা? কলকাতার বাড়িটা বিক্রি করে এদিকেই রয়েছি।

—এদিকে মানে?

—কালিম্পং।

—মানে?

—মানে শ্বশুর-শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর কলকাতায় আর কিছু থাকল না। চাকরিটাও করতে ভাল লাগল না আর। টাকা-পয়সা যা ছিল, সব নিয়ে এখানে একটা ছোট বাড়ি কিনলাম। আমার এক দূর সম্পর্কের মামার একটা বাগান ছিল কালিম্পঙে। উনি বিয়ে করেননি। সেভাবে বাগানটা দেখার কেউ ছিল না। ঘটনাচক্রে বাড়িটা বাগানের পাশেই। মামারও কেউ নেই। আমারও—

—বাঃ। অদ্ভুত। তোমার সবই অবশ্য এইরকম।

—সে কী আমার খুশিতে?

—না। তবে, যাওয়ার সময় ঠিকানাটা যদি দিয়ে যেতে, তবে কুড়ি বছর এই কষ্টটা পেতে হত না।—বলেই আকাশ নিজের অভিব্যক্তি লুকোবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তাকায়। গাড়ির উপরের ধুলো মোছে।

বৃষ্টি কিছুক্ষণ নীরব থাকে। তারপর মৃদু স্বরে বলে—কষ্ট কেন?

—তুমি জানো বৃষ্টি।

—কষ্ট যাতে না পাই আমরা কেউই, তার জন্যই তো সেদিন চলে গেছিলাম।

—খুব সোজা না? চলে গেলেই ভুলে যাওয়া যায়? তুমি কি ভেবেছিলে আমার এক সুখী দাম্পত্যজীবনে তুমি বাধা হবে না, তাই তো? দাম্পত্য তার নিজের জায়গায় আছে বৃষ্টি। কিন্তু তুমি আমার কাছে যে অনুভব নিয়ে এসেছিলে সেটাও তো মিথ্যে নয়। আমি জানি না কি এর নাম, এই অনুভূতির, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলতেই পারলাম না। কেন বলো?

জবাবে চুপ বৃষ্টি।

—অদ্ভুত ব্যাপার। কোইনসিডেন্স কি একেই বলে? আজই শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং যাব আমি। ভয় নেই। তোমার বাড়িতে যেতে চাইব না।

—না না। ভয় কেন? এভাবে বোল না!

এর মধ্যে হঠাৎই কুয়াশা ঘিরে ধরে চরাচরকে। ঠাণ্ডা বেড়ে যায়। গাড়ির ভিতরে বসতেই হয়। অজান্তেই স্টিয়ারিং-এ হাতও রাখে আকাশ, গাড়ি চলতে থাকে, তারপরই প্রশ্ন—

—তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন বৃষ্টি?

—তোমাকে পেলাম না যে!—বলেই হেসে ফেলে সে, এক সেকেন্ড জন্য হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায় আকাশের। তারপর সে-ও বলে—

—এখন করবে?

এবার হাসতে হাসতে বৃষ্টি বলে—পাগল? সতীন নিয়ে ঘর করার কোনো বাসনা নেই আমার।

—ডিভোর্স নিয়ে নিচ্ছি।

—যত্ত বাজে কথা! তুমি জানো আমি মজা করছি।

—জানি। তোমাকে জানি না?

—কি করে জেনে ফেলো, বলো তো? সব সময়।

—সত্যি বলছি বৃষ্টি। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা। নিশ্চয়ই করবে। তুমিও আমাকে চেনো। তুমি অনেকটাই আলো-ছায়ার মতো ছিলে আমার স্মৃতিতে। মাঝে মাঝে মনে পড়ত। রোজকার রুটিনে ভুলেও যেতাম। আজ দার্জিলিং থেকে গাড়ি যখন স্টার্ট করি, তখন অদ্ভুত একটা ওয়েদার, পথে এসে হঠাৎই তোমার কথা, দার্জিলিং-এ আমাদের একটা রাতের কথা। তুমি অত কাছে থেকেও কত দূরে রেখেছিলে নিজেকে। তারপর তো চলেই গেলে। সেই দার্জিলিংকে আমি কোনোদিন ভুলব না।

—হ্যাঁ। খুব বৃষ্টি পড়ছিল।

তারপরই কিছুটা গাঢ় হয়ে যায় বৃষ্টির গলা—আমিও কিছু ভুলিনি আকাশ।

—আরও অদ্ভুত হল, এর মধ্যে এপথে একেবারে যে যাইনি তা নয়, কিন্তু তোমাকে সেভাবে মনে পড়েনি। হয়তো একা ছিলাম না কখনওই, তাই।

গাড়ি চলতে চলতেই চারপাশের দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়। শিলিগুড়ি খুব দেরি নেই বোঝা যায়।

—বৃষ্টি, তুমি দার্জিলিং কেন গিয়েছিলে? বেড়াতে?

—না, না। ওখানে আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের এক আত্মীয় থাকেন। অনেক বয়স। নিঃসন্তান দম্পতি। ওঁরা সুমন, মানে আমার স্বামীকে খুব ভালবাসতেন। সুমন মারা যাওয়ার পর কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অনেকদিন ছিলেনও। এখন দুজনেই খুব অসুস্থ। ওঁদের সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা নেপালের, কিন্তু দিব্যি বাংলা বলেন। আমায় খুব স্নেহ করেন। মাঝে মাঝেই যাই।

এর মধ্যে হঠাৎই ফোন বাজে আকাশের। গাড়ি সাইড করে ফোন ধরে আকাশ।

কথাবার্তা ভেসে আসে বৃষ্টির কানেও।

বেশ উত্তেজিত আকাশের গলা। তারপর একসময় ফোনে কথা বন্ধ হয়।

আকাশ তাকায় বৃষ্টির দিকে—

—কোনও মানে হয় বলো?

—কোনও বিপদ?

—আরে না, না। আমার সেই কলিগের কথা বলেছিলাম, যার আসবার কথা শিলিগুড়িতে, তার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আই.সি.সিইউতে। ওরা অনেকক্ষণ থেকে আমাকে কথাটা জানাবার চেষ্টা করেও নেটওয়ার্ক পায়নি। ও কাল

সকালের ফ্লাইটে আসছে।

—ওঃ। তাহলে কি করবে তুমি এখন?

--কি করব? কি করব বৃষ্টি?

দুষ্টুমি চকচক করে আকাশের চোখে, সঙ্গে একরাশ খুশি, তারপরই—

গাড়িতে তেল ভরব, তারপর আবার দার্জিলিং। কাল সকালেরটা কাল দেখা যাবে।

—ওঃ। তা ভাল। আমাকে তুমি বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিও, তাহলেই হবে।

—বাসস্ট্যান্ডে আবার কী? চুপচাপ বোস। নয়তো বুড়ো বয়সে কিডন্যাপের দায়ে জেলে যেতে হবে আমাকে।

—মানে?

—মানে, তুমিও যাচ্ছ। একদিন পর বাড়ি ফিরলে, তোমার নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না?

—না, তা হবে না। তবু?

—আবার 'তবু'? এই 'তবুটা' এবার ছাড়ো বৃষ্টি। আর ক'বছর বাঁচব বলোতো? তুমি আমার সঙ্গে এখন দার্জিলিং গেলে, পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। ভয় নেই, তুমি তোমার আত্মীয়ের বাড়িতেই নাহয় থেকো।

—তা কেন, এবার আমি তোমার সঙ্গেই থাকব—হাসতে হাসতে বলে বৃষ্টি।

—সত্যি?

—সত্যি।

গাড়িতে তেল ভরা। টুকটাক খাবার জিনিস কেনার পর গাড়ি যখন শিলিগুড়ি ছাড়ে তখন সূর্য শেষ দুপুরের আলো ছড়াচ্ছে। এই সময় গাড়ি চালিয়ে যাওয়াটা বেশ রিস্‌ক জানে ওরা দুজনেই। তবু উত্তর-পঞ্চাশের এই অচেনা অ্যাডভেঞ্চারে মেতে ওঠে আকাশ আর বৃষ্টি। তারপর আকাশকে অবাক করে দিয়েই বৃষ্টি বলে—মন খারাপটা এবার চলে যাবে তো?

জবাবে আকাশ একবার দেখে তাকে। কিছু বলে না। সামনের দিকে তাকায়। দার্জিলিং। সেই দার্জিলিং-এ যাচ্ছে তারা। কুড়ি বছর পর। তারপর বলে—আকাশের সঙ্গে বৃষ্টির যে চিরন্তন মন খারাপের সম্পর্ক। তবে এবার তো আর না বলে. পালাবে না তুমি, ভরসা সেটাই।

চিরন্তন মন খাবাপটা এড়াতেই একদিন পালিয়েছিল বৃষ্টি। কিন্তু মন খারাপটাকে এড়ানো যায় না। যায় না এড়ানো যে টানাপোড়েন চলেই।

খুনি

কৌশিক ঘোষ

সমুদ্রের ধারে এইভাবে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি অমলেশ। ভাবার কথাও নয়। তবু পৃথিবীতে অনেক কিছু এই ধরনের কাণ্ড ঘটে যা ভাবার বাইরে। দেখা হওয়াটা কাকতলীয় ঠিকই। অমলেশের যদি লোভ না থাকত, তাহলে হয়ত বা দেখা হওয়াটা আটকানো যেত। বুড়ো বয়সে এত লোভ থাকা ভালো নয়। এটা ভেবেই অমলেশের নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। অমলেশ তো কবি নয়। একান্ত মধ্যবিত্ত ছাপোশা কেরানি। তার এইসব শখ থাকা উচিত নয়। আসলে বন্দনাই যত নষ্টের গোড়া। মাঝে মধ্যেই কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে, সমুদ্র নির্জন। বিয়ের পরে প্রথমবার দীঘাতে বেড়াতে গিয়ে বন্দনার সমুদ্র খুব ভালো লেগেছিল। তার আবদারকে প্রশ্রয় দিতেই অমলেশকে বন্দনাকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে সমুদ্র-ঘেরা শহর। এবারে ঘুরেফিরে মাত্র কয়েকদিনের ছুটিতে এসে হাজির দীঘায়।

বছরের মধ্যভাগ জুলাই-আগস্ট মাসে দীঘায় বড় একটা ভিড় হয় না। হোটেল খালিও থাকে। ঘর পাওয়ার ঝামেলা নেই। একটু দরাদরি করলে ঘরভাড়ায় কিছু ছাড়ও পাওয়া যায়। তবু এবারেও সেই বন্দনার বায়নাতেই নিতে হল সেই হলিডে হোম। একেবারে সমুদ্রের গা-ঘেঁষা। হলিডে হোমের গেট দিয়ে বেরোলে একফালি বালির রাস্তা। কেমন অদ্ভুতভাবে এঁকে বেঁকে সমুদ্রের পাশ দিয়ে নীল জলে গিয়ে হারিয়ে গেছে। এই অদৃশ্য অনন্তর এক অসাধারণ রূপ আছে। নিজের চোখে না দেখলে তা বোধগম্য হয় না। এই দৃশ্য বন্দনার মত অমলেশকেও ভাবায়। তারও খুব সুন্দর লাগে। বন্দনার মতে দীঘার এই হলিডে হোম থেকে এই দৃশ্য বেশি ভাল লাগে বলেই অমলেশ এই হলিডে হোমের ঘরটাই বুক করেছিল।

এই হলিডে হোম বুক করতে যাবার আগে তার মনে সন্দেহ ছিল, আদৌ এই হলিডে হোম পাবে কিনা। হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘ বাইশ বছর আগে বিয়ের পর নিরিবিলি দিন কাটানোর জন্য এই নির্জন হলিডে হোমের কথা বলেছিলেন অমলেশের এক সহকর্মী। শুভঙ্কর দত্ত। তাঁর এক বন্ধুর বাবা সেই সময়ে দীঘাতে জমি কিনে থাকবে বলে দোতলা বাড়ি করেছিলেন। তাঁর ছিল অগাধ পয়সা। কোন এক কোলিয়ারির তিনি মালিক ছিলেন। সেই ভদ্রলোক ছুটি কাটাতে মাঝে মধ্যে এই বাড়িতে থাকতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর সব কিরকম ওলট-পালট হয়ে যেতে লাগল। শুভঙ্করবাবুর বন্ধুটি ছিল একেবারে

অকর্মণ্যের ঢেঁকি। রেসের মাঠ, মদ, এমনকি মেয়েছেলে—সব দোষই তাকে গ্রাস করেছিল। পয়সাকড়ি সব উড়িয়ে গ্রাসাচ্ছদনের জন্য অবশেষে তিনি এই বাড়িটা হলিডে হোম হিসেবে ভাড়া দিতেন। ঝামাপুকুর লেনের কোণের একটা বাড়িতে একতলার ঘরে হলিডে হোমের অফিস ছিল। বাইশ বছর পরে সেই অফিস ওখানে থাকবে কিনা তা দেখতে দুরুদুরু বুকে অমলেশ একদিন দুপুরে সেখানে গিয়ে হাজির। বাইশ বছরেও অফিস পাল্টায়নি। শুধু পাল্টেছে মানুষটা। প্রথম যখন অমলেশ এসেছিল, তখন এক বৃদ্ধ বুকিংয়ের টাকা অ্যাডভান্স নিতে নিতে মুখে লাল পানের পিক আটকে একটু মুচকি হেসে বলেছিল—হানিমুন। তায় আবার বসন্তকাল। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের। এর মত জায়গা হয় না। অমলেশ সেবার লজ্জা পেয়েছিল খুব। এবারে এখানে সেই বৃদ্ধের বদলে রয়েছে এক যুবক। মেজাজ ততোধিক তিরিক্ষে। অমলেশকে দেখেই মনে হল যুবকটি তেতে উঠল। বোধহয়, তাঁর কোথাও বেরুনোর ছিল। অমলেশকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাড়াতাড়ি বলুন, কবে থেকে কতদিন। আর কটা ঘর লাগবে! অমলেশ খানিকটা হতভম্ব হয়ে কথা বলা পুতুলের মত উত্তর দিল। অন্য সময় হলে সেও ছাড়ত না। এক-দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কেন জানা নেই, এক্ষেত্রে সে চুপ করেই রইল। মনের মধ্যে একটা চোরা স্রোতের স্মৃতি কেমন যেন হঠাৎ বয়ে গেল অমলেশের শরীরে। এই সময় বাগবিতণ্ডা করতে একেবারেই আর ভাল লাগল না।

বিয়ের একমাস পরে বড় ছুটি পেয়ে সিমলায় আক্ষরিক অর্থে মধুচন্দ্রিমা যাপনে তারা গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার আগে জীবনে প্রথম একজন নারীর সাথে রাত কাটানো এক নির্জন বাড়িতে—তার অভিজ্ঞতা, রোমাঞ্চ এবং ভয় ঢুকিয়েছিল অনেকেই। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছ সমুদ্রের ধারে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। কেয়ারটেকার ভদ্রালোক সুবলবাবু খুব ভালো ছিলেন। তবু বন্দনাকে অমলেশ কখনো কাছ ছাড়া করেনি। কত কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসতে লাগল অমলেশের মনে।

হলিডে হোম বুক করে অমলেশ সেদিন বেরিয়ে বাইরে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। এক কাঁচের গেলাসে ভর্তি চা নিয়ে বসে পড়ল। বোধহয় একেই বলে স্মৃতিভারে জর্জরিত। সেই চারদিন তুমুল আনন্দ করেছিল তারা। সকালে সূর্য উঠতে বেরিয়ে যেত। তারপর সমুদ্রের পাড় দিয়ে বালিপথে হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে যেত। একদিন তারা জেলেদের গ্রামে চলে গিয়েছিল। কেমন সুন্দর করে তারা তখন জাল বুনছিল। এক জেলে বৌ তার ঘরের জন্য ভাত রান্না করছিল। বন্দনার খুব ভালো লেগেছিল। একটা ছোট শিশু মাছ ধরার জালের ওপর কেমন হামাগুড়ি দিচ্ছিল। বন্দনা তাকে কোলে নিল। জেলে বৌ বলল,

তোমারটা কই গা। বন্দনা খুব লজ্জা পেয়েছিল। জেলে বৌ কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাদের দেখছিল। জেলেপাড়া থেকে ফিরে এসে সেদিন রাতে অমলেশকে কেমন যেন এক দস্যু ভর করেছিল। সমস্ত বাঁধনের বেড়া ভেঙে একেবারে নিজেকে লুণ্ঠিত করে সঁপে দিতে চেয়েছিল বন্দনার শরীরে। বন্দনা শেষে অবাক হয়ে বলেছিল—তুমি বোধহয় আমাকে মেরেই ফেলতে আর একটু হলে। এতটা অমানুষ, তা বুঝে উঠতে পারিনি। অমানুষ কথাটা শুনে অমলেশ হো হো করে হেসেছিল। তার সেই সময়ে মনে হয়েছিল, বন্দনার অভিযোগ কেমন যেন অভিমানের কুণ্ডলী হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের মাঝখানে। তার হাসি, বন্দনার অনুযোগ, অভিমান আজও সাক্ষী করে রেখেছে সেই বাড়ি।

এইসব পাঁচ-সাত কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ আগেই চায়ের গেলাস খালি হয়ে গিয়েছিল অমলেশের। মাঝখানে চায়ের দোকানের ছেলেটি একবার বলেও গিয়েছিল টেবিল ছেড়ে দিতে। অমলেশ স্মৃতি রোমন্থনে এতটাই ব্যস্ত যে সে ভুলেও গিয়েছিল তা। আর একবার ফের এসে ছেলেটি বলল—বাবু। আপনার হয়ে গেলে উঠে পড়ুন। দু'জন খদ্দের আছে। অনেকক্ষণ পরে অমলেশ সম্বিৎ ফিরে পেল। উঠতে যাবে সেই সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে দুটি বছর তিরিশের যুবক ঝড়ের বেগে ঢুকল চায়ের দোকানে। চায়ের দোকানের মালিক তখন ক্যাশ গুনছিলেন। তাকে লক্ষ্য করেই একজন যুবক বলল—মাল ছাড় শালা। কালকে ক্যাটারিংয়ের অর্ডারে হাজার পঞ্চাশেক লাভ হয়েছে। তার অর্ধেক আমায় দে।

চায়ের দোকানের মালিক প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন—আমি যা পেয়েছি তা তো সবার মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খুব কমই লাভ রেখেছি। আর একজন বলে উঠল—এতসব শুনতে রাজি নই। টাকা দিবি, নয়ত স্বর্গে যাবি। মালিক এবার রেগে উঠে স্রেফ জানালেন—এক পয়সা দেব না। যা করার কর। এইভাবে বাদানুবাদের পরই একজন একটা রিভলভার বের করে ভদ্রলোককে দোকানের মধ্যেই গুলি করল। তারপর, অমলেশের দিকে তাকিয়ে বলল—চেঁচালে তোকেও শেষ করব। যতক্ষণ না পালাচ্ছি ততক্ষণ নড়তে পারবি না। মোবাইল থাকলে আমাদের দিয়ে দে।

অমলেশ প্রতিবাদ করবে কী, নিজে কিরকম হতভম্ব হয়ে গেল। এমনকি যারা দোকানে ঢুকতে চাইছিল, তারাও থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যুবক দুটি এক নিমেষে রাস্তার ধারে একটা দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিতে করে পালিয়ে গেল। দোকানের বৃদ্ধ মালিক ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়েছে। ছোট চায়ের দোকানটির মেঝে ভেসে যাচ্ছে লাল রক্তে। অমলেশ একটা ছেলেকে ডেকে বলল—দাঁড়িয়ে না থেকে চলুন, ভদ্রলোককে কাছেপিঠে কোন হাসপাতালে নিয়ে যাই। যদি বাঁচানো

যায়। যাইহোক, ভদ্রলোক সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন। গুলিটা বুকে না লেগে, লেগেছিল হাতে। কিন্তু, অমলেশ পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেল না। যেহেতু, সে এবং আরও কয়েকজনের সামনে ঘটনাটা ঘটেছিল, তাই থানায় দৌড়োদৌড়ি, দুষ্কৃতীদের স্কেচ—সবই অমলেশের বয়ানে পুলিশ করল। সেই ভিত্তিতে খোঁজ চলেছিল কয়েকদিন। কিন্তু তারা ধরা পড়েনি।

গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে যে ঢেউ হয়, বর্ষাকালে তার চাইতেও বেশি হয়। তাছাড়াও এইসময় সমুদ্রের রূপ বড় ভয়ঙ্কর। আকাশের ধূসর মুখের প্রতিচ্ছবি পড়ে সমুদ্রে। নীল সমুদ্র ধূসর থেকে কালো হয়ে কেমন যেন ফুঁসতে থাকে। এরপর কালো হয়ে যখন মেঘ নামে দিগন্তের পারে, তখন মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত প্রলয় একাকার করে মিশেছে সমুদ্রে। দীঘাতে বেড়াতে এসে অব্দি অমলেশ আর বন্দনা প্রথমদিন বাড়িটির বারান্দায় বসেই সমুদ্রের এই দৃশ্যই দেখল সারাদিন। প্রথমদিন কলকাতা থেকে আসার সময়ে খাবার নিয়ে এসেছিল। বাইশ বছর আগে এখানে রান্নার এক লোক ছিল। নাম কপিল। এখন আর কেউ নেই। খাবার খেতে হলে নয় বাইরে গিয়ে খেতে হবে অথবা কাঁচা বাজার কিনে রান্নাঘরে রান্নাও করা যেতে পারে। দু'দিন বেড়াতে এসে রান্না করতে নারাজ বন্দনা। তাই খাবার দোকান কাছাকাছি কোথায় তা দেখতেই বেরিয়ে ছিল অমলেশ। বেরিয়ে তার প্রথম মনে হল, সামনে কী আছে তা একটু ঘুরে দেখা যাক। আর তাতেই বিপত্তি।

একটু হেঁটে যেতেই অমলেশ দেখল বালির উপর একটা রঙিন ছাতা পাতা। তার তলায় মাদুর পেতে বসে দুজন যুবক। একজনের গায়ে হলুদ টি শার্ট, অন্যজন পরেছে শুধু হাতকাটা গেঞ্জি। দুজনেরই পরিধানে বারমুণ্ডা। পায়ের স্লিপার মাদুরের বাইরে অবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। চোখে দুজনেরই রোদচশমা। সামনে খোলা পানীয়ের বোতল। সমুদ্রের ধারে এরকম দৃশ্য একেবারেই নতুন নয়। অমলেশ সবকিছু দেখলেও লোক দুটিকে ভাল করে দেখতে পেল না। লোক দুটি বসেছিল রোদের দিকে মুখ করে। ফলে পেছন বা পাশ থেকে তাদের দেখা খুব শক্ত হয়ে উঠছিল অমলেশের পক্ষে। একমাত্র তাদের কাছে গেলেই তবে তাদের সরাসরি দেখা সম্ভব। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে ডাকল—দাদা। আপনার কাছে ম্যাচেস হবে? কথাটা শুনে অমলেশ একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে এগিয়ে গেল ওই লোক দুটির দিকে।

একজন হাত বাড়িয়ে দেশলাই নির্ল। এদের বয়স বেশি বলে মনে হল না। লোক না বলে বছর তিরিশের ছেলেই বলা চলে। অমলেশের তাদের কেমন চেনা চেনা মনে হল। সে যেন কোথাও তাদের দেখেছে। ছেলে দুটি একেবারে নির্বিকার। একজন মধ্যবয়স্ক লোকের কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে সিগারেট ধরাতে

তাদের বিন্দুমাত্র আটকায় না। তারা বোধহয় অমলেশকে চিনতে পারেনি। তাহলে তারাও হয়ত বলত কিংবা অমলেশের দিকে অবাক হয়েই চাইত। যাইহোক, অমলেশের ছেলে দুটির আচরণ ভাল লাগল না। পকেটে দেশলাইয়ের বাক্স রেখে আবার হাঁটতে শুরু করল অমলেশ। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল ছেলে দুটির মুখ। চায়ের দোকানের মালিককে গুলি করার সময়ে এদের দেখেছিল অমলেশ। একটা অদ্ভুত ভয় শিরশিরিয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠা নামা শুরু করল। চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে এল। গা-বমি করতে শুরু করল। শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে অমলেশ চেষ্টা করল কত তাড়াতাড়ি ছেলে দুটির চোখের নাগাল থেকে পালিয়ে আসবে। অমলেশ কী করে যে হলিডে হোমে ফিরে এল, তা সে নিজেই জানে না। বন্দনা ঘরের মধ্যে কাজ করছিল, অমলেশকে দেখে একেবারে চমকে উঠল। মুখ একেবারে শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেছে। দরদর করে ঘাম পড়ছে। অমলেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বন্দনাকে চুপ করতে বলে বলল—দেখো তো বাইরে কেউ দেখছে কিনা। বন্দনা কিছু না বুঝেই ব্যালকনি থেকে মুখ বাড়াল নীচে। কেউ কোথাও নেই।

অমলেশ এবার বন্দনাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল। ভদ্রলোককে খুন করার চেষ্টার পর থেকে ছেলে দুটিকে অমলেশ দেখেনি। কিন্তু তার বর্ণনা শুনেই পুলিশ স্কেচ করেছে। ছেলে দুটি যদি ধরা পড়ে তাহলে অমলেশের কৃতিত্বেই তারা ধরা পড়বে। সেটা যদি জানতে পারে, তাহলে অমলেশকে তারা প্রাণে মারবে।

সেদিন ঘর থেকে অমলেশ আর বন্দনা রাস্তায় বেরোল না। দুজনেই ঠিক করল আগামীকাল সকালেই দীঘা ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবে। রাতে খিদে পাওয়ায় একবার নীচে গিয়ে কোনরকমে রাতের খাবার কিনে নিয়ে এসেছিল অমলেশ। পরের দিন ভোর হতেই তারা হাজির হল দীঘার বাসস্ট্যান্ডে। সবে এখন উনুনে আঁচ পড়ছে। আশেপাশের দোকানদাররা দোকানে ঝাঁট দিয়ে দিনের পসরা সাজাতে ব্যস্ত। লোকজন কম। কয়েকজন মাত্র যাত্রী যাদের না বেরোলেই নয় তারাই প্রথম বাস ধরে ফিরে যাবে শহরে। হাওয়ার সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন ক্রমে বিশাল আকার নিচ্ছে। এত লোকের মধ্যেও নির্জনতা কেমন করে অমলেশকে গ্রাস করছে। বাসটা স্ট্যান্ডেই দাঁড়িয়েছিল। দু-একজন যাত্রীও বাসে বসে। অমলেশ আর বন্দনা টিকিট কেটে সিট নাম্বার খুঁজে বসতে যাবে, অমলেশের চোখে পড়ল বাসস্ট্যান্ডে সেই দুটি যুবক। হাতে স্যুটকেশ। তারাও বোধহয় ফিরবে কলকাতায়।

কোন কথা না বলে অমলেশ হঠাৎ বন্দনার হাত ধরে হিড়হিড় করে নেমে গেল বাস থেকে। তারপর পাগলের মত দৌড়। বন্দনা চেঁচাতে লাগল—আমায়

ছেড়ে দাও...আমি আর দৌড়তে পারছি না...। তুমি কী পাগল হয়ে গেলে। এইরকম একটা দৃশ্য দেখে সাতসকালে অনেকেই হকচকিয়ে গেল। বন্দনা চেঁচাতে লাগল, আমার ব্যাগ পড়ে। অমলেশের কোনদিকে হুঁশ নেই। প্রায় মিনিট দশেক দৌড়নোর পরে অমলেশ আর বন্দনা দেখল, ওরা এসে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রের ধারে। অমলেশ একটু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচার জন্য নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে বন্দনাকে কী একটা বলতে যাবে, সেই সময় দেখল পেছনে কয়েকজন লোক তাদের ব্যাগ নিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে ওই দুই ছেলেও রয়েছে।

অমলেশ এবার কেমন পাল্টাতে শুরু করল। একান্ত নিরীহ গোবেচারা মানুষটি যেন এক আহত বাঘ। ছেলে দুটির আর তার মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক গজ। হঠাৎ বালির মধ্যে থেকে ভেঙে যাওয়া একটা মদের বোতলের অর্ধাংশ তুলে ছুঁড়ে মারল ছেলে দুটিকে। একজনের মাথায় ঢুকে আটকে গেল সেই বোতল। অন্যজন এবার পালাল।

অমলেশের অনেকক্ষণ সম্বিৎ ছিল না। একটা শব্দ খুনি তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে তুলল। তা বোধহয় ভাঙার নয়। চারিদিকে হৈ হৈ। এদিক ওদিক লোক ছুটতে লাগল। অমলেশ তার মধ্যেই কেমন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। অবস্থা সামাল দিয়ে আহত লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে অমলেশকে নিয়ে গেল থানায়। এবার ইন্সপেক্টর তাকে বললেন—এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছেন মশাই। আর একটু হলে ছেলেটি মারা যেত। সেক্ষেত্রে খুনি হিসেবে আপনাকে জেল খাটতে হত। অমলেশ এবার ইন্সপেক্টরকে সব ঘটনা খুলে বলল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে তাদের দুজনকে ধরার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন আর তাদের দীঘা ছেড়ে যাওয়া হল না। পুলিশের তত্ত্বাবধানে দীঘার একটা হোটেলেই রয়ে গেল। পরের দিন, স্থানীয় পুলিশের নিরাপত্তায় তাদের ফিরে যাওয়ার কথা।

সে রাতে অমলেশ আর বন্দনা অনেকক্ষণ জেগে রইল। দুজনেই চুপচাপ। সমুদ্রের দেশে বেড়াতে এসে দুজনেই যেন সমুদ্র পেরোবার ধকল নিয়েছে। তাতেই ওরা ক্লান্ত।

বিয়ের পর এতদিন যা হয়নি, এবার তাই হল। বন্দনা অমলেশকে বলল—প্রয়োজনে তাহলে তুমি আমাকেও মারতে পারো এইভাবে। অমলেশ এর কোন জবাব খুঁজে পেল। তার মনে হল, সত্যিই তো, যে কোন সময়ে সে মানুষকে খুন করতে পারে। তাহলে তাকেই বা লোকে খুনি বলবে না কেন?

ছায়াপথ

অঞ্জনা রেজ ভট্টাচার্য

স্বামী কেন আসামি। অসাধারণ পালা। সুযোগ জীবনে একবারই আসে। এখনও যারা টিক্যাট কাটেন নাই, তাড়াতাড়ি আসেন। আগামী চৌঠা মাঘ। রাত্রি দশ ঘটিকায়। কালীবাড়ির মাঠে। শীঘ্র শীঘ্র আসেন। মঞ্জুরী অপেরার নবতম যাত্রাপালা। কলিকাতার সাড়া জাগানো যাত্রা। সারারাত্রি ব্যাপী ...।

লাল নীল রঙবেরং পোস্টারে মোড়া সাইকেল রিকশাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। গ্রামের মেঠো পথের ধুলো উড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে একপাল ন্যাংটো অর্ধন্যাংটো শিশু। হাতে ধরা লাল হলুদ যাত্রাপালার বিজ্ঞাপন। রিকশার পিছনে বড় পোস্টার। নায়িকার চোখভরা জল। হাতে হাত রাখা আসামি স্বামীর খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ডানদিকে স্বল্পবসনার লাস্যময়ী নৃত্য। বাঁদিকে দুই ভিলেনের ঘুসোঘুসি।

গাঁয়ের আঁকাবাঁকা পথে ধুলোর ঝড় তুলে শালুকভরা ডোবা, ধানের গোলা, ঢেঁকি ঘর, হাঁস মুরগির খোঁয়ার, গোয়ালঘর, হাট-মাঠ, গঞ্জের মোড় পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে সাইকেল রিকশা। মাইকে মুখ রেখে কালো ঢ্যাঙা ছেলেটি বলে চলেছে—

সবাই শোনেন, আমাদের তরুণ সঙ্ঘের অ্যাই বৎসর রজতজয়ন্তী। তাই সেরা যাত্রাপালার সঙ্গে জলযোগেরও আয়োজন আছে। টিক্যাট কাটলেই কুপন দেওয়া হইবে। অনুষ্ঠান শ্যাষ হইলে মিষ্টির প্যাকেট ...। আসন সংখ্যা সীমিত। শীঘ্র শীঘ্র ...।

ফুলডুংরি ছোট গ্রাম। এক্কেবারে দেশের বর্ডারে। এখানকার বেশির ভাগ লোকই পূর্ববঙ্গের। চাষবাস করে দিন আনে দিন খায়। অভাব-অভিযোগ এদের নিত্যসঙ্গী। তবুও এদের প্রাণ আছে। আছে সারল্যমাখা হাসি আর মনের অনাবিল আনন্দ। দেখতে দেখতে পথের দু-পাশে ভিড় জমে। একসময় গ্রামের ছেলেবুড়ো সবার হাতে হাতে হয় টিকিটের হাতবদল।

দশ বারো বছরের শিবু। রোগা লিকলিকে। বুকের পাঁজর কখানা গোনা যায়। ছুটতে ছুটতে ঘরের দিকে আসে। একটু ছুটেই হাঁপাতে থাকে। উঠোনে দাদুকে দেখতে পায়। চ্যালা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়া বাঁধছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—দাদু ও দাদু, শুনতাছ আমাগো এ্যাইখানে যাত্রা আইসে। থুমি টিক্যাট কাইটবা না?

দাদু কাজ করতে করতে কোঁচর থেকে একটা বিড়ি বার করে বলে—

—যা তরে শিবু, এ্যাকটুখানি আখার থিইক্যায় গরম আঙ্গার আইন্যা দে।

দেখ্‌ত রে লাক্‌ড়ি জ্বলতাছে—নাকি? বিড়িটা ধরামু।

—হ দিমু অনে। কিন্তু আগে কও টিকিট কাইটবা না?

—কাটুম কি দিয়া? ট্যাকা কই? খাওন জোটে না, আবার যাত্রা।

—দাদু, আমি কিস্যু শুনুম না, যাত্রা কিন্তু দ্যাখুমই দ্যাখুন।

—আইচ্ছা আইচ্ছা হইব খ'ন। তরে এক ফাঁক দিয়া ঢুকাইয়া দিমু অনে। এখানে আমার অনেক পুরান ছাত্র রইসে, অসুবিধা হইব না।

গত বছরটা ছিল শিবুদের কাছে খুবই ভয়াবহ। সে বছরই হঠাৎ শিবুর বাবা বাসুদেব সাপের কামড়ে রাতারাতি এ জগতের মায়া ত্যাগ করে। পুত্রশোকে মহাদেব এখনও মুহ্যমান। একমাত্র নাতি শিবুকে বুকে ধরে কোনওমতে দিন গুজরায়। রোজগারি একমাত্র পুত্রেব মৃত্যুতে গোটা পরিবার প্রায় পথে বসে। বৃদ্ধ বাবা মহাদেব, পঙ্গুভাই সহদেব, নাবালক পুত্র শিবু, ছোট দুই কন্যা, গিন্নি সরলা সবাইকে এখন ঘন ঘন অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত থাকতে হয়।

গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে শিবুদের বাড়ি। মাটির বাড়ি। খড়ের চাল। বাঁশের বেড়া। মাটি গোবরে লেপা। মেঝে দাওয়া টান টান করে নিকানো। শান বাঁধানো মেঝেকেও হার মানায়। উঠোনের একপাশে ধানের গোলা যদিও এখন শূন্য। ধানের গোলা গৃহস্থ বাড়ির শোভাবর্ধক। আর একপাশে ছোট ঢেঁকিঘর। মাঝখানে মাটির বেদিতে তুলসীর গাছ। পিছনে গোয়াল, হাঁস, মুরগির খোঁয়ার। যদিও এখন সব অব্যবহৃত। গৃহস্থের সমৃদ্ধির পরিচায়ক মাত্র। সীমানা বাঁশের কঞ্চি আর পাটকাঠি দিয়ে ঘেরা। সদর দরজায় বাঁশের ঝাঁপ। কিছুদিন আগেও খড়ের চালের উপরে তুলে দেওয়া লাউগাছ ভর্তি ফুল ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মহাদেবের মনে পুলক ধরে না। নাতি-নাতনিদের ডেকে ডেকে দেখায় আর বলে—

—এ্যাইবার অনেকগুলা লাউ হইব। দেখছস কত ফুল হইছে? খাওনের পরও কয়েকখান বিক্রি করা যাইব।

হাতটুকু জমিতে গাদাগাদি করে লালশাক, পুঁইশাক, কুমড়োশাক মাথা তুলেছে। সরলা সেদিকে চেয়ে, আদুরে গলায় বলে—

—বুঝলেন বাবা, এ্যাকটু রইয়া সইয়া খাইলে অনেকদিন ধইরা শাক খাওন যাইব। ভাত না জোটে শাক তো জুটব। না খাইয়া তো মরতে হইব না। কি কন বাবা?

—হ বৌমা। হক কতাই কইছ।

একপাশে দুটো পেঁপে গাছ। একটায় আবার পাখিতে ঠোকরানো পাকা পেঁপে। সেটা দেখেই সরলা খ্যানখ্যানে গলায় বলে ওঠে—ও শিবু, বলি চোখের মাতা খাইছস্? সারাদিন পোলাপানের লগে খেললেই হইব? পাকা পাইপ্‌পাটা পাখিতে খাইয়া গেইছে, সেইদিকে খ্যাল্ আছে তর? পাইরা আনদিকি। কাইট্যা

দিই। বড় আছে। হগলে একটুকরা কইরা খাইতে পারব খ'ন।

মাস দুয়েক হল অভাবটা আরও জাঁকিয়ে বসেছে। এখন ফলমূল সবজিরও বড় আকাল। এই মুহূর্তে সরলাই ভাঙা সংসারের হাল ধরেছিল। লোকের বাড়ি বাড়ি ধানসেদ্ধ করে, ঢেঁকি পার দিয়ে, বাগানে সবজির চাষ করে, হাঙরের মতো হাঁ-সংসারের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কপাল মন্দ। সরলাকে কালাজ্বরে ধরে। একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে। বেশ কিছুদিন বিছানায় শয্যাগত। শিবুর দাদুই কোনোমতে একবেলা সেদ্ধভাত চড়ায়। বৃদ্ধ মানুষ। বাতের ব্যথায় কাবু। তার পক্ষে চাষবাস করা অসম্ভব। শিবু যতটা পারে সাহায্য করে। বোনেরা ছোট। এভাবেই এখনও ধিক ধিক করে টিকে আছে। তাই মহাদেবের কাছে যাত্রার টিকিট ! 'আকাশ-কুসুম কল্পনা'!

কিন্তু ক-বছর আগেও মহাদেবের এরকম অবস্থা ছিল না। তখন শিবুর বাবা বাসুদেব ছিল যুবক। মহাদেবের শারীরিক অবস্থাও এরকম ছিল না। পিতাপুত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে টেনে নিয়ে চলছিল সংসার জাহাজ। মহাদেব আচার্য এই গ্রামেরই এক পাঠশালার পণ্ডিত ছিলেন। পাঠশালার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা ছেলে বাসুদেবকে মাঠে চাষবাসে সাহায্য করতেন। আর আজ... ?

রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ফুটফুট করছে চারধার। দাওয়ায় বসে মুড়ি চিবোতে চিবোতে চোখে জল আসে মহাদেবের। অতীত যেন হাঁটি হাঁটি পা পা করে ভিড় করে মহাদেবের চারধারে। দু-চোখের জমি ভিজে উপচে নামে জলের ধারা।

এখন ফুলডুংরির আকাশ বাতাস যাত্রার আলোচনায় মুখরিত। পথে-ঘাটে দুটি মানুষের দেখা হলে, যাত্রার কথা একবার না একবার উঠবেই উঠবে। গ্রাম্যজীবনে যাত্রাই একটু স্বর্গীয় আনন্দ। দুঃখ ভোলার, খিদে ভোলার মহৌষধ। সরল মানুষেরা যাত্রার মেকি দুঃখকে আসল ভেবে নিজেদের সুখী মনে করে।

পয়লা মাঘ, কালীবাড়ির মাঠে ত্রিপল ঘেরা হল। সব্বাই খুব সতর্ক। একটু ফাঁকফোকরও যাতে না থাকে। বাইরে থেকে কোনওভাবে দেখা না যায়। গ্রামের সবাই খুশির মেজাজে ডগমগ। শিবুর মনেও পুলক ধরে না। সকাল থেকে দাদুকে তাড়া দেয়—

—ও দাদু, আইজ সকাল সকাল পাক কর দিকি। রাত্রের পাকও অ্যাইব্যালায় স্যইয়া ফ্যালো।

—আরে দাদুভাই, তুমি যাত্রা দ্যাখতে যাইবা, আমি তো যামু না। তবে আমি পাক করলে তোমার কি?

—না না ওইসব কতা শুনুম না। তোমার আমার লগে যাইতে হইব। আমি কোনও কতা শুনুম না—শুনুম না—শুনুম না।

অগত্যা মহাদেবকে শিবুর সঙ্গে যেত হয়। অ্যালুমিনিয়ামের টোলপরা

বাটিতে কিছু খাবার ফেলেই শিবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাঁটা দেয়। মাঝে মাঝে দাদুকে তাড়া দেয়—

—দেরি হইয়া গ্যালে দাদু, বহনের জায়গা পামু না।

—আরে দাদুভাই; অনেক দেরি আছে। আমি কি তর মতোন লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে পারি?

শীতটা এবার বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। পথে বেরিয়ে মালুম হয় মহাদেবের। কালো ছেঁড়া শালে মাথা থেকে হাঁটু অবধি মোড়া। নিচে খাটো ধুতি। পা দুটো ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে। ধুলোমাখা পা টেনে টেনে চলেছে মহাদেব। আর খালি পায়ে লাফাতে লাফাতে আগে আগে চলেছে শিবু। গায়ে বহু পুরানো ধূসর রং-এর আলোয়ান। পিছনছেঁড়া হাফ প্যান্টের নিচে সরু সরু পা দুটো যেন হাড়কাঁপানো শীতকে অনায়াসে ব্যঙ্গ করে চলেছে।

দূরত্ব অনেকটাই। কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়ায় শিবু। দাদু অনেক পিছনে। বয়সের ভারে চোখেও কম দেখে। শিবু হাঁক পারে—কি হইল দাদু, অত পিছাইয়া পরল্যা ক্যান?

টেনে টেনে মহাদেব বলে—দাদুভাইরে, পথ শ্যাষ হয় না। বাতের ব্যথায় আর তো হাঁটতে পারি না।

—এ্যাকটু খাড়াও দাদু। আমি ধইর‍্যা আনতাছি।

—না দাদুভাই এ্যাকটুখানি বইয়া লই। ঠাণ্ডায় আমার পাও তো জড়াইয়া যাইতেছে। আর না জিরাইয়া হাঁটতে পারুম না।

শিবুর হয়েছে জ্বালা। শিবুর আর তর সয় না। দাদুকে ফেলে একাও যেতে পারে না। গ্রামের অনেকের সঙ্গেই একে একে দেখা হয়। সবাই সাহায্য করতে চায়। কেউ কেউ বলে—

—ওঠেন খুড়া ধইর‍্যা লইয়া যাইতেছি।

—না না, ধরনের কোনও প্রয়োজন নাই। আমি একাই পারুমখ'ন। কিছুক্ষণ জিরাইয়া লই। তোমরা আগাও দেখি।

এভাবেই কিছুক্ষণ বসে, কিছুক্ষণ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বেতো রোগী মহাদেব একসময় কালীবাড়ি মাঠে পৌঁছয়। তখন যাত্রা প্রায় শুরুর মুখে। সবাই যে যার আসনে বসে পড়েছে। গেটের কাছে ভিড়টা খুব বেশিক্ষণ নয়, ছাড়া ছাড়া। পাতলা ত্রিপলের ভিতরটা বাইরে থেকে ছায়াছায়া দেখা যায়। গ্রামের প্রায় সব্বাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। লোকে গিজগিজ করছে। শিবু সেদিকে তাকিয়ে দাদুকে খেকিয়ে ওঠে— তোমার লিগা আমাগো একেবারে পিছনে বইতে হইব! কত কইর‍্যা কইলাম, আরও আগে আইতে, শুনলা না তো আমার কতা, এ্যাখন দ্যাখো কি করবা?

—আরে পোলা, চুপ কর। এ্যাখন্ আর কইয়া কি হইব। আগে তো ঢুকি,

পরে বহনের কতা ভাবুম।

শিবুর চোখ তখন যাত্রার গেটে। আনন্দে নেচে ওঠে শিবুর কচি কলাপাতার মতো নরম মনটা। মনের সব দুঃখ কষ্টকে সেই মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে খুশিতে ডগমগ হয়ে গেট দিয়ে ঢুকতে যায়। বাধা পায় গেটে দাঁড়ানো স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে—এ্যাই ছ্যালে ঢুকতাছস কি করে? টিক্যাট নাই তর? তাড়াতাড়ি মহাদেব এগিয়ে আসে—এ্যাই যে বাবারা ও আমার লগেই আইছে। ওরে ঢুকতে দাও দিকি।

—কই দ্যাখান আপনাদের টিক্যাট। তবে তো ঢুকামু।

—না বাবা, আমাগো টিক্যাট নাই। আমরা দুইজন চাটাইয়ের এক কোণায় বইয়া যাত্রা দ্যাখুম। বেশি জায়গা লাগব না।

—দ্যাখেন দাদু, আমাগো কিছু করণের নাই। টিক্যাট না থাকলে কর্তাদের নির্দ্যাশ আছে কারুকেই ঢোকান যাইব না। শত কাকুতি-মিনতি করেও মহাদেব আর শিবু যাত্রার আসরে বিনা টিকিটে ঢোকার অনুমতি পায় না। তাছাড়া মহাদেবের ভাবনাটায়ও ভুল ছিল। পুরনো ছাত্ররা তো সেখানে ছিলই না বরং মহাদেবের চেনার তুলনায় অচেনাই অনেক বেশি ছিল। কারণ একটাই। এ বছর রজতজয়ন্তী। তাই দু-চারটে গ্রাম নয়, আশেপাশের বেশ কয়েকটা গ্রামের লোকেরা এখানে অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে যতদূর সম্ভব নিয়মের কড়াকড়ি।

কথায় বলে মাঘের শীত বাঘের গায়ে।

মাঘের হাড়কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডায় মহাদেব আর শিবু ত্রিপলের বাইরে। অন্ধকারে মিশে আছে। শীতের মাঠ যেন বড় জবুথবু। অন্ধকার গায়ে মেখে, অন্ধকারের ঘ্রাণ নিতে নিতে মাঠটা যেন বড় ক্লান্ত। একাকী নির্জনে কিছু লাল ধুলোমাটি, নুড়িপাথর, শুকনো ঝোপঝাড়, পাতাঝরা দুচারটে ছড়ানো ছিটানো গাছ নিয়ে শীত গুটিসুটি মেরে আছে।

সেই মাঠের এক কোণে ঠাঁই হয় মহাদেব আর শিবুর। সামনে ত্রিপলঘেরা যাত্রার আসর। পাতলা ত্রিপলের মধ্যে দিয়ে ছায়াছায়া যাত্রানুষ্ঠান দেখা যায়। শিবু সেদিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। মহাদেব শিবুকে কাছে টানে। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে—দুঃখ করস ক্যান দাদু? আগে যদি জানতাম, এ্যাতটা কড়াকড়ি হইব, তাইলে তর লিগা কোনও না কোনও ব্যবস্থা করতাম। শোন দাদুভাই, গরিবের কতার কোনও গুরুত্ব নাই। কি আর করুম ভাই। তবে এক কাম কর। যদি আমার কথা শোনস্, যাত্রা দ্যাখা তর হইব।

শিবু তাড়াতাড়ি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। চোখের জল মুছে দাদুর দিকে তাকায়। দাদু বলে—হ শোন্, তুই ঘুইরা বয়। এ্যাই যে আমার মতোন কইর‍্যা।

শিবু তাড়াতাড়ি মহাদেবের মতো মাঠের দিকে পিঠ দিয়ে যাত্রার দিকে মুখ করে বসে। দাদু বলে—তুই চাইয়া থাক্ যাত্রার দিকে। আমি তরে কি হইতেছে না হইতেছে কইতে থাকুম। আমি তো আগে অনেক দ্যাখছি সব মোটামুটি

অ্যাকই রকম। দ্যাখবি তর যাত্রা দ্যাখ্যা হইয়া যাইব।

—তুমি কিছু বাদ দিবা না তো?

—হ বাদ দিমু ক্যান? তর যেমন কথা। সব কমু তরে।

—তুমি কি কইরা বুঝবা?

—ক্যান্ বুজুম না। ওই তো ভিতরে আলোয় ছাওয়া ছাওয়া সব দ্যাখা যাইতেছে। তুই চুপ কইরা বইয়া থাক। আমাগো যাত্রা দ্যাখা কেটা বন্ধ করতে পারে, দেখুম'খন?

—শ্যাষ অবধি কইবা তো?

—হ হ কমু কমু। যাত্রা যখন শ্যাষ হইব, আমাগো দ্যাখাও তখন শ্যাষ হইব। নে নে চুপ কইরা তাকাইয়া থাক। ওই তো বাজনা শুরু হইল, বাজনা থামলেই এ্যাকটা যুবতী মাইয়্যা নাচতে আইব। দ্যাখ্ দ্যাখ্ তাকা। চক্ষু সরাইস্ না।

—হ দাদু, তুমি সত্য কতা কইছ। ওই তো একটা বড় মাইয়্যা নাচতে নামছে।

—হ শিবু, আমার কথা সত্য হইবই। যা যা ওইখানে হইব, সব তরে কমু।

এরপর যাত্রা শুরু হয়। সামাজিক পালা। দাদু ছায়া দেখে দেখে তাতে নিজের মনের রং মিলিয়ে একের পর এক ঘটনার ব্যাখ্যা করেন। রুদ্ধশ্বাসে গিলতে থাকে শিবু। অপলভাবে দাদুর মুখের দিকে একবার আর একবার যাত্রার দিকে—এই দুদিকে তাকাতে তাকাতেই কখন যেন রাত ভোর হয়। বিহান ফুটে ওঠে। যাত্রার নায়িকার হাঁটু মুড়ে বসে কান্না থেকে শুরু করে নায়কের কাঠগড়ার জবানবন্দি পর্যন্ত সব সব উঠে আসে দাদুর গল্পে।

একসময় যাত্রা শেষ হয়। শেষ হয় শিবুর দেখা কাল্পনিক যাত্রাও। খুশি হয় শিবু। দাদুকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। তৃপ্ত মনে চারধারে তাকায়। সন্ধ্যাবেলার আধপেটা খাবার হজম করে শিবুর পেটে তখন নাড়িভুঁড়িগুলো ডন দিচ্ছে।

একে একে সবাই হুড়মুড় করে গেট দিয়ে বেরোচ্ছে। হাসি মুখে, মিষ্টি হাতে। কেউ কেউ প্যাকেট খুলে মিষ্টি খেতে খেতে, আবার কেউ কেউ দোলাতে দোলাতে বেরোচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে শিবু দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলে—দাদু খুবই ক্ষুধা পাইছে।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয় মহাদেবের বুক থেকে। টেনে টেনে বলে—শিবু, যাত্রার তো ছাওয়া আছে। সেই ছাওয়া দ্যাইখা যাত্রা কওয়া যায়। এমনকি মনও ভরানো যায়। কিন্তু ক্ষুধার তো কোনও ছাওয়া নাই দাদুভাই, যা দিয়া প্যাট ভরানো যায়।

সমব্যথী

প্রশান্তকুমার রায়

এক

কিছুদিন ধরেই দেখা যায়, আসানসোলের গড়াই রোডে প্রায় উলঙ্গ তিনটি ছেলে রাস্তার ধারে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে। পথচারীরা কেউ দয়া করে সামান্য কিছু দেয়। কেউ দেয় না। কারও পরনে একটি ছেঁড়াফাটা প্যান্ট, কারও বা গায়ে শতচ্ছিন্ন তেলচিটে জামা, কারও বা তাও নেই। চুলে কতদিন তেল-সাবান পড়েনি, তা ওরাও বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। শরীরে ময়লার একটা পুরু প্রলেপ থাকার ফলে শরীরের আসল রং বোঝাই যায় না। অদূরে (হয়তো) তাদেরই অসুস্থা মা একটা খাবারের দোকানের সামনে ময়লা, ছেঁড়া কাপড় কোনওরকমে গায়ে জড়িয়ে বসে বসে ভিক্ষে করছে। পুষ্টির অভাবে মনে হয় অকালেই বার্ধক্য এসে গেছে। শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই। অস্থি-চর্ম-সার একটা কাঠামো মাত্র। হাঁটা-চলা করার বিশেষ ক্ষমতাও নেই। খাবারের দোকানের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার কোনওরকমে জোগাড় করে দুপুরবেলা সবাই মিলে পরমানন্দে তাই খায়। রাত্রে ফুটপাতের উপরেই সকলে মিলে কোনওরকমে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকে।

এভাবেই তারা কোনওরকমে বাঁচবার তাগিদেই জোর করে বেঁচে থাকবার একটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যদিও এরা মানুষ, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনাই হোক বা পূর্বজন্মের অভিশাপের ফলেই হোক এদের এখন আর মানুষের পর্যায়ে আনা চলে না। বর্তমান ব্যস্ততার যুগে এদের দেখবারও কেউ নেই, এদের কথা শোনবারও কেউ নেই। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

দুই

আসানসোলের গড়াই রোডের পাশে একটা ছোট রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলে একতলা বাড়ি। সেই বাড়িতে পার্থবাবুর অসুস্থা মা, স্ত্রী ও তাদের একটি বছর বারোর পুত্রসন্তান বাস করে। নিজে কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়ার সুবাদে বেশির ভাগ দিনই কলকাতাতেই থাকে। মাঝেমধ্যে আসানসোলের বাড়িতে এসে মা এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করে আবার নিজের কর্মস্থলে ফিরে যায়।

মোটামুটি এই পরিবার অত্যন্ত সচ্ছল পরিবার। পুত্র অর্ক বাড়ি থেকে পনের

মিনিটের হাঁটাপথে সেন্ট ভিনসেন্ট নামে একটি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। লেখাপড়া ও স্বভাবে মোটামুটি খুবই ভাল, বিশেষ কোনও বন্ধু-বান্ধবও নেই বললেই চলে।

স্কুল আর পড়াশুনা ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে বা টি.ভি.তে কার্টুন দেখেই সময় কাটায়। প্রতিবছর পরীক্ষায় ফলও তার খুবই ভাল হয়। স্কুলের মাস্টার বা আপনজনেরা তাকে খুবই ভালবাসে। প্রথম প্রথম সে রিকষশায় চড়ে স্কুলে যাতায়াত করত, এখন বড় হয়েছে তাই হেঁটেই যায়।

স্কুলে যাতায়াতের পথে রোজই সে ওই ছেলেগুলোকে ও তাদের রোগগ্রস্তা মাকে এভাবে ভিক্ষা করতে দেখে। ফলে তার শিশুমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের কষ্ট অর্কের শিশুমনকে নাড়া দেয়। মনে মনে ভাবে, এরা কত কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছে। খাবারের অভাব, জামাকাপড়ের অভাব, ওদের মায়ের ওইরকম শরীরের অবস্থা, চিকিৎসার কোনও পয়সা নেই; তাও ওরা সকলের এঁটো খাবার খেয়ে, ছেঁড়া কাপড়-জামা পরে কেমন নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাচ্ছে। এত কষ্টের মধ্যেও ওরা কেমন হাসিমুখে আছে।

ওদের জন্য অর্কের মনে বড় কষ্ট হয়। রোজ ভাবে ওদের জন্য যদি নিজে কিছু সাহায্য করতে পারত তাহলে বড় ভাল হতো। কিন্তু তার কাছে তো কিছুই নেই, সে তো খুব ছোট। মায়ের কাছে চাইলে হাজার রকম জিজ্ঞাসা করে কোনওদিন বড়জোর এক টাকা, দু-টাকা দেবে। কিন্তু তাতে তো এদের পেটের জ্বালা মিটবে না। ঈশ্বর মানুষকে কেন যে এত কষ্ট দেয় এ কথাটাই অতটুকু শিশুর মাথায় ঢোকে না। কেউ কত সুখে দিন কাটায়। কেউ কত দুঃখে দিন কাটায়; এটা ভগবানের কি রকম বিচার। এইসব চিন্তা করে অর্কের মনটা মাঝে মাঝে খুবই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিন চারদিন ধরে চিন্তা করে করে অবশেষে এদের কিছুটা সাহায্য করার মত একটা উপায় সে বের করে ফেলল।

স্কুলে যাবার সময়ে রোজই মা অর্ককে রুটি-আলুভাজা অথবা পাউরুটি-কলা-মিষ্টি অথবা কোনো কোনো দিন নগদ টাকাও টিফিনের জন্য দিয়ে দেয়। অর্ক প্রতিদিনই প্রায় সব খাবারটুকুই সেই ভিখারিনী বুড়িটাকে ও ছেলেগুলোকে খাইয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে স্কুলের পথে হাঁটা দিত।

আগে টিফিনের সময় সকল বন্ধুর সাথে একত্রে মিলেমিশে টিফিন খেত কিন্তু আজকাল একা অন্যদিকে বসে যদি একটু খাবার বেঁচে থাকত তাহলে সেটা খেয়ে, জল খেয়ে নিত। নয়ত শুধুই জল খেয়ে ক্লাসে চলে যেত। স্বাভাবিক কারণেই তার পেট ভরত না। ছুটি হলে ঘরে এসেই কোনওরকমে স্নান করে মায়ের কাছে খাবারের জন্য তাগাদা করতে আরম্ভ করে দিত। মা ভাবে হয়তো তার পেট ভরে না তাই পরদিন থেকে একটা রুটি বা পাউরুটি বেশি দিতে

লাগল। কিন্তু তাতেও অর্কের একই অবস্থা। মা খুব চিন্তায় পড়ল, ভাবল ছেলের হয়ত কোনওরকম শারীরিক কিছু গোলমাল হয়েছে। বাবা এলে বাবাকে বলে ডাক্তার দেখানো হল। ডাক্তার ভাল করে ছেলেকে দেখেশুনে তার শারীরিক অবস্থা ঠিকই আছে বলে ছেড়ে দিল।

একদিন অর্ক নিজের কটা পুরানো জামা-প্যান্ট স্কুল ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ওদের দিয়ে দিলো।

একদিন আবার মায়ের কাছে দুটো পুরোনো শাড়ি চাইলে, কি হবে এই কথা জিজ্ঞেস করাতে মাকে সে সত্যি কথাই বলল। মাকে বলল—এক গরিব বুড়িকে দেবে। তার বড় কষ্ট, তার শাড়ি নেই, দেখে মায়া হয়।

মা আর কোনও কথা জিজ্ঞেস না করে দুটো শাড়ি তাকে দিয়ে দিল। সেও শাড়ি দুটো নিয়ে সেই বুড়ি ভিখারিনীকে দিয়ে দিল। বুড়িটা শাড়ি পেয়ে তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল।

এভাবেই সে মায়ের অগোচরে তার পুরোনো জামা-প্যান্ট বা টিফিনের খাবার বা টাকা-পয়সা যা পেত তা দিয়ে ওদের যতটা সম্ভব সাহায্য করতে আরম্ভ করল। তাতেই সে পরম আনন্দ লাভ করে তৃপ্তি পেত। এভাবেই ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই সেই ভিখারিনী ও ছেলেগুলোকে সে কেমন আপন করে নিয়েছিল। ওদের দুঃখে নিজে দুঃখ পেত, ওদের আনন্দে নিজের আনন্দ হত।

একদিন এক বাসনওয়ালা বাড়িতে এলে অর্কের মা পুরোনো জামা-প্যান্ট, পুরোনো শাড়ি-কাপড় দিয়ে বাসন নিতে গেলে অনেক জামা-প্যান্ট ও শাড়ি-কাপড় কম থাকায় অর্ককে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, অর্ক সঠিক কোনও উত্তর না দেওয়াতে মায়ের সন্দেহ অর্কের উপর রয়েই গেল। মা গোপনে কয়েকদিন একটু এধার-ওধার খোঁজখবর নেওয়ার ফলে এবং ওই বুড়ি ভিখারিনী ও ছেলেগুলোর গায়ে নিজেদের জামা-কাপড় দেখে আসল ঘটনাটা জানতে পেরে গেল। এরপর অর্ককে প্রচুর বকাঝকার পর অর্ক সমস্ত ঘটনাটাই মায়ের কাছে প্রকাশ করে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ অর্কের বাবা বাড়ি এলে মা অর্কের বাবাকে সমস্ত ঘটনাই জানাল। এসব শুনে পার্থবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেল কিন্তু অর্ককে কোনরকম বকাঝকা না করে পরদিন সকালে স্কুলে যাবার সময় অর্কের সঙ্গে গিয়ে ওদের দেখে আসবার কথা বলল।

যথারীতি পরদিন সকালে পার্থবাবু অর্ককে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিল এবং সেই ভিখারিনীর কাছে গেলেই ভিখারিনীর ছেলে তিনটে খাবারের লোভে অর্কের কাছে দৌড়ে এল।

পাশের দোকানের লোকজন অর্কের বাবার কাছে অর্কের ভূয়সী প্রশংসা

করতে লাগল। ওরা বলতে লাগল—আমরা এতদিন পর্যন্ত যা করতে পারিনি এইটুকু ছেলেটা তাই করে দেখাচ্ছে। এই ছেলেটার জন্যই ওরা আজ নিজেদের লজ্জা নিবারণ করতে পেরেছে। সকালে একটু ভাল খাবার পাচ্ছে। এরকম ছেলে সমাজে আরও কিছু জন্মালে সমাজের আজ এই অবস্থা হত না। গরিবের দুঃখে যে কাঁদে সেই তো আসল মানুষ। এইটুকু ছেলেটার মানসিক অবস্থা দেখে গর্বে সকলের বুক ভরে যাওয়া উচিত। ধন্য আপনি বাবা। যে এই যুগে এ রকম ছেলের জন্ম দিয়েছেন।

অর্ক বাবার সামনেই নিজের টিফিনের সমস্ত খাবারটাই ওদের দিয়ে ধীরে ধীরে স্কুলের পথে হাঁটা দিল। অর্কের বাবাও কাউকে কিছু না বলে ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পর অর্কের বাবা, মা অর্ককে এ ব্যাপারে আর কোনও কিছু বলল না। পরদিন সকালে স্কুলে যাবার সময় অর্কের বাবা দশটা টাকা, ওদের দেবার জন্য অর্কের হাতে দিয়ে দিল। অর্কও খুশিমনে ওদের ওখানে গিয়ে দেখল ওই ভিখারি ছেলেগুলোর মা একধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে আর ছেলেগুলো পাশে বসে কান্নাকাটি করছে। অর্ক একটু চিন্তিত হয়ে আশেপাশের দোকানগুলোতে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, ওদের মায়ের কাল দুপুর থেকেই অসম্ভব জ্বর হয়েছে। মাঝে মাঝে খুব ভুল বকছে। দোকানদাররা কিছু ওষুধপত্র জোগাড় করে এনে খাইয়েছে, কিন্তু কিছু উন্নতি হয়নি। আজ বেলা হলে সবাই চাঁদা তুলে কিছু টাকা জোগাড় করে একটা ডাক্তার এনে দেখাবে।

অর্ক বাবার দেওয়া দশ টাকা আর নিজের জমানো বাবদ কুড়ি টাকা, এই ত্রিশ টাকা ওদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে খাবারগুলো ছেলেদের খাইয়ে স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিল।

স্কুল থেকে ফেরার পথে খবর নিয়ে জানতে পারল যে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর ফলে ও এখন একটু সুস্থ আছে। এরপর অর্ক নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে রাত্রে বাবা এবং মাকে সব ঘটনাই খুলে বলল। বাবা, মা দুজনেই ওকে সান্ত্বনা দিলে অর্ক খেয়েদেয়ে শুতে গেল।

পরের দুদিন স্কুল ছুটি থাকার ফলে অর্ক আর ওদিকে যেতে পারেনি। একটা দুশ্চিন্তা কিন্তু ওর মনের মধ্যে রয়েই গেল। মাঝেমধ্যেই ভাবতে লাগল —কে জানে ওরা কেমন আছে, ছেলেগুলোর মা ভাল হবে তো। এই চিন্তা করতে করতে দুদিন পার হয়ে গেল।

সোমবার আবার স্কুল যাওয়ার পথে ওদের কাছে গেল কিন্তু ওদের কাউকেই ওখানে দেখতে না পাওয়ার ফলে আশেপাশের দোকানগুলোতে জিজ্ঞাসা

করে জানতে পারল যে এই ছেলেগুলোর মা কাল সকালে মারা গেছে। আশেপাশের লোকজন আসানসোল কর্পোরেশন অফিসে ও সরকারি চিকিৎসালয়ে খবর দেবার পর সেখান থেকে লোকজন এসে একটা গাড়িতে করে ওর মৃতদেহ নিয়ে চলে যায়। ছেলেগুলো পেছনে পেছনে চলে গেল কিন্তু আর ফিরে এল না।

এই কথা শুনে অর্কের দুচোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। দোকানের লোকজন ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। অর্কও স্কুলে না গিয়ে সোজা বাড়ি এসে কিছু না খেয়ে বিছানায় শুয়ে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। ওর মা ব্যাপারটা শুনে ওকে খুব বোঝাতে লাগল।

দিন কয়েক পরে ওর বাবা বাড়ি এসে সব কথা শোনবার পর অর্ককে আদর করে খুব সান্ত্বনা দিল। অর্কের কান্না থামল কিন্তু মনের ভেতরে একটা দুঃখ, একটা বেদনা যেন ওকে কুরে কুরে খেতে লাগল। সে কারও সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাবার্তা বলল না। মনে হল যেন কোনও আপনজনের বিয়োগযন্ত্রণায় কাতর।

এই কয়দিন অর্ক স্কুলে না যাওয়াতে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অভিভাবকের কাছে একটা চিঠি এল প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তারপরের দিন পার্থবাবু অর্ককে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওদের স্কুলে গিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনাই বিস্তারিতভাবে প্রিন্সিপালকে বলে ছেলেকে এবারের মত ক্ষমা করে দেবার জন্য অনুরোধ জানাল। সব কথা শুনে প্রিন্সিপাল অর্ককে বুকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করতে করতে অর্কের বাবাকে বলল—এমন ছেলে মা, বাবা ও স্কুলের গৌরব। একথা আপনারা আগে জানালে আমরা আরও সুযোগ করে দিতাম। এরকম ছেলেকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। ভাল শিক্ষা দিয়ে সমাজের উপকারে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে। ভাল অভিভাবকের ভাল শিক্ষার গুণে ভাল ছেলে তৈরি হয়। আপনারা ছেলেকে ভাল শিক্ষা দিয়েছেন তাই আশা করি আপনাদের ছেলেও ভালই তৈরি হবে।

যাহোক স্কুল কমিটির তরফ থেকে স্কুলের বাৎসরিক উৎসবের সময় একে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করার ব্যবস্থা করে এ ধরনের ছেলেকে এইসব কাজে আরও উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হবে।

এরপর অর্ককে ক্লাসে পাঠিয়ে ছেলের গর্বে গর্বিত বাবা ধীরে ধীরে ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

সন্ন্যাস

দেবপ্রসাদ দাস

এ গল্প সবার জানা। বিশেষত যারা রোজ দূরদর্শনে বসেন, তারা তো অবশ্যই জানবেন। বামা বলছে দিদিকে। আচ্ছা দিদি, তুই তো সাধনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিস। এখন এক পূর্ণাঙ্গ ভৈরবী, তোকে সবাই-ই ভৈরবী মা বলে ডাকে। সম্মান করে। ভয়ও কম করে না! তোর কি একবারও মায়ের কথা মনে পড়ে না? পড়ে। তবে টান এত বেশি যে কাছে যেতে ভয় করে। কখন যে আবার সংসারের আকর্ষণ বোধ জেগে উঠবে, তা তো বলা যায় না। অথচ নিয়ম হচ্ছে একবার ঘর ছাড়া সাধক-সাধিকা হলে ওমুখো আর হতে নেই। মন থেকে ওসব স্মৃতি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়। আমি তাই-ই করতে চাই। তাবলে তুই মাকে ভুলতে পারবি; নাকি পারা যায়? কোথাও কী এমন বিধান দেওয়া আছে? সাধনার কারণে গৃহত্যাগী হলে মায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে নেই! না-না-না। বামাদেব জোরের সঙ্গে এই কথাটা বললেন। পরামর্শ দিলেন দিদিকে। যা, বাড়িতে, 'মা' তোর জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছে। কার কাছে শুনেছে—তুই শিগ্গিরি তারাপীঠে আসবি। তাই ওইরকম আশা করে দিন গুনছেন। তোর উচিত কাজ হবে মায়ের সঙ্গে দেখা করা।

নারে বামা, সেটা সম্ভব নয়।

কেন-কেন-কে-ন-না—? উত্তেজিত হয়ে তৎবৎ অঙ্গ সঞ্চালনা সহ বললেন—কেন সম্ভব নয়। এরকম কোন নিয়ম আছে নাকি—! ভৈরবীবেশে মেয়ে মায়ের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলবে না। এখন মা যদি ছুটে আসে আত্‌লা গ্রাম থেকে, কইরে কালী, তারাপীঠে এসেও মায়ের সঙ্গে দেখা করার মত সময় করে উঠতে পারলি না! কেন রে? আত্‌লা গ্রাম কী তারাপীঠ মায়ের মন্দির থেকে অনেক দূর! এই অবস্থায় তুই কী মাকে সরিয়ে দিতে পারবি? বলবি কি করে!

মা তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা বলতে নেই। আমি যে এখন ভৈরবী হয়েছি। কালী বোধকরি একটু অস্বস্তিতেই পড়েছে।

বামা সাধক হয়েও কালীর এইসব বিচ্ছিন্নতার নিয়মকে মানতে পারছে না বরং বিপরীতে ভয়ঙ্করভাবে বিরোধিতা করে চলেছে।

কালী স্তম্ভিত হল। ভাবতে লাগল তবে এই অবস্থায় তার কী করা উচিত হবে! এইখানেই—প্রচলিত মুখে মুখের নিয়ম মানা হবে. নাকি সাধন-জগতের সঙ্গে সাংসারিক জগতের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত সেই তত্ত্বের অনুসন্ধানে সময় ব্যয় করবে।

আমি একজনকে দেখেছিলাম, কপালে বেশ একটা তিলক। চন্দনের ফোঁটা

বেশ শৈল্পিক আঙ্গিকে আঁকা। অঙ্গে গেরুয়া বসন। মাঝারি দৈর্ঘ্যের, একটু বাঁটুলতার দিকে ঝোঁকা। গাল দুটো একটু ফোলা ফোলা। স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলতে গেলে দাঁতের অগ্রভাগটা কিঞ্চিৎ হলেও দৃশ্য হয়ে পড়ে। পায়ে খরম। হাঁটলে তবলার গাবের শব্দ তালে তালে ওঠানামা করে। যেন কেউ ডানে-বায়ে তবলায় তাল তোলার অভ্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একদিন বসে আছি এক 'চা'-এর দোকানে। দেখলাম ওই প্রথম, আরও একদিন। আরও একদিন। এভাবেই দেখে চলেছি মাসের পর মাস। প্রথম দিন ভাবনায় এক সন্ন্যাসীকে দেখলাম বলে মনে হয়েছিল। যতদিন যায় ওই ভাবনা এতই পুরানো হয়ে গেল যে ওঁবে নিয়ে আর কোনই কৌতূহল রইল না। সন্ন্যাসীর কথা কখনও বা শুনেছি। এ বাড়ির দোরে বা ওই প্রশস্ত মাঠে একাধিকবার ওই জাতীয় মানুষের দেখা পেয়েছি। হঠাৎই চোখে পড়ে গেছে। মনের মধ্যে একটা সমীহ ভাব হয়তো বা দানা বেঁধেছে আমারই মনের অজান্তে। স্বাভাবিক ভাবেই একটা অনাবশ্যক কৌতূহলের সৃষ্টিও হয়ে থাকবে। তাই ওঁদের জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টি হয়তো নিবদ্ধ থাকত, সেও আমার অজ্ঞাতসারে। বাবা, জ্যাঠা বা শিক্ষকের কাছে শোনা—ওঁরা নাকি জীবনের সব লোভকে জয় করেছে। ওরা তাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই ভাবনাটা আমাকে যখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তখনই আমার প্রথম দেখা ওই সন্ন্যাসীর জীবনদর্শন আমার মধ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে দিল। তাই যখনই ঘন ঘন দেখা হত তখনই মনে প্রশ্ন জাগত—এ কেমন সন্ন্যাসী? এর সঙ্গে ঘি মাখন ইত্যাদি স্নেহজাতীয় দ্রব্য বিক্রয়ের একটা সম্পর্ক আছে মনে হয়! সেই সুবাদেই এখানে ওনাকে প্রায় দেখা যায়!

বেশ কিছু বছর পরে—শুনলাম, উনি নাকি সংসার পেতেছেন! একজন বললে—সন্ন্যাসীর শ্বশুরমশায় এখানেই প্রায় আসেন ওই ব্যবসায়িক কারণেই! পরে জেনেছিলাম যা, শুনেছি, সবই সত্য। উনি আসলে সনাতন ধারণায় পরিপুষ্ট সন্ন্যাসী উপাধিধারী ছিলেন। উনি গৃহী সন্ন্যাসী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

সুতরাং সন্ন্যাসী মাত্রই গৃহত্যাগী হবেন এমন কথা সত্য নয়। বিপরীতে বলা যায় যে 'ত্যাগী' কথাটায় শুধুমাত্র গৃহত্যাগ বোঝায় না। এই কথাটার অর্থবিন্যাস আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে আছে, স্থূলে অথবা সূক্ষ্ম ধারণার প্রকাশে। স্বার্থবোধ শূন্যতাকে ত্যাগের সক্রিয় রূপ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

সেটা কী বাস্তব? বোধহীন স্বার্থের অস্তিত্ব কি এই সংসারভূমিতে খুঁজে পাওয়া যায়? অবশ্যই না। আমি খাব। আমি থাকব। আমি বস্ত্র পরিধান করব। আমি সংসারী হব। মা, বাবা, পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব পালন করব। এর জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই কারণে একটা আয়ের ব্যবস্থা করব। স্বাস্থ্যের কারণে আমি চিকিৎসকের পরামর্শ নেব। সুশিক্ষার জন্য আমার সন্তানেরা বিদ্যালয়ে যাবে।

সে ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। এখানেও কিছু অর্থ খরচের প্রয়োজন আছে। লোক-লৌকিকতার জন্যও কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে। সবই সাংসারিক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত উপাদান। এখানে স্বার্থকে কীভাবে ত্যাগ করব?

এই ভাবনার সঙ্গে অন্য এক ভাবনা যুক্ত হলেই আমি স্বার্থের মধ্যেই থেকে অস্বার্থের দলভুক্ত হতে পারি। আমার মত অন্য সংসারীদের মনেও এইসব প্রয়োজনবোধ থাকতেই পারে। সেখানে তাদেরও জীবনে অর্থের প্রয়োজন আছে। এদেরও স্বার্থের পূরণ ঘটুক।

ঘর-সংসারের সবরকম স্বার্থ পূরণের তাগিদ আছে। যথা—সন্ন্যাসী। এরকমটার সন্ধান পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠে। এটার সঙ্গে সংসার ত্যাগ করার কোন আর্থিক, মানসিক বা কোন প্রকার ব্যর্থতার প্ররোচনা থাকে না। দিক্‌বাল বাবু থামে না। আমাকে সংসার, পরিবার, পরিজন বা পরিবেশ প্রতারণা করেই চলেছে। সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে কোন বিচারই পাচ্ছি না, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে কেউই আমার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না, মনের দিক থেকে আমার নিঃসঙ্গতা আমাকে ঘর ছাড়ার প্ররোচনা দিয়ে চলেছে প্রতিটা ক্ষণে—এই অবস্থা আমার কাছে অসহনীয়, তাই মনে হয়, আমাকে আকাশ, খোলা মাঠ ডাকছে, এইরকম মানসিক অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাসের পথ বেছে নিতেই পারে।

এই সময়ে কেউ তান্ত্রিকের আড্ডায় ডাক পেতে পারে। এই এক অবস্থা, কিছু মানুষ হয়তো হঠাৎই গ্রহণ করে ফেলে অস্থির মনে। এদের ক্ষেত্রে সংসারে ফিরে যাওয়ার কোন ডাকই হয়তো আসে না অন্তরলোক হতে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ইচ্ছে থাকলেও লোকনিন্দার ভয়ে আর ঘরে ফিরতে চায় না সংসারত্যাগী মানুষটি।

এই প্রসঙ্গে বামা, কালীর মধ্যেকার কথোপকথনে আবার ফিরে যাই, যেখানে কালী বলছে—'না, আমাদের সংসারের দিকে আর ফিরে তাকাতে নেই—।' 'তাই যদি হবে, তবে তারাপীঠে ফিরে এলি কেন? কিসের টান ছিল?' বামার জবাব। সেখানে কালীর কোন উত্তর নেই। যদিও বা থেকে থাকে কোন কারণে হয়তো বলতে দ্বিধা ছিল। সে কথা যখন অপ্রকাশিত ছিল তখন কিছু অনুমানের কথাই প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসার সুযোগ পেয়ে যায়। যেমন টান যে একেবারে চলে যায় না, সেটাই বোঝার অবকাশ থেকে যায়। একথাটা কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনার গোড়ার কথার সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। যেখানে বিষয় নির্দিষ্ট হয়—সাধকের কি অন্তর থেকে—মা, বাবা, ভাই, বোন ইত্যাদি সংসারের প্রাণী সম্পদের প্রতি আসক্তি একেবারেই থাকে না', এমনকি নিজ সন্তানদের প্রতিও কোনো আগ্রহই থাকে না? তত্ত্ববিদরা এই আত্মগত বন্ধনের কি ব্যাখ্যা দেবেন? কতটাই বা বাস্তবসম্মত হবে তার উত্তরের কাঠামোটা?

সাধারণভাবে বলা যায় যে এর কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর হতে পারে না। এসব উত্তর প্রস্তুতে কতকগুলো 'যদি', 'তাই', 'সুতরাং' প্রভৃতি শব্দকে টেনে আনতে হবে শর্তমূলক বাক্য গঠন করার জন্য। যথা—যদি মানুষটির মন বৈরাগ্যভাবের সৃষ্টি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, তবে উত্তর হতে পারে এইভাবে—হ্যাঁ, পরিবার-পরিজনের মায়া ত্যাগ করতে পারে। কোন এক অচঞ্চল মানসিক অবস্থার দোলাচলের মধ্যে পারে।

আবার নাও হতে পারে, যদি দেখা যায় যে তার ঘরে কোন আর্থিক অনটন নেই। আবার যদি দিয়ে শুরু করি—অর্থজনিত বা অন্য কোন সামাজিক সমস্যাজনিত চাপের দ্বারা অনবরত পৃষ্ট হচ্ছে যে জন, সেও কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে পারে বৈরাগ্যের ভাণ করে।

যে ক্ষেত্রে সুচিন্তিত মন সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে সক্ষম হবে এবং একই সাথে মনের গভীরে কোন মহাভাবের উৎপীড়ন শুরু হবে। সেই অবস্থায় বৈরাগ্য গ্রহণের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে—সেই ব্যক্তি প্রিয়জনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে কোন দ্বিধাই করবে না। তবে এরকম ব্যক্তির সাক্ষাৎকার খুব একটা ঘটে না।

এটাও ঠিক যে কীভাবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে চেনা যাবে? সেরকম কিছু যুক্তির রসায়ন সাধারণের কাছে জানা নেই। বেশভূষা ও কিছু বহিরঙ্গের উপাদান দেখে সন্ন্যাসী কথাটার হয়তো প্রাণের রূপ ঠিক করা যায়। কিন্তু তিনি যে সর্বত্যাগী তা বোঝার উপায় আছে কি? রাস্তা-ঘাটে বা লোকালয়ে গেরুয়াধারী অনেক সন্ন্যাসীকে প্রায়ই দেখা যায়। তবুও কী পরিচ্ছদহীন মানুষের মধ্য থেকে তাঁকে সন্ন্যাসী বলে চিহ্নিত করা যাবে? অনেকে বলবেন—কেন অঙ্গের বিভূতির মার্জন বা চন্দনচর্চিত মানুষ দেখলেই তাঁকে সাধারণ থেকে বিশেষ বলে চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ হবে না। তবে তর্কের খাতিরে কোন লেপন বা চর্চিত অবস্থা থাকবে না, সেই অবস্থায় সাধারণ নাগরিক থেকে বিযুক্তকরণ করার প্রস্তাবকেই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

অর্থাৎ কোন চিহ্নধারণ বহির্ভূত অবস্থায় শুধুমাত্র গুণ প্রকাশের লক্ষণ দেখেই বোঝা যাবে কোন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এই মানুষের ভিড়ে অবস্থান করছে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তবে কোন্ মাহাত্ম্যের শক্তিতে সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী পুরুষের মূর্তিতে ভিড়ের মধ্যে বিশিষ্ট বলে পরিচিত হবেন!

এখানে কেউ বলবেন, ভাল জিনিস চিনতে হলে বাছাইকারীকেও সমভাবের অনুভূতিসম্পন্ন পুরুষ হতে হবে। নতুবা কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছা-অব্যক্ত গুণধারী মানুষকে খুঁজে পাবে না। হয়তো তিনি অতি নিকটেই অবস্থান করছেন। তাঁর একটা দৈবীঘ্রাণ আছে। তবুও নির্যাসগ্রহণে অক্ষম মানুষ সেটাকে ধরতেই পারছে না।

আমার এই আলোচনায় আমরা খুঁজবার চেষ্টা করছি এমন একজন আধ্যাত্মিকজনকে যিনি আমাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবেন, গৃহত্যাগী কোন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী তাঁর পূর্বাশ্রমের মাতা, পিতা, ভাই, বোন, স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেন কিনা? এই গভীর জিজ্ঞাসার উত্তরদানের জন্য আমি সর্বত্যাগী আধুনিকমনস্ক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে যাব।

গুরুভাইয়ের মৃত্যুর খবরে উতলা বিবেকানন্দের চোখে জল দেখে স্তম্ভিত আরেক গুরুভাই জানতে চাইলেন—'স্বামীজি, আপনি না সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী! আপনার চোখে জল!'

'কেন, সন্ন্যাসী বলে কি তাঁর হৃদয়বৃন্তের প্রকাশ থাকতে নেই!' সপাটে এই জবাব দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও এই মায়ার জগৎ থেকে কেউই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তিনি তার মা, ভাইয়েদের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রেখেই সর্বত্যাগের ব্রতপালনে একনিষ্ঠ ছিলেন। আসলে, আপনি সংসারে কীভাবে থাকতে চেয়েছেন, কর্তব্যপালনে নাকি ভোগের টানে? ত্যাগ বাহ্যিক উপাচারে নয়, এটা অন্তরের বিচ্ছিন্নতার একটা আধ্যাত্মিক প্রয়াস মাত্র।

আপনি সবার সঙ্গে আছেন। কিন্তু তবুও আপনার মানসিক ও আত্মিক সত্তা সর্বদাই তাঁরই ধ্যানে নিযুক্ত হয়ে আছে। এটাই একটা বিশিষ্ট প্রকারের নিষ্কাম কর্মযোগ। এর জন্য চাই নিবৃত্তিমূলক সাধনায় সর্বসিদ্ধ মহাসাধককে। এই ধরনের কর্মযোগীরা রাজযোগের প্রতিটি পর্যায় সফলভাবে অতিক্রম করে প্রকৃত অর্থে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হয়ে থাকেন। তাঁদের কাছে অবস্থান দোষ বা গৃহসান্নিধ্যের দোষ, কোন দোষেরই অস্তিত্ব থাকে না। আমি শব্দ গন্ধ স্পর্শ রূপ রস-এর থেকে পালিয়ে বেরিয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছি—একথা বা তত্ত্ব যারা বলে বেড়ান তাঁরা আদৌ ওই নামের দাবিদার হতে পারেন না।

এ কাহিনী সবাই জানেন বলেই বোধহয়—স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মধ্যেই মাংস রান্না করেছেন। ঠাকুর পরমহংসের কাছে এই অভিযোগ এসেছে। কিন্তু অভিযোগকারীরা হতাশ হলেন। রান্না বন্ধ হল না। নরেনের কোন শাস্তিই হল না। বরং ঠাকুর উৎসাহ দিলেন। 'শোন্ মাংস ওকে খেতে পারবে না। ওই উল্টে মাংসকেই হজম করে ফেলবে। ওরে, নরেন নিজেই আগুন। ও সবই দগ্ধ করে দিবে। ওর শরীরে বা মনে কোন দোষই লাগবে না।'

অর্থাৎ এমনই সাধকের তেজ যে যত রকমের পার্থিব মোহ আছে, সব একত্রিত করলেও ওর ঊর্ধ্বলোকের তপস্যা ভঙ্গ করতে পারবে না। উল্টে ওঁর তেজের আগুনে সমস্ত মোহের বস্তু ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এই-ই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সাধনার বৈশিষ্ট্য। ওকে স্পর্শ করলে, ওইস্থানে অবস্থান করলে আমার সাধনার ফল নষ্ট হয়ে যাবে, এই কাপুরুষোচিত ভাবনা তাদের মনে স্থান পায় না।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বাস্তবোচিত ব্যাখ্যা—(৫)

মৃত্যুঞ্জয় সিংহ রায়

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে প্রকৃতির বিশ্লেষণ। প্রকৃতির যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সেই রূপের মধ্যেও যিনি অরূপ হয়ে বিরাজ করেছেন যেটাকে সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না, বা জানতে পারে না। সেই অদেখাকে ও অজানাকে দেখবার ও জানবার জন্যই প্রয়োজন তৃতীয় নেত্র যা একমাত্র যোগ ও ধ্যানজপের মধ্য দিয়েই দেখা বা জানা যায়। এই যোগমার্গে ও ধ্যানমার্গে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁরাই হচ্ছেন যোগী বা ঋষি। আমাদের দেশের যোগী ও ঋষিরা এই আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করে যা কিছু জেনেছেন বা উপলব্ধি করেছেন তা সবই এক একটি রূপক কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই সব পুরনো রূপক কাহিনী যে সব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই পুরাণ। তাই পুরাণ হচ্ছে মুনি-ঋষিদের আধ্যাত্মিক চেতনার জ্ঞানভাণ্ডার। এই শাস্ত্র মানুষকে সৎ ও সত্যের পথ দেখায় এবং অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে যায়। তাই পুরাণ কখনো পুরনো হয় না। ইহা চিরনতুন ও চির উজ্জ্বল।

গীতা হচ্ছে এই রকমই এক যোগোপদেশ ও যোগসন্দেশ। কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ সেটা হচ্ছে যোগশিক্ষার একটা পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে গুরুর কাছে কে কতটা যোগশিক্ষা করেছে তারই পরীক্ষা হয়েছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে। মহাভারতে আছে অর্জুন পুত্র অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ রচনা করে সপ্তরথীতে ঘিরে হত্যা করেছিলেন। সেটা কি রকম? সপ্ত রথীই বা কারা এবং চক্রব্যূহ বা কী?

চক্রব্যূহ হচ্ছে মানব শরীরে বায়ুর গমন ও নির্গমনের পথ। কুম্ভকের দ্বারা প্রাণবায়ুকে সুষুম্ণা নারীর মাধ্যমে সপ্ত চক্রব্যূহ ভেদ করে পরিচালনা করতে পারলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। তখন মানুষই হয়ে ওঠে দেবতাস্বরূপ বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। এই সপ্তচক্রের অধিপতি হচ্ছেন সপ্তরথী যেমন (১) মূলাধার চক্র, (২) স্বাধীষ্ঠান চক্র, (৩) মণিপুর চক্র, (৪) অনাহত চক্র, (৫) বিশুদ্ধ চক্র, (৬) আজ্ঞা চক্র ও (৭) সহস্রা চক্র। এই এক একটি চক্র এক একটি শক্তির অধিকারী। কুম্ভকের দ্বারা সূক্ষ্ম প্রাণবায়ুকে এক একটি চক্রে স্থাপন করতে পারলে মানুষ সেই শক্তির অধিকারী হয়। যেমন আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনীতে শুনেছি বা ছবিতে দেখেছি এক এক রথী এক এক ধরনের বাণ নিক্ষেপ করছেন যেমন অগ্নিবাণ, সর্পবাণ, জলবাণ, বায়ুবাণ, পুষ্পবাণ প্রভৃতি। এই বাণ বা শক্তিগুলি এক একটি চক্রে অবস্থান করে। যেমন মূলাধার চক্রে বা কূলকুণ্ডলিনীকে জাগালে বিষাক্ত বীষ বা সর্পবাণ নির্গত হয়। স্বাধীষ্ঠান চক্রে থাকে জল যেটাকে আমরা

বলি কিডনি। এই জল হতে জলবান সৃষ্টি হয়। মণিপুর চক্র যা নাভিচক্রে থাকে অগ্নি, এই অগ্নি থেকে হয় অগ্নিবাণ। অনাহত চক্রে থাকে বায়ু যেটাকে আমরা বলে থাকি বক্ষ বা ফুসফুস। এখানে সৃষ্টি হয় বায়ুবাণ। এবং বিশুদ্ধ চক্রে থাকে পুষ্প যেটাকে আমরা বলে থাকি কণ্ঠ। এই কণ্ঠ হতেই উঠে আসে বৈদিক মন্ত্র। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় পুষ্পবাণ। আজ্ঞাচক্র হচ্ছে স্বর্গদ্বার বা ত্রিবেণী সঙ্গম। এখানে অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যখানে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ি সুষুম্ণা নাড়ির সহিত মিলিত হয়েছে। সাধকেরা এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে তবে সহস্রাচক্রে বা স্বর্গে পৌঁছতে পারেন। এই ছয়টি চক্রভেদ করে যেমন সহস্রাচক্র যা স্বর্গে পৌঁছাতে যা আরোহণ করতে হয় আবার ঠিক অনুরূপভাবেই সপ্তচক্র ভেদ করে অবরোহণ করতে হয়। সপ্তচক্রে আরোহণ ও অবরোহণ এই দুই পদ্ধতিই গুরুর কাছে শিক্ষা করতে হয়। অভিমন্যু তার গুরুর কাছে আরোহণের শিক্ষাটাই লাভ করেছিল কিন্তু অবরোহণের শিক্ষাটি পায়নি যার ফলে অভিমন্যু সপ্তচক্রে প্রবেশ করে আর বাহির হতে পারেনি এবং এই চক্রব্যূহের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটেছিল। এই জন্যই বলা হয় অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে চক্রব্যূহ রচনা করে হত্যা করেছিল। উচ্চমার্গের সাধকেরা ঠিক এইভাবেই দিনক্ষণ স্থির করে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতেন। অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুকে ষড়চক্রে ভেদ করে সহস্রাচক্রে নিয়ে গিয়ে জ্বালা-যন্ত্রণাহীন এক মহাসমাধিতে সমাধিস্থ হতেন এবং ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হয়ে যেত।

প্রাণ কি?

আমরা অহরহ যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি এই ক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ু। এই প্রাণের আদি সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আদিত্য বা সূর্য অর্থাৎ ইনিই ব্রহ্মা। এই নক্ষত্রটির নাম সূর্য বলে চিহ্নিত করেছেন আমাদের আদিকালের মুনি-ঋষিরা। সূর্য কথাটির ব্যাকরণগত অর্থ যিনি গমন করেন। অতএব সূর্যের একটা গতি অবশ্যই আছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেছেন সূর্য স্থির এর কোন গতি নেই। একমাত্র জড়পদার্থেরই কোন গতি থাকে না। তবে কি বিজ্ঞানীরা বলতে চাইছেন সূর্য একটি জড় পদার্থ। আমার মতে এটা ভ্রান্ত ধারণা। এই ডিম্বাকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু সমস্ত জ্যোতিষ্কই পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে যার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পাক খেতে খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর যেমন একটা গতি আছে সূর্যেরও সেইরূপ একটি গতি আছে। তবে সূর্যের চলার গতি পৃথিবীর থেকে অনেক গুণ বেশি। পৃথিবী যেমন সূর্যের আকর্ষণে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে সেইরূপ সূর্যও একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে কোন এক বিরাট নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে যেটা পৃথিবী ও সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত। তাই আমরা পৃথিবীর মধ্য থেকে দেখতে পাই

সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। যেমন দুটি রেলগাড়ি যদি একই দিকে এবং একই গতিতে যায় তাহলে গাড়িতে বসে আমাদের মনে হয় দুটি গাড়িই যেন স্থির কারুর কোন গতি নেই। কিন্তু একটা গাড়ির যদি গতিবেগ বেশি হয় তাহলে স্বল্পগতিসম্পন্ন গাড়িতে যাঁরা বসে আছেন তাদের মনে হবে দ্রুতগামী গাড়িটাই চলছে স্বল্পগতির গাড়িটি স্থির আছে বা এর কোন গতি নেই। তাই আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যকেই চলতে দেখি, পৃথিবীকে যেন মনে হয় গতিহীন স্থির। আসলে উভয়ের গতি আছে বলেই এমনটি মনে হয়।

গীতার একটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করে বলেছেন— 'আমি অনাদি অনন্ত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখছ তা সবই আমা হতে সৃষ্টি। এইসব সৃষ্টির কোটি কোটি বছর আগে আমার জন্ম তাই 'আমি সর্বময় ও সর্বব্যাপ্ত।' তাহলে এই কৃষ্ণটি কে? এবং এই উক্তির বাস্তবোচিত ব্যাখ্যাটিই বা কি?

কৃষ্ণ কথাটির অর্থ কালি বা মহাশূন্য। আজ হতে আমরা যদি কোটি কোটি বছর পিছনের দিকে তাকাই অর্থাৎ যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ বা জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়নি তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছিল দুটি জিনিস। এক মহাশূন্য আর দুই নিকষ অন্ধকার। এছাড়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ছিল না। তাহলে এই মহাশূন্যতার প্রতীক হচ্ছেন কৃষ্ণ এবং অন্ধকারের প্রতীক হচ্ছেন কালী। তাই আমাদের আদি দেব ও দেবী হচ্ছেন কৃষ্ণ ও কালি। একটি পুরুষ আর একটি প্রকৃতি। এই অন্ধকার ও শূন্যতার মিলনেই সৃষ্টি হল বায়ু ও শব্দব্রহ্ম। শূন্যতা ও বায়ুর মিলনে সৃষ্টি হল উত্তাপ ও গ্যাসীয় পদার্থ অর্থাৎ নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি। বায়ু আর উত্তাপের মিলনে সৃষ্টি হল জল কণা ও মেঘপুঞ্জ। মেঘ হতে বৃষ্টি এবং পৃথিবী হলো জলময়। এইভাবেই মহাশূন্য ও অন্ধকারের মিলনে অর্থাৎ এক অদৃশ্য পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে সৃষ্টি হল মহাবায়ু—মহাগ্নি—মহাসাগর ও মহাদেশ। মহাশূন্যের মাঝে মাটি জলবায়ু ও উত্তাপের প্রভাবে সৃষ্টি হতে লাগল শেওলা যার মধ্যে প্রাণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুকীট সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পঞ্চভূতের আধার এই অণুকীট থেকেই জলজ কীট, উদ্ভিদ কীট থেকে পতঙ্গ, পতঙ্গ থেকে পশুপক্ষী, জলচর ও স্থলচর প্রাণীর সৃষ্টি হতে লাগলো। পৃথিবী হল প্রাণময়। এইভাবেই বিবর্তনের মাধ্যমে চুরাশি লক্ষ প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। এই চুরাশি লক্ষ প্রাণের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সবশেষে এসেছে মানুষ, যাকে বলা হয় সৃষ্টির বা প্রকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট উন্নত জীব। যেভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই প্রাণের সৃষ্টি হয় মাতৃগর্ভ হতে। প্রথমে মাতৃগর্ভ থাকে শূন্য ও অন্ধকারে ভরা। তারপর স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে নারীর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে যায় বায়ু এবং উভয়ের চাপে সৃষ্টি হয় তেজ বা উত্তাপ। বায়ু ও উত্তাপের মিলনে সৃষ্টি হয়

জলকণা ও জল। এই জলেই ভাসতে থাকে পুরুষের শেওলারূপ শুক্রকীট। এই শুক্রকীট দশমাস দশদিন ধরে মাতৃগর্ভে পরিবর্তিত হতে হতে চুরাশি লক্ষ ইতর প্রাণীর পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু। তখন শিশুর মাথাটা থাকে উপর দিকে। দুই হাত ও দুই পা জোড় করে মুদ্রিত নেত্রে এক অন্ধকারময় সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করে। দুই চক্ষু প্রস্ফুটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হতে আলোর মধ্যে আসার জন্য মাতৃ যোনীদ্বারে যে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা যায় সেই দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে আলোর পথ ধরে বেরিয়ে আসতে চায়, তখনই শুরু হয় মায়ের গর্ভযন্ত্রণা। যতক্ষণ না শিশুটি ভূমিষ্ঠ হচ্ছে ততক্ষণই মাকে এই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যেমন কোন একটি বীজকে যদি অন্ধকারে মাটির মধ্যে রাখা হয় তবে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরুলেই সে আলোর দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়, কারণ কোন প্রাণীই অন্ধকারে থাকতে চায় না সে ছোটে আলোর দিকে। আলো হচ্ছে প্রাণের প্রতীক আর অন্ধকার হচ্ছে নিষ্প্রাণতার প্রতীক। তাই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জীবজগৎ হয়ে পড়ে প্রাণময় ও কর্মচঞ্চল আবার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে পড়ে কর্মবিমুখ নিষ্প্রাণ। তাই আজও যোগী ও বৈজ্ঞানিকেরা শব্দযানে চড়ে ছুটে চলেছে নতুন আলোর সন্ধানে। অর্থাৎ পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা জানবার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। তাই তো কবি লিখেছেন—

কে যেন ডাকিছে মোরে,
দূর হতে বহু দূরে—
সেই অচেনা-অজানা আহ্বানে
ছুটে চলেছি সবাই তাহারই সন্ধানে।।
কেহ নাহি জানে—
এ চলার শেষ করে কোনখানে।।

অপর্ণা

বন্দনা পাল

আগে আপনাদের ন্যাপলার গল্প শুনিয়েছি। যার পোশাকি নাম নেপালচন্দ্র মাল। ন্যাপলা পড়ত Co-education স্কুলে। সুতরাং ছেলে মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল, প্রকৃতির নিয়মে স্ত্রী-পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ছেলে-মেয়েরা তাদের কথাবার্তা আদান প্রদান করত। প্রকৃতির নিয়মেই অপর্ণার সঙ্গে ন্যাপলার বন্ধুত্ব হয়। ক্রমে তা আরো গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

অপর্ণা একটি সাধারণ মেয়ে। সেভাবে বলতে গেলে এক অসাধারণ বাড়ির অসাধারণ মেয়ে। কারণ অপর্ণারা আট ভাইবোন। তারা যে পরিবেশে থাকে সেই বাড়িটিও বেশ অসাধারণ। টালির ছাউনি বাড়ি, স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে স্যাতস্যাতে দেওয়াল, নোংরা পরিবেশ। বস্তিবাড়ির হাজার উপসর্গ, যার সবকটি তাদের মধ্যে বর্তমান।

অপর্ণার বাবার পেশা দালালি করা এবং এই পেশার মাধ্যমেই তার অর্থ উপার্জন এবং এই পেশাই তাকে সংসার চালাতে সাহায্য করে। কিন্তু সেই সময় দালালি পেশায় উপার্জন ছিল খুবই কম। তাই তাকে অন্যপন্থা অবলম্বন করে উপার্জন করতে হত। যা ছিল সমাজের কাছে খুব ঘৃণ্য যা রুচিহীন, অসামাজিক। প্রতিদিন আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়ি ঢুকত। তারপর শুরু হত স্ত্রীর সঙ্গে বচসা অশালীন আচরণ। এক সময় নেশার ঘোরে মেয়েদের উপর অত্যাচার শুরু হত। ভয়ে মেয়েরা বাবার উপর কোন কথা বলতে পারত না।

তারা দেখত তাদের মা কি পরিশ্রমটাই না করছে। অন্যের বাড়ি বাসন মেজে, কারো বাড়ি কাপড় কেচে, ঘর মুছে বা গৃহস্থের অন্যান্য কাজের বিনিময়ে খাবার জোগাড় করে সন্তানদের অন্নের ব্যবস্থা করত। বহু কষ্টে অভাবে অনটনে অনাহারে সন্তান-সন্ততিরা গায়ে-গতরে বড় হল বটে তাদের পড়াশোনায় কোন কিনারা বা সুরাহা করে উঠতে পারলেন না। অবশেষে বড় ও মেজ মেয়ে তারা কোনোরকমে বিনা বেতনে সরকারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর গণ্ডি পার করে। বাবা তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি সবাইকে নিয়ে শহরে পাড়ি দিল, শহরে এসে শহরতলির একটি বস্তিতে একটি মাত্র ঘর ভাড়া নিল। যার মধ্যে এতগুলি ছেলেমেয়ে সহ স্বামী-স্ত্রী সকলের স্থান সঙ্কুলান না হলেও তার মধ্যেই থাকতে হত।

ক্রমান্বয়ে সংসারের অভাব বাড়তে শুরু করল। সন্তানদের নিয়ে মা কি করবে ভেবে কোন কূল-কিনারা খুঁজে পেলেন না। অবশেষে বড় দুই মেয়েকে

সঙ্গে নিয়ে লোকের বাড়ি কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। শেষমেশ কাজেরও ব্যবস্থা হল। বড় ও মেজ মেয়ে দুটি দেখতে ভালই। গায়ের রং ফরসা। মুখশ্রী ভালো। স্বাভাবিক উচ্চতার মেয়ে দুটিকে চেহারায় এবং ব্যবহারে ভালই লাগার কথা। কিন্তু স্বভাবে খুব একটা ভাল হয়ে উঠতে পারেনি।

অভাবক্লিষ্ট সংসারে থাকতে থাকতে তারা মনে এবং স্বভাবে সমানভাবে স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল। তাই তাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বাবুর বাড়ি কাজের তুলনায় তার বাড়ির কোনো পুরুষ বা তাদের বয়স্ক কোনো ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়া বা নিজেদের বিশ্বাসের ভীতটা শক্ত করে নেওয়া।

এক একটা দিন যায় তারা একে একে নিজের মণিবের নিজেদের বিশ্বাস-যোগ্যতার প্রমাণ দেয় এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। অল্প দিনের মধ্যে তারা আরো বেশ কিছু বাড়ির কাজ পেয়ে যায়। তার ফলে মা-র কিছুটা শারীরিক ও মানসিকভাবে সাশ্রয় হয় এবং কিছুটা মনে মনে শান্তি পান।

এদিকে বাবা তার দালালির কাজে মনোনিবেশ করে। শহরের যে সমস্ত জায়গায় গেলে তার কাজ চলে, সেই সমস্ত জায়গায় এসে হাজির হয়। দুর্নীতি, প্রলোভন, চিটিংবাজির সামান্য আয়ে আকণ্ঠ মদ খেয়ে, সময়ে-অসময়ে স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। সন্তানদের প্রতি তার দায়বদ্ধতা থাকলেও তা সে পালন করতে অক্ষম। এমনি করেই তাদের দিন চলে যায়। অনাহারক্লীষ্ট জীর্ণ সংসারে স্ত্রী প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকে। তবুও তার বিশ্রাম নেই।

এত কষ্টের মধ্যে দিয়েও ছেলে-মেয়েগুলির পড়ার ব্যবস্থা করে। মনিবের বাড়ির উচ্ছিষ্টে তারা মানুষ। তাই তাদের মনগুলিও সেইমত শক্ত-পোক্ত হয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক তাদের মনিবের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের কাছাকাছি যেমনভাবে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করা। এদের মধ্যে অতি চালাক ও ধুরন্ধর অপর্ণা। সকলের প্রয়োজন ভুলে নিজের প্রয়োজনটা ভালো বোঝে। তাই সে বড়দি মেজদির মত লোকের বাড়ি কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায় না। ভাগ্যক্রমে তার এক বন্ধু জুটে যায় যে তাকে বোঝে বা তার অভাব অনাহারক্লিষ্ট দিনের কথা জানে। তার নাম মিঠু। মিঠু ব্যবসায়ী, ধনী বাড়ির মেয়ে, মিঠুর দেওয়া সাহায্যে অপর্ণা স্কুলজীবন থেকে কলেজজীবন শেষ করে। মিঠু অপর্ণার বইপত্র, স্কুল-কলেজের মাহিনা পোশাক-আশাক সবরকম সাহায্য দিয়ে তাকে সভ্য জীবনে ফেরার উপায় বাতলে দিয়েছে।

অপর্ণার পরিবার বলতে—বাবা, মা, দিদি, তিনটি বোন এবং দুটি ভাই। ভাইবোনেরা বড়ই ছোট। দুই দিদি ও মাকে দেখে তারা বিভিন্ন পুরুষদের বিভিন্নভাবে মনোরঞ্জন করে। সংসারের তাগিদে তারাও নিজেদের এইভাবেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে অপর্ণার বাবা আর একটি বিবাহ করে বসে। বাল্যবিধবার একমাত্র কন্যা। অন্ধের যষ্টি ওই মেয়ে। তাকে বিভিন্ন প্ররোচনায় বিদ্ধ করে। অবশেষে বিবাহ করে। তার বাড়িতেই ঘরজামাই থাকে। কয়েক কাঠা জমির উপর দুইতলা বাড়ি। তলায় ভাড়াটিয়াদের বাস।

ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে মালকিনের দ্বন্দ্ব মিটাবার নামে বিধবার মেয়েটিকে বশ করে। পরে বুড়ি মা-কে বোকা বানিয়ে তার মেয়েটিকে বিবাহ করে। অপর্ণার কানে এই খবর পৌঁছানো মাত্র সে খুব বেগেই ছিল। বাবা মত্ত অবস্থায় বাড়ি ঢুকতেই তাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেয়। কর্তব্যের খাতিরে মা তাকে হাওড়া হাসপাতালে ভর্তি করে।

অপর্ণার বাবা দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে খবর পাঠায়, একটি দুর্ঘটনায় তার পা জখম হয়েছে। তাই সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চিন্তা যেন না করে। স্ত্রীর নাম শান্তি, শান্তি সবে নতুন কঁনে। স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে ভয় হোল এবং পা প্লাস্টার করার পর শান্তি তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে তুলল। শান্তির সেবাযত্নে তিনি সেরে উঠলেন। তারপর আবার শুরু হল তার লড়াই। লোকঠকানো, বুদ্ধু বানানো ইত্যাদি ইত্যাদি যত রকম সব জঘন্যতম কাজ।

ইতিমধ্যে ভাড়াটিয়া উৎখাত হল। বাড়ি, জমি, মেয়ে-জামাইয়ের নামে লিখে দিতে বুড়িমার একটুই দেরি হল না। বাড়ির দখল পেয়েই অপর্ণার বাবা তাদের মানে বাবার পুরো পরিবার নিয়ে ওই বাড়ির একতলায় থাকার ব্যবস্থা করে নিল।

অপর্ণা জানে এইরকম দুশ্চরিত্র বাবার ছত্রছায়ায় থাকা না থাকা দুইই সমান। তাই তার জিদ চাপল তাকে পড়াশোনা করে বড় হতেই হবে। তাই সে নিজের মত করে বড় হতে লাগল। কিন্তু পরিবেশের দোষ যাবে কোথায়, ভাগ্যচক্রে গর্হিত কোন অপরাধে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। অন্য একটি স্কুল থেকে সে মাধ্যমিক পাশ করে। কলেজে ভর্তি হয়। উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্মানিক বিষয়ে পড়াশোনা করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে। তারপরই চাকরি পায় কলেজে।

অধ্যাপনার পাশাপাশি তার বিবাহিত জীবন শুরু হয়। সেটাও নাটকীয় ভাবে। ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন এক অতি বড়লোকের ছেলের সাথে তার আলাপ হয়। পরে প্রেম, তারপর একপ্রকার জোর করেই তাকে বিবাহ করে। পরের বছরই আসে এক পুত্রসন্তান। স্বামী, সন্তান, শ্বশুর, শাশুড়ি নিয়ে তার বেশ ভালই কাটছিল, ইতিমধ্যে তার সঙ্গে পুনরায় দেখা হয় ন্যাপলার। বয়সের ভারে কেউ কাউকে চিনতে না পারলেও পরে পরে কথায় বার্তায় তাদের পুরনো দিনের স্মৃতি গুঞ্জরিত হতে থাকে। ফেলে আসা অতীত আর বর্তমান কোথায় যেন মিলেমিশে পাক থেকে থাকে।

কফিন

সুব্রত বসু

স্টেশনের নাম রাঙামাটি। শহর থেকে অনেক দূরে ছোট স্টেশন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট, এক ঘন্টা অন্তর ট্রেন আসা-যাওয়া করে। স্টেশনের পূর্বদিকে রিকশাস্ট্যাণ্ড আছে। সেখানে চার-পাঁচটা রিকশা সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে। প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাবার জন্য। আর আছে দুটো চায়ের দোকান। সকাল থেকে সন্ধে সাতটা-আটটা পর্যন্ত চা, বিস্কুট, পান-বিড়ি সিগারেট বিক্রি হয়। চায়েব দোকান দুটোর পাশ দিয়ে একটা পিচের চওড়া বড় রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার দুধারে শুধু ধানের ক্ষেত। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটা পথে মাইলখানেক গেলে যে গ্রাম পড়বে তারই নাম রাঙামাটি। প্রায় দুশো ঘর বাড়ি নিয়ে কিছু গরিব মানুষ এই রাঙামাটি গ্রামে বহু বছর ধরে বসবাস করছে।

এই গ্রামের কিছু বাড়িতে তাঁতের কাপড় বোনা হয়। সেই কাপড় হাটে-বাজারে, শহরে নিয়ে যায় বিক্রি করতে। আবার কিছু মানুষ সকাল হলে জাল, খ্যাপলা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুকুর-খাল-বিল-নদী থেকে মাছ ধরতে। সেই মাছ বাজারে কিংবা এখান থেকে শহরে নিয়ে যায় বেচতে। আবার কেউ রিকশা, ভ্যান রিকশা চালিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। রাস্তার ধারে টালির চাল দেওয়া দরমার বাড়িটার সাথে লাগোয়া ছোট টিনের গুমটির দোকান ঘরটার ভিতরে যে লোকটা জিনিস-পত্র বিক্রি করছে তার নাম ইসলাম মণ্ডল। বছর চারেক হল ইসলামের বৌ মারা গেছে কলেরায়। একটি মাত্র ছেলে আকবর। তার বিয়ে দিয়েছে ইসলাম। আকবর সি.আর.পি.এফ-এ কাজ করে। এখন পোস্টিং দান্তেওয়ারায়। জায়গাটা কোথায় তার হদিশ জানে না ইসলাম। তবে যারা খবরের কাগজ পড়তে জানে তারা বলে খুব সাংঘাতিক জায়গা। বন—বন—আর বন, আর নকশালদের ঘাঁটি শুনে কেঁপে ওঠে ইসলাম। কেবলই আল্লার নাম জপে।

বিঘেখানেক চাষের জমি বেচে সেই টাকায় ইসলাম, মেয়ে রুকমানার সাদি দিয়েছে পাশের গ্রামের একটা ছেলের সাথে। ছেলেটা চাষবাস করেই সংসার চালায়। তবে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে সংসার চালানো দায়। তবু গরিব মানুষরা নিরুপায়।

এখন দুপুরবেলা। ইসলামের ছেলের বৌ শামিনা পুকুর থেকে চান করে ভিজে কাপড়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে ইসলামকে উদ্দেশ করে বলে উঠল· –'আব্বাজান বেলা অনেক হয়িচে এবার দোকান বন্ধ করি চান সেরি আসেন আমি ভাত বারতেচি'। ছেলের বৌয়ের কথা শোনা মাত্রই ইসলাম দোকানের সামনে রাখা লজেন্স আর বিস্কুটের কাচের বয়ামগুলো একটা একটা করে দোকানের ভিতরে গুছিয়ে রেখে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ির ভিতর চলে এল। তারপর বারান্দায় রাখা গামছাটা নিজের কাঁধের উপর ফেলে,

হাতের তালুতে কিছুটা সরষের তেল শিশি থেকে ঢেলে নিয়ে মাথায় মাখতে মাখতে পুকুরে চলে গেল স্নান করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুকুর থেকে স্নান করে এসে ইসলাম বারান্দায় দড়িতে টাঙানো লুঙিটা নিয়ে পরতে পরতে নিজের ছেলের বৌকে উদ্দেশ করে বলে উঠল 'ও শামিনা খেতি দাও।' শামিনা মাথায় ঘোমটাটা হাত দিয়ে টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা আসন বারান্দায় পেতে, একগ্লাস জল দিয়ে বলল 'খেতি বসেন।' ইসলাম বারান্দায় পাতা আসনটাতে গিয়ে বসল। রান্নাঘর থেকে থালায় করে ভাত, বেগুন ভাজা, বাটিতে ডাল, চুনো মাছের ঝোল, পুঁইশাকের তরকারি ইসলামের সামনে দিয়ে শামিনা বলতে থাকেন 'প্রায় তিন তিনটে মাস হয়ে গেলো আপনার ছাওয়াল এট্টাও চিঠি পাটায়নে। কেমন আচে আল্লাই ঝানে।' ডালের বাটিটা পাতের পরে ঢেলে ভাত দিয়ে মেখে বাটি থেকে একটা বেগুন ভাজা তুলে খেতে খেতে ইসলাম বলে উঠল 'তুমি এতো ভেব না দিন, একদিন সব শান্ত হয়ি যাবে, আকবর মাতা উঁচু করে গেরামে ফিরি আসপে। যাও ঘবে গিয়ে দাদু ভাইকে খেতি দাও।'

ইসলামের কথা শুনে শামিনা বলে উঠল 'আপনার দাদু ভাইরে অনেকক্ষণ হল খাওয়ানো হয়ে গেছে সে এখুন ঘুমুচ্চে।' মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে বাটি থেকে মাছ তুলে নিয়ে খেতে থাকে ইসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল তার। তারপর বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে রাখা জলের বালতি থেকে জল নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে, বারান্দায় একটা চৌকি পাতা ছিল, গামছায় মুখ মুছে সেই চৌকিটাতে একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল ইসলাম। শুয়ে শুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে থাকল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের সূর্যটা অস্তাচলে। ঠিক সেই সময় ডাকপিয়ন এসে হাজির হল। ইসলামের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে পিয়ন বলে উঠল—'ইসলাম চা-চা ও ইসলাম চা-চা! ইসলাম বারান্দায় ঘুমোচ্ছিল। পিয়নের গলার আওয়াজ শুনে উঠে পড়ে বলে উঠল—'কি মুবারক চিঠি আচে বুঝি' বলেই ইসলাম একটু জোরেব সঙ্গে বলে উঠল—'ও শামিনা চিঠি এইচে আস।' ইসলামের ছেলের বৌ শামিনা ঘরের ভিতরে ছিল। ইসলামের ডাক শুনে নিজের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এবার ইসলাম বলে উঠল—'ও মুবারক ওই তো শামিনা এইচে এবার চিঠির খামটা ছিঁড়ি চিঠিটা পড়ি শোনাও।' অন্যান্য বারের মতো এটা চিঠি না, টেলিগ্রাম। মুবারক টেলিগ্রামটা ছিঁড়ে খবরটা মনে মনে পড়ে চমকে ওঠে। ইসলামের তর সয় না, বলে—'কি হলো মুবারক শোনাও কি নিকেচে ছাওয়ালডা।' মুবারক বাধ্য হয়ে বলে—'ইসলাম চা-চা মনটারে শক্ত কর।' মুবারকের কথা শুনে ইসলামের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। দুরু দুরু বুকে বলে ওঠে—'কেন চিঠিতে কি খবর এইছে? মুবারক বলো।' মুবারককে এবার বলতেই হয়—'তোমার ছেলে আকবর ব্লাস্টিং-এ মারা গেছে এই চিঠিতে তাই

লেখা আছে।' মুবারক যে কথা বলল তার সবটা না বুঝলেও মারা গেছে শোনামাত্র ইসলাম চিৎকার করে বলে উঠল—'না, না, আমার ছাওয়াল মরতে পারে না-না-না! শামিনা খবরটা শোনা মাত্রই হাউ-হাউ করে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বারান্দায় মেঝেতে আছড়ে পড়ে। আশপাশের বাড়ির লোকজনরা কান্নার আওয়াজ শুনে ইসলামের বাড়িতে ছুটে এল। পাশের গ্রামে ইসলামের মেয়ে-জামাই থাকে। পাড়ার লোকেরা সেখানে খবর দিয়ে তাদেরও ডেকে আনল।

এরপর দেখতে দেখতে দিন চার-পাঁচ কেটে গেল। ইসলামের ছেলে আকবরের মৃত্যুসংবাদটা রাঙামাটি গ্রামে ছড়িয়ে যাওয়াতে গ্রামটা কেমন শোকাচ্ছন্ন হয়ে আছে। একদিন দুপুরবেলায় মাথার চুলগুলো এলোমেলো, গালভরতি কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে, খালি গায়ে লুঙি পরা অবস্থায় ইসলাম নিজের বাড়ির বারান্দায় বসেছিল। এমন সময় একটা মিলিটারি গাড়ি এসে ইসলামের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল একজন মিলিটারি পোশাক পরা অফিসার। অফিসারটা ইসলামের বাড়িব মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো—'এটা ইসলাম মণ্ডলের বাড়ি ?' ইসলাম মিলিটারি অফিসারের কথার উত্তরে ভয়ে ভয়ে বলে উঠল—'এজ্ঞে আমি ইসলাম মণ্ডল।' মিলিটারি অফিসারটা এবার বলে উঠল—'আপনার ছেলে শহিদ হইয়াছে। ডেডবডিটা আমরা কফিনে করে আনিয়াছি, আপনাদের দেখিয়ে গোরস্থানে কবর দিতে চাই।' বলেই মিলিটারি অফিসারটা যেখানে মিলিটারি গাড়িটা দাঁড়ানো ছিল সেইদিকে তাকিয়ে হিন্দি ভাষায় বলে উঠল—'এহাঁ পর কফিন লে আও।' মিলিটারি গাড়ির মধ্যে জনা আট মিলিটারি সোলজার বসেছিল। তারা অফিসারের নির্দেশ শোনামাত্রই গাড়ি থেকে নেমে কাঁধে করে কফিনটা নিয়ে মার্চ করতে করতে ইসলামের বাড়ির উঠোনে এনে কফিনটা রেখে স্যালুট করে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিলিটারি গাড়ি আর মিলিটারিদের দেখে গ্রামের মানুষজন সব ছুটে এসেছিল। ঘর থেকে ইসলামের মেয়ে জামাই, আর ছেলের বৌ কাঁদতে কাঁদতে এসে বাড়ির উঠোনে দাঁড়াল। ইসলামের বাড়িভর্তি লোকে লোকারণ্য। উঠোনে দাঁড়িয়ে মিলিটারি অফিসারটা একটা ফাইল থেকে একটা কাগজ বের করে পড়তে লাগলো!

'আদেশনামা! দেশমাতৃকার যুদ্ধে আকবর মণ্ডল প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার মরদেহ এই কফিনে বন্দি রহিয়াছে। এই কফিন কবর দেওয়া হইয়া গেলে তাহার পরিবার এককালীন অনুদান বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা পাইবে। তার স্ত্রী আজীবন ভরণ-পোষণ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা প্রতি মাসে মাসোহারা পাইবে। আব তার পরিবারের একজন লোক সরকারি চাকরি পাইবে। যদি কেহ এই কফিনের তালা ভাঙিয়া কফিন খুলিয়া ফেলে তাহা হইলে সরকারি আদেশ অনুসারে সমস্ত রকম অনুদান বন্ধ হইয়া যাইবে এবং দণ্ডনীয় অপবাধ হইবে।'

মিলিটারি অফিসারের কথা শেষ হওয়া মাত্রই ইসলাম আগের মতো চিৎকার করে বলে ওঠে—'আমার ছাওয়াল আকবর মরে নাই সে ফিবি আসবেই তার জন্যিই তো আমি বেঁচে আচি।' ইসলামের মেয়ে জামাই উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল।

তারা মিলিটারি অফিসারের কাছে এসে বলল—'আপনি ওনার কথায় কিছু মনি করবেন না, ওনার ছেলেটা মরি যাওয়ার খপর শোনার পর থেকে মাতাটা খারাপ হয়ে গেচে।' অফিসারটা ইসলামের জামাইকে বলল—'ঠিক আছে। গোরস্থানটা কোথায় আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।' বলেই সোলজারদের নির্দেশ দিলেন কফিনটা উঠোন থেকে তুলে নিয়ে গাড়িতে তোলার। অফিসারের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই মিলিটারি সোলজাররা কফিনটাকে কাঁধে করে মার্চ করতে করতে কফিনটা গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে নিজেরাও গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো। ইসলামের জামাই সালেম এবার অফিসারকে বলল—'এই গ্রামটা পেইরে গেলি একটা খামার পরবে। খামারের পাশেই গোরস্থান।' অফিসার সালেমকে সাথে করে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিটারি গাড়িটা হু হু করে গোরস্থানের দিকে ছুটে চলল।

এই ঘটনার তিনদিন পর এক দুপুরবেলায় ইসলাম ঘর থেকে শাবল আর কোদালটা নিয়ে হঠাৎ বাড়ি থেকে উত্তেজিত হয়ে গোবরস্থানের দিকে বেরিয়ে পড়ল। ইসলামকে বাড়ি ফিরিয়ে আমার জন্য তার মেয়ে রুকমানা আর তার জামাই সালেম পাড়ার লোকজন নিয়ে ইসলামের পিছু পিছু চলল।

নিজেদের গ্রাম আর খামারটা পেরিয়ে ইসলাম গোরস্থানের কাছে পৌঁছাল। গোরস্থানে এসে একটু ঘোরাঘুরি করতেই সে একজন বয়স্ক লোককে দেখতে পেল, তার কাছে গিয়ে ইসলাম জিজ্ঞাসা করল—'আজ থিকি দিন তিনেক আগে একেনে কি কোনও কবর দিয়ে গেচে মিলিটারিরা?' লোকটা ইসলামকে একটা কবর দেখিয়ে বলল—'ওই যে বেদিটা দেকতিচেন ওটার নিচে একটা কবর দিয়ে গেচে।' ইসলাম বয়স্ক লোকটার কথা শোনা মাত্রই তাড়াতাড়ি সেই বেদিটার কাছে গিয়ে শাবল দিয়ে ঘা মেরে মেবে বেদিটা ভেঙে ফেললো। তারপর ইটগুলো তুলে ফেলে কোদাল দিয়ে মাটি তুলে তুলে কবর থেকে কফিনটা জোরের সাথে টেনে তুলে আনল। পাড়ার লোকজন, ইসলামের মেয়ে জামাই সবাই ততক্ষণে এসে হাজির হল গোরস্থানে। ইসলাম এবার খুব জোরে কফিনের তালাটাতে শাবল দিয়ে ঘা মারতেই তালাটা ভেঙে গেল। লোকজনেরা সবাই হৈ হৈ করে উঠল। ইসলাম এবার দুহাত দিয়ে কফিনের ডালাটা খুলে ফেলে দিতেই সবাই অবাক হয়ে দেখতে পেল কফিনটার ভেতরে আম গাছের শুকনো পাতা শুদ্ধ মোটা একটা ডাল। অট্টহাসি হাসতে হাসতে ইসলাম বলে উঠলো—'সব মিথ্যি সব ধুঁকা। আমার ছেলি আকবর মরিচে না বেঁচি আচে তার কুনও খবর নাই অথচ লাখ লাখ টাকা আর চাকরির নোব দেইকে যে তাকে মরা বলি ঘোষণা করি দে গেলো মুকপুড়ার দল। এ কী আজব খেল দেশের সেবকদের নে—এ কেমন জালিয়াতি !' এরপর চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ইসলাম বলে উঠল— 'না, না সে বাঁচি আচে। সে একদিন ফিরি আসবেই। আমি যে তার ফিরি আসার পিতিক্ষায় আচি—থাকপো।'

বিকেলের পথ

মনোজিৎ কুইতি

বিকেল গড়িয়ে পড়েছে। বাড়ি ফিরব বলে গাড়ি ধরার জন্য হেঁটে চলেছি। স্ট্যান্ডে প্রচণ্ড ভিড়। অফিস-আদালত সব ছুটি হয়ে গেছে; ফলে রাস্তা-ঘাটও বেশ জনবহুল। হঠাৎ পেছন হতে কে যেন ডেকে উঠল, কিরণপ্রকাশদা, ও কিরণপ্রকাশদা। পিছন ফিরে দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে ঠিক চেনা পরিচিত কাউকেই দেখতে পেলাম না। পুনরায় চলা শুরু করব এমন সময় আবার ডাক। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, দেখলাম এক বিবাহিত মেয়ে আমায় হাত তুলে তার উপস্থিতি জানাল। একটু ভাল করে লক্ষ করলাম, চিনতে কোন অসুবিধা হল না। কলেজ জীবনের এক সহপাঠিনি। নাম সোমা, ইতিমধ্যে হেঁটে আমার কাছে চলে এসেছে। আমি বললাম, তুমি। তাহলে চিনতে পেরেছ দেখছি। কেন তুমি কি ভেবেছিলে যে চিনতে পারব না বুঝি? কতদিন কত আপন হয়ে একসঙ্গে কাটালাম, রঙিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে কত মূল্যবান সময় হারিয়ে ফেললাম। সেই মহিলাকে চিনতে পারব না। ওসব কথা বাদ দাও, বলো কোথায় গিয়েছিলে? এই মঞ্জুশ্রীতে এসেছিলাম, এক ভদ্রলোকের কাছে কিছু তথ্য সংগ্রহ করব বলে, তা তুমি এদিকে? এখানেই আমার কর্মস্থল, চল কিরণপ্রকাশদা, ওই মিষ্টির দোকানে বসে মিষ্টি খেয়ে ফিরব। কিন্তু আমার দেরি হয়ে যাবে। কেন বৌদি বুঝি বকবে? বৌদি? মানে, ও বুঝেছি। আমি বললাম, শুনেছি তোমার স্বামী, বেশ বড় অফিসার। তোমার ছেলে-মেয়ে কয়টি? সোমা উত্তর দিল, একটি মেয়ে। জিজ্ঞাসা করল, কিরণপ্রকাশদা তোমার ছেলে-মেয়ে কয়টি? কথাগুলো শুনে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন এক ব্যথা উপলব্ধি হল। অজান্তে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বললাম, বিয়েই হল না, তার উপর ছেলে-মেয়ে। সত্যিই তুমি বিয়ে করোনি? কেন বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি বিয়ে করলে না কেন? এত বয়স হয়ে এল, তবুও তুমি বিয়ে করলে না! আমি বললাম, কি করে করব? বিয়ের ইচ্ছা থাকলেও আর বিয়ে হয়না, মেয়েদের পছন্দের ব্যাপার আছে। এইতো, তুমিও জলজ্যান্ত উদাহরণ। দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক, তুমি বেকার বলে আমায় বিয়ে করতে চাইলে না, এড়িয়ে গেছো, বিয়ের খবরটাও পর্যন্ত দিলে না। দেখা করতে চাইলে তুমি দেখাই করলে না। সেদিনের সে দিনগুলো কিভাবে আমার কেটেছে তা তো কখনো ভেবে দেখোনি। অপর মেয়েরাই বা আমায় বিয়ে করতে চাইবে কেন বলো? সোমা চুপ করে যায়। বলল, তুমি এখন কি করছ? আমি বললাম, সাংবাদিকতার কাজ করছি। একটু বসবে না? না, সোমা, আমায় ফিরতে হবে।

রাতে গিয়ে খবরের কাগজের ম্যাটার সব রেডি করতে হবে। সোমা বলল, এত ভিড় বাসে উঠবে কি করে? আমি ঝুলে ঠিক চলে যাব। চলো তবে, আমি তোমার সাথে চলে যাব।

স্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, একটু পরে একটি বাস এল। সোমাকে ভিড় বাসের মধ্যে তুলে দিয়ে, আমি গেট ধরে ঝুলে যেতে লাগলাম, বাসের দুই দরজাই খোলা। যাত্রীরা যেন বাদুড়ঝোলার মত হয়ে চলেছে। সোমা আমার কাঁধের ব্যাগটি নিয়ে ভালভাবে ঝুলে যেতে সাহায্য করল। গাড়ি চলেছে, প্রচণ্ড ভিড়, একটু ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। যদিও বাসটি ভিড় ছিল বটে তবে ভেতরে তুলনামূলক যথেষ্ট ফাঁকা ছিল। সকলে সহযোগিতা করলে হয়ত কোন যাত্রীকে ঝুলতে হত না। উপায় নেই আমার মত আরো অনেকে ঝুলে রয়েছে। কোনভাবে হাত ফসকে গেলে রক্ষে নেই, একেবারে চাকার তলায়। প্রত্যেকদিনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ায় তেমন কিছু মনে হয় না। গাড়ি ছুটে চলেছে, এক একটা স্টপেজ আসছে, গাড়ি দাঁড়াচ্ছে, একজন দুজন করে নামলেও উঠছে অনেক বেশি। তবুও স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা সকল যাত্রী উঠতে পারছে না। কিছু সময় পরে একটি স্টপেজে দুটি মেয়ে হাত দেখাতে গাড়িটি দাঁড়িয়ে পড়ে। মেয়ে দুটো ভিড় বাসে খুব একটা কষ্ট না করে উঠে পড়ল। দরজায় ভিড় করা যাত্রীরাও তাদের ভিতরে যাওয়ার সুযোগ করে দিল। গাড়ি চলেছে, মনে মনে ভাবছি, বাসের দরজায় ঠিকমত দাঁড়াতে পারছি না, অথচ মেয়ে দুটো অতি সহজে বাসের ভিতরে চলে গেল। তবু আনন্দের কথা, আমাদের দেশের মানুষেরা মেয়েদের মর্যাদা দেয়। বাস চলেছে, বাসের ভিতর কেমন যেন গুঞ্জন হতে থাকে। একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর কানে এল, দাদা একটু সরে দাঁড়ান, ওভাবে গায়ে পড়ে যাবেন না। উত্তরে ভদ্রলোক বলল, কি আর করা যাবে, ভিড় বাস, আমি চেষ্টা করছি। পাশের মানুষের চাপ, আটকানো যাচ্ছে না। আপনি একটু এগিয়ে যান। বলে ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে দাঁড়ালেন। তারপর চুপচাপ, কিছুক্ষণ পরে সম্ভবত সেই দুজন মেয়ের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভদ্রভাবে দাঁড়াতে পারেন না। বাড়িতে তো মা বোনেরা আছে। পাশের ভদ্রমহিলা বলে উঠল, গালে এক চড় লাগিয়ে দে না। যে ভদ্রলোকের উদ্দেশে মহিলাটি এই কথাগুলি বলছিল, সেই ভদ্রলোক দমবার লোক নয়, বলল, স্পেশাল গাড়ি ভাড়া করে যাবেন ভিড় বাসে যাবেন, আর গায়ে গা লাগলে চিৎকার করবেন। আজেবাজে কথা বলবেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। একসময় উভয়ের তর্ক বেশ চরমে উঠে যায়। শুনতে পেলাম আরো কয়েকজন মেয়ে, ভদ্রলোকটিকে তিরস্কার করছে। সেই সঙ্গে সোমারও কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গাড়ি ছুটে চলেছে, ভিতরে কিছুই দেখা যায় না। কান, মন, ভিতরে রয়েছে। গাড়ি যত এগিয়ে চলেছে, যাত্রীদের ভিড়ও কমতে থাকে। কিছুটা হালকা হয়েছে বলে মনে হল। হঠাৎ

একটি আর্তনাদের সুর, হায় আমার ব্যাগ কেটে সমস্ত টাকা নিয়ে নিয়েছে। এক মেয়েরও কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হায় আমার গলার হার নিয়ে নিয়েছে। যাত্রীরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু কে নিয়েছে কে বলবে। কণ্ডাক্টার বলল, এর আগের স্টপেজে একসঙ্গে পাঁচটি ছেলে নেমে গিয়েছে, ওরা আসলে দাগী পকেটমার। সম্ভবত ওরাই এ কাজটি করেছে। গুঞ্জনের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মূল্যবান জিনিস আছে কিনা চুপি চুপি দেখে নিতে থাকে। একসময় বাস ফাঁকা হয়ে যায়। আমি উঠে সোমার কাছ থেকে ব্যাগটি নিয়ে দাঁড়ালাম। পুনরায় কথা শুরু। সোমা বলল, দেখো কিরণপ্রকাশদা, বাসে যাতায়াত করা বড় কঠিন। বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের, তাদের কোন শালীনতা বলে কিছুই থাকে না। ভিড়ের অজুহাতে, ব্রেককষার অজুহাতে যে যার মতলব মত সুযোগ নিতে থাকে। এ প্রত্যেক দিনের ঘটনা। প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো মেয়ে এইভাবে নির্যাতীত হতে থাকে। মেয়েরা অসহায়ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। যারা পারে না, তাদের সঙ্গে ঝগড়া, মারধর পর্যন্ত হয়ে যায়। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, আর কিছু বলতে পারলাম না। সোমাই বলে যেতে লাগল, এখন দেখা যাচ্ছে সরকারের আইন করে, হয় শুধু মেয়েদের জন্য স্পেশাল বাসনামানো উচিত অথবা প্রত্যেক বাসের মধ্যে ঘিরে একদিকে মেয়েদের আর অপরদিকে ছেলেদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা উচিত। নচেৎ যত দিন যাবে মেয়েরা আরো লাঞ্ছিত হবে। আমি বললাম, মেয়েরা কোথায় লাঞ্ছিত হচ্ছেনা। ঘরে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি আত্মীয়স্বজন দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। অফিস-আদালতে বসের-দ্বারা, বাসে-ট্রেনে যাত্রীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। সোমা অবাক হয়ে বলল, তুমিও একথা বলছ? কেন, যা সত্য তাই বললাম। কেন তুমি বুঝি কোন মেয়ে দ্বারা প্রতারিত বা লাঞ্ছিত হও না? ফলে মেয়েদের উপর তোমার কোন রাগ বা ঘৃণার উদ্বেগ হয় না? অন্তত সব মেয়ের ক্ষেত্রে না হলেও একজনের প্রতি হওয়া উচিত। কথাগুলো শুনে আমার হাসি পেল। মনের মধ্যে পুরনো কথা আবার যেন নতুন করে আমায় দগ্ধ করল। সমস্ত কিছু চেপে বললাম, কেন, রাগ হবে কেন? সে তো ঠিকই করেছে। আমার প্রতি সে তার নিরাপত্তাহীনতাবোধ করেছে, ভাল সুযোগ পেয়েছে সে তাই চলে গেছে, তাতে কি যায় আসে। হয়ত আমার কষ্ট হয়েছে। কিন্তু সে তো সুখী হয়েছে। অবচেতনভাবে সোমার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তুমি ঠিক বলেছ, সত্যিই এতদিন তোমায় চিনতে পারিনি, তুমি মহান। আমার নামবার সময় হল, আসি। বাড়িতে এসো, বলে নেমে যায় আমায় বিদায় জানিয়ে। উদাসভাবে চেয়ে আছি, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। মনের মধ্যে কে যেন বলল, দুর্বল হয়ো না। অনেক পথ বাকি। তুমি যে কিরণপ্রকাশ। তখনও আমি তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে আছি।

উত্তরণ

বিজনবিহারী দলুই

১

হরিহর আজ বেশ খোশমেজাজে আছে। তার কারণ সে এখন বেশ চাপমুক্ত। সে আজ স্থির করে নিয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই আত্মহত্যা করবে। তাই আর কোন বিষয়েই কোন চিন্তা নেই। সে এখন মন খুলে গান গাইছে। শুনে তো স্ত্রীর বিষম লাগার জো। কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না প্রভাবতী। এমনিতে সে দাপুটে মহিলা। গম্ভীর হয়ে বললে, থামাও তো তোমার চেঁচামেচি। ভাল লাগে না ওসব।

কিছুদিন আগে হলে এই ধমক খেয়ে হরিহর নিশ্চয়ই থেমে যেত। কিন্তু এখন সে ভয়হীন। প্রভাবতীকে আর সে ভয় করবে কেন। সে দৃঢ়ভাবে বললে—

—বাড়ি যখন আমার তখন আমার ইচ্ছেমতন আমি থাকব, আমি হাসব, কাঁদব, গান করব, ইচ্ছে হলে নাচতেও পারি।

—তা তুমি পার, তোমার মাথাটা যে বিগড়েছে তা বুঝতে আর বাকি নেই। এই বয়সে কারো প্রেমেটেমে পড়োনিতো?

—প্রভা তুমি সারাজীবন আমায় উপহাসই করে গেলে। আমায় বোঝার চেষ্টা কোনদিন করলে না।

—তোমায় আর বুঝিনি, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। বুঝেছি বলেই সংসারের হালটা নিজের হাতে রেখেছি। কাল তো মাইনে হয়েছে। টাকা তো এখনও হাতে দিলে না।

—না প্রভা না, আর নয়। মাইনের টাকা এবার থেকে আমার হাতেই থাকবে।

—তোমার হাতে থাকবে মানে? তুমি টাকা নিয়ে করবে কি? প্রতিদিন সকালে তোমার অফিস যাওয়ার খরচ তো তোমার হাতে দিই।

—তা দাও, ভিক্ষে দেওয়ার মত দাও। তা আর হচ্ছে না।

—আমার খরচখরচার জন্যে কি তোমার কাছে হাত পাততে হবে।

—তোমায় আর খরচ করতে হবে না। অনেক সভাসমিতি করেছ। অনেক দেশসেবা হয়েছে। এবার ঘরে থেকে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সেবা কর।

প্রভা স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভাবতে লাগল হঠাৎ কি এমন ঘটল যে মানুষটা রাতারাতি বদলে গেল। কাল পর্যন্ত আমার কথায় মিঁউমিঁউ করত আর আজ বাঘের মত গর্জন করছে।

হরিহর সত্যিই আজ নতুন মানুষ। সে ভাবছে আত্মহত্যা যখন করতেই হবে তখন ভয় করে আর বাঁচব কেন? শনি রবি ছুটির পর আজ অফিস। সকালে উঠেই হরিহর হুকুম করে বললে, প্রভা, চা-টায় একটু আদা দিও, গাটা একটু ম্যাজম্যাজ করছে।

—সেটা সরলার মাকে বল। আমায় বলে কি হবে।

—সরলার মা আর আসবে না। আজ থেকে তুমিই সরলার মা, তুমিই সরমা মাসি। চারজনের সংসার তার আবার রান্নার লোক, ঝাড়ুর লোক, মোছার লোক!

—তার মানে? আমি রান্না করব। আমি ওসব পারব না।

—না পারলে উপোস। তোমায় আর রেঁধে খাওয়াতে পারব না। হ্যাঁ অসুখ বিসুখ হয় সে আলাদা কথা।

এমন জানলে আমার বাবা-মা নিশ্চয়ই তোমার হাতে আমায় দিতেন না।

—বিয়ের ত্রিশ বছর পরে ওসব কথা তুলে আর লাভ নেই প্রভা। আর বিয়ের আগে আমিও কি জানতুম আমাকে তোমার দাসত্ব করতে হবে।

—শোন, ওই সব কথা বোল না। তোমাকে দিয়ে মোটেই দাসত্ব করাইনি। মানছি আমি একটু কঠিন প্রকৃতির। থাক সে সব কথা। তুমি যদি এরকম কর, আমি সুজনের কাছে কলকাতা চলে যাই।

—তা যেতে পার। তবে তাতেও শান্তি আছে বলে মনে হয় না। দেখ ছেলের কাছে গিয়ে আশি কিলো দেহটাকে একশোয় নিয়ে যাওয়া যায় কি।

—আবার আমার ওজন নিয়ে কথা বলছ। একটু মোটা বলেই না তোমায় বিয়ে করেছি।

—অনেক হয়েছে। এবার থাম। রান্নাঘরে যাও। আর আমাকে যদি রান্নাঘরে যেতে হয় তবে তোমারটা বাদ দিয়েই রান্না হবে। তোমার সঙ্গে ফালতু বকার আর সময় নেই। অফিস বেরুতে হবে।

প্রভার হাঁ ছোট থেকে ক্রমশ বড় হতে থাকে।

২

হরিহর অনেক দুঃখে এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রী পার্টি আর প্রোগ্রাম করে বেরিয়েছে। নাচের প্রোগ্রাম। প্রভা যে খারাপ নাচত তা নয়, কিন্তু এসব সাধারণ ঘরে বিয়ের পর আর মানায় না। নাচের জন্যে প্রভাকে এখানে ওখানে যেতে হয়। কোথাও কোথাও রাত কাটিয়েও আসতো। তার পুরুষবন্ধুর সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রথম প্রথম হরিহর কিছুই মনে করত না।

কিন্তু সবকিছুর একটা লিমিট আছে। প্রোগ্রাম করতে একবার দীঘা গেল। পুরো একমাস কাটিয়ে এল। সেদিন থেকেই শুরু হল ঝঞ্ঝাট। সবচেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট বাঁধল একমাস পরে। প্রভা অন্তঃসত্ত্বা হল। প্রভা তখনই মা হতে চায় না। হরিহর, শ্বশুর-শাশুড়ি অনেক বোঝাল। অনেক তর্কবিতর্ক, অবশেষে প্রভা মা হল। মা হলে কি হবে। মাতৃত্ব ভাবটাই ওর মধ্যে নেই। এভাবেই চলছে। শাশুড়িই সব কিছু করে। সুজনও বড় হচ্ছে। বুঝেশুনে হরিহর ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করল। সুজন লেখা পড়ায় ভালো। ছোট্ট সুজন বড় হল। এম.বি.এ. পাশ করে চাকরিও পেল।

হঠাৎ একদিন এসে বললে বাবা কাল আমার বিয়ের পার্টি। তোমরা এসো।

—বিয়ের পার্টি মানে। বিয়ে কবে করলি? আকাশ থেকে পড়ল হরিহর।

—দিন দশেক আগে।

—বিয়ে করলি, একবার বাবা, মা দাদু-ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসাও করলি না।

—জিজ্ঞাসা করার আর কি আছে, তা ছাড়া রুনার মা চায়নি গ্রামের কোন লোক বিয়ের অনুষ্ঠানে থাকে।

—বাঃ বাঃ রুনার মার কথাই বড় হল, একবার নিজের বাবা-মার কথা মনে পড়ল না।

—মনে ঠিকই পড়ে। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎটাও তো দেখতে হবে। নিউ টাউনে একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে। একটা গাড়ি দিয়েছে।

—আমাদের ছাড়াই যখন বিয়েটা করলি বিয়ের পার্টিটাও আমাদের ছাড়া কর। পাশ থেকে প্রভা বললে,

—বারে ছেলেটা অতদূর থেকে বলতে এসেছে আর আমরা যাব না।

আগ বাড়িয়ে কথা বলাটা প্রভার বরাবরের অভ্যাস। বিরক্ত হয়ে হরিহর বলল,

—তোমার যদি যাবার ইচ্ছে হয় যাও, আমি যাব না।

প্রভা চলে গেল ছেলের সাথে বিয়ের পার্টিতে। ফিরে এসে পার্টির ভিডিও সি.ডি. দিয়ে বলল, দেখ ছেলের বউকে কি সুন্দর দেখতে। সত্যি সুন্দর। তবে প্যান্ট আর টপ পরে নাচানাচিটা হরিহরের মোটেই পছন্দ হয়নি। টিভির সামনে থেকে উঠে গিয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

সেই থেকে ছেলের প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হরিহর। ছেলেও মাঝে মধ্যে ফোনে খোঁজখবর নিত। এখন তাও আর নেয় না। নাতি-নাতনি কি হল তাও জানে

না হরিহর। একমাত্র ছেলে সেও বাবা-মার খোঁজ নেয় না। ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখের কোণে জল আসে। শয্যাশায়ী বাবা-মা আর স্ত্রীকে নিয়ে হরিহর ভেবেছিল শান্তিতেই কাটাবে। মানুষ যা চায় তা কি আর হয়। প্রভার বয়েস বাড়ছে কিন্তু তার স্বভাবটা এখনও আগের মতই থেকে গেছে। এখনও শ্বশুর-শাশুড়িকে আপন করে নিতে পারেনি। এই নিয়ে হরিহরের সঙ্গে প্রতিদিনের ঝগড়া। আর তাই তার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত। আত্মহত্যা সে করবেই। দিন স্থির করার শুধু অপেক্ষা।

৩

সোমবার অফিস গিয়েই হরিহরের মাথা গরম হয়ে গেল। বিধানসভা নির্বাচনে তার ডিউটি এসেছে। যতসব উটকো ঝামেলা। তবে মারামারি আর বোমা পড়ার ভয় আর নেই। মৃত্যুর ভয় আর তার নেই। সে আত্মহত্যা করবে এটা তো ঠিক করেই ফেলেছে। তবে কবে করবে এবং কিভাবে করবে সেটা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। প্রভার কথা চিন্তা করার কিছুই নেই। কারণ ও একাই একশো। শুধু বাবা-মা।

নির্বাচনের আগের দিন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হল সদলবলে। হরিহর প্রিসাইডিং অফিসার। যে স্কুলে ভোটকেন্দ্রটি সেটি বেশ বড়। আশেপাশে ছোট ছোট কারখানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দূরে কয়েকটি ইট-ভাটার চিমনি দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতা দেখা করে গেল। রাত্রের খাবারের ব্যবস্থাও করে দিল।

তাদের মধ্যে একটি দলের বক্তব্য তাদের ছাপ্পা ভোট মারতে দিতে হবে। তারা নাকি এখানে একচেটিয়া। তারা এভাবেই ভোট দিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। না হলে ফল যে ভালো হবে না সেটাও আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল। সন্ধ্যার পর কয়েকটা বোমও পড়ল আশেপাশে।

হরিহর ভাবল এই সুযোগ। কারুর কথা শুনব না। আমি আমার নিয়ম অনুযায়ী চলব। তাতে যদি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় ভালোই হয়। আত্মহত্যার পাপ আর করতে হয় না। আর বুড়ো বাবা-মা, ওদের ঠিক চলে যাবে। সবার তো আর সন্তান থাকে না। আবার অনেকের থেকেও থাকে না। যেমন আমার। মরলে ছেলে কি আর মুখাগ্নি করতে আসবে। হরিহরের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল।

পরের দিন ঠিক সাতটায় ভোট শুরু হল। ভোটারের সংখ্যা বারশো। প্রতিবারেই হাজারের বেশি ভোট পড়ে। ওর মধ্যে ছাপ্পা ভোটটাই বেশি।

এবার আর তা হবার নয়। হরিহর একটাও ছাপ্পা ভোট দিতে দিলে তো। অনেক হুঙ্কার এল—বাড়ি ফিরতে পারবেন না। বউছেলের মুখ আর দেখতে

পাবেন না। হরিহর এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও মুচকি হাসল। এমনিতেই ছেলের মুখ দেখা হয় না। আর বউ, তার মুখ না দেখলেও জীবনের গতি থেমে যাবে না। দু-একটা আধলা ইট জানালায় এসে পড়ল। তাতেও হরিহর দমবার পাত্র নয়। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়ল না।

ভোট শেষ হল। যারা ভোটার হবার পর থেকে একবারও ভোট দিতে পারেনি তারাও এবার মহা আনন্দে ভোট দিয়ে গেল। মৃত্যুভয় না থাকলে একটা মানুষ যে কি করতে পারে তা হরিহরকে না দেখলে বোঝা যেত না—

যারা ভোট দিল তাদের মধ্যে অনেকেই ভোট দেবার অধিকার থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিল। তাদের অনেকেই চারিদিকে এই খুশির খবরটা প্রচার করল। খবরটা পৌঁছে গেল সংবাদমাধ্যমের কাছেও। একটি সংবাদ মাধ্যম তার সাক্ষাৎকার বারবার দেখাতে লাগল দূরদর্শনের পর্দায়। সেই সাক্ষাৎকার প্রভা যেমন গ্রামের ঘরে বসে দেখল তেমনই সুজন শহরের ফ্ল্যাটে বসে দেখল। প্রভা শুধু ভাবতে লাগল নিরীহ মানুষটা এত সাহসী হল কেমন করে।

৪

হরিহর বাড়ি ফিরছে। পথে পাড়ার একটা ছেলে বলল,

—কাকু, দাদু, ঠাকুমার শরীরটা বড্ড খারাপ। আমরা ক্লাব থেকে কয়েকজন গিয়েছি এখুনি হসপিটালে নিয়ে গেলে ভাল হয়।

—বলছ কি? তোমরা আমার সঙ্গে একটু এসো তো দেখি।

হরিহর বাড়ি গিয়ে দেখল, বাবা-মা দুজনেরই অবস্থা ভীষণ খারাপ। নাড়ি আর যেন চলতে চাইছে না। হারান ডাক্তার দেখে বললে, হসপিটালে দেওয়াই ভালো হবে। আমি খুব একটা ভালো বুঝছি না।

পাড়ার ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। হরিহর যাদেরকে বখাটে ছেলে ভেবে এতদিন এড়িয়ে চলত, তাদের আন্তরিকতা, তাদের সেবায় অবাক হয়ে গেল। তিমির, মিহির সারা রাত হসপিটালের বাইরে হরিহরের সঙ্গে অপেক্ষা করল আর হসপিটালের ভিতরে থাকল সুখেনের মা।

বহু চেষ্টা করেও শেষরক্ষা হল না। হরিহরের বাবা-মা পাঁচ মিনিট ছাড়াছাড়ি মারা গেলেন। এরকমটি খুব একটা দেখা যায় না। মহা ধুমধাম করে গ্রামের শ্মশানে দাহ করা হল। সুজনকে ফোনে খবর দেওয়া হয়েছিল। তার সময় হয়নি। হরিহরের তাতে একটুও রাগ হয়নি। কারণ পাড়ার কিছু ছেলেকে সে এখন চিনতে পেরেছে যাদেরকে নিজের ছেলের স্থানে বসাতেই পারে।

এবার পুজোয় হরিহর আর বাইরে বের হয়নি। ঘরে বসেই টিভিতে প্রতিমা দর্শন করে। প্রভা শহরে, ছেলের কাছে। সুজনের হাউজিংয়েও বড়

পুজো। বড় মণ্ডপ হয়। যদি একটু সুজনকে দেখা যায়। তার সেই ছোট্ট সুজনের কথা মনে পড়ে। কোলে করে গ্রামের পুজো দেখাতে নিয়ে যেত। একটা বেলুন কিনে দিলে কি আনন্দ। দু-চোখের কোণে জল চিকচিক করে। টিভির পর্দায় ওই যে দেশপ্রিয় আবাসনের প্রতিমা। ওদের পূজাকমিটি সভাপতির বক্তব্য। হ্যাঁ—ওই তো সুজন। পাশে দাঁড়িয়ে রুণা। কিন্তু প্রভা কোথায়, তারও তো ওখানে থাকার কথা। এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দ।

—কে?

—আমি প্রভা।

—তুমি, তুমি চলে এলে?

—হ্যাঁ, চলে এলুম, ওখানে মাটির প্রতিমা নিয়ে সুজন ব্যস্ত। আমায় দেখার তার সময় কোথায়। তাছাড়া নিজের ছেলের বাড়ি ঝি-এর কাজ করতে পারব না।

—সে কি কথা। ওর তো বাড়িতে ঝি-চাকর আছে।

—তা আছে, তোমার বৌমা তাদের দেখতে পায় না। যা কিছু ফরমাশ সব আমাকে।

—সুজন কিছু বলে না।

—সে বাড়ি থাকে কতক্ষণ।

এর মধ্যে হঠাৎ লোডশেডিং। চারিধার অন্ধকার। ক্লাবের কাছে ভীষণ চেঁচামেচি। হরিহর প্রভাকে বললে,

—শোন একটু দেখে আসি।

—সেকি কথা। তুমি যাবে ক্লাবে।

—না-না ক্লাবে নয়। শুধু দেখে আসি কোনও গণ্ডগোল হল কিনা।

হরিহর ক্লাবে গিয়ে দেখল, কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছে। গোবিন্দবাবুর কাছে দুশো টাকা চাওয়া হয়েছে তিনি সেটি দিতে রাজি নয়। আর এরাও দুশো টাকা না পেলে ছাড়বে না। চারদিক থেকে নানা রকম কথা। কেউ বলে—

—টাকায় ঘুণ ধরবে। কেউ বলে,

—অত টাকা কে ভোগ করবে?

হরিহরকে দেখে ক্লাবের ছেলেরা একটু থেমে গেল। গোবিন্দবাবু এগিয়ে এসে বলল, দেখেছেন, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার। জোর করে চাঁদা চাইছে। একটা বে-আইনি কাজ।

হরিহর মৃদু হেসে বলল, মশাই, আপনার তো একটাই ছেলে। থাকে ব্যাঙ্গালোর। আর কোনদিন আসবে বলে মনে হয় না। বিপদে-আপদে এরাই

কিন্তু ছেলের দায়িত্ব পালন করবে।

—তা বলে আমার থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করবে। তা কিছুতেই হবে না।

—আরে মশাই আপনাকে আর চাঁদা দিতে হবে না।

ছেলেগুলো তো হরিহরের কথা শুনে অবাক,

—আরে, কাকু একি বলছেন? এইভাবে চাঁদা ছেড়ে দিলে পুজো হবে কি করে?

—সে নিয়ে চিন্তা কোরো না, এবছর ঠাকুরের দামটা তো দেবই, প্রতি বছর ঠাকুর নিয়ে তোমাদের আর চিন্তা করতে হবে না।

ছেলেগুলোর মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ওদিকে গোবিন্দবাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে,

—মিহির, দুশো টাকায় কি আর হয়? আজকালকার বাজার যা পড়েছে। পকেট থেকে চারটে পাঁচশো টাকার নোট বের করে দিয়ে বললে, এটা রাখো। বড়ো ধুমধাম করে পুজো কর।

৫

পল্লীসমাজ ক্লাবটা শুধু আর একটা ক্লাব নেই। সেটা এখন একটা এন. জি. ও.-র অফিসও। হরিহর অবসরের পর ক্লাবের ছেলেগুলোকে সুপথে চালিত করেছে। তারা এখন কেবল রাঙামাটি গ্রাম নয়, আশেপাশের সমস্ত গ্রামের দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। অনুন্নত মানুষের ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে।

কয়েক বছর পর পল্লীসমাজের শাখা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সব মানুষের মধ্যেই একটা সুন্দর সহানুভূতিশীল সুপ্ত মনের অবস্থান আছে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সেটাকে প্রকাশ পেতে দেয় না। একটু অনুকূল পরিবেশ পেলেই মানুষের সুকোমল প্রবৃত্তিগুলো প্রকাশ পায়।

প্রভা আজ আর আগের মত কঠোর হৃদয়হীন নারী নয়। সে আজ স্নেহময়ী মা। তারই তত্ত্বাবধানে চলছে পল্লীসমাজের মহাযজ্ঞ।

সুজন শহরের কংক্রিটে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে গ্রামের সবুজে ফিরে এল। তার কোম্পানি তাকে অনেক টাকা দিয়েও ধরে রাখতে পারেনি। শ্বশুর-শাশুড়ি বহুদিন আগেই মারা গিয়াছে, আর রুণা, তার অবস্থা বড়ই করুণ। এডস্ হওয়ার-ই কথা। লাগামহীন জীবনের পরিণতি অন্ধকারের ধাক্কা খাওয়া। আর সেই অন্ধকারের সঙ্গী কেউ নেই। শুধু একা।

সুজনের পাঁচ বছরের ছেলেটা কি সুন্দর। নামটাও কি সুন্দর, অমৃত।

হরিহর আর প্রভা এখন পল্লীসমাজের দায়িত্ব সুজনকেই দিয়েছে। সঙ্গে আছে গোবিন্দ আর পল্লীসমাজের অসংখ্য সদস্য।

অমৃত দাদু-ঠাকুমার কাছে মানুষ হচ্ছে।

সুজনের শহরের শ্বশুরবাড়িটা এখন পল্লীসমাজের হেড অফিস। হরিহর ভাবে ভাগ্যিস ভেবে ছিলুম আত্মহত্যা করব। অমৃতের হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, গ্রামের স্কুলে। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর এসে উঁকি দেয়। পাখিগুলো গান গায়। অমৃত দাদুর হাত ছাড়িয়ে এক ছুটে জবাগাছটার নীচে ফুল পাড়তে চায়, হাত পায় না। হরিহর পেড়ে দেয়। সেই ফুল হাতে নিয়ে অমৃত স্কুলের দরজা পার হয়। হরিহর হাত নাড়ে। দেখে পাশে দাঁড়িয়ে প্রভাও হাত নাড়ে। আনন্দে কখন দুফোঁটা চোখের জল গ্রামের মাটি ভিজিয়ে দিল দুজনের কেউই বুঝতে পারল না।

সূর্য ছুঁয়ে কান্না

শিখা রায়

১

আমি সুকান্তা। আমায় আপনারা চেনেন না, আমি এক সাধারণ মেয়ে। আমার বয়স সবে আঠারো, কিন্তু এর মধ্যেই পাক ধরেছে চুলে, চোখের কোণে পড়েছে কালি। জানেন আগে আমি এরকম ছিল না। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলেও একেবারে কৃপণতাও দেখাননি। কিন্তু যেদিন বাবা কারখানা থেকে ছাঁটাই হল সেদিন থেকেই আমার শ্রীর ক্ষয় হতে শুরু করল। মার দিন কাটে বাড়ি বাড়ি বাসন মাজা আর ঘর মুছে। ছোট দুটো ভাই-বোন আর বাবা-মার সংসারে আমি এখন একমাত্র নির্ভরতা। দিদিমণিরা বললেন পুষ্টির অভাব, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করো। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া? দুবেলা ভাতই জোটে না। ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু তাতেও পাঁচদিনের বাজারই হয় না। আমার মেদহীন শরীরে মেদ আরও কমতে লাগল। আঠারো বছর বয়সের রামধনুর রংগুলো থেকে একটা একটা করে রং যখন মিলিয়ে যেতে লাগল, ঠিক তখনই তাকে দেখলাম। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে বসে থাকা এক সৌম্যকে। লম্বা, ফর্সা, কোঁকড়ানো চুল। রোজ পড়াতে যাবার সময় একজোড়া জরিপ করা চোখ আমায় বিদ্ধ করতে লাগল। বিস্ময়, রাগ, বিরক্তির মিশ্র অনুভূতিতে আমি বিভ্রান্ত হতে লাগলাম। তারপর কখন যে আমার রাগ আর বিরক্তির রং পাল্টে গেল টেরই পেলাম না। হৃদয়ের মধ্যে ভ্রমরের গুঞ্জন শুনতে পেলাম। ভুলে গেলাম দারিদ্র্যের ছাপে অকালে বুড়িয়ে যাওয়া আমার চেহারাটাকে। আমি তলিয়ে গেলাম। হারিয়ে যাওয়া রামধনুর রংগুলো একে একে ফিরে আসতে লাগল। একদিন হলাম তার মুখোমুখি, সে আমাকে তার ভালবাসার কথা জানাল। তার আবেগভরা দৃষ্টি আমার মধ্যে এক বিশ্বাসের জন্ম দিল। আমি ভেসে গেলাম তার প্রেমের বন্যায়। হাতে আসতে লাগল ফল মিষ্টি টাকা। আমি সুন্দর হলাম। পূর্ণ হল আমার নারী শরীর। একদিন জানলাম খুব শীঘ্র আমি ওর ঘরণি হব। চলে যাব মুম্বাই শহরে। সেখানে এক ভালবাসার গালিচায় মোড়া এক ছোট্ট বাসা থাকবে। স্বপ্ন দেখতে লাগলাম শাঁখা সিঁদুরের, অবশেষে আমার স্বপ্নের দিন শেষ হল। উঠে বসলাম মুম্বাইগামী এক ট্রেনে। সে তার প্রতিশ্রুতি রাখল রাতের চাঁদকে সাক্ষী রেখে। আমার হৃদয়ে ঘুমিয়ে থাকা রঙিন প্রজাপতিরা তাদের রঙিন ডানাগুলো মেলে ধরল।

২

আমি মিস লায়লা। মুম্বাই শহরে আমাকে অনেকে চেনে, আমি আজ অসাধারণ মেয়ে। এক নামকরা পল্লীর সুন্দর এক ফ্ল্যাটে আমি থাকি। আজ আমার অনেক টাকা। দামি শাড়ি আর গয়নাতে আজ আমি 'মোহিনী'। আমার ফ্ল্যাটের সামনে অনেক দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে আসে যায়। কিন্তু আসে না সে। আমার মজনু, যে আমাকে এই ঝলমলে আকাশের তারা করে দিয়ে গেছে, যে আমাকে অনেক পুরুষের মক্ষীরাণি করে সোনার শিকল পরিয়ে দিয়ে গেছে। আমার বিনিময়ে সে অনেক সুখ আর বৈভব কিনে নিয়ে ফিরে গেছে তার বাড়ি, তার আপনজনের কাছে। হয়ত আবার অন্য কোথাও মিথ্যে প্রেমের জাল বিছিয়ে বসে আছে কোন চায়ের দোকানে। যখন সন্ধ্যাবেলায় আমার চারপাশে সূর্যের গনগনে আগুনের ছটা ছড়ায় ঠিক তখনই আমার চিদাকাশে জমতে থাকা মেঘ গুমোট বাঁধে। দিনের বেলায় সেই মেঘ কান্নার বৃষ্টি ঝরিয়ে আমার শরীরকে ভিজিয়ে দেয়। আমার কান্না আমার একমাত্র সঙ্গী হয়ে আমাকে সান্ত্বনা দেয়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে, আমি সুকান্তাকে ডাকি, 'সুকান্তা আমায় ফিরিয়ে নাও। সুকান্তা আমায় গ্রহণ করে না। ছুটে ধরতে যাই ওকে। পায়ের শিকলের টানে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। আমার ঘুম ভেঙে যায়। শিকল পরা পায়ে আমি আবার উঠে দাঁড়াই। সারাক্ষণ কতকগুলো শব্দ আমার চারপাশে ঘুরতে থাকে—সুকান্তা আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি ফিরতে চাই, আমি ফিরতে চাই...।

ওরা কি সব ছায়ার পাখি

অমিয়কুমার নন্দী

"আমাদের চারপাশে যাদের দেখি—যাদের সাথে মিশি, যাদের সাথে ওঠাবসা চলাফেরা—তারা কেউই আমাদের বন্ধু নয়। তারা নিছক পরিচিত ব্যক্তি। তারা বন্ধুর সংজ্ঞায় পড়ে না। তারা সবাই অ্যাকোয়েন্ট্যান্স। তাদের মধ্যে দু-একজন কখনও-সখনও মনের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে। গড়ে ওঠে একটা আত্মিক সম্পর্ক। তখন তারা হয়ে ওঠে আমাদের বন্ধু। ইংরাজী ডিকশনারিতে বন্ধুর ডেফিনেশনে লেখা আছে—অ্যান ইন্‌টিমেট অ্যাকোয়েন্ট্যাস।' নারী-পুরুষের সম্পর্কও যখন ব্যঞ্জনাময়—হৃদয়গ্রাহী হয় তখন একটা পারস্পরিক মানসিক বোঝাপড়া—নৈকট্য গড়ে ওঠে। তৈরি হয় একটা সম্পর্ক। এই সম্পর্ক গড়তে কত সময়—কত ধৈর্য—কত প্রতীক্ষা আর কত তিতিক্ষা লাগে। অথচ ভেঙে যায় এক লহমায় কত সহজে। পরমাও ছিল একদিন আমার কৈশোরের খেলার সাথী—যৌবনের উচ্ছ্বাস—হৃদয়ের আবেগ। মনে হয়েছিল সেই সম্পর্ক কত দৃঢ়—কত কঠিন—কত মজবুত। অথচ সেই সম্পর্কও ভেঙে গেল একদিন। পরমা ছেড়ে চলে গেল অন্য আর একজনের সাথে।" এই পর্যন্ত লিখে স্বপ্ননীল কলমটাকে সরিয়ে ডায়েরিটা বন্ধ করল।

স্বপ্ননীল মাঝেমধ্যে কখনও-সখনও ডায়েরি লেখে। নিয়ম মেনে—সময় ধরে প্রত্যেকটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা তার ধাতে সয়ে না। জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলো শুধু লিখে রেখেছে। নিজেই নিজের ভাবাবেগে আচ্ছন্ন থেকেছে—কাউকে দেখাবার জন্য নয়—কাউকে পড়াবার জন্য নয়। অনেকদিন ডায়েরি লেখা বন্ধ ছিল। প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের চাপে সদা ব্যস্ত কেজো মানুষটি অনেক কিছুই ভুলে গেছে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা আর তার কাছে সুখ ফেরি করতে আসে না। ও মোবাইলটা খুলে মিসড্ কল এ্যালার্টের কললিস্টটা দেখে নিল। পাঁচটা মিসড্ কল। তিনটে বিশ্বরূপ দত্তের। একটা কন্টিনেন্টাল সার্ভিস কোম্পানির। 'ডিভিডি'টা সার্ভিস করতে দিয়েছিল—একটু ডিসটার্ব করছিল—সার্ভিস হয়ে গেছে বোধহয়—কোম্পানি ফোন করে সকালবেলাতেই জানিয়েছে। ও মিসড্ কল লিস্টটা ওপেন করেনি। পঞ্চম ফোনটা অচেনা লোকের—ওর মোবাইলে স্টোর করা নেই। রাত সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। এত রাতে আর বিশ্বরূপবাবুকে ফোন করে ডিসটার্ব করল না। এর আগেও উনি অনেকবার ফোন করেছেন। 'যাচ্ছি' বলেও ওনার বাড়ি বেশ কিছুদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অথচ গড়িয়াহাটের ডোভার লেন থেকে যাদবপুরের সেন্ট্রাল

রোডের দূরত্ব খুব বেশি নয়। কাল ফোন করে জানিয়ে দেবে রবিবারে সন্ধ্যেবেলায় ও অবশ্যই বিশ্বরূপবাবুর বাড়ি যাবে।

সকালে উঠে অফিস যাওয়ার তাড়া। অফিস বলতে স্বপ্ননীল একটা ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ী। এস বি আই-এর বিভিন্ন ব্রাঞ্চ ঘুরে এখন এন্টালি ব্রাঞ্চে পোস্টেড। দেখতে দেখতে এতগুলো বছরের ব্যাচেলর লাইফ দিব্যি কাটিয়ে দিল।

সামনের বছরে রিটায়ারমেন্ট। সংসার বলতে এখন বিধবা বৌদি আর ভাইপো। তাকে নিয়ে সাকুল্যে তিনজন। ভাইপো অয়নও ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা দিয়ে একটা ফরেন ব্যাঙ্কের অফিসার। মৌলালীর মোড়ে সি আই টি রোডের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে রয়েছে। ডোভার লেনের বাড়ি থেকে ন'টায় বের হয়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে গেল ব্যাঙ্কে। শুভেন্দু-অতনু-বিমলদা-রেণুদি-ঘোষদা—একে একে সবাই আসতে শুরু করলো। ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার সুখেন্দু দত্ত আগেই এসে গেছেন দোতলায় তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটাতে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট লাহিড়ীবাবু তাঁর কাচঘেরা ঘরটাতে বসে প্রস্তুত হচ্ছেন। আজ ক্যাশ কাউন্টারে বসেছে ও। পরপর কাচঘেরা তিনটে কিউবিকল রয়েছে। টাকা তোলা ও জমা পড়া একই কাউন্টারে হয়। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে অবধি ব্যাঙ্কিং আওয়ার্স। মাঝে আধঘণ্টা দুপুর দুটো থেকে আড়াইটে অবধি রিসেস আওয়ার। শনিবারে একটা অবধি ব্যাঙ্ক খোলা থাকে। ব্যাঙ্কের কাস্টমাররা আসতে শুরু করেছে। টোকেন মেশিনের বোতাম টিপে তারা টোকেন নিয়ে বসে পড়েছে খালি চেয়ারগুলোতে। ক্যাশ কাউন্টার থেকে নম্বর অনুযায়ী পরপর ডাকা হচ্ছে বেল টিপে। বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক বোর্ডে ফুটে উঠছে তাদের নম্বর। একজন কাস্টমারের কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় জনের নম্বর ফুটে ওঠে। এই সিস্টেমে কাজ হয় এখন এস বি আই ব্যাঙ্কে। মাসের প্রথম সপ্তাহ বলে এখন একটু ভিড় বেশি। ক্যালকাটা বয়েজ ও অন্যান্য আরও দু'একটা ইস্কুলের মাহিনা এই ব্র্যাঞ্চ জমা পড়ে। অনেক রকম রেকারিং ডিপোজিটের টাকা মাসের প্রথম সপ্তাহতেই বেশি জমা পড়ে। এছাড়া পেনশনাররাও টাকা তুলতে আসে। প্রথম সপ্তাহে লেনদেন হয় সবচেয়ে বেশি। যদিও ব্যাঙ্কে বসে গেছে কমপিউটার অনেকদিনই—তবুও খুব একটা স্পিডি ওয়ার্ক হয় না এখানে।

কাজ শেষ হতে হতে চারটে বেজে যায়। তারপর ওরা একটু আড্ডা মারে। পুজো পেরিয়ে গেছে অক্টোবরে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কালীপুজো। আর মাত্র দুদিন বাকি আছে। কালীপুজোর একদিন বাদে ভাইফোঁটা। এবারেও রেণুদি শুভেন্দু-অতনু-বিমলদা-ঘোষদা আর ওকে ভাইফোঁটার নেমতন্ন করেছে প্রত্যেক বছরের মত। সবাই যায় রেণুদির কসবার বাড়িতে ফোঁটা নিতে—কিন্তু ও কোনদিনও যায়নি। এই না যাওয়ার কারণটা একটা রহস্যই রয়ে যায় প্রত্যেকের কাছে। পরের দিন কলিগরা ব্যাঙ্কে এসে বিশেষ দিনটার আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ

করে। ভূয়সী প্রশংসা করে রেণুদির। ওকে ‘মিস’ করার জন্য দুঃখও প্রকাশ করে। প্রত্যেক বছর এই বিধবা ভদ্রমহিলা অভিযোগ আর অনুযোগের সূক্ষ্ম তীরে বিদ্ধ করে ওকে। আবার পরের বছর নির্দিষ্ট দিনটিতে সবাইকে নেমতন্ন করে। যথারীতি স্বপ্ননীল যায় না। সে ছাড়া আর সবাই কিছুতেই ওই দিনটাকে মিস করে না।

ট্রেনের তাড়া আছে বলে বেরিয়ে পড়ল যাদের বাড়ি বেশ দূরে। রেণুদি আর ও বসে আছে মুখোমুখী। আশেপাশে কেউ নেই। আজ রেণুদি তার ক্ষোভ উগরে দিল—‘তুই কি আমাকে তোর দিদি হিসাবে স্বীকার করিস না নীল? সবাই আসে কত আনন্দ করে। তুই কোনদিনও ফোঁটা নিতে গেলি না। এবারেও হয়তো যাবি না। আজ তোকে বলতেই হবে এর কারণটা কি? আর তো মাস ছয়েক আছে আমার রিটায়ারমেন্টের। তুই-শুভেন্দু-অতনুও সামনে বছরে রিটায়ার করছিস। তারপর কে কোথায় থাকব—আর দেখা হবে কিনা কে জানে। এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটালাম। আমার কোন নিজের ভাই নেই। তোদেরকে ভাই হিসেবে মনে করি। স্বামী মারা যাবার পর ছেলেটাকে আগলে পড়ে আছি। আজ আমার ছেলে সৌম্য ক্লাশ ইলেভেনে পড়ে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল কেমন দ্যাখ। ওর বাবা যখন মারা যায় ওর তখন বয়স ছিল চোদ্দ বছর মাত্র। আমার জানতে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে নীল...অবশ্য তুই যদি মনে করিস এটা তোর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার তাহলে নাও বলতে পারিস।’

হঠাৎ স্বপ্ননীলের মনে হল দিদির মত এই স্নেহপ্রবণা বিধবা ভদ্রমহিলাকে ও বছরের পর বছর নিদারুণ আঘাত দিয়েছে। অথচ প্রত্যেক বছরেই নতুন উৎসাহে রেণুদি তাকে ফোঁটা দিতে চায়।

‘আজ তোমাকে সব কথা বলব রেণুদি। এতদিন বলার মত কাউকে পাইনি। অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপারগুলো দীর্ঘদিন মনের গোপন অন্ধকার কোটরে বন্দী থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছে। তারা বন্দীদশা কাটিয়ে মুক্তি পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একদিন এই আটপৌরে মনটাও রঙ-রূপ-রসে-গন্ধে ভরপুর ছিল। সময়ের সাথে সাথে সেই রঙ হয়ে গেছে কত ফিকে—রূপ গেছে হারিয়ে—রসের স্রোত আর বহে না। গন্ধ গেছে উবে কর্পূরের মত। আমার কথা শুনতে তুমি বোর ফিল করবে না তো?’

—‘না-না বোর ফিল করবো না। আমার জানতে আগ্রহ হচ্ছে কি এমন ব্যাপার তোর জীবনে ঘটেছিল যা তোর মনের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কিত একটা সংশয়—একটা ভয়—একটা অবিশ্বাস দানা বেঁধেছে? জানি আমার এই কৌতূহল অহেতুক-অনাবশ্যক আর অনধিকার চর্চা।’

—‘রেণুদি তুমি তো ভাই হিসেবে আমাকে গ্রহণ করেছ। ফোঁটা দেওয়াটা বড় ব্যাপার নয়। ভাইবোনের এই নির্ভেজাল আন্তরিক সম্পর্কটাই বড় কথা।’ ও মনে মনে ঠিক করল রেণুদিকে আজ বাড়ি ডেকে নিয়ে যাবে। ওর যত না-

বলা কথা আজ সব বলে নিজেকে কিছুটা হলেও হালকা করবে। রেণুদি প্রথমে রাজি হয়নি—রাত্রি হয়ে যাবে বলে। ডোভার লেন থেকে খুব বেশি দূর নয় কসবা—বোঝাতে রেণুদি রাজি হলো।

—'চল চল বেরিয়ে পড়ি আমরা—আর দেরি করব না' বলে স্বপ্ননীল এন্টালি মার্কেট থেকে একটা ট্যাক্সি করে নিল। সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই পৌঁছে গেল রেণুদিকে নিয়ে ওর বাড়ি।

বৌদির সাথে আলাপ করিয়ে দিল। ভাইপো অয়ন তখনও ফেরেনি ব্যাঙ্ক থেকে। ওর ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে আটটা বেজে যাবে। ও রেণুদিকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। এর আগেও রেণুদি এসেছিল অয়নের জন্মদিনে। সে অবশ্য বহুকাল আগে। বৌদি দুজনের চা-জলখাবার দিয়ে গেল। ওরা দুজনে গল্পে মেতে উঠেছে। আজ রেণুদি এসেছে স্রেফ স্বপ্ননীলের জীবনের বন্ধ দরজাগুলো একে একে খুলতে। নারী প্রেমের মত স্নেহেও প্রত্যাখ্যাতা হলে খুব কষ্ট পায়। এই নারী স্নেহময়ী-কোমলপ্রাণা জননী। সে দৌড়ে এসেছে তার কাছে—জানতে চেয়েছে কোন অপরাধে সে ভ্রাতৃস্নেহে বঞ্চিত হল?

একে একে নিজের জীবনের অকথিত অগ্রথিত অনুচ্চারিত কাহিনী যা তাকে দুঃখ দিয়েছে,—কষ্ট দিয়েছে—দিয়েছে যন্ত্রণা—যার জন্য জীবনের বিশ্বাসের ভিতটাই নড়ে উঠেছিল—সেই কাহিনীও ব্যক্ত করল এক সমমর্মী নারীর কাছে। তারপরেও কেউ কেউ তার জীবনে এসেছে—দরজায় কড়া নেড়ে গেছে। ও কাউকেও এনট্রি দেয়নি। নিগোশিয়েশন বিয়ের দিকেও ঝোঁকেনি। পরমার উপাখ্যান তার জীবনকে তাড়া করে বেরিয়েছে—তার থেকে কোনদিনও তার রেহাই নেই—নিষ্কৃতি নেই।

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগের ঘটনা। তখন স্বপ্ননীলের বাবা-মা-দাদা বেঁচে। দাদার তখনও বিয়ে হয়নি। ওরা থাকত বৌবাজারের মলঙ্গা লেনের পৈত্রিক বাড়িতে। বাড়িটা বানিয়েছিল স্বপ্ননীলের ঠাকুর্দা। বাড়ির সামনে ছিল হালকা ঘাসে মোড়া একটা লন। সেই লনের ধারে ধারে ছিল কিছু গাছগাছালি। ওখানে ছোট্টবেলায় ও খেলাধূলা করত।

পাশের বাড়ির একতলায় সবে ভাড়াটে এসেছে। ফ্যামেলি বলতে স্বামী-স্ত্রী তাদের ছোট একটা ছেলে আর রোগা ছিপ্‌ছিপে ফর্সা কিশোরী মেয়ে। দু-একদিন কেটে যাবার পরই ছোট ছেলেটা দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলল ওর সাথে। ও তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্সে। বন্ধুবান্ধব বেশি ছিল না। পাড়াতেও খুব একটা মিশত না। মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলে ভোম্বলও আসত লনেতে ব্যাডমিন্টন খেলতে। নেট লাগিয়ে খেলা হত। কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটি একটা র‍্যাকেট এনে ওর খেলার পার্টনার হয়ে গেল। এরপর কিশোরী মেয়েটাও দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে দেখতো সেই খেলা। ছেলেটার নাম পার্থ আর মেয়েটার

নাম পরমা—জানতে বেশি সময় লাগল না ওর। মাঝে মাঝে পরমা দেখত আবার হঠাৎ করে কখনও-সখনও উধাও হয়ে যেত। ও মুখে কিছু বলতে পারছে না। একদিন সাহস করে বলে ফেললো পরমাকে—'রোজ রোজ শুধু খেলা দেখলে হবে—ধরো র‍্যাকেট বলে নিজের র‍্যাকেটটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল। পার্থ এসে তার র‍্যাকেকটা স্বপ্ননীলের হাতে দিয়ে বলল—'আজ নীলদার সাথে তুমি খেলো দিদি—কে হারে আর কে জেতে দেখি। ভারি মজা হবে।' ও ইচ্ছে করে হারল পরমার কাছে।—'হেরে গেলেন তো!'—পরমার মৃদু উচ্ছ্বাস।

হাসতে থাকে ও—'সবাই সব সময় কি জিতে ফেরে? কিছু মানুষকে তো হারতেই হয়। যে হেরেছে সে জেতার আনন্দটাই তো জয়ী লোকটাকে দিয়ে যাচ্ছে। এই দ্যাখো না আমি হেরেছি বলেই তুমি জেতার আনন্দটা পাচ্ছো।'

বাড়ি থেকে বোধহয় ডাক পড়ল। পরমা 'আসছি' বলে ওর বাড়িতে ঢুকে গেল। পার্থর সাথে খেলাটা আর জমল না। সরল ছেলেটা তখনও বলে চলেছে—'দিদি থাকলে বেশ মজা হয় না! কেমন তোমাকে হারিয়ে দিল নীলদা! কবে যে তোমাকে হারাতে পারবো। আর একটু বড় হলে ঠিক হারিয়ে দেব দেখে নিও।'

সবাই জিততে চায়। কেউ হারতে চায় না। ওইটুকু ছেলেও জেতার স্বপ্ন দ্যাখে। যারা হেরে যাচ্ছে জগৎময় তাদের নিয়েই সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

কলেজফেরতা প্রায় দিনই ব্যাডমিন্টন খেলায় মেতে ওঠে পরমার সাথে। তখন ও পরমাকে নিয়ে বিশেষ ভাবিত নয়। মনের মধ্যে কোথাও অস্থিরতা প্রকাশ পায়নি। কিশোরী পরমা নিছকই খেলার সাথী। ইতিমধ্যে ওর মা এসে আলাপ করে গেছে স্বপ্ননীলের মায়ের সাথে। স্বপ্ননীলের মাও কয়েকবার গেছে পরমাদের বাড়িতে। দুটো পরিবারের মধ্যে একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খাবার-দাবার ও জিনিসপত্রের আদান-প্রদান ঘটে। ক্লাস নাইন থেকে পরমা শাড়ি পরে ইস্কুলে যায়। বাড়িতে পরে ফ্রক। পরমার চেহারায় আসছে নারীসুলভ লালিত্য আর মাধুর্য। তার শারীরিক গঠন আর বাচনে এসেছে পরিবর্তন। ও আস্তে আস্তে তন্বী হয়ে উঠছে। ঠোঁটের ডগায় হাসির সাথে সাথে মুখে লজ্জার লালিমা। কখনও-সখনও ওদের বাড়িতে চলে আসে—ওর সাথে হালকা খুনসুটিও করে। ওর দাদার কাছে পারতপক্ষে ঘেঁষে না—দাদা খুব গম্ভীর বলে। ওর দাদা খুব কেরিয়ারিস্ট। তখন কমপিটিটিভ পরীক্ষাগুলো দিয়ে যাচ্ছে তার দাদা। পড়াশুনা ছাড়া কিছুই বোঝে না। পরমা একটু অঙ্ক আর ইংরাজিতে কাঁচা। বাড়িতে যদিও টিচার আছে। একদিন হঠাৎ করে ওকে বলল—'আমাকে অঙ্ক আর ইংরাজিটা একটু দেখিয়ে দেবে?' তখন থেকে ও পরমার অঙ্ক আর ইংরাজী নিয়ে মাথা ঘামাল। কখনও পরমার বাড়িতে কখনও বা নিজের বাড়িতে।

এ বছরে পরমা ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে

শুরু করেছে। নিজের পড়াশুনা আর পরমার পড়াশুনা দ্যাখাতেই সময় কেটে যায়। কলেজে দু-একটা বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দেয় কলেজ ক্যানটিনে। কয়েক মাস পরে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। তারপর ফাইনাল পরীক্ষা। টেস্ট নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হল। টেস্টে রেজাল্ট ভালোই হয়েছে। স্বপ্ননীলের কাজ বেড়ে গেল। সাজেশন জোগাড় করা—উত্তর লিখে দেওয়া—প্রশ্ন বাছা। পরমাও সোৎসাহে স্বপ্ননীলের গাইডেন্সে পড়াশুনা শুরু করে দিল।

ফাইনাল পরীক্ষার সিট পড়ল এন্টালি সুরেশ সরকার রোডের ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারি গার্লস হাইস্কুলে। পরমার বাবা রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ করেন। স্টেট গর্ভমেন্ট এমপ্লয়ী। ছুটি নিতে গেলে সি এল কাটা যাবে। তখন স্বপ্ননীলের পরীক্ষা হয়ে গেছে। অখণ্ড অবসর। পরীক্ষাকে উপলক্ষ্য করে দুটো পরিবার যেন এক হয়ে গেল। ওর মা-পরমার মার মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওর মা তো পরম উৎসাহে বলে বসল—'নীল থাকতে তোমার ভাবনা কি দিদি। চল আমরা দুজন নীলের সাথে ট্যাক্সিতে যাই পরমাকে নিয়ে।'

স্বপ্ননীলও অতি উৎসাহে মা আর পরমার মার সাথে প্রত্যেকদিন পরমাকে পরীক্ষা হলে পৌঁছনো—টিফিন টাইমে টিফিন খাওয়ানো আবার পরীক্ষা শেষে ব্যাক টু প্যাভেলনে ফিরে আসা।

ইস্কুল ফাইনালে দুটো সাবজেক্টে লেটার মার্কস পেয়ে ফাস্ট ডিভিসনে পাস করল পরমা। তারপর হায়ার সেকেন্ডারিতে মোটামুটি রেজাল্ট। বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হলো সিটি কলেজের মর্নিং সেকশন রামমোহন কলেজে।

ফার্স্ট ইয়ারে পড়াশুনার চাপ কম। ও পরমাকে নিয়ে কখনও এলিট, কখনও গ্লোব সিনেমা, কখনও লাইট হাউস, কখনও বা মেট্রো সিনেমা। নতুন বই এলে আর কথা নেই—পরমাকে দ্যাখাতে হবেই। নিউ মার্কেট চত্বরের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে সময় কাটিয়েছে দুজনে। আমিনা রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমিনা স্পেশালের স্বাদ গ্রহণ করেছে। ইডেনে, গঙ্গার ধারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কতবার যে ঢুঁ মেরেছে তা লেখা-জোকা নেই। একবার তো চিড়িয়াখানায় খাবার-দাবার নিয়ে গিয়ে বাঘভাল্লুক দেখার ফাঁকে মিনি ফিস্ট করেছিল দুজনে। শীতের আমেজ ধরা দুপুরে ফ্লাক্স থেকে কফি ঢেলে খাওয়ার আনন্দই আলাদা। তখন এত মাল্টিপ্লেক্স-শপিংমল-ক্যাফেটেরিয়ার রমরমা ছিল না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কিছু রেস্টুরেন্ট শুধু। আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যত দিন যেতে লাগল সেই সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। একটা সময় শরীর-মন সোচ্চার হয়ে জানিয়ে দিল তারা পরস্পর পরস্পরকে চাইছে। এতদিন ইচ্ছাগুলো মনের ঘেরাটোপে ছিল বন্দী—আজ তারা বন্ধাহীন-বাঁধনহীন-অর্গলবিহীন হয়ে গেল।

যতদিন যেতে লাগল পরমা তত সুন্দরী, আকর্ষণীয় হয়ে উঠল স্বপ্ননীলের

চোখে। সেই কিশোরী মেয়েটার আজ পূর্ণতা পেয়েছে। তার শরীরে কানায় কানায় যৌবনের ঢল নেমেছে। উথলে পড়েছে জোয়ারের জল। ফ্রকের শাসন আর মানতে চাইছে না শরীর। তাঁকে ঢেকে রাখতে হচ্ছে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। এদিকে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে স্বপ্ননীলের। পিপারেশন নিচ্ছে ব্যাঙ্কিং-পিএসসি পরীক্ষার জন্য। তার বাড়িতে পরমার অবাধ যাতায়াত। রান্নাঘর-বসার ঘর-শোবার ঘরে অবাধ গতি। মায়ের মনে প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন ছোটছেলের বৌ করবে বলে। বাবারও যখন-তখন হাঁকডাক পরমাকে। দু একটা রান্নার নতুন পদ মা পরমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। খাবার সময় সেই পদ পরমা সবাইকে পরিবেশন করেছে। গোমড়া-মুখো কেরিয়ারিস্ট দাদাতো দিব্যি পরমার সাথে বসে গল্প করে। দাদার বিয়ের আসরে গান গেয়ে ও সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এহেন পরমাকে নিয়ে স্বপ্ননীলের গর্ব। পরমা তো তারই আবিষ্কার। মায়ে-ছেলে কথা হয়—মা খুব ফ্রাঙ্ক। মা বুঝতে পারে ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। একদিন পরমাকে না দেখলে মন খারাপ হয়ে যায় আর সামনে দেখলেই মনটা ছলাৎ করে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন বহুদিন আগে—'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, বিশেষতঃ সে যদি যুবতী নারী হয়।' মা অনেকখানি এগিয়ে গেছে—পরমার বাবা-মাকে প্রপোজ করেছে। তারাও এককথায় রাজি। স্বপ্ননীল চাকরিটা পেলেই তাদের বিয়েটা হবে। পরমার মা আসা-যাওয়া করেন—মাও যায় মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি।

একদিন বৃষ্টিস্নাতা হয়ে পরমা এল ওর বাড়িতে। তখন বেলা তিনটে হবে। বৃষ্টিতে তার শাড়ি-ব্লাউজ ভিজে একসা। তার শরীরের প্রত্যেকটা বিভঙ্গ রেখায় নারীর সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে। অসম্ভব সুন্দর লাগছে ওকে। বৃষ্টির দানা কয়েকটা তার কপালে গালে ছড়িয়ে পড়েছে। ওকে একটা টাওয়েল এনে দিল। ও মাথাটা মুছে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল যখন শুনল স্বপ্ননীলের মা বাড়িতে নেই। ও ফিরে যেতে চাইল। স্বপ্ননীল তাকে আটকায়—এক ঝটকায় বুকে টেনে নিয়ে মিশিয়ে নিল তার শরীরে। ও প্রথমে সচকিত হয়—পরে আত্মসমর্পণ করে। স্বপ্ননীল তাকে চুম্বনে আর আশ্লেষে পাগল করে দিল। কিন্তু তারপরই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। এর কারণটা ওর বোধগম্য হল না। তারপর থেকে আসা-যাওয়া একটু কমিয়ে দিল পরমা। ক্বচিৎ-কদাচিৎ আসে—মায়ের সাথে গল্প করে চলে যায়।

আর একদিন দ্যাখা হতে স্বপ্ননীলকে ওর কলেজে আসতে বলল সকাল দশটায়। দশটায় পৌঁছে গেল ও। পরমা কলেজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। অনতিদূরে হৃষিকেশ পার্ক। পার্কে একটা বেঞ্চে বসে দুজনে। সেদিনের ঘটনা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এল। পরমা হেসে হেসে গল্প করে।

—'আমাদের বাড়ির রাস্তা কি ভুলে গেছ পরমা? অনেক দিন তো আসোনি।

মা বলছিল—'

—'মাসিমা না তুমি?' পরমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—'ধরো আমিই বলছি,—একদিন না এলে রাতের ঘুমই হত না যার—সে হঠাৎ করে এত লঙ্ এ্যাবসেন্ট!'

—'এই তো সেদিন গেলাম। আসলে জানো তো একটা কাজে খুব ব্যস্ত'...

—'হঠাৎ করে কি এমন কাজ পড়ে গেল তোমার?'

—'ও তুমি বুঝবে না।'

—'বুঝবো। কিন্তু আমাকে বলা যাবে না—এই তো!'

দুজনের কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎ করে পাজামা-পাঞ্জাবিপরা প্যাংলা ছোটখাটো চেহারার বছর তিরিশের একটি যুবকের উদয়। ছেলেটির হাইট মেরেকেটে পাঁচ ফুট হবে।

—'একটু আসতে দেরি হয়ে গেল, রাস্তায় যা জ্যাম।'

—'এসো এসো দাদা এসো' বলে পরমা পরম সমাদরে তাকে পাশে বসাল। ওর দিকে চেয়ে বলল—'আমার দাদা—সমর বোস। খুব ভালো ছবি আঁকে।'

দাদা একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। তারপর স্বপ্ননীলের দিকে চেয়ে বলল—'তুমি খুব লাকি নীল। পরমার মত একটা সর্বগুণসম্পন্না মেয়ে পেয়েছ। আমাকে ও তো খুব ইনস্‌পায়ার করে। আমি যে এত পোট্রেট আঁকি—সবই ওর ইনস্‌পিরিসনে।' দাদা উঠে দাঁড়াল—যাবার জন্য—যাবার আগে পরমাকে বলে—'তোর জন্য একটা ছবি এঁকেছি—কাল বাড়িতে যাস দ্যাখাব।'

দাদা চলে গেল। স্বপ্ননীল বিস্ময়-আবিষ্টের মত বসে রইল কিছুক্ষণ। মনের মধ্যে একটা বিদ্বেষ—একটা ক্রোধ—একটা হতাশা ফণা তুলে ছোবল মেরে বিষ গেল ঢেলে।

দুজনে চুপচাপ বসে। একসময় নীরবতা ভেঙে স্বপ্ননীল মুখর, হল—'দাদা! কি রকম দাদা—যদ্দুর জানি তোমার কোন 'তুতো' দাদা নেই। এই বস্তুটিকে কোন ফ্যাকটারি থেকে ম্যানুফ্যাকচার করলে?'

ওর কথায় শ্লেষ ঝরে পড়ল—'তোমার এই পরম শ্রদ্ধেয় দাদা কি করে জানল যে আজ আমরা এখানে বসব?'

—'আমি বলেছি নীলদা। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। দাদার মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভা রয়েছে—আমার কত ছবি এঁকেছে জানো—হুবহু আমার মত।'

—'তাতে আমাদের কী! প্রতিভা যাচাই করা তো আমাদের কাজ নয়। ওই কাজটা করার অনেক লোক আছে। কার কি প্রতিভা আছে—সে তার বাড়িতে সযত্নে লালন-পালন করুক। আমার ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে ভদ্রলোক টানা-হ্যাঁচড়া করছেন কেন—বুঝতে পারছি না। পরমা বুঝতে চেষ্টা করো আমাদের দুজনের

মিলনে দুটো পরিবারের মধ্যে ঘটবে অচ্ছেদ্য বন্ধন। তোমার বাবা-মার সাথে আমার বাবা-মাও কত খুশি হবে—একবার ভাবো তো। আজ বাড়ি চলো। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। আর একটা কথা, মাসিমা-মেসোমশাই জানে যে তুমি এই পাতানো দাদার বাড়ি যাও?'

—'না। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার—ব্যক্তিগত ভাবনা। তুমি আবার...'

—'না—সে ভয় নেই। বিয়ে তো করব আমরা। বাবা-মাকে লাগানি-ভাঙানি করে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? এবার বলো তো এই দাদার সাথে তোমার কি করে আলাপ হল? দাদায় মজলে কি করে?'

—'আমাদের সাথে পড়ে ঈপ্সিতা। ঈপ্সিতার দাদাই সমর বোস। রাইজিং আর্টিস্ট। ওর বাড়ি গেছি কয়েকবার। ওর দাদাই বলল—আমার মুখখানাতে নাকি আর্টিস্টিক অ্যাপিল আছে—যা পোর্ট্রেট আঁকতে আর্টিস্টকে ইনস্‌পায়ার করে।'

—'বর্তমানে দাদা কি কোন কাজকর্ম করে?'

—'কেন দাদা ছবি আঁকে। অন্য কিছু কাজ করার সময় কোথায় তার? তাছাড়া দাদা ইস্কুল ফাইনালের পরে আর পড়াশুনা করতে পারেনি সংসারের চাপে।'

—'দাদার এত ঝুরি ঝুরি প্রশংসা করছ পরমা। আমার কি কোন গুণই নেই? আমি একজন শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন লোক। দেখতে খুব খারাপ নই। আমার হাইট পাঁচ ফুট দশ। ওজন ষাট কেজি। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। ব্যাঙ্কের চাকরির লিস্টে নাম উঠেছে। সুতরাং চাকরিটা পাচ্ছিই। আজ মিঃ সমর বোস অ্যান্ড কোং স্টোরিটা থাক। চল বাড়ি যাই।'

পরমার সাথে এখন বেশি দ্যাখা হয় না। যখনই দ্যাখা হয় তখনই তার 'দাদা'কে নিয়ে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা-উৎসাহ। দাদার স্তুতি কীর্তনে কান ঝালাপালা। দাদার প্রশংসায় শতমুখ। জরুরি দরকার আছে বলে ভাইকে দিয়ে ডেকে পাঠাল স্বপ্ননীল তার বাড়িতে। পরমার সাথে সব কথা আজ পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভালো। ইতিমধ্যে পরমার বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এসবিআই ব্যাঙ্কের এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পেয়ে গেছে স্বপ্ননীল। দশদিন পরে ট্রেনিং শুরু হবে। পরমা এল দুপুরবেলা। ও একবার ভাল করে দেখল ওকে। এই সুন্দরী যুবতী নারী—যাকে সে আপন মনের মাধুরী দিয়ে তৈরি করেছিল —যাকে সে পেতে চলেছিল তার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে—কামনা দিয়ে—ভালোবাসা দিয়ে। তার কাছে আজ স্পষ্ট জানতে চাইবে—সে এখনও তাকে ভালোবাসে কিনা? আজ মনে হল ওর বাহিরের ঐশ্বর্য ছাপিয়ে অন্তরের দৈন্য প্রকট হয়ে উঠেছে। পরমা কোনদিন তাকে ভালোবেসে ছিল কিনা? সে নিছক কি এক পরিচিত ব্যক্তি পরমার চোখে? 'ভালোবাসা' 'বিয়ে' এসব গুরুত্বপূর্ণ কথার গুরুত্ব সে কি অনুধাবন করতে পারেনি?

দাদার জন্মদিনে দাদার সাথে গলা মিলিয়ে গান করা—দাদাকে জন্মদিনে দামী উপহার দেওয়া—এসব কথা অম্লান বদনে তার কাছে বলেছে। দাদার কথা বলতে তার গলায় উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে,

—'জানো নীলদা, সেদিন খুব মজা হয়েছিল। উপহারটা নেবার পর দাদা খুব আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে আমার কপালে ছুঁয়ে দিল তার ঠোঁট। যাকে বলে স্নেহের চুম্বন।'

—'পরমা আমার সাথে তোমার সম্পর্ক ভাইবোনের নয়। সম্পর্কটা প্রেমিক-প্রেমিকার—গভীর ভালোবাসার স্পর্শ। দুদিন বাদে বিয়ে হলে সেই সম্পর্কটা গভীরতর হবে। তুমি আমাকে 'নীল' বলে ডাকবে। তাতে আমি বেশি খুশি হব।'

—'বেশ তোমাকে তাই বলেই ডাকব। আজ আমি যাই' বলে পরমা উঠতেই ও খপ করে হাতটা ধরল আর রাগে-দুঃখে-অনুরাগে প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণায় তার পরুষ ঠোঁটদুটো চেপে ধরল পরমার নরম ঠোঁটের মধ্যে। মৃদু দংশন করে শুষে নিয়ে পেতে চাইল তার আস্বাদ। 'আমি তোমাকে হারাতে চাই না পরমা—আমি তোমাকে ভালোবাসি।' পরমার কোন উত্তেজনা—কোন আবেগ—কোন বিহ্বলতা—ভাবাবেগ প্রকাশ পেল না। সে নিরপেক্ষ-নির্লিপ্ত- নিরুত্তাপ। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল না তার বুকে—আদরে আদরে আচ্ছন্ন করল না। নিতান্ত বেবাক বেকুবের মত বলে বসল—'এই যে তোমাকে আদর করলাম—তোমার দাদা কোনদিন তোমাকে এরকম আদর করেনি?'

—'দাদা তোমার মত আদর করলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করতাম। সে ভাগ্য কি আমার হবে কোনদিন।'

এত বড় কথাটা এত সহজে যে পরমা বলতে পারবে তা স্বপ্ননীলের চিন্তার মধ্যেই ছিল না। ও তখনও নিজেকে সংযত রেখেছে—ওর উত্তেজনা প্রশমিত করেছে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরমাকে যাচাই করতে চাইছে। এর পরে আর সময় হয়তো পাবে না।

—'পরমা দাদাকে ফোঁটা দাওনি ভাইফোঁটায় কোনদিনও?'

দাদার কথা শুনলেই পরমার উচ্ছ্বাস—'সে এক মজার ব্যাপার। দাদার সব কিছুতেই এক্সেপ্সন। দাদা খুব রাগারাগি করল, 'এবারে দিচ্ছিস দে। এইসব অনুষ্ঠানে আমার বিশ্বাস নেই। সম্পর্কটাই আসল। তুই এলে ভালো লাগে—আঁকার উৎসাহ পাই। মাঝে কতদিন আসিসনি—আমার আঁকাটাও বন্ধ হয়ে পড়েছিল।'

এরপর কোন যুক্তি-আর্গুমেন্ট-তর্ক-বিতর্কের মধ্যে গেল না স্বপ্ননীল। ওর মনের মধ্যে একটা স্যাফোকেশন হচ্ছে—পরমার কথা শুনতে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ও চিৎকার করেনি। ওর অনুচ্চারিত কথা সোচ্চার হয়ে গেল নিজে

থেকে—'পরমা তুমি যাও। প্লিজ তুমি যাও। প্লিজ লিভ মি এ্যালোন। এখন আমার অনেক কাজ। এই সম্পর্কটা রেখে আর কি লাভ? মায়ের সাথে সব কথা খুলে বলতে হবে—মা'ই ওদের সব জানিয়ে দেবে।' সমস্ত দোষের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে পরমাকে মুক্তি দিল।

একদিন যে অলৌকিক ভাগ্য বলে ভালবাসা দুহাতের অঞ্জলি ভরে পেয়েছিল—আজ তা অনাদরে অবহেলায় ধুলোয় ফেলে দিয়ে যেতে হল।

এতক্ষণ চুপ করে বসে রেণুদি ওর স্বপ্ন দ্যাখা আর স্বপ্নভাঙার জীবনকাহিনী শুনল। রেণুদি উঠে দাঁড়াল—'আমাকে একটু এগিয়ে দে নীল।' যাবার আগে ছোট্ট একটা কথা বলে গেল—'বোকা শিক্ষিত মেয়েটা একটা ইলুসনের স্বীকার। তার দোষ দেব না। ওকে ওর মত করে বাঁচতে দিয়ে তুই সরে এলি। যেদিন ও বুঝবে সেদিন ওর করার কিছু থাকবে না। যাবার আগে ও তোর চরম ক্ষতি করে দিয়ে গেল। মানুষের ওপর তুই বিশ্বাসই হারিয়ে ফেল্‌লি। নীল মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাস না। একটা মানুষকে দিয়ে সবাইকে বিচার করতে যাবি না। এবারের ভাইফোঁটায় অবশ্যই তুই যাবি। আমি তোর অপেক্ষায় থাকব। দিদি হয়ে তোর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনব—যে কটা দিন বাঁচব।

কাঁকড়া

আশুতোষ মণ্ডল

হুকোর কলকেটা এক হাতে নিয়ে উপুড় হয়ে চিমটে দিয়ে উনুন থেকে কাঠকয়লার আগুন তোলার চেষ্টা করেও যখন দেখলো বার বার চিমটেতে শুধু ছাই উঠল তখন বিরক্ত হয়ে হরিলাল বাঘ বলতে লাগল—দিনকাল যা পরেছে চারদিকে শুধু ভেজাল, আর ভেজাল আখার আগুনেও ভেজাল। দেশটাই ভেজালে ভেজালে রসাতলে গেল।

শঙ্কর সেই সময়ে এসে হাজির। সে একটু রসিকতা করেই বলল কি—দাদু, কি হল? এখন আখার আগুনেও ভেজাল দেখতে পাচ্ছ।

হরিলাল বাঘ হাঁটুতে ভর দিয়ে কিছুটা সোজা হয়ে বলল—কি আর বলব ভাই কলকেয় একটু আগুন দেব তারও উপায় নেই। এই মাত্র রান্না করে গেল আর এরই মধ্যে সব নিভে ছাই।

শঙ্কর কলকেটা হাতে নিয়ে বলল—তুমি মশারির তলায় বসো আমি আগুন দিচ্ছি।

হরিলাল বাঘ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সুড়সুড় করে নিজের মশারির ভিতর ঢুকে গুনগুন করে গান ধরল—"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়..."

তত সময়ে শঙ্কর কলকেতে আগুন দিয়ে হুঁকোটা রেডি করে হরিলাল বাঘের হাতে দিতেই যেন প্রাণ বন্ধ হয়ে হুঁকোতে গড়গড় করে কয়েকটা টান দিয়ে তারপর একটা সুখটান দিয়ে হুঁকোটা শঙ্করের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—জীবনটা যেন এই নেশার সঙ্গে আঠার মত আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এক মুহূর্ত না হলে প্রাণটা যেন খাঁচায় বন্দি পাখির মত ছটফট করে। নেশা আর ভালোবাসা যেন যমজ দুই বোন, কলিজাটা পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়, না পেলেই বুকের ভিতরে ছিয়ার পারের মত ধড়ফড় ধড়ফড় করতে থাকে।

শঙ্কর উৎসাহ নিয়ে বলল—দাদু তুমি কোনদিন প্রেমে পরেছ?

হরিলাল বাঘ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—সে সৌভাগ্য আর হল কোথা! জীবনটা নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়ির মত ওপার থেকে এপার ওল্টাতে পাল্টাতে-পাল্টাতে মহা সংসার সমুদ্রে এসে পড়ল। আর এই নোনাজলে হাবুডুবু খেতে খেতে জীবনটা খোকা ইলিশের মত ফ্যাকাসে হয়ে সুখ দুঃখ মিলেমিশে পোড়া রুটির মত; ঝাড়া দেওয়ার জো নেই। বাড়ির গিন্নি কড়াইতে এ-পিঠ-ও-পিঠ উল্টে পাল্টে ভাজছে তো ভাজছে, যত সময় না

কড়াইতে পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছে।

শঙ্কর মন দিয়ে দাদুর কথা শুনছে, আর হুঁকো খেয়ে যাচ্ছে।

কার্তিক এসে শঙ্করের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল —হুঁকোটা দে—তো বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোয়া দিয়ে নি।

ওদিকে দুই-একজন করে আসতেই আসর বেশ জমে উঠল। কয়েক দিন ধরে মশার বেশ বাড়বাড়ন্ত। চারিপাশের জঙ্গল থেকে সন্ধ্যার দিকে মশারা দলে দলে রে-রে করে হামলা করছে। কানে নাকে হাতে পায়ে যে যেখানে পাচ্ছে কামড়ে যাচ্ছে। কেউ গামছা দিয়ে কেউ হাত দিয়ে তাড়াতে চেষ্টা করেও কিছুতে কিছু হচ্ছে না।

ঘনা বিরক্ত হয়ে বলল—দাদু! তুমি কি মশার চাষ করেছ, তোমার মশার ফার্মে ভালোই মশার উৎপাদন, কয়েক লরি মশা বিদেশে চালান কর। আমি ট্রান্সপোর্টকে খবর দিচ্ছি।

কার্তিক পাশ থেকে বলল—এটা গেরিলা আক্রমণ, দাদু হল এই গেরিলা মশাদের সেনাপতি।

হরিলাল বাঘ বলল—সে যাই বলিস, তোদের কিন্তু কিছুতেই রেহাই নেই।

ঘনাকে উদ্দেশ করে শঙ্কর বলল—কয়টা খড়-বিচুলি জ্বেলে ধোঁয়া দে তাহলেই মশারা পালাবে।

ঘনা উঠোনে গিয়ে ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করল। কিছু সময়ের মধ্যেই ধোয়ায় চারদিক ভরে গেল।

হরিলাল বাঘ মশারির ভিতর থেকে বলল—এইবার ঘনা একটা কাজের কাজ করেছে।

দীপু আর নিমাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল—দাদু কেমন আছ?

হরিলাল বাঘ মশারির ভিতর থেকে উত্তর দিল—সে কিরে দীপু! আজকাল তো আর তোর দেখাই পাওয়া যায় না। ওদিকে আসা ছেড়েই দিয়েছিস। রসিকতা করে বলল—নতুন বউ পেয়ে ঘরকুনো হয়ে গেছিস তাই না।

দীপু একটু লজ্জা পেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—না না ঠিক তা নয়। প্রচণ্ড কাজের চাপ, বাবার তো বয়স হয়েছে। তাই নিজেকেই সব সামলাতে হয়।

হরিলাল বাঘ দীপুর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ সব বুঝেছি। তা বল আজ গিন্নি কি রান্না করেছিল? বাজারে গিয়েছিলি?

দীপু বলল—না না! বাজারে যাওয়ার সময় কোথায়! ওই ভাদু জেলের কাছ থেকে কটা মাছ রেখে তাই দিয়ে যাহোক একরকম চালিয়ে নিতে হল।

কার্তিক যেন একটু অবহেলা করে বলল—ভাদু জেলের কাছ থেকে মাছ কিনেছিস? কাঁকড়া ছাড়া আর কিছু তো হাঁড়িতে থাকে না?

নিমাই বাধা দিয়ে বলল—কেন থাকবে না, অনেক মাছই থাকে, তবে সব জ্যান্ত বিলের মাছ।

হরিলাল বাঘ একটু গম্ভীর ভাবে বলল—আসলে কি জানিস তো মানুষটা অনেক কষ্টে বেঁচে আছে। সে বহুদিনের কথা, ছেলেবউ নিয়ে সুখেই ছিল, একদিন কি হল, ভাদুর আট-দশ বছরের ছেলে, একদিনের কলেরায় আর রাত পোহালো না, ছেলেটাকে হারাল। তখন তো আর ডাক্তারবৈদ্য ছিল না। কোন চিকিৎসা করতে পারেনি। আর সেই থেকেই বউয়ের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। পাগলের মত মরা ছেলেটাকে এদিক-ওদিকে খুঁজে বেড়াত। রাস্তায় যাকে পেত, জিজ্ঞাসা করত—আমাদের পরানকে দেখছ? ছেলেটা কখন বেরিয়েছে; এখনো কিছু খায়নি তাই খুঁজতে বেরিয়েছি। যদি রাস্তায় দেখতে পাও বোলো যে, তোর মা তোকে খুঁজছে। তাড়াতাড়ি যেন বাড়ি যায়। আমি ভাত রান্না করে রেখেছি। ওকে না খাইয়ে তো আমি খেতে পারি না তাই বলছি। বলবে কিন্তু? সবাই হাঁ-করে শুনত আর মাথা নাড়ত আর বড়জোর বলত—ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও আমি বলে দেব। এইভাবে এপাড়া, ওপাড়া ঘুরে বেড়াত। বউ পাগল হলেও ভাদু কিন্তু ঠিক ছিল। সব বুঝত, সারা দিন লোকের বাড়ি কাজ করে বউকে খুঁজে নিয়ে বউকে খাইয়ে নিজে খেয়ে কোনরকমে ছিল। অনেক চেষ্টাও করেছে বউকে ভালো করার জন্য। সব ভগবানের লীলা। একদিন ভাদুর বউকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না, অনেক জায়গায় ভাদু খুঁজেছে কোথায়ও পায়নি।

আর তারপর থেকেই ভাদুও কেমন যেন হয়ে গেল, সেই থেকে কারোর বাড়িতে কাজে যায়নি। শুধু বিল থেকে মাছ গুগলি কাঁকড়া যা পায় তাই ধরে। আর পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করে। যে কয়টা পয়সা পায় তাই দিয়ে কোনরকমে চলে।

নিমাই পাশ থেকে বলল—হাটে গেলে ভাদু জেলেকে ঘুরতে দেখা যায় বেশি।

ঘনা, নিমাইকে সমর্থন করে বলল—ঠিক বলেছিস। একদিন আমি দেখি হাটের মধ্যে কি যেন খুঁজছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি খুঁজছ ভাদু কাকা? সঙ্গে সঙ্গে বলল—কই! কিছু না তো! বলে—এড়িয়ে গেল।

হরিলাল বাঘ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—চলার পথ কার কখন কোন দিকে মোড় নেয় কে জানে, সব উপরওলার ইচ্ছা।

কার্তিক গুরুগম্ভীর ভাবটা কাটবে বলে প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে নেওয়ার জন্য বলল—জানিস তো, ভাদু জেলে সমাজের একটা উপকার করে, সেটা হল

প্রতিদিন বিলের থেকে অনেক কাঁকড়া ধরে, তাতে ধানের জমি বেঁচে গেল আর দ্বিতীয়টা হল গ্রামের লোকেরা কাঁকড়ার ঝোল খেয়ে ক্যানসারের হাত থেকে রেহাই পেল।

শঙ্কর বলল—ঠিক বলেছিস। ওর হাঁড়িতে শতকরা নিরানব্বই দিনই কাঁকড়া থাকে। বড় বড় রাম কাঁকড়া। খেয়াল করে দেখবি বেটার সারা গায়ে কাঁকড়াগুলি হাঁটতে থাকে যেন একঝাঁক কাঁকড়ার একটা ঢিপি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

ঘনা, শঙ্করের মুখের কথাটাকে কেড়ে নিয়ে বলল—পাড়ার যত কুচো ছেলে-পুলে ভাদুর পিছু পিছু ছোটে। কাঁকড়া নিয়ে ওদের কত মজা, কেউ কাছা ধরে টানছে, কেউ কাঁকড়া ধরে নিচ্ছে। আর ভাদু হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে ছেলেপুলেকে তাড়া করছে।

এই কাঁকড়ার প্রসঙ্গ শুনে হরিলাল বাঘ আর থাকতে পারল না। সবে আসরটা গমগম করেছে, আর তখনই একটা ধমক দিয়ে বলল—কি দেখেছিস কাঁকড়া? তাহলে শোন আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা।

সবাই চুপ।

ঘনা সাহস করে বলল—ভাদু জেলে যে রাম কাঁকড়া ধরে, এতবড় বড় রাম কাঁকড়া কিন্তু কোথাও দেখা যায় না।

ঘনার কথায় হরিলাল বাঘ আরও বেশি বোধহয় চটে গেল, কিন্তু প্রকাশ করল না। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল—তোরা জীবনে কি দেখেছিস। ভাদুর হাঁড়িতে কটা কুচো কাঁকড়া ছাড়া!

কার্তিক পাশ থেকে বলল—কুঁচো নয় দাদু? বড় বড় রাম কাঁকড়া।

হরিলাল বাঘ এইসব কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগল—সে বহু বছর আগের কথা, তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সেই সময় আমরা কাঁকড়াডাঙ্গার বিলে যেতাম মাছ ধরতে। সেখানে আমাদের অবশ্য কয়েক বিঘা জমিও ছিল। আর আমাদের বাড়ির বিলটি উত্তর দিকে ছিল, আর বিলের পশ্চিম পাড়ে ছিল হরিহর সাহার ভেড়ি। আর সেই ভেড়ির পাশেই ছিল সরকারি একটা মৎস্য গবেষণাগার। ভেড়িতে আমি হামেশাই যেতাম কিন্তু ওই গবেষণাগারের ভিতরে ঢুকতে দিত না কোন লোকজনকে।

নিমাই-এর মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেল—তোমাকেও ঢুকতে দিত না?

—আমাকে দেবে না কেন! আমার সঙ্গে তো ডঃ মালহোত্রার ভালো ভাব ছিল।

—ডঃ মালহোত্রা কেমন লোক ছিল, উনি কি করতেন? ঘনা বলে বসল।

—উনিই ছিলেন বিজ্ঞানী, মৎস্য গবেষক, তাঁর নেতৃত্বে এখানে গবেষণা হত।

—প্রধানত এঁরা মাছ নিয়েই গবেষণা করতে এসেছিল কিন্তু এই বিলে প্রচুর কাঁকড়া ছিল, তাই ড: মালহোত্রার ইচ্ছে হয়েছিল, মাছ নয়, কাঁকড়া নিয়ে গবেষণা করার।

শঙ্কর বলল—সেটা কিরকম গবেষণা দাদু?

—তাই তো বলছি, মন দিয়ে শোন। একদিন শীতের সকালে খেজুরগুড়ের পাটালি আর উড়িধানের মুড়ি নিয়ে যখন ড: মালহোত্রাকে দিলাম খুব খুশি হয়েছিল, এরকম মাঝেমধ্যেই এটা-ওটা দিতাম। তাই আমাকে একটু বেশি খাতির করত। আর এই সুযোগে ড: মালহোত্রাকে বললাম—আপনারা কাঁকড়া নিয়ে যে গবেষণা করছেন, সেটা কি ধরনের কাঁকড়া হবে আর কি কাজে লাগবে। তখন মালহোত্রা বলল—তুমি দেখবে? আমি তো উৎসাহ নিয়ে বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় দেখব। বলল—তাহলে আমার সঙ্গে এসো দেখবে। মালহোত্রা আমাকে নিয়ে গেল আন্ডারগ্রাউন্ডে। সেখানে গিয়ে দেখি এলাহী কাণ্ড। না দেখলে বিশ্বাস করবে না। নানা রঙের কাঁকড়া। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ—আরো কত রকমের যে হিসাব নেই।

ঘনা বলে বসল—স্বপ্ন দেখছিলেন না তো?

হরিলাল বাঘ বড় বড় চোখ করে ঘনাকে দেখতেই শঙ্কর ঘনাকে ধমক দিয়ে বলল—চুপ কর না। কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটা তোর একটা বদ অভ্যাস!

হরিলাল বাঘ একটু নরম হয়ে বলতে লাগল—সেখানে শুধু নানা রঙের কাঁকড়াই নয়। ছিল সামুদ্রিক বড় বড় এক-একটা শঙ্কর মাছ।

এই কাঁকড়া আর শঙ্কর মাছ নিয়েই ছিল তাঁর মূল গবেষণা। আর ওদের ক্রসবিট করে একটা নতুন ধরনের কাঁকড়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই কাঁকড়ার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল—এই কাঁকড়াগুলির বয়স হবে এক একটা শঙ্কর মাছের বয়সের প্রায় সমান বা বেশি এরা আকারে কত বড় হবে তা বলতে পারব না, তবে আশা করা যায় অনেক বড় হবে। এরা মানুষের কথা বুঝতে পারবে। আর এদের ঠ্যাং থেকে ক্যান্সারের ঔষধ তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিমাই একটু অবাক হয়ে বলল—মানুষের কথা বুঝতে পারবে?

—আমি সেখান থেকেই কতগুলি বাচ্ছা কাঁকড়া চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

ঘনা বলল—কি করলে কাঁকড়াগুলি ভাজা খেয়ে ফেললে? না কি...

হরিলাল বাঘ ঘনাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে বলল—ওগুলি নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ির পিছনে বড় পুকুরে ছেড়ে দিলাম।

তারপর কি হল বলে নিমাই অনেকটা জানার আগ্রহ প্রকাশ করল।

হরিলাল বাঘ বলল—প্রায় ছয় মাস কেটে গেল. কিছুই দেখতে পেলাম

না, তখন পুকুরের জল অনেক কম। আমি ভাবলাম ওরা হয় মরে গেছে না হলে হেঁটে হেঁটে কোথাও চলে গেছে।

গোপাল এত সময় চুপ করে শুনছিল, এই সুযোগে বলে বসল দেখলে তো সব ফাঁকা আওয়াজ। কিছুই হল না তো।

হরিলাল বাঘ ওর কথায় কান না দিয়ে বলল—তখন আষাঢ় মাসের প্রচণ্ড গরমে টিকতে পারা যাচ্ছিল না আর সেই সময় হঠাৎ করে একদিন রাতে প্রবল বৃষ্টি সারা রাত ধরে চলল। ঘুমও খুব ভাল হল। ভোরবেলায় উঠে দেখি উঠোন ভর্তি বড় বড় নাদার মত কি যেন হাঁটা হাঁটি করছে। অবাক হয়ে গেলাম, এগুলি কি! সাহস করে নিচে নেমে আসতেই দেখি ওরা আমার দিকে এগোচ্ছে। প্রথমটা ভয় পেলেও ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখি এরা তো সেই কাঁকড়াগুলো। ছয় মাসে এত বড় হয়ে গেছে। আমি তখন আনন্দে আত্মহারা।

ঘনা বলল—তারপর কি করলে কাঁকড়াগুলোকে?

—ওরা আমার কাছে আসতেই গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বললাম—তোরা এত বড় হয়ে গেছিস, আমি একদম বুঝতে পারিনি।

গোপাল জিজ্ঞাসা করল—কাঁকড়াগুলি তোমার কথা শুনে কি করল?

—ওরা কি কথা বলতে পারে? পাশ থেকে নিমাই বলল।

—ওরা মানুষের মত কথা বলতে পারে না তবে আমাদের সব কথা বুঝতে ওদের অসুবিধা হয়নি। বড় দুটি ঠ্যাং, ওদের হাতের কাজ করে। আর এই হাত নেড়েই আমাকে সব কথার মানে বুঝিয়ে দিল। প্রথমে একটু অসুবিধা হয়েছিল, পরে সব ঠিক হয়ে গেছে। যেমন ধর, বানর, মহিষ, টিয়া, ময়না, গরু, কুকুর এরা সবাই মানুষের কথা বোঝে, প্রায় সেইরকমই।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল—তারপর কি হল?

—ওদের নিয়ে সকাল থেকেই সারা পাড়ায় মানুষের বিশাল উৎসাহ। নানা লোকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। আমি কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই চেপে গেলাম।

—ঘনা জিজ্ঞাসা করল—ওদের কি খেতে দিলে? শত হলেও তো নতুন অতিথি।

—বস্তা ভর্তি আলু ছিল, তাই বের করে দিলাম। ওরা মহানন্দে খেতে লাগল। ওরা কাঁচা আলুই বেশি পছন্দ করে।

গোপাল বলল—আলু খেয়ে ওরা কোথায় গেল?

—ওদের বিলে চরাতে নিয়ে গেলাম আমার পিছু পিছু লাইন ধরে চলতে লাগল। গিয়ে সোজা কাঁকড়াডাঙার বিলে নিয়ে ছেড়ে দিলাম।

অবাক হয়ে নিমাই বলল—ছেড়ে দিলে?

—আরে বললাম তো চরানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। ওরা তো আর গরু-মহিষের মত ডাঙায় চরে ঘাস খাবে না। বিশাল বিলে নতুন বৃষ্টির জল পেয়ে

ওদের খুব আনন্দ, সবাই মিলে খেলতে শুরু করে দিল। বিলের পাড়েও হাজার হাজার মানুষ এই দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল। দেশ-বিদেশে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল।

—তারপর কি হল? গোপাল বলল।

—ঘণ্টাখানেক পরে উঠে আসতে বলতেই ওরা জল থেকে উঠে এল। আর আমি ছাতা মাথা দিয়ে সব থেকে বড় কাঁকড়ার পিঠে উঠে বসে সোজা বাড়িতে।

কাঁকড়ার পিঠে চরে বাড়িতে! সকলেই প্রায় চোখ কপালে উঠিয়ে বলল।

হরিলাল বাঘ শান্ত গলায় বলল—অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। মানুষ ঘোড়া, মহিষ, গাধার পিঠে চড়তে পারে আর আমি কাঁকড়ার পিঠে চড়ে বাড়ি ফিরতে দোষ কোথায়?

শঙ্কর সুর মিলিয়ে বলল—না না দোষের কিছু নেই।

ঘনা এবার খোঁচা দিয়ে বলল—এরা তোমার কোনও কাজ করে দিত?

—কাজ করবে না কেন? সমস্ত গৃহপালিত জন্তুদের মতই কাজ করত। মাঠ থেকে ফসল পিঠে করে বাড়িতে আনা, জলাজঙ্গল সাফ করতে আর জলা জমি চাষ করতে ওস্তাদ ছিল। ওদের সামনের দুটি ঠ্যাং যেন ট্রাক্টরের ফালের থেকেও শক্ত ছিল।

গোপাল জিজ্ঞেস করল—কাঁকড়াগুলি কতদিন বেঁচে ছিল?

—ওরা প্রায় বাইশ বছর বেঁচে ছিল যা একটা বলদের বয়সের সমান।

এদিকে আসর ভাঙার সময় হয়েছে। দুই-একজন ওঠার জন্য উসপিস করছে —সেই মুহূর্তে ঘনা বলে বসল—বুড়োর গল্প শুনে কাম নেই বাড়ি চল। অনেক রাত হল!

হরিলাল বাঘ চটে গিয়ে বলল—আমি সব শুনতে পাই, তোরা কি ভেবেছিস শুনতে পাই না!

ঘনা যদিও কথাটা একটু আস্তেই বলেছিল, হরিলাল বাঘ শুনতে পারায় একটু আমতা আমতা করে বলল—দাদু আমি ওভাবে বলিনি যে...

হরিলাল বাঘ থামিয়ে দিয়ে বলল—থাক থাক তোরা প্রমাণ চাইছিস তো? তাও আছে। ওই দেখ নাদাটা—ওটা হল সেই কাঁকড়ার খোল, আর তার পাশেই কয়েকটা কাঁকড়ার ঠ্যাঙ পরে আছে।

শঙ্কর উঠে গিয়ে দেখল বহু পুরোনো প্রায় অর্ধেক ভাঙা, কিছুটা মাটিতে ঢুকে থাকা কালো একটা নাদা পড়ে আছে আর তার পাশেই পরে আছে ভাঙা লাঙ্গলের কয়েকটা টুকরো, উঁইপোকায় খেয়ে এমন করে দিয়েছে যা দেখতে অনেকটা কাঁকড়ার বড় ঠ্যাঙ দুইটির ভাঙা অংশ বলে মনে হতে পারে।

মোবাইল ফোন

রতনকুমার মৃধা

এক

ছোট থেকে সঙ্গীতা কখনো বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে গল্প-টল্প করে সময় নষ্ট করেনি। কারণ জ্ঞান হওয়া থেকে সঙ্গীতার বাবার মুখে একটা কথাই ছিল, 'কষ্ট করে নিজে পড়াশুনা করে বড় হতে হবে। আমার ভাগ্যে পড়াশুনার সুযোগ আর হল না। আমাদের এই অভাবের ছোট সংসারের গৌরব, সুখ, আনন্দ, উজ্জ্বল করবে তোমরা তার জন্য আমি যতই পরিশ্রম করি না কেন তাতে আমার কোনো কষ্ট হবে না। সেই কষ্ট আমার কাছে এক বড় আনন্দ।'

সঙ্গীতা খুব মেধাবী ছাত্রী। স্কুলের শিক্ষকদের খুব প্রিয়। দেখতে সুন্দরী ও স্বল্পভাষী। মনে হয় গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে। সঙ্গীতার কাছে সব থেকে বড় কর্ম—পড়াশুনা। প্রিয় বন্ধু তার একমাত্র বই। সময়ের অবসরে মাকে একটু সাহায্য করা। সঙ্গীতা দশম শ্রেণির ছাত্রী। ছোট ভাই রাহুল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। ছাত্র হিসাবে খুব ভাল। বাবা বিজেন্দ্রনাথ বড়ুয়া। অতীব ভদ্র-নীতিবান লোক। পেশায় ট্রাকচালক। বিষয়-সম্পত্তি নেই বললেই চলে। সততাই তার কাছে বড় সম্পদ। সহজ-সরল সৎভাবে তার জীবন। কোনো কষ্ট নেই। ইচ্ছে তার একমাত্র ছেলে-মেয়েকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। গ্রামবাসীদের কাছে খুব প্রিয়। ট্রাকচালক অনেকে খুব খারাপ ভাবে বলে অথচ উনি সম্পূর্ণ আলাদা জগতের লোক। ঠিকভাবে বাড়িতে আসতে পারেন না। খিদিরপুরের মালিকানাধীন হয়ে ট্রাকে মাল নিয়ে বহুদূর চলে যান। তাই মাঝে মাঝে বাড়ির জন্যে ব্যাকুল হয় মন। ক্লান্তির অবসরে মনে পড়ে বাড়ির কথা, জানতে ইচ্ছে করে তাঁরা কেমন আছে? কি করছে? যন্ত্রনা চাপা হৃদয়ে মনে মনে ভাবছেন এবারে একটা মোবাইল ফোন বাড়িতে দিলে হয়ত প্রতিদিন সংবাদ নিয়ে নিজেকে শান্তি দিতে পারবে। তাহলে কোনো অসুবিধাও আর থাকবে না। বাড়িতে এসে একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করে মেয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'দূরে থাকি, প্রতিদিন বাড়িতে আসা সম্ভব নয়। কলকাতা থেকে দূরে চলে গেলেও সংবাদটুকু নিয়ে আমি শান্তি পাব।' মেয়ে সঙ্গীতাকে মোবাইল ফোনটি দিয়ে ডায়াল, রিসিভ করা শিখিয়ে দিল। কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা বলে দিয়ে বাবা সঙ্গীতাকে বলল, 'ফোন কিন্তু উপকারের থেকে জীবনে সর্বনাশের পথ তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে। যদি না সেটা আনন্দ বা উপহাসের জন্য ব্যবহৃত হয়।' তবে বিশেষ দরকারে ফোন খুব উপকারী বন্ধু। নানাভাবে উপমা দিয়ে সঙ্গীতাকে বুঝিয়ে বলল, সঙ্গীতা বললো,

'বাবা! কোনো চিন্তা করো না। আমরা কখনো তোমার মনে আঘাত দেব না। কখনো অবাধ্য হব না। এ বিশ্বাসটুকু রাখ। তোমার ইচ্ছে পূরণ করব'।

বাবা বললেন, 'ভয় সেখানে নয়, তুমি বড় হয়েছ, আমি বাড়িতে তোমাদের পাশে থাকতে পারি না। তোমার মা একা কিভাবে সামলাবে।'

সঙ্গীতা বলল, 'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবে। আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি।'

বাবা বলল, 'ওই তো একমাত্র ভরসা। আমি প্রতিদিন রাতে নটার সময়ে তোমাদের কুশল জেনে নেব। আর কাউকে নম্বর দেবে না। নিজস্ব লোক ছাড়া কাউকে নম্বর দেবে না।'

সঙ্গীতা মনে মনে ফোন পেয়ে আনন্দ হল। বাবার সাথে প্রতিদিন কথা বলতে পারবে। পরদিন ইস্কুলে যাবার পথে প্রিয় বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা ও সাথীকে নম্বর দিলো। পাশাপাশি বাড়ি, একই ক্লাসে পড়ে। 'বিশেষ দরকার হলে ফোন করবি। নম্বর কাউকে দেব না।' সঙ্গীতার কাছে মোবাইলের গুরুত্ব একমাত্র বাবার সাথে কথা বলার জন্য।

দুই

মাস দুয়েক পরে সঙ্গীতা প্রতিদিনের মতন সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে বই নিয়ে পড়তে বসেছে। হঠাৎ করে এক সময়ে 'বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও...।' ফোন বেজে উঠছে। মোবাইলটি তখন বিছানার উপরে। সঙ্গীতা তখন বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকাল। স্ত্রিনে ভেসে উঠেছে অজানা এক নম্বর। নম্বর দেখে বাবার কথা স্মরণ করে ফোনটি রিসিভ করল না। কিছুক্ষণ পরে আবার একটানা বেজে চলেছে। বালিশ চাপা দিয়ে রেখে দিল শব্দ না কানে আসে। বইয়ের পাতায় মন দিল। সঙ্গীতা ফোন আর তুলল না। ঘড়ির কাঁটা নয়টার ঘরে আসতেই ফোনটি হাতের কাছে রাখল, কারণ বাবা এখুনি ফোন করবে। তখন রাহুল ও মা পাশে এসে দাঁড়ায় ফোনে কথা বলার জন্য। বাবার সাথে কথা হলে ফোনটিকে বন্ধ করে রাখে। পরপর চারদিন হয়ে গেল এই অজানা নম্বর থেকে উড়ো ফোনটি আসে ঠিক রাত আটটা বাজতেই। আজ ফোনটি আসার সাথে রিসিভ করে ছোট ভাই রাহুলের কানে চেপে ধরল। রাহুল জানতে চাইল—হ্যালো, কে বলছেন?

উঃ—তোমার দিদিকে দাও।

রাহুল—আপনি কে বলছেন?

কোনো জবাব না দিয়ে লাইনটি কেটে দিল। সঙ্গীতা মনে মনে ভাবল এটা কোনো ভালো ছেলের নয়। মাকে ফোন আসার ব্যাপারটা বলল। মা সঙ্গীতাকে বলল—ঠিক আছে, একবার রিসিভ করে কথা বলো। কে করেছে? কেন? কি

বলতে চায়? একবার দ্যাখো না। সেভাবে বুঝলে বলবে আর কোনোদিনও ফোনে ডিস্টার্ব না করতে।

সঙ্গীতা আজ নিজেই কথা বলবে। কখন ফোন আসে অপেক্ষা করতেই বেজে উঠেছে মোবাইল। রিসিভ করে সঙ্গীতা। জানতে চেয়েছে—হ্যালো। কে বলছেন?

—আমি বলছি।

—আমি কে? একটা নাম তো থাকে।

—সঙ্গীতা আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

—ঠিক আছে। আপনি কে বলছেন? সেটা তো বলুন।

—আমি সমীরণ বলছি।

—আমি কোনো সমীরণ-টমীরণ চিনি না।

সঙ্গীতা একথা বলে মোবাইলের লাল বোতাম টিপে দিয়ে ফোনটা কেটে দিল। একটু পরেই আবার ফোন বেজে উঠল ওই নম্বর থেকে। সঙ্গীতা রিসিভ করে বলল—এভাবে আর ডিসটার্ব করবে না। খানিক পরে ফোন আসে বাবার। পরিবারের সকলের সাথে কথা বলার পর ফোনটি সুইচ অফ করে দিয়েছে। সঙ্গীতার সাথে বাবার অনেক সময় কথা হয়েছে। বাবা সঙ্গীতাকে অনেকভাবে উপদেশ দিয়েছে, বলেছে—আমি তোমাদের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছি। মায়া-মমতা, স্নেহ সবকিছু ফেলে রেখে রাস্তায় রাস্তায় ইঞ্জিনের ব্রেক হাতে চেপে চলছি। পড়াশুনা করবে মন দিয়ে। কারও সাথে বন্ধুত্ব করবে না। বন্ধুত্ব করার বয়স এখনও তোমার হয়নি। তার সময় জন্য অনেক। সঙ্গীতা বুঝতে পারছে বাবা ফোনটি দিয়ে আরও চিন্তা করছে ওর জন্য। বাবা সব কথা বলেও নিজেকে দুশ্চিন্তা থেকে দূরে রাখতে পারছে না, কারণ মেয়েটি অনেক বড় হয়েছে। অর্থ উপায়ের একমাত্র উপায় এই ট্রাকের ড্রাইভারি। এ ভিন্ন তো অন্য পথ দেখছে না। সন্তানদের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারলে তাঁর কাছে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। মাঝে মাঝে ভাবছে—বর্তমানে মোবাইলের যুগ। আর এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উড়ো বন্ধু জুড়ে বসে সে রকম কিছু না হয়। আনন্দ-উপহাসের মধ্যে সব কিছু নষ্ট করে দেয়। অনেকের জীবনে এই ফোনের দ্বারা সবকিছু হারাতে হয়েছে। সঙ্গীতার উপর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে আতঙ্কে কাটে। যত ভয় বখাটে ছেলেদের নিয়ে। তারা পড়াশুনা না করে মোবাইল হাতে নিয়ে নম্বর সংগ্রহ করে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বিরক্ত হয়। আবার কেউ বন্ধুত্ব করে ডেকে জীবনের সর্বনাশ। সঙ্গীতার বাবা চারদিকের ঘটনার সাক্ষী দেখে এগুলো ভেবে হতাশায় ভুগছে। আবার নিজেকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চুপ করে থাকে।

সেদিন ছিলো বুধবার। প্রতিদিনের মতন দশটার সময় সঙ্গীতা স্কুলে রওনা দিল। বাড়ি থেকে প্রায় দূরত্ব এতটা স্কুলে পৌছতে পঁচিশ মিনিট সময় লাগে। সাথী ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তিনজনে একত্রে যাতায়াত করে। সেদিন প্রিয়াঙ্কা ও সাথী স্কুলে যেতে পারেনি। সঙ্গীতা একা স্কুলে যাবে না এরকম ইতস্তত করে ভেবে দেখল বিজ্ঞান শিক্ষক অনুকূল দত্ত স্যারের প্রাকটিক্যাল ক্লাস। না গেলে খুব অসুবিধে হবে। আর কোনো চিন্তা না করে সঙ্গীতা স্কুলের পথ ধরে হেঁটে চলেছে। মনে মনে ভাবছে, মাঝপথে চলে গেলে অন্য রাস্তা দিয়ে অনেক মেয়েরা আসে তখন আর ভয় থাকবে না। অনেক সঙ্গী পেয়ে যাবে।

মাঝপথে এসেই সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুলে আসে এবং ক্লাস শেষে একত্রে অনেকে আসে। সঙ্গীতা তারপর একা। ওরা সবাই পূর্বদিকের রাস্তায় চলে গেল। সঙ্গীতা একা আপনমনে নীচের দিকে চোখ রেখে হেঁটে চলছে। অনেকটা দূরে আসার পর রাস্তার পাশেই বটগাছের নীচে তিন-চারটি ছেলে হাসি-ঠাট্টা করছে। কাছে আসা মাত্রই একটি ছেলে বলল, 'ফোন করলে ফোন কেন রিসিভ করছ না? সঙ্গীতা চোখ তুলে একবার আপাদমস্তক দেখে মাথা নীচু করে হেঁটে চলছে। পিছনে পিছনে অনেক কথা বলছে। শেষমেশ বলল, 'রাতে ফোন করব। কথা বলতে ভুল না হয়।' সঙ্গীতা কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে হেঁটে চলেছে। বাড়িতে এসে মাকে সে কিছুই জানাল না। মা খুব চিন্তা করবে। সঙ্গীতার মনে একটা আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। হয়ত সঙ্গীতা কোনো কথা বললে ওরা আরও সাহস পেয়ে যাবে। সঙ্গীতা একবার তাকিয়ে ছেলেগুলো খুব খারাপ তা বুঝতে পেরেছে। চোখে-মুখে ওদের একটা জঘন্য ছাপ পড়ে আছে। ভয়ের একটা আতঙ্ক মনে দাগ কেটেছে। ছেলেগুলো কি করে মোবাইল নম্বর পেল? এটাই ভাবতে পারে না। কাউকে চিনতে পারছে না। কোন বাড়ির ছেলে। রাত আটটা বাজতেই ফোন বেজে উঠেছে। রিসিভ না করে কেটে দিল। ভাবল এভাবে কেটে দিলে আরও উত্তপ্ত হবে। তার থেকে আবার ফোন করলে বুঝিয়ে বলতে হবে আমাকে বিরক্ত না করার জন্য। কিন্তু ভাবনার মধ্যেই ফোন বেজে উঠল। সঙ্গীতা ফোন রিসিভ করে জানতে চাইল, তা হলে তুমিই তো সমীরণ?

—হ্যাঁ, আমি।

সঙ্গীতা—আমাকে বিরক্ত করবে না।

সমীর—বিরক্ত আর কোথায় করলাম। আমি তো তোমাকে ভালবাসি।

সঙ্গীতা—বখাটে ছেলেদের আর কি-বা কাজ।

সঙ্গীতা আর কোনো কথা না বাড়িয়ে মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল। সর্বদা পড়াশুনার চিন্তা। সবকিছু মাথা থেকে দূর করে বইয়ের পাতায় মন দিলো।

ঘণ্টাখানেক পরে বাবার ফোনের জন্য মোবাইল অন করল। বাবা ফোন করে বিস্তারিত খবর নিতে বাবার কথা শেষ হলেই মোবইল বন্ধ করে দিল। পরদিন সাথী, প্রিয়াঙ্কা একত্রে স্কুলে আসে। সঙ্গীতার ইচ্ছে ছিল আজ একা স্কুলে আসবে না যদি প্রিয়াঙ্কা ও সাথী না আসে। একত্রে তিনজনে স্কুলে আসার পথে সঙ্গীতা সাথী ও প্রিয়াঙ্কাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার নম্বর কাউকে দিয়েছে কিনা?' সাথী ও প্রিয়াঙ্কা বলল না, না কাউকে দেয়নি। আর কাকে দেব। কেন, কি হয়েছে? জানতে পেরে সঙ্গীতা কিছুই বলল না। শুধু বললো—না, তেমন নয়। কাউকে দিসনি তো। সাথী ও প্রিয়াঙ্কা তেমনভাবে আর জানার জন্য আগ্রহ করল না। আগ্রহ বোধ করলেও সঙ্গীতা বলত না। কারণ ওরা অন্যভাবে হয়ত ভাববে। এদিন স্কুল থেকে এসে ফোন বন্ধ করে রাখে। সেই রাত নয়টার সময় বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্য অন করে। সমীরণ আর ফোনে না পেয়ে স্কুলপথে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস পাচ্ছে না। যেহেতু সঙ্গীতা একাকী থাকে না।

তিন

বেশ কিছুদিন এমনিভাবে কেটে গেল। সমীরণ মোবাইলের সুইচ অফ পাচ্ছে কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কখনো ভুল হচ্ছে না। ছেলেটি একদিন স্কুলে আসার পথে তিনজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সঙ্গীতার প্রতি দৃষ্টি রেখে বলল—মোবাইল কেন বন্ধ? তুমি কি তোমার মোবাইল বন্ধ রেখে আমাকে দূরে ফেলতে পারবে? আমি যে তোমাকে চাই। প্রিয়াঙ্কা ও সাথীরা আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রিয়াঙ্কা জানতে চাইল, 'আচ্ছা তোমাকে মোবাইল নম্বর কে দিয়েছে? সমীরণ বলল, 'যাকে ভালবেসে কাছে পেতে চাই আমি তার কুষ্ঠিবিচার অনেক ভাবেই খুঁজে পাই। প্রিয়াঙ্কা মনে মনে ভাবল তা হলে সেদিন সঙ্গীতা এইজন্য মোবাইল নম্বরের কথা জিজ্ঞাসা করল। সাথী বলল, 'ভালবাসা কি হাতের মোয়া? রাস্তায় বসে চেয়ে নিলে আর হাতে পেয়ে গেলে সে তো নয়। তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হয়।' কথাটি শেষ করতেই পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তি নিশিকান্ত অধিকারী ওই পথ দিয়ে আসে। ছেলেগুলো নিশিকান্তবাবুকে দেখা মাত্র কোথায় চলে গেল। কারও মুখ দেখতে পারল না। নিশিকান্তবাবু ওদের কাছে জানতে চাইল 'কি ব্যাপার?' ওরা ঘটনাটা বলল। কাউকে চেনে কিনা? বলল, 'আমাদের পাড়ার ছেলে নয়। নিশিকান্তবাবু বলল, 'ব্যাপারটা ভাল নয়। এতবড় সাহস কি করে হল? তোমরা স্কুলে যাও। আমি হেডমাস্টারের সাথে কথা বলব। নিশিকান্তবাবু গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। নিশ্চয়ই একটা বিহিত করবে।

প্রিয়াঙ্কা ও সাথীর কাছে সঙ্গীতা ব্যাপারটি সব খুলে বলার পরে ওরা হতবাক। চিন্তা করতে পারছে না কি করবে। প্রিয়া৪ঙ্কা ও সাথী বলল,

'হেডস্যারের কাছে বলতে হবে না হলে আজকের পর ওদের আরও সাহস বেড়ে যাবে। না হয় তোর বাবাকে বিষয়টি বলতে হবে', সঙ্গীতাকে বলল। প্রিয়াঙ্কা ও সাথী সঙ্গীতাকে বলল, 'আজ মোবাইল খুলে রাখবি ফোন করলে ভদ্রভাবে বলে দিবি। তুমি ভালো কাজ করছ না। স্কুলে জানিয়ে দেব। কোথায় বাড়ি তার জানার চেষ্টা করবি।' ওদের কথা অনুসারে মোবাইল অন করে রাখল। সন্ধ্যা হবার শুরুতেই ফোন করল। সঙ্গীতা রিসিভ করে বলল, 'হ্যালো কে বলছেন?'

সমীরণ—আমি সমীরণ বলছি।

সঙ্গীতা—তোমার বাবার নাম কি?

সমীরণ—ওসব পরে জানাব।

সঙ্গীতা—শোন ভাই, পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে থেকে যারা মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করে কিংবা মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে বিরক্ত করা যাদের স্বভাব তারা বিকৃতি রুচির অসভ্য, জানোয়ার ভিন্ন অন্য কিছু নয়। মেয়েরা মায়ের মতন। মা ভাবতে শেখো। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে খারাপ ছাড়া আর কি হবে। নিজেকে সাবধান করো। মন খারাপ হলে মায়ের কাছে বসো। মাতৃস্নেহ পেলে নিজেকে অসভ্যতার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। কথাগুলো মনে থাকে যেন। আর কখনো ফোন বা পথে-ঘাটে দাঁড়াবে না। সঙ্গীতা কথাগুলো শেষ করতেই মোবাইলের লাইন কেটে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে সমীরণ ফোন করে। সঙ্গীতা রিসিভ করে বলল, 'এতক্ষণ যা বললাম তোমার মগজে ঢোকেনি।'

সমীরণ—একটা কথা বলার জন্য।

সঙ্গীতা—বলে ফেলুন।

সমীরণ—বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সঙ্গীতা—তোমাকে ভালোবাসার শিক্ষা ভালো করে দেব। আগামী দিনে স্কুলে যাই। অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার? বলে মোবাইল অফ করে দিল।

সঙ্গীতার মনে একটা আতঙ্ক, অপমানের চিন্তা বারবার হৃদয়ে বিদ্ধ করে চলেছে বুঝে উঠতে পারছে না। এবার সঙ্গীতা, প্রিয়াঙ্কাকে সব খুলে বলল। ওরা বলল ছেলেগুলো আদৌ ভালো নয়। তোর বাবাকে আসতে বল এবং সবকিছু খুলে বল। স্কুল থেকে এসে প্রিয়াঙ্কা, সাথী সঙ্গীতার বাড়িতে এসে সঙ্গীতার মাকে সব খুলে বলার পর মা বড়ো চিন্তিত হয়ে পড়ল। সঙ্গীতার মা বলল, 'তোর বাবা রাতে ফোন করলে, বাবাকে আজকালের মধ্যে আসতে বলব। সঙ্গীতার কোনো কিছু আর ভালো লাগছে না। বাবার ফোনের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে করতে বাবার ফোন আসে। ফোন রিসিভ করেই সঙ্গীতা বাবাকে বলল, 'বাবা তুমি দু-একদিনের মধ্যে চলে এসো। তোমাকে খুব দরকার। বিস্তারিত সব

সাক্ষাতে বলব। আমরা সবাই ভাল আছি।' বিজেন্দ্রবাবু খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বিজেন্দ্রবাবু বলল, 'আগামী পরশুদিন চলে আসব। কোনো চিন্তা করো না। মালিকের কাছে ছুটি নিয়ে চলে আসছি।' সঙ্গীতা খুব মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছে। সেদিন আর স্কুলে যায়নি। বাবা সকালবেলা বাড়িতে চলে আসে। সঙ্গীতা বাবাকে কিভাবে বলবে ভেবে উঠতে পারছে না। সঙ্গীতা ইতস্তত বোধ করছে দেখে সঙ্গীতার মা বলল, 'সঙ্গীতার কাছে জেনে নাও। সঙ্গীতা ভাল করে বলতে পারবে।' সঙ্গীতাকে বাবা বলল, 'নিজেদের পরিবারের মধ্যে নিজেদের মত আপন বন্ধু আর হয় না। সন্তান যখন ষোল বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তখন বাবা-মাকে বন্ধু ভেবে সবকিছু জানাতে হয় তা না হলে বিপদের মধ্যে নিজেকে ঠেলে দিয়ে হয়। বাবা-মার থেকে বড় বন্ধু আর কেউ হতে পারে না।' সঙ্গীতা বাবাকে সব কিছু জানাল। বাবা জানতে চাইল তাদেরকে চেনে কিনা? মোবাইল নম্বর কিভাবে পেল? সঙ্গীতারও একই প্রশ্ন। সে কাউকে চেনে না বরং কখনও দেখেনি।

বিজেন্দ্রবাবু খুব চিন্তিত হয়ে সঙ্গীতা ও রাহুলকে কাছে ডেকে বলল, 'মন দিয়ে পড়াশুনা করো। কখনো কাউকে প্রতিবাদ করবে না। বোবার কিন্তু শত্রু থাকে না। শিক্ষিত সন্তানের দ্বারা গোটা পরিবার উজ্জ্বল হয়। গুণবান ও বুদ্ধিমান সন্তানই তো দেশে আলো ছড়াতে পারে।' আমি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি তোমাদের জন্য, আমার কর্ম তোমাদের স্পর্শ না করে। এ বিশ্বাসটুকু আমার আছে। তোমরা তোমার বাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। যা কিছু ঘটে আমার কাছে জানাবে, আমি যা করার করব।' বিজেন্দ্রবাবু সন্তানদের কাছে এ কথাগুলো বলে নিশিকান্তবাবুর কাছে গিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করল, 'স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে একান্তভাবে জানাতে হবে। দুজনে স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের কাছে বিস্তারিত বলার পরে হেডমাস্টারে বলল, 'ব্যাপারটি নিয়ে কাউকে কিছু বলতে হবে না। বাজে ছেলেরা বেশি একটা উত্তপ্ত হল হয়ত বা লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক ঘটনা ঘটাতে পারে। ইংরেজি শিক্ষক হরনাথবাবু আপনাদের ওই পথ থেকেই আসে। উনি সঙ্গে থাকবেন। বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে একটু অপেক্ষা করে নিয়ে আসবে। স্কুল ছুটি হলে একত্রে চলে যাবে।' বিজেন্দ্রবাবু বলল, 'এভাবে কতদিন চলবে?' হেডমাস্টার এবং অন্যান্য শিক্ষকরা বলল, 'এই ভয়ে তো একটা ভালো মেয়ের সর্বনাশ হোক এটা তো আমরা আশা করি না। ছেলেটির পরিচয় জানত পারলে অন্যভাবে একটা ব্যবস্থা করা যেত। আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না।' সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বিজেন্দ্রবাবুকে তার কর্মস্থানে যেতে বলেন।

চার

বিজেন্দ্রবাবু বাড়িতে এসে নিজেকে একটু স্বস্তিবোধ করলেন। প্রিয়াঙ্কা ও সাথীর

বাবা-মাও ভরসা দিলেন। আমরা তো সবাই মেয়েদের বাবা-মা, আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। বিজেন্দ্রবাবু পরদিন ভোরে আবার কাজে চলে গেলেন। হরেনাথবাবুর সাথে প্রতিদিন প্রিয়াঙ্কা, সাথী ও সঙ্গীতা স্কুলে আসা-যাওয়া করে। সঙ্গীতা মোবাইল সুইচ অফ করে রাখে। সেই রাতে অন করে। অন করলে অনেক মিসড কল দেখা যায়। সেদিন থেকে আর কখনো ওই ছেলেগুলোকে দেখছে না এবং ফোনেও পাচ্ছে না। কিন্তু ছেলেটির কি মানসিকতা কেউ বুঝতে পারছে না অথচ সঙ্গীতার মনের ভিতর একটা আতঙ্ক থেকেই আছে। স্যারের জন্য হয়ত বা রাস্তায় দেখা যায় না কিন্তু ও যে নিজেকে সচেতন করেছে আমার বিশ্বাস হয় না। প্রিয়াঙ্কা ও সাথী বলল, 'সত্যি আমাদেরও তাই মনে হয়, কারণ যে ধরনের স্বভাব দেখলাম একেবারেই চরম অসভ্যের মত। যাক এখন তো আমাদের অসুবিধা নেই, আমরা একটু সাবধান হলেই হল। এরপর যদি কখনো কোথাও দেখি না সেদিন দেখব কি করা যায়!' সাথী সঙ্গীতাকে বলল, 'সঙ্গীতা চুপ করে থাকবি না। নিজেকে শক্ত করতে হবে। এটা মনে রাখিস।'

মাস তিনেক পরে স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। একদিন বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা শেষে সঙ্গীতা সেদিন একাই ছিল। ওদের ওই বিষয় নেই। পরীক্ষার শেষে শিক্ষক হরনাথ স্যারের জন্য অপেক্ষা করছে। হরনাথ স্যার সঙ্গীতাকে ডেকে বলল, 'সঙ্গীতা আমার অফিসে একটু কাজ আছে। মিটিং শেষে বের হতে দেরি হবে। তুমি কি একা যেতে পারবে?' সঙ্গীতা বলল, 'স্যার এখন তো আর অসুবিধা নেই। আমি একা যেতে পারব।' 'ঠিক আছে, তাহলে যাও। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে একটা ফোন করতে ভুলো না। এই আমার মোবাইল নম্বর। একটা ছোট কাগজে নম্বরটা লিখে দিল। সঙ্গীতা কাগজটি নিয়ে স্কুলব্যাগে রেখে হাঁটতে শুরু করল। দুর্ভাগ্যের পরিহাস সঙ্গীতা মনে মনে যে আতঙ্কের মধ্যে কেটেছিল তাই ঘটে গেল রাস্তায় মাঝপথে এসে দেখতে পেল চার-পাঁচজন ছেলেরা দলবেঁধে বসে আছে। সঙ্গীতা দেখে চমকে দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গীতার ভয়ে আর পা চলছে না। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল কোথাও কেউ নেই। গাছপালা চারিদিকে, যেন চোখে ঘন কুয়াশার ছায়া দেখছে। ইতিমধ্যে একটি ছেলে সঙ্গীতার হাত ধরে বলল, 'আজকে তোমায় পেয়েছি। কারা রক্ষা করে দেখি?' সঙ্গীতা উচ্চ চিৎকার করতে গেলে সমীরণ একটি রুমাল পকেট থেকে বের করে সঙ্গীতার মুখে চেপে ধরতেই সঙ্গীতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তারপর সঙ্গীতা আর কিছুই জানে না। বিকেল গড়িয়ে গেল, সঙ্গীতা ঘরে ফিরল না। মা পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবশেষে সাথীর বাড়িতে গিয়ে জেনে আসে ওদের পরীক্ষা ছিল না, সঙ্গীতা একাই স্কুলে গেছে। মা আরও চিন্তিত হয়ে গেছে। প্রিয়াঙ্কার বাবা মনমোনহন

সঙ্গীতা ফিরে না আসায় সঙ্গীতাদের বাড়িতে আসে। এখনও সঙ্গীতা ফেরেনি। তখন রাহুলকে নিয়ে হরনাথ স্যারের বাড়িতে চলে যায়। তখন পৃথিবীর আলো মুছে গিয়ে চারদিকে ঘন আঁধার ঘিরে আসছে। হরনাথবাবু খুব সঙ্কটে পড়ে গেল, কি করবে? হরনাথবাবু মনমোহনবাবুর সাথে সঙ্গীতার বাড়িতে এসে বলল, বিজেন্দ্রবাবুকে ফোন করার জন্য। সঙ্গীতার মা বলল, 'তার নির্দিষ্ট নম্বর নেই কখন কোথা থেকে করে তা বলতে পারব না। আপনি মোবাইলটি অন করে রাখেন। আমি চারদিকে খোঁজ নিয়ে আসি।' রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে নানা জায়গায় খোঁজ নিয়ে কোথাও কোনো খোঁজ না পেয়ে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরল। প্রতিবেশী গ্রামের লোকজন একের পর এক বাড়িতে আসছে। ঘড়িতে রাত নটা বেজে গেল। বিজেন্দ্রবাবু ফোন করে। মাস্টারমহাশয় বিজেন্দ্রবাবুর সাথে কথা বলে এবং বিশেষভাবে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসার জন্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বিজেন্দ্রবাবুর অস্থিরতায় ছটফট করছে। ভাবতে পারছে দুর্ঘটনা হয়েছে। নিজেকে সামলাতে পারছে না। সবকিছু বুঝেও কেন মোবাইল মেয়ের কাছে দিলেন এটাই বড় দুঃখ। সংবাদ পাবার পরই তড়িঘড়ি সেই রাতে বাড়িতে আসার জন্য রওনা করলেন। সকাল আটটায় পৌঁছে বাড়িতে ঢুকে লোকজনের সমাগম দেকে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠে বলছেন, 'কি হয়েছে?' বিজেন্দ্রবাবুকে সবাই সান্ত্বনা দিয়ে সুস্থ করে সরাসরি থানায় চলে গেলেন। হেডমাস্টার স্কুল ছুটি দিতে সকল শিক্ষক মিলে থানায় আসে। সবকিছু জানার পর পুলিশ ডায়রি লিখে অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ জিপ নিয়ে বের হল। পুলিশ তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল এবং পুলিশের কনস্টেবল বলল, 'কোথাও কোন সংবাদ পেলে থানায় জানাতে ভুল করবেন না।' পথে আসতেই দু-চারজন ছেলেরা দৌড়ে ছুটে আসে এবং বলল, তিলজলা নদীর ধারে ঝাউগাছের পাশে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সেখানে ছুটে যায়। তিলজলা তো অনেক দূরে। সবকিছু ভাবতে অবাক লাগে। সংবাদ নিয়ে লোক পাঠাল। থানার কাছে পৌঁছে সবাই দেখতে পেল ক্ষত-বিক্ষত নগ্ন দেহখানা নিথর হয়ে পড়ে আছে। পরনের জামা-পায়জামা অনেক দূরে পড়ে আছে। বিজেন্দ্রবাবু মেয়ের মুখখানা দেখে চিৎকার করে উঠে বললেন, 'হায়রে! মোবাইল, আমার মেয়েটির জীবন কেড়ে নিল।' বিজেন্দ্রবাবু আর কোন কথা বলতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মেয়ের পাশে।

মকরাব হুসেন ও কমলিনী

অঞ্জন কুমার ঘোষ

দূরে দূরে কত গাছপালা, সামনে পেছনে নানারকম বাহারি ফুল হাওয়ায় দোল খাচ্ছে আবার দু-একটা ঝরে পড়ছে। অশ্বারোহী লোকটি একটা ফুল তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। তার সুগন্ধি তাকে আমোদিত করল। সে সেই লাল রঙের ফুলটি বুকের পাশে আটকে দিয়ে ফের ঘোড়া ছোটাল বহু দূর একটা জনপদের দিকে। যেতে যেতে একটা ছোট্ট গ্রামের পাশে জলাশয়ের ধারে ঘোড়াটাকে থামাল। জলাশয়ের পরিষ্কার টলমল জল তাকে মুগ্ধ করেছিল। সে স্নানের জন্য জলে ঝাঁপ দিল। স্থির জলে আলোড়নের ফলে ছোট ছোট তরঙ্গ পাড়ে এসে ধাক্কা দিতে লাগল। গাছের পাতাগুলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো জলের ওপর পড়তেই চারধার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকটি পরম তৃপ্তিতে অবগাহনের স্বাদ নিতে লাগল। গাঁয়ের রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। নির্জন স্নান ঘাটেও কেউ নেই। শুধু কতকগুলি পাখি গাছে কিচিরমিচির করছে আর দূর প্রান্তরে গাছের গোড়ায় বসে থাকা রাখালের বাঁশির সুর ভেসে আসছে। লোকটা উঠে পড়ল। অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। ঘোড়ায় চেপে দূর পানে তাকাল। লোকটার নাম মকরাব হুসেন। সে যাবে নদী পেরিয়ে। আজিমগঞ্জে তার বন্ধুর কাছে। বন্ধুর নাম বাহারউদ্দিন, যে ছিল নবাব আলিবর্দীর অধীনে একজন ফৌজদার। অষ্টদশ শতকে এদেশে রাতের বেলায় বড় একটা যাতায়াত ছিল না। তাই দিনে দিনেই সকলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে চাইত। মকরাব দূরপথে দেখতে পেলে গরুর গাড়ি চড়ে গ্রামের লোকজন চলেছে দক্ষিণ দিকে। অনেকে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। কয়েকটা ঘোড়ার গাড়িও সে দেখল। মকরার ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান পৌঁছে জানলো নওরোজ উৎসব উপলক্ষ্যে পীরবাবার দরগার কাছে এক বিরাট মাঠে মেলা বসেছে। মেলা দেখার জন্য সে সেখানে পৌঁছে গেল। মেলাপ্রাঙ্গণে অনেক লোকজনের ভিড়, পীরবাবার দরগা দর্শন করে সে চলে এল মেলাতে। সেখানে বিক্রি হচ্ছিল নানা ধরনের জামা, কাপড়, বাসন-কোসন, নিত্যসামগ্রী যেমন আটা, চাল, চিনি, গুড়, ছোলা, বেসন ও নানারকম খাবার জিনিস এমনকি খেলনাপাতি ও আরো কত কি। মকরার একটা রুটি ও কাবাবের দোকানে এসে দু-পয়সায় দুটো রুটি ও কাবাব কিনে একটা গাছের তলায় বসে খেতে লাগল। সেইসময় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও দুজন কমবয়সী রমণী গাড়ি থেকে নেমে পাশে মিঠাইওয়ালার দোকান থেকে দরবেশ

ও লাড্ডু কিনে শালপাতায় মুড়ে তাদের কোচোয়ানকে দিল আর নিজেরাও খেতে লাগল। মকরাব খাওয়ার পর জলপান করার সময় দেখল একজন রমণী অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। মকরাব জানত না যে তার হাতের আংটির পাথরে সূর্যের আলো ঠিকরে গিয়ে সেই রমণীর চোখে পড়েছে। রমণী ছিল ফর্সা ও সুন্দরী, বয়স তার বেশি নয়। মকরাব মুগ্ধ হয়ে ওর পানে তাকিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পাশ দিয়ে চলে গেল মেলার অন্যদিকে। একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে এক যোগীপুরুষ আসনে উপবিষ্ট ছিল। মকরাব সেখানে পৌঁছতে দেখল যোগী পুরুষ তার আসনে উঠে দাঁড়াল। তারপর শূন্যপথে হাঁটতে হাঁটতে উঠে গেল অনেক ওপরে গাছের ডালে। সেখানে একটু বসে আবার শূন্যপথে হাঁটতে হাঁটতে নেমে এল তার আসনে। দর্শনার্থীরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় তাকে নমস্কার জানিয়ে পয়সা রেখে দিল তার আসনের কাছে। মকরাবও তাকে পয়সা দিল। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে মকরাব এল পাখিওয়ালাদের কাছে। সেখানে নানারকম রংবেরঙের পাখি ছিল। যেমন, দোয়েল, শ্যামা, ময়না, কাকাতুয়া, ফিঙে, বৌ কথা কও, চোখ গেল, ঘন সবুজ রঙের টিয়া ও আরও কত রকম। মকরাব চলে এল মেলার শেষপ্রান্তে এক ভাল্লুকওয়ালার কাছে। তার ছিল তিনটে বড় ভাল্লুক। সে বাজনা বাজাচ্ছিল আর তালে তালে ভাল্লুকগুলো নাচছিল। এই চমৎকার দৃশ্য দেখার জন্য অনেক ভিড় হয়েছিল সেখানে। মকরাব খুব মজা পাচ্ছিল সেখানে। মকরাব ভাল্লুকওয়ালাকে পয়সা দিয়ে ঘোড়া চড়ে মেলা ছেড়ে চলল উত্তরে আজিমগঞ্জের দিকে। মেলা দেখে কিছু লোক ফিরতে শুরু করে দিয়েছে। তারা যাচ্ছে নিকটবর্তী গ্রামগুলির দিকে। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। মাথায় উষ্ণীষ ও কোমরে তলোয়ার নিয়ে মকরাব ঘোড়া ছোটাল।

অনেক দূর চলে যাবার পর মকরাব দেখল সেই ঘোড়ার গাড়িটা পড়ে রয়েছে রাস্তার একধারে। তার সাদা ঘোড়াটা রাস্তার পাশে ঘাস খাবার চেষ্টা করছে কিন্তু আরোহীরা কেউ নেই। মকরাব অবাক হল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল কিছু অঘটন ঘটেছে। সে দুপাশে তাকাল। হঠাৎ চোখে পড়ল তার বাঁদিকে একটা শিরীষ গাছের নীচে আরোহী চারজন গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। লক্ষ করল ছয়-সাত জনের ডাকাতদল একটু দূরে পুকুরপাড়ে টাকা-পয়সা ও গয়না গুনছে। সে তৎক্ষণাৎ চুপিসারে ঘোড়া রেখে তাদের দ্রুত বন্ধনমুক্ত করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে চলে যেতে বলল। তারপরেই ঘোড়ায় চড়ে ক্ষিপ্রগতিতে তলোয়ার নিয়ে ডাকাতদলকে আক্রমণ করল। তারাও পাল্টা আক্রমণ করল। একজন সাঁ করে বর্শা ছুঁড়ে মারল মকরারেব দিকে। মকরাব সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে বর্শাটা হাত দিয়ে ধরে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারতেই সেটা একজন ডাকাতের পায়ে লাগল। তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে জঙ্গলের দিকে পালাল। মকরাব তাদের

ফেলে যাওয়া গয়না, টাকা-পয়সা গাড়ির আরোহীদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ফের ঘোড়ায় চড়ল। ওই পরিবারের কর্তা মকরাবের প্রশংসা করে জিজ্ঞেস করল, সে কোথায় যাবে। যখন কর্তা জানল সে আজিমগঞ্জে বাহারুদ্দিনের কাছে যাবে তখন সে জানাল তারাও সেদিকে যাচ্ছে। বক্তা মকরাবকে তাদের গৃহে আসার আমন্ত্রণ জানালে মকরাব খুবই খুশি হল। বক্তা আরও জানাল যে সেখানে জমিদার রমলাকান্ত চৌধুরীর নাম বললেই সবাই তাদের গৃহ দেখিয়ে দেবে। এরপর তাদের গাড়ি চলে গেল। মকরাব সেই রমণীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেও কিছু বলতে পারল না।

মকরাব চারদিক তাকিয়ে ফের যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর ওদের গাড়িকে দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে চলে গেল ও যথাসময়ে আজিমগঞ্জে পৌঁছাল।

বাহারউদ্দিন মকরারকে দেখে খুবই উল্লাসিত হল। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর মকরার চলে এল খাবারের জায়গায়। সেখানে আরও অনেকের সঙ্গে পরম তৃপ্তি ভরে রুটি মাংস খেয়ে চলে গেল শোবার জায়গায়। ফৌজদারের কুঠির মধ্যে ছিল আলো কিন্তু বাইরে চারধারে অন্ধকার। পরিশ্রান্ত মকরাব খাটিয়ার বিছানায় শোওয়া মাত্রই নিদ্রায় ঢলে যেতে লাগল। চকিতে সেই রমণীর ছবিটা মনে ভেসে উঠল, তারপরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সে বাহারুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করলে সে মকরাবকে জানাল যে তাকে সৈন্যদলে নেওয়া হয়েছে ও তার মাসিক বেতন ৭ টাকা। এখন সে ফৌজদারের কুঠিতেই থাকবে, পরে মুর্শিদাবাদে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। মকরার হুসেন বন্ধু বাহারুদ্দিনকে রমলাকান্ত চৌধুরী ও তার মেয়ের কথা উল্লেখ করলে সে জানাল ওই জমিদারও তার বন্ধু। তারা দুজনে জমিদারের গৃহে পরদিন গেলে রমলাকান্ত চৌধুরী তাদের সাদরে আপ্যায়ন করল। জায়গাটি বড়ই চমৎকার। তার গৃহকে প্রাসাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। লোকজনের আনাগোনা ও দাস-দাসীদের চলাফেরার একটা চাপা গুঞ্জনে সেই গৃহ মুখরিত। আহারপর্বে রমলাকান্ত নিজে দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে অতিথিদের পরিবেশন তদারকি করল ও মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলিনী স্বহস্তে তাদের পায়েস পরিবেশন করল। কমলিনী একটা হলদে রঙের বেনারসী শাড়ি পরেছিল। সে মকরাবকে প্রশ্ন করল তাদের রান্না বিশেষ করে পায়েস কেমন লেগেছে। মকরাব জানাল তাদের রান্না করা খাবার খেয়ে মন তার ভরে গেছে আর সুস্বাদু পায়েস খাওয়াটা তার বহুদিন মনে থাকবে। আহারপর্ব শেষ হওয়ার পর বাহারুদ্দিন রমলাকান্তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বড় মেয়ে কমলিনীর সঙ্গে মকরাবের বিবাহ প্রসঙ্গ আনলে রমলাকান্ত একটু ভাবার সময় নিলেন। মকরাবের সুন্দব চেহারা ও গুণাবলী তাকে

আগেই আকর্ষণ করেছিল। তিনি স্ত্রী সুভদ্রার সঙ্গে মত বিনিময় করে সাতদিন পর সম্মতি দিলে বাহারুদ্দিন আনন্দিত হয়ে সে খবর মকরাবকে জানাল। অতঃপর মাসখানেক পর ওদের বিয়ে আড়ম্বরের সঙ্গে সমাধা হল। স্বয়ং আলিবর্দিখাঁন ওদের বিয়েতে এসে একটা সোনার বাক্স গয়না সমেত উপহার দিয়েছিলেন। বিয়ের পর মকরাব কমলিনী ও তার বোন শৈবলিনীকে নিয়ে প্রায়শই সুদৃশ্য বজরায় নদীবক্ষে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে খুবই আনন্দ করত। রমলাকান্ত ওদের জন্য মুর্শিদাবাদে একটা সুন্দর অট্টালিকা কিনে দিলে ওরা সুখেই দিন কাটাতে লাগল।

বছরখানেক পরে মারাঠা নেতা রঘুজী ভোঁসলে তার বর্গী সৈন্যদের নিয়ে বাংলা আক্রমণ করলে আলিবর্দি খাঁর সঙ্গে তার তুমুল যুদ্ধ হয়। ওই সময়ে বাহারুদ্দিন ও মকরার হুসেন আলিবর্দির খাস সেনাদলে থেকে প্রবল পরাক্রমে লড়াই করেছিল। সেই সময় একদিন বর্গী সৈন্যরা অতর্কিতে আক্রমণ করে মকরাবের ডান হাত বর্শায় বিদ্ধ করে। সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে গৃহে নিয়ে এসে সেবাশুশ্রূষা করা হয়। বহুদিন পরে সে কমলিনীর পরম যত্নে সেরে ওঠে। আলিবর্দি সেইজন্যে তাকে ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয়। তার বংশধরেরা আজও মুর্শিদাবাদে ও কলকাতায় বাস করছে।

রিকশাওয়ালা ডাক্তার

বাপ্পা

"Impossibility : a word only to be found in the dictionary of a fools" - *Nepolean Bonepart*

"চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই—চেষ্টা করলে অনেক কিছুই করা যায়'—প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে" একথাটা আনসার মোল্লা আজও বিশ্বাস করেন। কেননা তাঁর নিজের জীবনেই যে ঘটনাটা ঘটেছে তা দিয়ে তিনি কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করেন। ইচ্ছা থাকলে আর পরিশ্রম করলে নিজের স্বপ্ন সার্থক করা যায় একথা তিনি সর্বদাই বলে থাকেন। আর উদাহরণ হিসাবে নিজের জীবনের কথা বলেন। আনসার মোল্লার ঘটনাটা হল এরকম।

প্রতিদিনের মত আজও গদি রিকশা নিয়ে ঘটকপুকুর রিকশা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন আনসার। যাত্রীদের শুনিয়ে একনাগাড়ে হেঁকে চলেছেন, ভাঙড়, ভাঙড়, ভাঙড়। এই তো দাদা এগিকে আসুন, কোথায় যাবেন? এখুনিই পৌছে দিচ্ছি— এমনই কত না কথা বলতে হয় আনসারের মত রিকশাওয়ালাদের। ক্ষুধা নিবারণের জন্য দুবেলা দুমুঠো অন্ন, লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্র আর আশ্রয়ের জন্য ভাঙাচোরা বাসস্থানের জন্য কতই না পরিশ্রম করতে হয় আমাদের দরিদ্র ভারতবাসীদের। আরাম, বিলাসিতা, মস্তি কি জিনিস জানে না তারা, বেঁচে থাকার জন্য এরা নিরন্তর লড়াই করে।

প্রায় প্রতিদিনই আনসারের রিকশায় করে যাওয়া-আসা করেন ভাঙড় থানার পুলিশ অফিসার। আজও তিনি এগিয়ে এসে আনসারকে বললেন, "চলো আনসার, যাবে তো?"

"হ্যাঁ স্যার, আপনার জন্যই তো অপেক্ষা করে আছি।" রিকশা নিয়ে এগিয়ে আসলেন আনসার। অফিসার রিকশায় উঠে বসলেন। 'প্যাঁ পু, প্যাঁ পু' শব্দ করে রিক্শা নিয়ে এগিয়ে চললেন আনসার। কিছুক্ষণ পর আনসার অফিসারের উদ্দেশে সৌজন্যমূলক প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছেন স্যার?"

"ভালো। তুমি কেমন আছো?" পাল্টা প্রশ্ন অফিসারের।

"এই দেখছেন তো! ভালো-মন্দে মিশিয়ে চলছে।"

"ছেলেমেয়ে ভালো আছে তো?"

"হ্যাঁ। কদিন আগে বড় মেয়েটার বিয়ে দিলাম। বেশ সুখেই আছে।" গর্বের সহিত বললেন আনসার।

"জামাই কি করেন?" জানতে চাইলেন অফিসার।

"কি একটা কম্পানিতে চাকরি করে। তবে লেখাপড়া জানে ভালো।"

"তাই নাকি!" আনন্দের সহিত অফিসার জানতে চাইলেন. "আচ্ছা আনসার তুমি কতদূর পড়াশুনা করেছিলে যেন? আমার ঠিক মনে নেই।"

"আমি?" বলে একবার হর্নটা টিপে 'প্যাঁ পুঁ' শব্দ করে পথচারীদের সাবধান করে অফিসারের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার কথা কেন জানতে চাইছেন স্যার?"

"শুনি একটু।"

"ওই ক্লাস ফোর পর্যন্ত। ফোর পাশ করে আর ফাইভে ভর্তি হতে পারিনি।" আফসোস করে আনসার বললেন, "বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাই কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। একাজ, সেকাজ করতে করতে আজ প্রায় কুড়ি বছর রিকশা টানছি।" আনসার একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন। কিন্তু আনসারের শেষ কথাগুলো অফিসারের কানে গেল না। ভাবুক মনে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ইংরাজিতে ভালো ছিলে না? তুমিই তো একদিন বলেছিলে ক্লাসের মধ্যে ইংরাজিতে তুমি সেরা ছিলে, তাই তো?"

"হ্যাঁ স্যার।" বলার সঙ্গে সঙ্গে আনসারের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে যেন তাঁকে অনেকটা হাল্কা করে দিল।

"ইংরাজি ভালো পড়তে জানো?"

"হ্যাঁ স্যার। মোটামুটি লিখতে পড়তে পারি।" আনসার গর্ব করে বললেন, "আমাদের সময় লেখাপড়ার দাম ছিল। তখনকার ফোর-ফাইভের ছেলের কাছে এখনকার বি.এ., এম.এ পাশ অনেক ছেলেই পারবে না।"

"সে যাই হোক—" কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে কি যেন ভেবে অফিসার বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলব?"

"কি কথা স্যার?" জানতে চাইলেন আনসার। ইতিমধ্যে রিকশা একটা মোড় ঘুরল। আনসার রিকশা চালিয়েই চলেছেন। অফিসার বললেন, "যদি তুমি আমার কথা রাখো তাহলে বলি।"

"বলুন না স্যার!" আনসার বিনয়ের সুরে বললেন, "আপনার কথা রাখার চেষ্টা করব।"

"দেখ, তোমার রিকশায় প্রতিদিন যাতায়াত করি, তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে। তাছাড়া তোমাকে ভালোওবাসি তাই বলছি।" অফিসারের এ সমস্ত কথাবার্তা শুনে ভালো লাগল আনসারের। তিনি আনন্দের সহিত রিকশার প্যাডেল চালিয়ে যাচ্ছেন। অফিসার বলে যেতে লাগলেন, "ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো, সময় পেলে আজকে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

"কেন স্যার?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন আনসার, "এখনই বলুন না, স্যার কি কথা?"

"তুমি আমার সাথে দেখা করো, তখনই বলব এখন ডিটেলস-এ বলতে পারব না। পরেই বলব।"

আনসার আর দ্বিরুক্তি করলেন না। অফিসারও আর কিছু বলেন না। মিনিট দু-এক উভয়ই নীরব রইলেন। ইতিমধ্যে রিকশা নিয়ে থানার সামনে পৌঁছলেন আনসার। ভাড়া মিটিয়ে রিক্শা থেকে নেমে "দেখা করো কিন্তু" বলে থানার দিকে পা বাড়ালেন অফিসার। আনসার রিকশা নিয়ে চলে এলেন রিকশাস্ট্যান্ডে। আবারও যাত্রী বইতে হবে।

দুপুরের অবসর সময়ে অফিসারের সঙ্গে দেখা করে সারা বিকেল রিকশা চালিয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরে আনসার সমস্ত কথা স্ত্রীকে বলতেই স্ত্রী রেগে আগুন হয়ে গেলেন। আনসার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আহা রাগ করো কেন? উনি তো আর খারাপ কথা বলেননি। আমার ভালোর জন্যই বলেছেন।"

"মিনসে আমার পাগল হয়েছে।" ক্ষোভ প্রকাশ করে আনসারের স্ত্রী রহিমা বললেন, "তোমার কি ভালোর জন্য বলেছে শুনি। এত যদি ভালো চায় তাহলে টাকা দিয়ে সাহায্য করুক, দিন দেখি? তাহলেই তো বুঝব তোমার ভালোর জন্য বলেছে!"

"তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?" স্ত্রীকে শান্ত করার জন্য আনসার নম্রস্বরে বললেন, "আমি তো মনে করি উনি আমার ভালো চাইছেন বলেই বলেছেন। কই অন্য কেউ তো এমন উপদেশ দেয় না। তাহলেই বোঝ উনি কেন আমাকে এমন উপদেশ দিয়েছেন। নিশ্চিত আমার ভালো চান, তাই বলেছেন।"

"কিন্তু যে বইটার কথা বলেছে—" কথাটা অসমাপ্ত রেখে অনেকটা শান্ত হয়ে রহিমা বললেন, "কোথায় পাবে বইটা। আর কত নেবে তারও ঠিক নেই। কোথায় পাবে অত টাকা।"

"এমন কি দাম? লাখ টাকা তো আর হবে না।" উদাসভাবে আনসার বললেন, "চেষ্টা করব বইটা কেনার। প্রতিদিন কিছু কিছু টাকা জমাব। না হয় একটু কষ্টই হবে আমাদের। চেষ্টা তো করে দেখি!"

"চেষ্টা, হুঁ!" উপহাস করে রহিমা বললেন, "চেষ্টা করে দিনে একশো টাকার বেশি ইনকাম করতে পারে না, আবার ..." কথাটা অসম্পূর্ণ রাখলেন তিনি। কিছুক্ষণ থেমে দৃঢ় গলায় আবারও বললেন, "যা করছো তাই করো। রিকশা চালানো ছেড়ে অন্য কিছু করতে হবে না। দুবেলা দুমুঠো খেতে পারলেই হল। অত বেশি আশায় লাভ নেই।"

স্ত্রীর এমন দৃঢ় সংকল্প শুনে কি বলবে কিছুই ভেবে পেলেন না আনসার। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন অসহায়ভাবে। তারপর কোনো কথা

না বলে চিন্তিত মনে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

আর আনসারের স্ত্রী সেখানেই দাঁড়িয়ে পুলিশ অফিসারের উদ্দেশ্যে ক্ষোভপ্রকাশ করে বললেন, "আর তোমারেও বলি বাপ্। পাও তো সরকারি টাকা—বুঝবেটা কি? যদি এরকম রিকশা টানতে হত তাহলেই বুঝতে কত ধানে কত চাল। শুধু উপদেশ দিতে জানে! হুঁ!" বলে দম দম করে মাটিতে পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাতের আহার শেষে শুয়ে পড়ে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু আনসারের চোখে ঘুম নেই। তিনি বারবারই চিন্তা করতে লাগলেন, অফিসারের কথা ঠিক না স্ত্রীর কথা ঠিক! কার কথা মেনে চলি? একবার ভাবলেন, ফালতু ঝামেলায় লাভ নেই, দরকার কি ওসব কাজে? তার চাইতে যেমন আছি, তেমন থাকি। বেশি ইনকাম করে দরকার নেই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, একবার চেষ্টা করেই দেখি না। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি ! তাহলে চেষ্টা করতে দোষ কোথায়? হয়তো সফলও হতে পারি। হয়তো ওই অফিসারের কথাটাই ঠিক হতে পারে! উনি তো আমাকে সাহস দিলেন! সুতরাং একবার চেষ্টা করেই দেখি। নাহয়, সফল না হব, তাতে কি হয়েছে। একবার চেষ্টা তো করা যাক! বাকিটা পরে দেখা যাবে। এ ধরনের নানান চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন আনসার মোল্লা। অনেক রাত ধরে সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তা করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজের উপার্জন থেকে প্রতিদিন পাঁচ-দশ টাকা করে লুকিয়ে রাখব। চেষ্টা করবো টাকা বেশি করে জমানোর। তারপর একদিন বই কিনে পড়া আরম্ভ করব। শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে সকলকে অবাক করে দেব। কাউকেই জানাব না, আমার এ সংকল্পের কথা। লুকিয়ে লুকিয়ে তৈরি হব। এমনকি রহিমাকেও জানাব না। শুধু স্যারকেই বলব। স্যারের কথাই মেনে চলব।

উপার্জনের টাকা থেকে রোজই পাঁচ-দশ-পনেরো টাকা করে জমাতে লাগলেন আনসার মোল্লা। মাস ছয়েকের মধ্যে প্রয়োজনীয় টাকাও জোগাড় করে ফেলেছেন। চুপি চুপি একদিন কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে স্যারের বলে দেওয়া সেই বইটাও কিনে এনেছেন। এখন শুধু পড়ার আর টিপসগুলো আয়ত্ত করার অপেক্ষায়। বইটা নিয়ে তিনি সযত্নে লুকিয়ে রাখলেন। যখন রিকশা চালান তখন বইটা রিকশার সিটের তলায় লুকিয়ে রাখেন আর সময় পেলেই বইটা ফলো করেন। দুপুরের সময় প্যাসেঞ্জারের চাপ কম থাকে। তাই এই সময়টা কাজে লাগান তিনি। দুপুরে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে বইটা খুলে পড়তে থাকেন রিকশায় বসে। বাড়িতে ফিরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মাঝে মধ্যেও বইটাতে চোখ বোলান। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। স্ত্রীর নজরে

পড়ল, স্বামীর মনোবাঞ্ছা। এ নিয়ে স্ত্রী রহিমা অনেক উপহাস করেন। স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে তাচ্ছিল্য করেন। তবুও কিছু মনে করেন না বা কিছুই বলেন না আনসার। মুখ বুজে স্ত্রীর বঞ্চনা সহ্য করে অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে লাগলেন। ওদিকে যখন রিকশাস্ট্যান্ডে বসে বই পড়তেন তখন অনেক সহকর্মী রিকশাচালকও উপহাসের সুরে বলতে থাকেন, "কিরে আনসার, কি পড়ছিস? প্রেমের গল্প নাকি?" কিন্তু আনসার এসব কথায় উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না। শুধু মুখ টিপে হাসেন, এইভাবে দিন রাত অধ্যবসায়ে মেতে থাকলেন আনসার মোল্লা। অবশেষে একদিন আয়ত্তও করে ফেললেন বইয়ের সমস্ত টিপস। জেনে ফেললেন বিভিন্ন পদ্ধতি। এখন পুরো বইটাই আয়ত্ত করে ফেলেছেন। একটানা দু বছরেরও বেশি সময় ধরে বই পড়ে পড়ে বইয়ের সমস্ত কথা, সমস্ত সারাংশ জেনে ফেলেছেন। বইটাকে শেষ করতে পেরে আনন্দের সীমা রইল না আনসার মোল্লার। এখন শুধু কাজে লেগে পড়ার অপেক্ষায়। প্রায়শই ভাবেন, এইবার কাজে লেগে যাই। চেষ্টা করে দেখি কিছু করতে পারি কিনা!

ইতিমধ্যে একদিন প্রচণ্ড জ্বরে পড়ল আনসার মোল্লার মেজ ছেলে। জ্বরে সারা গা পুড়ে যাচ্ছে যেন আনসার ভাবলেন এই সুযোগ—এটাকে হাতছাড়া করা উচিত নয় ভেবে তিনি ছেলের চিকিৎসা করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীর এই ঔদ্ধত্য মানতে রাজি নয়। তিনি স্বামীকে উপহাস করে বলেন, "তুমি করবে ছেলের চিকিৎসা? তাহলে তো তোমাকে আর এখানে রাখা যাবে না! কলকাতার কোনো হাসপাতালে চাকরি দিতে হবে। এ গ্রাম তোমার জন্য উপযুক্ত নয়।"

"দেখ! তুমি উপহাস করো না। একটাবার আমি চেষ্টা করে দেখি সারাতে পারি কিনা।" অসহায়ভাবে আনসার স্ত্রীর কাছে অনুরোধ করে বললেন, "না পারি কি আছে! পরে দরকার হয় অন্য ডাক্তার দেখাব। আপাতত আমার শেখা বিদ্যাটা একবার প্রয়োগ করে দেখি না কি হয়? সফল হতেও তো পারি!"

"ছাড়ো, ছাড়ো!" ততোধিক উপহাস করে রহিমা বললেন, "তুমি কি পারবে তা আমার দেখা হয়ে গেছে। রিকশাটানা ছাড়া আর কি পার তুমি। এসব ফাজলামো ছাড়া আর কি পার তুমি। এসব ফাজলামো বুদ্ধি বাদ দিয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো—দেখ কিছু ইনকাম করতে পার কিনা! বাড়ি বসে ছেলের চিকিৎসা করতে হবে না।"

বস্তুতঃ গৃহিণীর এ ধরনের উপহাসের জবাব দিতে পারলেন না আনসার। উষা দেখতে না দেখতে তিনি গোধূলি দেখতে পেলেন। কিন্তু গোধূলির পর রাত

পোহালেই যে আরেকটা সুন্দর উষা অপেক্ষা তা তিনি জানেন না। সুতরাং সেই আকাঙ্ক্ষিত উষাও এসে গেল।

গৃহিণী ছেলেকে নিয়ে দুটো ডাক্তারের কাছে দেখিয়েছেন। খরচও করেছেন কিছু টাকা, কিন্তু ছেলের জ্বর আর সারে না। যা জ্বর ছিল তাই-ই আছে। এত চেষ্টা করেও রোগের উপশম হচ্ছে না দেখে রহিমা আনসারকে বললেন, "কি হবে বল দেখি? ছেলের জ্বর যে মোটেও কমছে না। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। চিন্তায় আমি আহার-নিদ্রা করতে পারি নে।"

"আমি কি করব।" উপেক্ষার সুরে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে আনসার বললেন, "তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো।" একটু থেমে আবারও বললেন, "যাই দেখি, রিকশা নিয়ে বার হই, যদি কিছু আয় করতে পারি।" একথা বলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘর থেকে বার হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রহিমা স্বামীর হাত ধরে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "শোন না!"

আনসার স্ত্রীর ডাকে সাড়া দিলেন না। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লেন। রহিমা স্বামীর হাত ছেড়ে দিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "আমি বলি কি—" এই পর্যন্ত বলে তিনি থেমে গেলেন। আনসার পিছন ঘুরে স্ত্রীর দিকে মুখ করে দাঁড়াতেই রহিমা আস্তে আস্তে বললেন, "দেখ না তুমি কিছু করতে পার কিনা? আমার যে আর ভালো লাগে না। আজ একসপ্তাহ ধরে ছেলেটা আমার জ্বরে ভুগছে। কত কষ্ট পাচ্ছে।" একথা বলে তিনি অসহায়ভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু স্ত্রীকে আমল না দিয়েই আনসার বললেন, "দেখ ভালো ডাক্তার দেখিয়ে, টাকা যা লাগে আমি দিচ্ছি। তুমি ওকে নিয়ে যে ডাক্তারকে দেখানোর ইচ্ছা হয় তাকে দেখাও।"

স্বামীর মুখে একথা শুনে রহিমা শুষ্ক মুখে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মুখ কাঁচুমাঁচু করে বললেন, "তুমি কিছু করতে পার কিনা দেখ না! আমি অন্য ডাক্তারের কথা বলছি না, তোমার কথাই বলছি।"

"আমি?" যেন অবাক হয়ে বললেন আনসার।

"হ্যাঁ।"

"আমি পারব?" বলে কিছুক্ষণ থেমে শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আনসার বললেন, "আমি ভেবেছিলাম হয়তো সামান্য জ্বর। কিন্তু এ দেখছি সামান্য জ্বর নয়, হয়তো অন্য কোনো অসুখ।" তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু রহিমা, আমি কি পারব। শুধু বই পড়ে কিছু শিখেছি। আমি তো আর ডাক্তারি শিখিনি। তাই ভয় হচ্ছে পারব কিনা।"

"তুমি পারবে—" স্বামীকে উৎসাহ দিয়ে রহিমা বললেন, "আমার মন বলছে তুমি পারবে। একবার চেষ্টা করে দেখ। সবাই তো বই পড়ে শেখে।"

"অন্যের বই পড়ে শেখা আর আমার বই পড়ে শেখার মধ্যে তফাত অনেক। অন্যেরা হাতে-কলমে শেখে কিন্তু আমি—" এই পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন আনসার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসু স্বরে স্ত্রীকে বললেন, "সেদিন তুমিই আমাকে বারণ করেছিলে, আর আজ সেই তুমিই বলছ ছেলের চিকিৎসা করতে!"

"হ্যাঁ বলছি। আর কেন বলছি জানি না। শুধু আমার মন বলছে তুমি একবার চেষ্টা করো। হয়তো তোমার শেখা বিদ্যা সফল হতে পারে।"

"বলছ!" বলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন আনসার।

"হ্যাঁ বলছি।" রহিমা সাহস দিয়ে বললেন, "যা করার তাড়াতাড়ি করো।"

স্বামীর ক্ষমতার ব্যাপারে রহিমার এতটা আস্থার কারণ আছে। মাসখানেক আগে রহিমার একবার সর্দি-কাশি হয়েছিল। ডাক্তারের কাছ থেকে দু-তিনবার ওষুধ আনার পরও যখন সর্দি-কাশি সারল না তখন স্বামীর কথামত একটা সিরাপ খেয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন রহিমা। তাই আজ তিনি জোর দিয়েই বললন, "সেদিন তো তুমি আমার অসুখ সারিয়েছিলে! তবুও তোমার প্রতি আমার আস্থা ছিল না। কিন্তু কেন জানি না আজ যেন মনে হচ্ছে তুমিই পারবে।"

"ঠিক আছে রহিমা। আমি চেষ্টা করব ছেলেকে সারিয়ে তোলার। তুমি আমার জন্য দোয়া করো আমি যেন ব্যর্থ না হই। সেদিনের মতোই যেন সফল হই।" বলে আনসার স্ত্রীর দিকে তাকালেন প্রত্যুত্তর পাওয়ার আশায়। রহিমা কোনো কথা না বলে স্বামীর বুকে মাথা রেখে মৃদুস্বরে বললেন, "তোমার জন্য দোয়া করবো নাতো কার জন্য দোয়া করবো!"

ছেলের অসুখের লক্ষণ দেখে এবং কিছু চিকিৎসার যন্ত্রপাতি কিনে ছেলেকে পরীক্ষা করে আনসার দেখলেন যে ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। সুতরাং আনসার লেগে পড়লেন টাইফয়েডের চিকিৎসায়। বইতে যা পড়েছে সেইমত কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র কিনে এনে ছেলেকে খাওয়ালেন। ছেলের সেবাযত্ন করলেন। প্রয়োজনীয় সতর্কতাও নিতে বললেন ছেলেকে। অবশেষে একসপ্তাহ ধরে চিকিৎসা করার পর আনসারের ছেলের অসুখ সারল। ছেলে সুস্থ হতে রহিমার আনন্দের সীমা রইল না। বাড়ির সকলেই আনসারের এই ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা ভেবেই পেল না তাদের বাবা কিভাবে রোগ সারালেন। আনসারও অবাক হয়ে গেলেন নিজের গুণ দেখে। তিনিও ভাবেননি যে ছেলেকে এভাবে সুস্থ করতে পারবেন। শুধু মনের জোরে—নিজের শেখা বিদ্যা প্রয়োগ করবেন বলেই ছেলের চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে সফল হবেন তা ভাবতেও পারেননি তিনি। ছেলে-মেয়েরা বারবার বাবার কাছে জানতে চাইছিল—কিভাবে

বাবা চিকিৎসা করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। আনসার তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন ছেলে-মেয়েদের কাছে। তিনি বললেন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ডাক্তারি শেখার পরামর্শের কথা, বললেন পুলিশ অফিসার যে বইটা কিনে পড়তে বলেছিলেন সেই বইটার কথা, বললেন স্ত্রীর সঙ্গে তার মতানৈক্যের কথা এবং তার সিদ্ধান্ত, বললেন বই কেনার জন্য টাকা সংগ্রহের প্রচেষ্টার কথা, বললেন লুকিয়ে লুকিয়ে অক্লান্তভাবে বই পড়ার কথা, আরও বললেন নিজের অর্জিত বিদ্যা প্রয়োগের কথা এবং শেষপর্যন্ত তিনি যে সফল হয়েছেন তার প্রচেষ্টার কথাও বললেন ছেলে-মেয়েদের। বাবার মুখে এসব কথা শুনে অবাক হয়ে গেল ছেলে-মেয়েরা, তাদের মধ্যে দু-একজনের যে ছোটখাটো অসুখ-ব্যারামের লক্ষণ আছে তা বাবাকে বলে জানতে চাইল অসুখ সারাবার উপায়। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দু-একজনের যে ছোটখাটো রোগব্যাধি ছিল তাও সারিয়ে তুললেন আনসার। নিজের প্রতি আস্থা বেড়ে গেল আনসারের। তিনি ভাবলেন এবারে চিকিৎসা করা শুরু করতে হবে। ছেলে-মেয়েরা বিশেষ করে রহিমা আনসারকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন একটা চেম্বার খোলার জন্য।

রিকশা চালানো ছাড়াও অবসর সময়ে পাড়া-প্রতিবেশী কারো অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা করার ঝুঁকি নেন আনসার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সফল হন। এভাবে কিছুদিন চলার পর আনসার ভাবলেন এবার একটা চেম্বার খুলে বসাই শ্রেয়। কিছু টাকা জোগাড় করে ঘটকপুকুর বাজারে একটা দোকান ভাড়া নিয়ে চেম্বার খুলে বসলেন তিনি। প্রথম প্রথম শুধুই একা একা দোকানে বসে থাকতেন। কিন্তু অবশেষে এক-দুজন করে রোগী আসতে লাগল। আর আনসার সঠিক রোগ নির্ণয় করে সঠিক ওষুধ দিতেই রোগীরা সুস্থ হয়ে ওঠে। অল্প লাভ রেখে চার্জও কম নেন তিনি। ফলে দিন দিন রোগী বেড়ে যেতেই লাগল। শেষ পর্যন্ত আনসার একজন নামকরা ডাক্তারে পরিণত হলেন। এক ডাকেই সকলে তাঁকে চেনেন— আনসার ডাক্তার রূপে। অনেকেই জানেন রিকশাওয়ালা আনসার আজ ডাক্তার আনসার নামে পরিচিত। দিনে দিনে আনসার একজন ভালো, সৎ, নামী ডাক্তার হয়ে গেলেন।

শুধুমাত্র বিকালবেলায়ই আনসার চেম্বার খোলেন। যখন হাতে রোগী থাকে না তখন তিনি সেই পুলিশ অফিসারের কথা ভাবেন। তাঁর কথামত কাজ করে আজ আনসার ডাক্তার হয়েছেন। তিনি যে বইটার কথা বলেছিলেন সেই বইটা পড়ে আজ আনসার ডাক্তার হয়েছেন, তাঁর পরামর্শ মেনেই তিনি সফল হয়েছেন। সেই পুলিশ অফিসারের প্রতি আনসারের মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। পুলিশ অফিসারের সেই পরামর্শের ঋণ আনসার সারা জীবনেও শোধ করতে পারবেন না। সেই পুলিশ অফিসারই তো আনসারকে নতুন জীবন দান করেছেন। আনসার চান পুলিশ

অফিসারকে একবার ধন্যবাদ জানাতে। ইচ্ছা হয় তাঁকে একটা সুসংবাদ দিতে। কিন্তু আনসার তা পারেন না। কেননা সেই পুলিশ অফিসার অনেকদিন আগেই বদলি হয়ে গেছেন। কোথায় বদলি হয়েছেন তা আনসারের অজানা। হয়তো এতদিনে আরও দু-একবার বদলি হয়েছেন। আনসারের খুবই কষ্ট হয় সেই লোকটির জন্য। যিনি তাঁর জীবনটাকে নতুনভাবে শুরু করার মন্ত্রণা দিয়েছেন, আজ তিনি কোথায় আছেন আনসার তা জানেন না। একবার তাঁকে সুখবরও দেওয়া হল না বা তাঁর আশীর্বাদ নেওয়া হল না। এসব কথা ভাবলে খুবই কষ্ট পান আনসার। কিন্তু কি আর করা যাবে! এই তো জীবন। তবে মনে মনে আনসার সেই দয়ালু মানুষটিকে জানান অসংখ্য ধন্যবাদ। শত কোটি প্রণাম। জানান তাঁর অন্তরের অতলের গভীর শ্রদ্ধা, গভীর ভালোবাসা।

আগেই বলেছি আনসার শুধুমাত্র বিকালবেলায় চেম্বার খোলেন। কেবলমাত্র বিকালেই রোগী দেখেন। তাহলে সকালবেলা তিনি কি করেন? সকালবেলায়? হ্যাঁ সকালবেলায় তিনি রিকশা চালান। ডাক্তারি করলেও তিনি রিকশা চালানো ছাড়তে চাইছেন না। আনসারের এই ধরনের আচরণ স্ত্রীর মনে খটকা সৃষ্টি করে। কৌতূহলী হয়ে তিনি একদিন স্বামীর কাছে জানতে চাইলেন, "একটা কথা বলব?"

"বল।" শান্তকণ্ঠে বললেন আনসার।

"তুমি তো ডাক্তার হয়ে গেছ। ইনকামও খারাপ হচ্ছে না। তাহলে রিকশা চালানো ছাড়ছ না কেন?"

প্রত্যুত্তরে আনসার শুধু মুচকি হাসলেন।

রহিমা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "হাসছ যে?"

"হাসব না তো কাঁদব!" বললেন আনসার। রহিমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর দিকে, স্বামীর এরূপ আচরণে তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আনসার বললেন, "কেন জানো আমি রিকশা চালানো ছাড়ছি না।"

"কেন?" আশান্বিত হয়ে শুধোলেন রহিমা। আনসার এক পা এক পা করে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানালার রড ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "দেখ রহিমা, রিকশা চালানো আমার প্রধান পেশা, এ পেশা আমি ছাড়তে পারবো না। রিকশা চালিয়েই আমি এতদিন সংসার চালিয়েছি। রিকশাওয়ালা হিসাবেই এতদিন জীবন কাটিয়েছি। এই রিকশাই এতদিন আমাকে বাঁচিয়েছে। যে পেশা আমার জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেই পেশা আমি ছাড়তে পারব না। এতে যে যাই বলুক আর যাই হোক না কেন রিকশা আমি চালাবই।" এই পর্যন্ত বলে আনসার চুপ করে জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রহিমা

হঠাৎ বললেন, "কিন্তু..."

"কোনো কিন্তু নয়।" রহিমাকে বাধা দিয়ে আনসার বললেন, "আমার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি আমি ডাক্তারি না শিখতাম তাহলে কি করতাম। রিক্শাই তো চালাতাম।"

"কিন্তু এখন তো তুমি ডাক্তার, এখনও রিক্শা চালালে লোকে কি বলবে?" রহিমা বললেন।

"লোকে কি বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আর লোকের কথায় আমি কর্ণপাত করতেও রাজি নই।" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে আনসার বললেন, "আর ডাক্তারি শিখে ডাক্তারি করছি বলে তুমি আমার পুরনো পেশা ছেড়ে দিতে বলছ।" বলে স্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাহলে বল তোমাকেও ছেড়ে দিই!"

স্বামীর মুখে একথা শুনে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল রহিমার। তিনি অবাক বিস্ময়ে ভীত হয়ে স্বামীর নিকটে সরে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। অস্ফুটে বললেন, "মানে?"

"মানেটা খুবই সহজ" বলে হাসতে হাসতে আনসার বললেন, "নতুন পেশায় প্রবেশ করেছি বলে যদি পুরনো পেশা ছেড়ে দিতে হয় তাহলে নতুন কোনো মেয়েকে পেলে তোমাকেও ছেড়ে দিতে হবে।" বলে স্ত্রীর ভীতসন্ত্রস্ত মুখ দেখে কাছে সরে এসে একহাতে স্ত্রীর মুখ উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, "না, না, ভয় পেও না। তোমাকে ছাড়বো না, তুমিই তো আমার সব, তবে রিক্শা চালানো আমি ছাড়বো না।"

"তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। আমি আর কিছু বলব না।" এই বলে স্বামীর বুকে মুখ লুকোলেন রহিমা।

সেই থেকে আনসার সকালবেলায় রিক্শা চালায় আর বিকালবেলায় ডাক্তারি করেন। রিক্শা চালান বলে তিনি রিক্শাওয়ালা। আর ডাক্তারি করেন বলে ডাক্তার। কিন্তু আমি ভেবে পাই না তাঁকে রিক্শাওয়ালা বলব না ডাক্তার বলব। তাই এককথায় আমি আনসারকে বলছি "রিক্শাওয়ালা ডাক্তার।"

চন্দ্রিমা

গৌতম দাস

অমল চন্দ্রিমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। চন্দ্রিমাও তা চেয়েছিল, গ্রামের কাঁচা পথ ধরে চন্দ্রিমার সঙ্গে কত রাত এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে অমল। গাঁয়ের লোকেরা অবশ্য ওদের চলাফেরা কিংবা মেলামেশাটাকে বেআব্রু মনে করেননি কখনো। কারণ তারা জানে, অমল তো চন্দ্রিমারই। চন্দ্রিমাও অমলের। তাই ওদের হাঁটা-চলা, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা কোনোটাতেই গা করেনি গ্রামবাসীরা। কৈশোরের কোনো এক সন্ধিক্ষণে চন্দ্রিমার সঙ্গে অমলের আলাপ। তারপর কত দিন, কত রাত কেটে গেছে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতায়। শস্যক্ষেতের নেশাধরানো বাতাসে ওরা হেঁটেছে কতকাল। নৌকায় বসে একে অপরের হাতে হাত রেখে ভাটিয়ালি গাইতে গাইতে ওরা চলে যেত দূরে, বহু দূরে। শ্রাবণের বর্ষাস্নাত বিকালে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে অমল আর চন্দ্রিমা ফুরফুরে বাতাসে ভেসে বেরিয়েছে কতদিন। আষাঢ়ের রথে চন্দ্রিমাকে নিয়ে অমল মধ্যরাত পর্যন্ত ঘুরে বেড্রিয়েছে, চরকিতে দোল খেলেছে, পুতুলনাচের আসরে সামিল হয়েছে, আবার হাতে হাত জড়িয়ে কুলফি মালাই খেয়েছে। কিন্তু জীবন-জীবিকার টানে অমলকে একসময় চলে যেত হয় শহর কলকাতায়। যাওয়ার দিন ওকে পৌঁছে দিতে চন্দ্রিমাও এসেছিল স্টেশন পর্যন্ত। বিদায়মুহূর্তে সে আরও একবার বলে—'যেও না অমল, তুমি যেও না।'

অমল বলে—'নাগো, এই অজ-গাঁয়ে থাকলে কেরিয়ার হবে না।'

চন্দ্রিমা বলে—'কেরিয়ার কি বুঝি না। কিন্তু আমার ভয় হয়, ওখানে গিয়ে তুমি যদি ভুলে যাও আমায়।'

অমল হাসে—'না না ভুলবো কেন? তোমাকে কী ভোলা যায়! তুমি আমার প্রেম, তুমি আমার সুন্দর। তুমি আমার চন্দ্রিমা। তোমাকে কোনোদিনও ভুলব না আমি।'

চন্দ্রিমা হাসে।

—হাসলে যে?

—না, এমনি।

—শোন, চিরদিন তুমি কিন্তু আমার—আমারই।

চন্দ্রিমা আর কথা বাড়ায়নি। সকালের ট্রেনটা ঝিকঝিক শব্দে দ্রুত ছেড়ে দিল। জানালার ফাঁক দিয়ে চন্দ্রিমার ভারাক্রান্ত মুখাবয়ব আরো কিছুক্ষণ দেখতে

পায় অমল। একসময় তা অদৃশ্য হয়।

অমল শহরে পা রাখে। কম্পিউটারের বি.সি.এ. কোর্সটা সে অনেক আগেই সেরে ফেলেছে। এখন ও একটা নামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি জুটিয়েছে। বেতনটাও বেশ, দশ হাজার। এখন ওর ফুরফুরে মেজাজ। বন্ধুও জুটেছে বেশ কয়েকজন। শহুরে কালচারের সংক্রমণটাও আচ্ছন্ন করেছে অমলকে। তাই ঘণ্টায় ঘণ্টায় সিগারেট ফোঁকাটা অমলের নিত্য অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে বিয়ার কিংবা হুইস্কি। পথে ঘাটে সুন্দরী মেয়েদের মোহনীয় অঙ্গভঙ্গিটাও নজর কাড়ে ওর। অফিসকলিগ রণিতা বেশ সুন্দরী। স্লিম ফিগাব, আবার সেক্সিও। এক সময়ের একরোখা, বদমেজাজি অমল একদিন রণিতার প্রেমে পড়ে। অফিসের কাজের নানা অবসরে রণিতাকে নিয়েও মেতে থাকে। শনিবারের অল্প কাজের অবসরে অমল রণিতাকে নিয়ে চলে যায় ভিক্টোরিয়ায়। ঝোপের আড়ালে, রণিতার নরম-গরম দেহটাকেও ও উপভোগ করে। রণিতাই বলে একদিন—'চলো বেড়িয়ে আসি।'

—কোথায়?

রণিতার কোমল স্বর—ডায়মন্ডহারবার কিংবা অন্য কোথাও।

অমল রণিতার প্রস্তাবে সাড়া দেয়। প্রেমের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় অমল। রণিতার চাহিদামতো সপ্তাহান্তে অমল চলে যায় দীঘা, বকখালি কিংবা গঙ্গার ঘাটে। খরচ-খরচা সবদিকটা তাকেই মেটাতে হয়। তাই মাসের শেষে বেতনের পুরো টাকাটাই হাওয়া হয়ে যায় তার পকেট থেকে। বেশ কয়েকমাস বাড়িতেও টাকা পাঠাতে পারেনি অমল। একটা বছর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে কেটেছে ওর দিনগুলো। কিন্তু রণিতার সঙ্গে সম্পর্কের আনন্দমুখর দিনগুলো একদিন তেতো হয়ে যায়। রণিতার চেঞ্জটা অমলের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়। অমল টের পায়, রণিতা কিছুদিন থেকে তাকে এড়িয়ে চলছে। পল্লব যোশী। অফিসের এগজিকিউটিভ ম্যানেজার। ওর সঙ্গে রণিতার মাত্রাতিরিক্ত মেলামেশা। অফিসের পর অমল নয়, রণিতার সঙ্গী এখন পল্লব। পল্লবের সঙ্গে মার্কেটিং করা, নাইট শোতে সিনেমা দেখা, এসব চলছিল প্রকাশ্যেই। এ ব্যাপারে অমল তাকে জবাবদিহি করে—আমি চাই না পল্লবের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করো।

রণিতার চটজলদি উত্তর—ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাটা আমি লাইক করি না।

—তাইবলে আমি যেটা পছন্দ করি না সেটা তুমি করতে পারো না রণি।

অমলের কণ্ঠস্বরে আক্রোশ ঝরে পড়ে।

জোরালো কণ্ঠে রণিতা জবাব দেয়—তোমার পছন্দে-অপছন্দে আমার কিছু

আসে যায় না। আফটার অল পল্লব আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে রিলেশানটা কোনোভাবেই ছাড়তে পারব না আমি।

উত্তেজিত কণ্ঠে অমল বলে—তাতে করে যদি আমাদের রিলেশান কাটা পড়ে।

বিরক্ত রণিতার তৎক্ষণাৎ জবাব—পড়বে পড়বে।

অমল উত্তেজনায় ফেটে পড়ে—ইউ আর এ কল গার্ল, আই হেট ইউ, আই হেট...

ঠিক তখনই পল্লব সেখানে হাজির হয়। অতি দ্রুত পল্লব রণিতাকে টেনে নিয়ে যায় ঘরে।

এই বাগ্‌বিতণ্ডার পরেই রণিতা অমলের সঙ্গে সবরকম সম্পর্কেরই ইতি টানে। রণিতাকে হারিয়ে অমল যেন গাড্ডায় পড়ে। হতাশা কাটাতে ও বারে যায়। কোনো কোনোদিন বউবাজার কিংবা সোনাগাছির নিষিদ্ধ আলয়ে।

অফিসের কাজেও ভুলভাল। বসের কাছে প্রতিদিনই বকুনি খাওয়া। তিতিবিরক্ত বস একদিন তো বলেই বসে—এভাবে আর চলছে না অমল, ডেস্কটপটা তো তোমার ভুলে ভরা।

নেশাগ্রস্ত গলায় অমল কাকুতি-মিনতি করে—আর একটা বার চান্স দিন স্যার, আর মাত্র একবার, প্লিজ।

বস বলে—চান্স অনেকবারই হয়েছে। তাছাড়া, তোমার জন্য উপর-মহলের শাস্তির বোঝাটা আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে বারবার। তোমার ব্রেনটাই ডিসটারবনেস। ওটাকে আগে ঠিক করো।

—আপনি কি বলছেন স্যার। আমার মাথা ডিসটারবনেস, কে বলল আপনাকে, ওই পল্লব শালাটা না!

উত্তেজনায় ফেটে পড়ে অমল।

বস তাকে থামাতে চায়—এটা অফিস অমল, ভদ্রভাবে কথা বলো, নইলে...

একটু থেমে—ওরা ঠিকই বলেছে, মাথাটা তোমার গেছে। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, ভালো সাইকিয়াটিস্ট দেখিয়ে আগে মাথাটা সুস্থ করো। তারপর কাজে এসো।

বসের এইপ্রকাব অপমানজনক কথাবার্তায় অমলও অধৈর্য হয়ে পড়ে মুখ থেকে একদলা থুথু ছিটিয়ে সে বলে ওঠে—দূর শালা! তোর চাকরি।

ফাইলটা মেঝেতে নিক্ষেপ করে দ্রুত পায়ে সে বেরিয়ে আসে অফিস থেকে।

এরপরে অমল আর অফিসে যায়নি। পথে-ঘাটে পাগলের মতো ঘুরে

বেড়িয়েছে। রণিতাকে বহুবার কল করেছে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই রণিতা ফোন কেটে দিয়েছে, নয়তো সুইচ অফ করে রেখেছে। পরে সিম্‌টা পাল্টেও নিয়েছে। অমল রণিতাকে একা পেতে চেয়েছে বহুবার। কিন্তু পায়নি। বারতিনেক দেখেছিল ওকে। কিন্তু পল্লবের সাথে। চাকরি থেকে বরখাস্তের পর অমল কিছুদিনের জন্য ফিরে গিয়েছিল গ্রামে। কিন্তু সেখানেও মন টেকেনি তার। দুর্বোধ্য কারণে অতি দ্রুত ফিরে আসে শহরে। একটা কম্পিউটার সেন্টারে অল্প মাইনায় কাজও জোটায়। মনটা পড়ে আছে রণিতার কাছে। কখনো প্রতিহিংসায় ছিন্নভিন্ন করে পল্লবকে, কখনো বা রণিতাকে। আবার কখনো বিরহের সুতীব্র যাতনায় একা একা কাঁদে। মাথার চুল ছেঁড়ে। ঘরের দু-চারটে আসবাবপত্র ভেঙে খান খান করে। সপ্তাহান্তে পাওয়া মাইনের টাকাটা মদের নেশা আর বেশ্যাপাড়ার মজলিশেই উড়িয়ে দেয় অমল। বেশি রাতে ঘরে ফিরেও নিস্তার নেই। ডিমলাইটের আলোয় রণিতার নগ্ন দেহটা ওর মনে ঈর্ষার পারদ চড়ায়। তখন পাগলের মতো এটা-ওটা চেপে ধরে।

রবিবার সন্ধ্যায় খোকন আসে ওর ঘরে—কিরে, শুনলাম ওদের বিয়েটা নাকি পাকা?

নাক সিটকায় অমল—বিয়ে! বিয়ে আমি ছাড়াচ্ছি। শালা আমার সঙ্গে বেইমানি!

তাচ্ছিল্যের সুরে খোকন বলে—তুই শালা একটা হিজড়ে। নইলে পল্লব এভাবে তোর মুখের গ্রাস কেড়ে নিল, আর তুই দিব্যি তা হজম করে নিলি। তোর জায়গায় আমি থাকলে শালা দুটোকেই খুন করতাম।

প্রবল উত্তেজনায় অমল হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—প্রতিশোধ আমি নেবই। তুই দেখে নিস্ খোকন, আমি রণিতাকে ...

—চুপ কর শালা। বাইরে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। যা বলবি আস্তে বল।

এক ধমকেই অমলকে থামিয়ে দিল খোকন। তারপরও ঘন্টাখানেক ওদের মধ্যে গোপন শলাপরামর্শ চলে।

শনিবার। আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে রণিতা। রণিতার গতিবিধির প্রতিটি মুহূর্তই মুখস্থ অমলের। রবীন্দ্রসরোবর মেট্রো থেকে হাঁটা পথে ওর বাড়ি মিনিট পনেরো। রণিতা যখন ঘরে ফেরে তখন সন্ধ্যে সাতটা। বাড়িটা প্রায় শূন্য। রণিতার বাবা-মা গুরুমার আশ্রমে যান প্রতি শনিবার। ফিরতে রাত দশটা। দাদাও চাকরির প্রয়োজনে বাইরে। গেট খুলে রণিতা ভেতরে

ঢোকে। একটা ছায়ামূর্তিও রণিতার চোখের অগোচরে ভেতরে ঢুকে গেল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায় রণিতা। চাবি নক করতেই দরজা খুলে যায়। পিছনে পিছনে ঢুকে পড়ে অমলও। ঘরে একটা ডিমলাইটের আবছা আলো। তাতেই অমল গা ঢাকা দেয়। বাথরুমের সাওয়ারটা খুলে রণিতা ইচ্ছা মতো স্নান করে। নাইটিটা গায়ে চাপিয়ে বাইরে আসে রণিতা। ডাইনিং রুমে পা দিতেই অমলের মুখোমুখি। চমকে ওঠে রণিতা—একি তুমি! মানে আপনি, এখানে কি করে!

অমলের মুখটা বীভৎস দেখায়। অমলের বিকৃত চেহারা দেখে রণিতা ভয় পায়। অমলের গম্ভীর গলা শোনা গেল—একটা বিশেষ দরকারে আমি এখানে এসেছি।

—তোমার সঙ্গে তো আর কোনো কথা থাকতে পারে না আমার।

—কাজটা কি তুমি ভালো করছ রণিতা?

—অফকোর্স। আমি ফ্রেন্ডের মতো তোমার সাথে মিশেছিলাম। বাট ইউ, তুমি আমার লাভার পল্লবকে থ্রেট দিয়েছ। পল্লবকে আমি ভালবাসি, তোমাকে নয়।

—চুপ শালী। একদম শেষ করে ফেলব। আমাকে চিট করে শেষে পল্লবের সঙ্গে রঙ্গরস করতে বেড়িয়েছিস।

—অমল, তুমি চলে যাও এখান থেকে, আই সে গেট আউট। অমল আচমকা রণিতার হাতটা চেপে ধরে—বেরিয়ে যেতে তো আমি আসিনি সোনা। আমি তোমাকে পেতে চাই, আরও একবার। প্লিজ আমার কাছে এসো সোনা। কথাটা বলেই অমল রণিতাকে জাপটে ধরে।

কোনোক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে উচ্চস্বরে রণিতা বলে—খবরদার অমল, আমাকে ছোঁবে না। আমি কিন্তু চেঁচাব। ভালো চাও তো ...

—সে সুযোগ তোমাকে আমি দিচ্ছি না ডারলিং। কথাটা শেষ করেই অমল পুনরায় রণিতাকে জাপটে ধরতে ধাবিত হল। রণিতা দ্রুত দরজার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। আবার কিছুক্ষণ। ধস্তাধবস্তি। রাগের মাথায় রণিতা একদলা থুথু ছেটায় অমলের গায়ে। অমল নিজেকে আর সামাল দিতে পারে না, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হিংস্র জন্তু হয়ে পড়ে। তলপেট থেকে ঝাঁ-চকচকে ধারালো ছুরিটা বের করে রণিতার গলায় বসিয়ে দেয়। গলা থেকে তলপেটে। রণিতা পড়ে যায় মাটিতে। ওর পরনের রঙিন নাইটিটা ছিঁড়ে ফালা ফালা। দেহটা হিস্টোরিয়া রুগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎই পড়ে গেল মেঝেতে। অমল ওর রক্তাক্ত নগ্ন শরীরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিকৃত জৈবিক ক্রিয়াটা সমাপ্ত করে অতি দ্রুত। ধারালো ছুরিটা রক্তাক্ত শরীরটার বেশ কয়েকটা

জায়গায় ছুঁয়ে গেল আরও একবার। রণিতার দেহটা শেষবারের মতো কেঁপে ওঠে। তারপর সব নিস্তেজ, নিস্তব্ধ। রক্তের ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে দরজার কাছে। সেদিকে অমলের হুঁশ নেই। অমল বাথরুমে ঢোকে সাওয়ার খুলে ইচ্ছামতো স্নান করে। দশ মিনিট বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। দরজার কাছে এসে কাঁপা গলায় ডাকে— খোকন, কাজ হাসিল। এবার দরজাটা খোল।

খোকন, বাইরে থেকে ছিটকানিটা খুলে দেয়। তারপর সবার অজান্তেই দুটো ছায়ামূর্তি অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়।

সেদিন রাতেই হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে অমল গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়। খোকনও বর্ডার টপকে চলে যায় ওপারে। গাঁয়ে ফিরেই অমল চন্দ্রিমাকে খোঁজে। মানসিক শান্তি পেতে ওর দরকার চন্দ্রিমার সান্নিধ্য। কিন্তু চন্দ্রিমা এখন কোথায়? কোন গাঁয়ে? জানে না অমল। জানে না গাঁয়ের লোকেরাও। সন্ধ্যার পর অমল বাইরে বের হয়। চন্দ্রিমার খোঁজে ও যায় নদীর ধারে। জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে নদীর চড়ায় ও চন্দ্রিমাকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু পায় না। দিনের আলোকে ভয়। উর্দিপরা লোকগুলো যদি ওকে চিনে ফেলে।

এক দুপুরে অমলের মা জিজ্ঞাসা করে—কতদিন হয়ে গেল বাড়ি আইছিস। কলকাতায় যাবি কবে।

একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করতেই অমল ক্ষোভে ফেটে পড়ে—সব ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামানো। বলেছি তো চাকরিটা আমার চলে গেছে।

—একটা চাকরি গেইছে, তা বলি দ্যাশে আর কি চাকরি নাই!

অমলের পিতা মিহির ঘোষ খেতে খেতেই কথাটা পাড়ে।

—এখন চাকরির বাজার মন্দা। তাছাড়া চাইলেই তো আর চাকরি হয় না।

ছেলের কথাটা কোনোমতেই মানতে পারে না মিহির ঘোষ—গাঁয়ে-গঞ্জে পড়ি থাকলে কি আর চাকরি জুটবে কোনোদিন।

অমলের মাও স্বামীর কথায় সায় দেয়—ওগো রানা কইছিল, চাকরি ছাইড়ে অমল হঠাৎ চলি এলো ক্যান মাসিমা? রাত-দিন ঘরের মধ্যি পড়ে থাকে। আমি কি জবাব দেব কও?

রানার নামটা শুনে অমল তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—রানা জানল কী করে এসব কথা!

মিহির ঘোষ উচ্চগলায় বলে— গাঁয়েগঞ্জে এসব কথা কারো কী আর জানতি বাকি থাকে! তুই না বললিও লোক খুচাইয়া খুচাইয়া বের করবে ঠিক।

বাবার সঙ্গে তর্কটা আর বেশি দূর গড়ায় না। বারান্দায় সন্দিগ্ধ পদধ্বনি

শুনে অমল চুপ করে যায়।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত রাতে বাতায়নে মুখ রেখে অমল চন্দ্রিমার কথা ভাবছিল। চন্দ্রিমা, তার প্রেমিকা চন্দ্রিমা এখন অন্যের ঘরণী। এত তাড়াতাড়ি কি করে চন্দ্রিমা ভুলে গেল তাকে! কী করে! একবার মনে হল রাতের অন্ধকারে চন্দ্রিমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে ওর শ্বশুরঘর থেকে। এসব ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই জানলার ধারে কাকে যেন দেখা গেল। অমলের চমক লাগে। কে ও? চন্দ্রিমা, নাকি রণিতা।

রাত দশটা নাগাদ পুলিশের একটা জিপ অমলদের বাড়ির সদরগেটে এসে থামে। অমল তখন খেতে বসেছে। ভাত চিবোতে চিবোতে সে মাকে জিজ্ঞাসা করে—কে এল যেন মা, দেখ তো। গাড়ির আওয়াজ শুনলাম।

সস্নেহে অমলের মা বলে—তুই খাতি থাক, আমি দ্যাখতিছি।

খেতে বসেও মনটা স্থির নেই অমলের। জটবাঁধা সুতোর মতো তা আরো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যত ছাড়াই, তত যেন জট পাকে।

এমন সময় ওর মা ঘরে ঢোকে। মায়ের কথায় চমক ভাঙে তার—পুলিশ তোরে খুঁজতিছে অমল, হ পুলিশ!

'পুলিশ' শব্দটা কানে যেতেই অমল শিউরে ওঠে। ভাত ফেলে ধড়মড় করে উঠে বসে। এঁটো হাতেই পিছন দরজা দিয়ে পালাতে চায় অমল। কিন্তু পারল না। সেখানেও দুজন উর্দিধারী লোক দাঁড়িয়ে। রাতের অন্ধকারে ওদের ভুত বলে ভ্রম হয় অমলের। অবশেষে ধরা পড়ল অমল। হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ তাকে তুলল জিপে। জিপ ছাড়ার মুহূর্তে মার আর্তকণ্ঠ শুনতে পায় অমল—ও খুন করনি। ওরে তোমরা ছাড়ি দাও। ওরে তোমরা লয়ে যাইয়ো না। ও নির্দোষ। পুরোপুরি নির্দোষ।

একটা পুলিশ ধমক দিয়ে তাকে থামাতে চায়—হ নির্দোষ। তোর ছেলে কচি খোকা তো। তাই ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।

বাবার করুণ কণ্ঠস্বরও কানে বাজে—আপনারা বিশ্বাস করুন স্যার, ও অমন কাজ করতি পারে না। কখনোই করতি পারে না।

উর্দিধারী লোকটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—ওসব বিশ্বাস-টিশ্বাস ওপরওয়ালা বুঝবেখন। আগে তো আমরা যাই।

বলতে বলতেই জিপ ছেড়ে যায়।

আলিপুর জেল। গত দু-বছর ধরে এখানকার অন্ধকার সেলে বন্দি অমল।

খুন-ধর্ষণের আসামী। রাষ্ট্র, আইন, আদালত সব কিছুকেই নতুন ঠেকে অমলের। ওদিকে পাকা খাতার হিসেব-নিকেশ ঠিকঠাক ভাবেই এগোচ্ছে। রাষ্ট্রনামক দানবটা মাঝেমধ্যে উঁকি দেয় অন্ধকার সেলে। বাঘা-বাঘা নখ আর বড় বড় দাঁত বের করে মুখ ভেংচায়—মরণফাঁদে পড়েছিস। তোর আর নিস্তার নেই। তোর রক্ত খাব, মাংস খাব, খাব তোর হাড়-গুড্ডি সব। অমল ভয়ে সিঁটিয়ে সেলের এককোণে জড়সড়ো হয়ে থাকে।

কদিন ধরে অমল টের পাচ্ছে সেলের মধ্যে আরও একটা সেলের অস্তিত্ব। সেখানে রক্ত, মাংস আর মরা মানুষের মুখ। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর রণিতার রক্তাক্ত মুখটা অন্ধকারেও স্পষ্ট হয়। ফাঁদের মধ্যে আটকে পড়া অমল মৃতের হিমশীতল স্পর্শে শিউরে ওঠে—মরা মানুষকেও ফাঁদে জড়িয়েছিস, ওটাকে সরা এখান থেকে। উঃ, আর সহ্য হচ্ছে না আমার। সরা, ওকে সরা, সরা, সরা, সরা...

সহ্য করতে না পেরে এক সময় হাউ হাউ করে কাঁদে অমল—চন্দ্রিমা আমায় বাঁচাও, প্লিজ, চন্দ্রিমা, প্লিজ...

কাঁদতে কাঁদকে অমল এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে কিসের শব্দে অমলের ঘুম ভাঙে। সেলের গরাদে ঘোমটাপড়া একটা বউ দাঁড়িয়ে। তাকে কী যেন বলতে চায়। ঘোমটা খসে পড়তেই অমল চমকে ওঠে। এ যে চন্দ্রিমা। তার চন্দ্রিমা। অমল তাড়াতাড়ি উঠে আসে। ডাগর ডাগর চোখ মেলে চন্দ্রিমা তারই প্রতীক্ষায়। চন্দ্রিমার সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে রকমারি চুড়ির ঝনঝনানি। গরাদের কাছে এসে চন্দ্রিমার মুখোমুখি হয় অমল। মনের কোনে হালকা বাতাস বয়। ফুরেফুরে বাতাস, ভাল লাগার।

চন্দ্রিমার মিষ্টি গলা শোনা গেল—তুমি সেলে কেন?

—অ্যা! জানি না তো।

—জান না? তুমি জান না!

—বিশ্বাস করো চন্দ্রিমা, আমি সত্যিই জানি না।

—কি করেছ তুমি? ধর্ষণ, না খুন?

—না না, বিশ্বাস করো, আমি চায়নি ওসব। ওরাই আমায় ফাঁদে জড়িয়েছে। নইলে আমি তো তোমাকে নিয়েই সুখী ছিলাম... বলতে বলতে গলাটা ধরে আসে অমলের।

—কিন্তু সবাই যে বলে, অমলই দোষী। অমল খুনি, অমল ধর্ষক।

—না না, এসব মিথ্যে। তুমি ওদের কথা বিশ্বাস করো না চন্দ্রিমা, আমি বলছি, ওরা সব মিথ্যে বলছে, মিথ্যে।

অমলের আর্তকণ্ঠ শোনা যায়।

সস্নেহে চন্দ্রিমা বলে— আমি বিশ্বাস করি না কারোকে। আমি শুধু তোমাকেই মানি। তুমি শান্ত হও অমল। প্লিজ...

অমলের মুখে প্রসন্নতার হাসি—তুমি খুব সুন্দর চন্দ্রিমা। খুব সুন্দর।

একটু থেমে—তুমি যদি সব কদিন থাকতে আমার সাথে তবে ওরা কোনোভাবেই ফাঁদে ফেলতে পারতো না আমায়।

চন্দ্রিমা হাসে।

—তুমি হাসছ। আচ্ছা চন্দ্রিমা, আমায় ফাঁদে জড়াচ্ছে দেখেও তুমি এলে না কেন আমায় বাঁচাতে?

স্নিগ্ধ গলায় চন্দ্রিমা বলে—আমি জানতাম না।

—জানলে না কেন তুমি! তুমি থাকলে আজ কী আমার এই দশা হয়!

আবেগে আপ্লুত অমলের মাথায় হাত রাখে চন্দ্রিমা—এখন থাক ওসব কথা। এখন ঘরে যাও লক্ষ্মীটি। রাত বাড়ছে যে। আমায় তো এবার যেতে হবে।

অমল তাড়াতাড়ি সচেতন হয়—হ্যাঁ যাও। কাল এসো আবার।

—হ্যাঁ, তুমি শুয়ে পড়ো। খালি মেঝেতেই শুতে হবে তোমায়?

—এখানে এই নিয়ম। বিছানাপত্র, তক্তাপোশ পাব কোথায়? একটু থেমে অমল কথা পাড়ে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব চন্দ্রিমা?

—করো, একটাই কিন্তু, আমাকে আবার বাসায় ফিরতে হবে।

—তুমি কি এই সেলেই থাকো? মানে, এখানেই কি তুমি চাকরি করো?

চন্দ্রিমা হাসে—ঠিক মাইনে ধরা চাকরি নয়। তবে আসি-যাই। আজ যেমন তোমাকে দেখতে এসেছি।

—রাতে কেন, দিনে আসতে পার না তুমি?

—দিনে ওরা থাকে যে।

উর্দিপরা লোক দুটোকে গরাদের কাছে দেখা গেল হঠাৎ। চন্দ্রিমাও আর দাঁড়াল না। হেঁটে গেল করিডোরের দিকে।

অমল চিৎকার করে ওঠে—চন্দ্রিমা, তুমি যেও না। ওরা তোমায় রেপ করবে। প্লিজ চন্দ্রিমা...

—না না, কিছু হবে না আমার। তুমি শুয়ে পড়ো..

বলতে বলতেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় চন্দ্রিমা।

পরের দিন সন্ধ্যায় চন্দ্রিমা আবার এল অমলের কাছে। গরাদের শিকে বুক ঠেকিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। পরনে গোলাপি শাড়ি। ঠোঁটেও গোপাপি রং। কোমর অবধি নেমে আসা লম্বা চুল।

অমলই প্রথমে কথা বলে—তোমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।

চন্দ্রিমা হাসে—রণিতার চেয়ে সুন্দর?

নামটা শুনে আঁতকে ওঠে অমল—রণিতা? রণিতা কে? ও নামে আমি তো কাউকে জানি না!

—আমি জানি, সব জানি আমি অমল।

চন্দ্রিমার মুখে দুষ্টু হাসি খেলে যায়।

—তুমি সব জানো?

অমলের কণ্ঠে উত্তেজনা।

—জানি বই কি। তোমার সঙ্গে রণিতার প্রেম প্রেম খেলা। তারপর ওর সরে যাওয়া, তাতে করে যন্ত্রণায় তোমার অস্থির হয়ে ওঠা, তারপরেই তো তুমি ওকে...

শিহরিত অমল চন্দ্রিমাকে থামিয়ে দেয়—থাক, থাক। ওসব আর শুনতে চাই না আমি। এখন অন্য কথা বল। তোমার কথা।

একটু থেমে অমল আবার প্রশ্ন করে—আচ্ছা, ছিলে কোথায় তুমি এতদিন?

চন্দ্রিমা উত্তর দেয়—এখানে, এই কলকাতাতেই।

—তুমি মিথ্যে বলছ। কলকাতায় থাকলে তোমায় দেখতে পাইনি কেন আমি?

—দেখতে চাওনি তাই দেখোনি, আমি ছিলাম কলকাতাতেই।

—ও চন্দ্রিমা! এভাবে লুকিয়ে কেন ছিলে এতদিন! ক্ষোভে ফেটে পড়ে অমল।

—কি করব বলো, আমারও তো একটা সংসার আছে, স্বামী আছে...

অমল ধমক দেয়—চুপ করো। সংসার, স্বামী! এসব কিছু থাকতে পারে না তোমার। না, না...

অমলের কণ্ঠস্বর আরো ধারালো হয়।

একটা পাহারাদার ছুটে আসে এদিকে—অ্যাই, ক্যায়া বোলে তু? আন্দর মে যাও। যাও, যাও...

লাঠির খোঁচা খেয়ে অমল ভিতরে ঢুকে পড়ে।

চৌদ্দই আগস্ট। আর মাত্র একটা দিন। কালো মুখোশধারী লোকদুটো ঘুমের মধ্যেও উঁকি দেয় সেলে। ভয়ে অমলের শিরদাঁড়াটা কনকন করে ওঠে। ধড়মড় করে উঠে বসে অমল। ঘেমে-নেয়ে সে একসা হয়। খুব ভয় ভয় করছে ওর। লোক দুটো বোধহয় এখুনি ঢুকে পড়বে ঘরে। তাকে নিয়ে যাবে তুলে। অন্ধকারে হাঁ করা ফাঁসির দড়িটা দেখে কুঁকড়ে যায় অমল।

অমলের অবস্থান এখন ছ-ফুট বাই আট-ফুটের একটা নিজস্ব ঘরে। এ স্থানটা খুব নির্জন, নিঃস্তব্ধ। এখানে কেউ তাকে বিরক্ত করে না। চতুর্দিকে দেওয়াল, শক্তপ্রাচীর। প্রাচীরের একপ্রান্তে একটা লোহার ভারী দরজা। দরজার আড়ালে মাঝেমধ্যে প্রহরীদের দু-চারটে কথা কানে আসে। এই অন্ধকার দুর্ভেদ্য আবেষ্টনীতে চন্দ্রিমারও প্রবেশাধিকার নেই। অমলের মনটা এখানে সারাদিন অন্ধকারে ডুবে থাকে। উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে আবছা আলো সেলের অন্ধকারে সাঁতরে বেড়ায়। কিন্তু সেই আলোতে চন্দ্রিমার দেখা মেলে না। দিনরাত সর্বক্ষণ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অমল কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়। কিছু একটা জাপটে ধরতে চায়। কিন্তু কোনো কিছুর কিনারা না পেয়ে হতাশায় ডুবে মরে। মাঝে মাঝে দেওয়ালে মাথা ঠোকে, কিন্তু প্রহরীর সতর্কতায় বড় অঘটন এড়ানো যায়।

তেরোই' আগস্ট সন্ধ্যা সাতটায় ওরা খাবার দিতে এল। ভালো খাবার। ভাত, মাছ, ডাল, তরকারি, বনফুলের বড়া। অমল কিছু খেল, কিছু খেল না। গলা দিয়ে নামতে চায় না খাবার। কি যেন একটা আটকে আছে গলার কাছে। প্রহরীর সস্নেহ কণ্ঠস্বর—খেয়ে নাও বাবা, আস্তে আস্তে খেয়ে নাও।

অমলের চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। খাওয়া শেষে প্রহরী জিজ্ঞাসা করে—কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও তুমি?

অমল বলে—চন্দ্রিমা।

প্রহরী চলে যায়। একটু পরে আবার ফিরে আসে—চন্দ্রিমা বলে তো কেউ আসেনি দেখা করতে। তোমার মা-বাবা একবার দেখতে চায় তোমাকে। ওদের নিয়ে আসি?

অমল নীরব থাকে। প্রহরী চলে যায়। একটু পরে সেলের ধারে অমলের বাবা-মাকে দেখা গেল। কান্নামিশ্রিত কিছু কথাও শুনতে পেল অমল। তারপর আবার সব শান্ত, নিস্তব্ধ।

রাতের ঘুমটা কেটে যায় অমলের। আবছা অন্ধকারে ছয় ফুট বাই আট ফুট ঘরে চন্দ্রিমাকে দেখতে পেল অমল। চন্দ্রিমাও একটা সেলের মধ্যে বন্দি। মুখোশধারী সেই লোকদুটো ঢুকে পড়েছে সেই সেলে। ওরা চন্দ্রিমাকে ছিঁড়েছে, ওর পোশাক, গোলাপি শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ সব। চন্দ্রিমার নগ্ন দেহে গোলাপি আভা। ওর স্তন, উরু, জান্তব হাতের থাবায় দলিত-প্রেষিত হচ্ছে। ক্রমাগত দলন, আর প্রেষণে ওর দেহটাও নীলবর্ণ ধারণ করেছে। তলপেট থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারা মিশেছে মেঝেতে। অমল আর সহ্য করতে পারে না। প্রচণ্ড আক্রোশে সে ছুটে যায় দরজার কাছে। সজোরে ধাক্কা বন্ধ আগলে—রেপ, রেপ, চন্দ্রিমাকেও রেপ করছে ওরা...। দরজা খোল, নইলে আমি সব ভেঙে দেব।

কথাগুলো বলতে বলতেই লোহার কপাটে দুমদাম লাথি মারতে থাকে অমল। দরজা খুলে দড়াম করে। উর্দিপরা প্রহরী কাছে এসে দাঁড়ায়—তুমি ঘুমোও বাবা, ভয় নেই তোমার, আমরা তো আছিই। অমল আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে—আমার চন্দ্রিমাকে ওরা রেপ করছে, ওরা খুন করবে ওকে। ওকে তোমরা বাঁচাও।

প্রহরী শান্ত স্বরে বলে—কেউ মারবে না তোমার চন্দ্রিমাকে। ওকে আমরা দেখবখন। তুমি ঘুমোও বাবা।

প্রহরীর গলা তরলিত। অমল আর কথা বলে না। মেঝেতে বসে পরে। প্রহরী ধরাধরি করে ওকে শুইয়ে দেয়। গায়ের ওপর হালকা চাদরটাও টেনে দিল সে। একজন পণ্ডিত গোছের লোক অমলের কানের কাছে ফিসফিস করে গীতার শ্লোক আওড়ায়। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘণ্টাধ্বনির শব্দে অমল জেগে ওঠে। একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে গা-টা কেঁপে ওঠে। কালো পোশাক আচ্ছাদিত দুটো লোক তাকে নিতে এসেছে। ওদের মধ্যে একজন গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে—সময় হয়েছে। এবার তোমাকে উঠতে হবে। বাধ্য ছাত্রের মতো অমল উঠে দাঁড়ায়। চানঘরে ঢোকে।

ওরা অপেক্ষা করছিল বাইরে। অমল আসতেই নতুন পোশাক গায়ে চাপায়। তারপর ওদের নির্দেশিত পথেই অমল এগিয়ে যায় সামনে।

উপেক্ষার আড়ালে

ছান্দিক

কণ্ঠস্বরটা শুনেই চমকে উঠি! তারপর অবশ্য শান্তভাবেই বলি, হ্যালো। চিনতে কষ্ট হচ্ছে! দুর্বল মনটা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। চিনতে পারছি বলা মানে তো স্বীকার করে নেওয়া মনের মধ্যে আজো সে বেঁচে আছে। এতবছর পরেও তার কণ্ঠস্বর চিনতে আমার ভুল হয় না। কিন্তু কি দরকার তাকে আমার চেনার? বললাম, আমি কি যাবতীয় নারীকণ্ঠের ইজারা নিয়েছি নাকি যে কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারব কে কথা বলছে?

বেশ মজা লাগছিল কথাগুলো বলতে। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল কিভাবে আমার কথাগুলো সে হজম করছে? ও বলল, সরি সৌদীপ আমার এভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। আমার কণ্ঠস্বরকে যে তুমি শোনা মাত্র চিনতে পারবে এতটা দাবি করা আমার অন্যায়। বললাম, থামুন আপনি! রাতদুপুরে এভাবে কাউকে ফোন করতে আপনার লজ্জা করে না! তাছাড়া আমার নামটাই বা জানলেন কি করে?

ও বোধহয় ভাবতে পারেনি আমি এতটা রূঢ় হতে পারি। বলল, এভাবে কথা বলো না সৌদীপ, বড্ড কষ্ট হয়! আমাকে অস্বীকার করতে চাও কর, প্লিজ একটু ভালভাবে কথা বল। উত্তরে বলি, দাবিটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? জানি না সৌদীপ, তারপর বলল, একবার ভেবেছিলাম সরাসরি তোমার কাছে চলে যাব, কিন্তু মুখের 'পরে যদি দরজা বন্ধ করে দাও? আর এতরাতে ফোন করার কারণ, এ সময়ে তোমাকে পাব বলে। হেসে বলি, বাঃ চমৎকার! তা দয়া করে বলবেন কি আমি আপনার কত নাম্বারের শিকার। সৌদীপ! যেন আর্তনাদ করে ওঠে ও। বললাম, থামুন! এত রাতে এসব ন্যাকামি একেবারে অসহ্য।

রিসিভারটা রাখতে যাব, বুঝতে পেরে ও বলে, প্লিজ আমার একটা কথা শোন, তারপর না হয় লাইনটা কেটে দিও। উত্তরে রুক্ষকণ্ঠে বলি, কি বার বার সৌদীপ, সৌদীপ করছেন, যেন কতকালের চেনা। ও বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, সত্যি কি আমায় চিনতে পারনি, না চিনতে চাইছ না? বাঃ রে, চিনতে পারলে জানতে চাইব কেন? তারপর বললাম, বহু বছর আগে এমনি করে আমাকে একজন বিরক্ত করতেন, যেন কত আপনজন। তারপর একদিন তার আসল পরিচয় জানতে পেরে মন থেকে চিরকালের জন্য তাকে মুছে ফেলি। তাই আপনার পরিচয়টা আগে জানা দরকার, কে আপনি?

বুঝতে পারি থরথর করে কাঁপছে ও। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, চিনতেই যখন পারছ না বা চাইছ না তখন আর কি লাভ আমার পরিচয় জেনে? তারপর বলল, আমার মতো মেয়েদের সময়-অসময় জ্ঞান না থাকলেও তোমার তো আছে, তাই আর বিরক্ত করব না। আর হ্যাঁ, এর আগেও বেশ কয়েকবার তোমাকে ফোন করেছি আর ছেড়েও দিয়েছি অন্য গলা শুনে। থাক গে সে সব কথা। তোমাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। তবে যদি সত্যি সত্যি কখনো চিনতে পার, দাবিটা একটু বেশি হয়ে গেলেও একবার ফোন কর। নাম্বারটা মনে হয় ভুলে যাওনি! তোমার ফোনের অপেক্ষায় বাকি রাতটা আমি জেগেই থাকব।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওর সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করার কি প্রয়োজন ছিল? আগেও কয়েকবার ফোন করেছে। হয়তো সে কিছু বলতে চায়। এমনো তো হতে পারে ও কোনো, বিপদে পড়েছে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি তুমি কি চাও সৌদীপ? তুমি কি মনে কর তোমার কোনো দোষ নেই? ও কাকে ভালবাসবে না বাসবে, কার সঙ্গে ওঠাবসা করবে সে তো ওর ব্যাপার। তুমি যদি ওকে সত্যিই ভালবাসতে তাহলে এই ছলনা করতে পারতে?

কি করেছে ও? তোমাকে অস্বীকার করে ও অঙ্কেশকে বিয়ে করেছে। আর এই অঙ্কেশের সঙ্গে তো তুমিই ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে। তারপর যদি ও অঙ্কেশকে ভালবেসে বিয়ে করে থাকে, তাতে তো তোমার কিছু বলার থাকতে পারে না। তুমি তাকে ভালবাসবে অথচ তার দায়িত্ব নেবে না এটা তো হতে পারে না। আর কোনো দায়িত্ব নেবে না তাও স্পষ্ট করে বলেছ যে নর-নারীর ভালবাসায় বিয়েই একমাত্র পরিণতি তা তুমি মানো না? তাহলে সে কাকে বিয়ে করবে কি না করবে তাতে তোমার কি যায় আসে? তোমার বিবাহহীন ভালবাসায় তার যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তাকে তুমি দোষ দিতে পার না।

আর অঙ্কেশ? সে তো এল দেখল এবং জয় করে নিল তার হৃদয়। তার ভালবাসার বন্য উন্মাদনায় সে ভাসিয়ে নিয়ে চলল শঙ্কিতাকে। নারী তো চিরকালই পুরুষের এমন দুঃসাহসী ভালবাসার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে ধন্য হয়।

যেদিন অঙ্কেশ এসে বলল, এমন আগুনে মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলি বলে তোর কাছে আমি ঋণী সৌদীপ। এমন এক উষ্ণ নারীকেই তো চেয়ে এসেছি চিরকাল। অথচ এতকাল যাদের সংস্পর্শে এসেছি ওদের বড়জোর দুধের সাথে আমসত্ত্বের মতো গুলে খাওয়া যায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকাই ওর দিকে। ও বলল, এমন করে তাকাচ্ছিস কেন? বললাম, ভাবছি। ও বলল কি ভাবছিস? উত্তরে বলি, অনেক মেয়ের তো সর্বনাশ করেছিস! শক্তিতাকেও সেই সর্বনাশের পথে না নিয়ে যেতে পারতিস। ও বলল, সর্বনাশ আমি করেছি? ওই তো পাগলের মতো তার দিকে আমায় আকৃষ্ট করেছে। তবে একথা তোকে বিশ্বাস করতে হবে যে পুরুষের রক্ত নিয়ে হোলিখেলার অধিকার তার আছে। তারপর বলল, নারীর মধ্যে যে এত উষ্ণতা থাকতে পারে তা ওর সংস্পর্শে না এলে বুঝতেই পারতাম না।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, শাটআপ অক্লেশ।

ইট ইজ টু মোর। লজ্জা করে না এসব নোংরা কথা বলতে! বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে অক্লেশ বলল, একে তুই নোংরা কথা বলছিস? তাহলে তো বলতে হয় আমাদের জন্মটাই এই নোংরার মধ্যে, তা না হলে নর-নারীর এই পবিত্র সম্পর্ককে তুই নোংরা বলতে পারিস? থাক গে সেকথা, কিন্তু যেভাবে তুই খামোকা আমায় অপমান করলি, তা আর কেউ করলে এক ঘুসিতে তার বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম। আমি শান্তভাবে বলি, তোর পক্ষে সবই সম্ভব তা না হলে কি এতগুলো মেয়ের সর্বনাশ করতে পারিস? ও বলল, অদ্ভুত তো, আমি কি জোর করে কিছু করেছি নাকি? আর ওরা যে এতে আনন্দ পায়নি তাও তো নয়।

ঘৃণায় সারা শরীর রি রি করতে থাকে। ওকে বলি এখান থেকে চলে যা। তোকে আমার একদম সহ্য হচ্ছে না। উত্তরে ও বলল, দুর্বল আবার কবে সবলকে সহ্য করেছে? কিন্তু তোর প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা আছে বলেই নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছি—আগামী রোববার আমাদের বিয়ে, যদি মেনে নিতে পারিস তাহলে অবশ্যই যাস।

ও চলে যেতেই নিজেকেই ফিসফিস করে বলি, একেবারে বিয়ে? শক্তিতা একবারও তার কাছে কিছু জানতে চাইল না? মনে মনে ভাবি, এখনো তো ছ'দিন বাকি, দেখা যাক কিছু বলে কিনা। কিন্তু ওর দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে চারদিন পরেই তাকে ফোন করি। ও হেসে বলে, সংবাদটা তাহলে পেয়ে গেছ? যেন আকাশ থেকে পড়ি। জানতে চাই, কিসের সংবাদ? ও মা! তাও জান না? তাহলে ফোন করলে কেন? বললাম, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তুমি আসবে না আমি যাব তোমার কাছে? ও বলল, হাসালে সৌদীপ, তুমি আসবে আমার কাছে? তারপর বলল, দরকার নেই অত সাহস দেখিয়ে। তার চেয়ে বল কোথায় দেখা করতে হবে?

এসেছিল ও কফি হাউসে। আমি আগে থেকে ওর জন্য অপেক্ষা

করছিলাম। আমাকে বসে থাকতে দেখে সারা গায়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলিয়ে বলল, সূর্য কি আজ পূর্ব দিকে অস্ত গেছে? বললাম, ঠাট্টা থাক এবং আসল কথাটা সেরে নেওয়া যাক। ও বলল, কফি ছাড়া? বললাম, ওটা সময়মতো আসবে, তার আগে আমার কথা সেরে নিই, এক, অঙ্কেশকে কিছুতেই বিয়ে করবে না, দুই, আগামী রবিবার আমিই তোমাকে বিয়ে করব। আর তিন, ভবিষ্যতে অঙ্কেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, অসম্ভব! তারপরে বলল, একদিন আমি তো তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়। কেন? ও বলল, ওকে আমি কথা দিয়েছি। নিমন্ত্রণ পর্যন্ত হয়ে গেছে এখন ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, তুমি আমায় ভালবাস না? ও বলল, জানি না সৌদীপ! কিন্তু তুমি তো বলেছ সব ভালবাসা একরকম নয়। উত্তরে বললাম, হ্যাঁ বলেছি এবং এখনো তা বলি। তাহলে আমাকে চাইছ কেন? বললাম, আমি তোমাকে নরক থেকে বাঁচাতে চাই। উত্তরে বলল, আমি স্বর্গ-নরক বুঝি না সৌদীপ। আমি ওকে কথা দিয়েছি, সেখান থেকে আমার ফেরা সম্ভব নয়। উত্তেজিত হয়ে বললাম, তাহলে ওই লম্পটটাকে তুমি বিয়ে করবে? শঙ্কিতার আর এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগে না। বলল, দেখ সৌদীপ, বার বার এক কথা বলে আমায় বিভ্রান্ত করো না, ভুলে যেও না অঙ্কেশ আমার ভাবী স্বামী, তাই আশা করবো তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে তুমি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করবে না।

স্তম্ভিত হয়ে যাই ওর কথায়। ও যে এমন করে আমায় উপেক্ষা করতে পারে ভাবতেও পারিনি। আমি চুপ করে আছি দেখে ও বলল, অঙ্কেশ সম্পর্কে তোমার যখন এতই অভিযোগ, তাহলে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে কেন। তারপর বলল, নিজে দুর্বল বলে সবাইকে দুর্বল ভেব না। মনে রেখ ওকে আমি ভালবেসে বিয়ে করতে যাচ্ছি। শেষ চেষ্টা হিসাবে ওকে বললাম, তুমি জান না ও কত বড় শয়তান! ও ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, শাটআপ সৌদীপ। তারপর বলল, কে শয়তান আর কে শয়তান নয় এটুকু চেনার মতো বুদ্ধি আমার আছে। আচ্ছা চলি।

ওকে বাধা দিতে পারি না। বার বার মনে হয় এর জন্য তো আমি দায়ী। এখন আর অন্যকে দোষারোপ করে কি লাভ? সত্যিকারের ভালবাসা তো চিরকালই এমনি করে মেকি ভালবাসা আর জৈবিক আনন্দের কাছে হার মেনে এসেছে। ক্লান্ত পায়ে কফি হাউসের বিল মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি অঙ্কেশ আর ও কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

যে ঈশ্বরকে কোনোদিন মানিনি তার কাছেই কাতরভাবে প্রার্থনা করেছি, হে ঈশ্বর যে কোনো অজুহাতে ওদের বিয়েটা তুমি ভেঙে দাও। কিন্তু বধির ঈশ্বর দুর্বলের প্রার্থনা কবেই বা শুনেছে? নির্দিষ্ট দিনে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। বন্ধুদের মধ্যে কেবল আমি ছাড়া সবাই গিয়েছিল সেই বিয়েতে।

বিয়ের পরে শঙ্কিতা চলে যায় দিল্লী। ওখানেই চাকরি করে অঙ্কেশ। দিন দশেক পরে শঙ্কিতার একটা চিঠি পাই। ছোট্ট চিঠি। শঙ্কিতা লিখেছে, 'তোমাকে আঘাত দেওয়ার বা অপমান করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। আশা করি বরাবর যেভাবে আমায় ক্ষমা করে এসেছ এবারও তাই করবে।' না আর কোনো কথা লেখেনি। না নিজের কথা, না অঙ্কেশের কথা।

এরপর তো ওর সংবাদ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিইওনি। এরপরে এক বন্ধুর মুখে শুনি যে শঙ্কিতা ভাল নেই। অঙ্কেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে যে, যে কোনোরকম অঘটন ঘটতে পারে। আমি কোনো আগ্রহ না দেখানোয় বন্ধুটিও তার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

এর মাত্র কদিন পরে বাংলার প্রায় সব দৈনিক কাগজে প্রথম পাতায় ছবিসহ বড় বড় করে লেখা হয় স্ত্রীর হাতে স্বামী ও তার প্রেমিকা খুন।

পুলিশ খুনি স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। সত্রী শঙ্কিতা মল্লিক পুলিশের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। শঙ্কিতাকে আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক তাকে পাঁচিশ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বিড়বিড় করে বলি, অসম্ভব। শঙ্কিতা কিছুতেই খুন করতে পারে না। কিন্তু ও তো নিজমুখে স্বীকার করেছে। আমার বিশ্বাসে কি যায় আসে?

একদিন ওর বাবা আসেন আমার কাছে! এই ভদ্রলোকের রূঢ় ব্যবহার শঙ্কিতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ সাধে। কিন্তু এই সত্যটা কোনোদিনও আমি শঙ্কিতাকে বলতে পারিনি। বললাম. কি ব্যাপার আপনি? ভদ্রলোক আমার হাতদুটি ধরে বললেন, ভুল যা করেছি সে আমি করেছি বাবা, আমার অপরাধের শাস্তি তুমি আমার মেয়ের পরে চাপিও না সৌদীপ! পিতৃ হৃদয়ের হাহাকারের আমি কি বুঝি? মনের ব্যথা মনেতে রেখে প্রণাম করে বললাম, এত ভেঙে পড়বেন না মেসোমশাই। আমি বিশ্বাস করি না শঙ্কিতা খুন করতে পারে। ম্লান হেসে বিনয়বাবু বললেন. তোমার বিশ্বাসে কি যায় আসে? ও তো নিজমুখে স্বীকার করেছে যে ওই খুন করেছে, এর থেকে তাকে যেমন নাড়ানো যাচ্ছে না তেমনি সে কোনো আইনি সহায়তাও নিতে চাইছে না। বললাম, খুবই দুঃখজনক। কিন্তু এ অবস্থায় আমার কি করণীয়? বিনয়বাবু বললেন, ও তোমাকে সত্যিই ভালবাসে সৌদীপ। এক তুমি যদি বল. আমার

বিশ্বাস ও তোমাকে অস্বীকার করতে পারবে না। না হলে ওর ফাঁসি হয়ে যাবে বাবা।

বললাম, এতটা আস্থা আমার 'পরে রাখবেন না মেসোমশাই। একবার তো অপমানিত হয়েছি। আবার অপমানিত হতে পারব না। আমার ক্ষোভ আর অভিমান আঁচ করতে পেরে বিনয়বাবু বললেন, আর একবার সব কিছু ভুলে চেষ্টা করে দেখ না সৌদীপ। না হয় আর একবার অপমানিত হলে? জীবন তো নেওয়া সহজ কিন্তু দিতে পারে কজন।

অগত্যা সব অভিমান ভুলে কথা বলতে হয় উকিলের সঙ্গে। তিমির ভাদুড়ি সব শুনে দিল্লি যেতে রাজি হন। তাকে শুধু বলি, যদি কোনোভাবেই রাজি না হয়, তাহলে তাকে বলবেন, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি। তিমিরবাবু তাকে কি বলেছিলেন জানিনা, তবে সে না করেনি। শুধু বলেছে, বিচারক যদি জানতে চান কে খুন করেছে, আমি কিন্তু মিথ্যে বলতে পারব না।

খুনের মামলা, তাই দিনের পর দিন শুনানি চলে, আর কোনো এক অজানা কারণে প্রতিদিনই আমি উপস্থিত থাকি আদালতে। তিমিরবাবু যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে প্রমাণ করতে চান এই খুন না করে উপায় ছিল না শঙ্কিতার। এমন একজন দুর্নীতিপরায়ণ এবং ব্যভিচারে লিপ্ত অফিসার থাকেন কি করে সরকারি দপ্তরে। সরকারেরই ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, আর কোনো স্ত্রীর পক্ষে এমন ব্যভিচারী স্বামীকে মেনে নেওয়াও সম্ভব নয়। হাজার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও দুর্বিনীত স্বামী কোনো কথা শুনতে চায়নি। শঙ্কিতা তাই নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে এবং ব্যভিচারী স্বামী যাতে আরো অনেক মেয়ের নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে তার জন্য উত্তেজনার বশে তাকে খুন করে। শঙ্কিতার জায়গায় আর কোনো মেয়ে থাকলে সেও তাই করত। মহামান্য আদালতের কাছে তাই আমার অনুরোধ তাকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হোক। সরকারি পক্ষের উকিলের বক্তব্য ছিল, খুন—খুনই। সুতরাং আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিষণ্ণ শঙ্কিতার কাছে মহামান্য বিচারক জানতে চেয়েছিলেন, আপনি উত্তেজনার বশে খুন করেছেন না ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে খুন করেছেন? উত্তরে সে শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, আমি খুন করেছি স্যার, তাই যা শাস্তি দেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেব।

সমস্ত আদালত কক্ষ নিঃশব্দ নীরব। বিচারকের রায়ের জন্য অপেক্ষায় সবাই। এই একবার প্রথম মনে হয়েছিল দেখুক আমাকে। ভিতরের ইচ্ছাটাকে দমন করে তাকিয়ে আছি সবার মতো বিচারকের দিকে। রায় ঘোষণার সময় নিচ্ছেন তিনি। সবার মধ্যে একটা উশখুশ ভাব। বিচারক এবার রায় পড়তে

আরম্ভ করেন— সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে আমি মনে করি এই মামলার সবচেয়ে বড় অপরাধী অক্লেশ। এ জাতীয় চরিত্র মানবজাতির কলঙ্ক। তার চরম শাস্তিই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু যেভাবে সে শাস্তি পেল সভ্যসমাজে তা কাম্য নয়। আইন কেউ নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারে না। আবার একথাও ঠিক যে অপরাধী শঙ্কিতা স্বামীর এই ব্যভিচারকে মেনে নিতে পারেননি, তাই নিজের হাতে তিনি স্বামী ও তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত মহিলাকেও খুন করেছেন। সম্ভবত একাজ তিনি তার বিবেকের নির্দেশে করেছেন। সমাজ-রাষ্ট্র এবং আইনের চোখে এরা দুজনেই সমান অপরাধী, কিন্তু এদের বিচারের ভার আজ আর রাষ্ট্র বা আদালতের হাতে নেই।

এখন প্রশ্ন শঙ্কিতা দেবী কেন আইন নিজের হাতে তুলে নিলেন? তিনি কি ভেবেছিলেন টাকার জোরে তার স্বামী আইনকে নিজের স্বার্থে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন? আর তাই যদি হয় তাহলে এটা তো রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, যা যথেষ্ট চিন্তার কারণ।

আমার মনে হয় খুনটা তিনি উত্তেজনার বশে করেছেন। হ্যাঁ এ ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে চাইছেন না। তিনি শুধু একটা কথাই বলেছেন যে তিনি খুন করেছেন। সুতরাং আইনের চোখে তিনি খুনি এবং চরম শাস্তিই তার প্রাপ্য। সব দিক বিচার করে আমি তাই আসামীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

আসামীর কাঠগড়া থেকে নামার আগে শঙ্কিতা শেষবারের মতো একবার দেখে নেয় সবাইকে। তারপর ধীরে ধীরে পুলিশের জিপের দিকে এগিয়ে চলে। বিনয়বাবু হঠাৎ আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বলে, তুমি আজও এসেছিলে। বললাম, আমি তো রোজই আসি। তবু একবার দেখা করলে না? বললাম, কি হত দেখা করে? ও যদি আমার কথা না শুনত খারাপ লাগত। তার চেয়ে এই-ই ভাল হল। যাবজ্জীবন মানে তো ম্যাক্সিমাম চোদ্দ বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এটুকুই যা সান্ত্বনা। তারপর বললেন, তুমি কি আজও দেখা করবে না? বললাম, না আজও থাক।

আড়াল থেকে দেখলাম কান্নায় ভেঙে পড়া ওর বাবাকে ও সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, আমাকে তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি বাবা। একদিন না একদিন তো আমি ফিরে আসব? তারপর হঠাৎ জানতে চাইল, আচ্ছা বাবা, ও কি আজও আসেনি? ওর বাবা বললেন, কার কথা বলছিস? কে আসবে শঙ্কিতা। বলল, না কারও কথা নয়। আমারই ভুল। ও কেন আসবে? আর এ কদিনে এই প্রথম দেখলাম ওর চোখদুটি জলে টলমল করছে।

সেই ওকে শেষ দেখেছিলাম। তারপর তো পৃথিবী এগিয়ে চলেছে তার আপন নিয়মে। কোনো কিছু থেমে নেই। প্রথম প্রথম ওর জন্য যে অনুভূতিটা হত ধীরে ধীরে তাও কমে আসে। কেটে যায় বারোটা বছর। এক সকালে বিনয়বাবু এসে বললেন, আগামী রবিবার শঙ্কিতা মুক্তি পাচ্ছে, আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু ওর তো চৌদ্দ বছর হয়নি? বিনয়বাবু বললেন, জেলের নিয়ম ঠিকঠাক মতো মেনে চলেছে বলে ওর শাস্তির মেয়াদ দু'বছর কমে গেছে। বিনয়বাবু কিন্তু অন্যান্যবারের মতো আমায় আর যেতে অনুরোধ করলেন না।

ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মুক্তি পাওয়ার দিনে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু কেন যে পারলাম না তা আমিও জানি না। এক বন্ধু গিয়েছিল। তার মুখেই শুনেছিলাম, শঙ্কিতা একান্তে তাকে বলেছিল এতই যদি ঘৃণা তবে কি দরকার ছিল উকিল পাঠিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করার। উত্তরে বন্ধুকে বলেছিলাম, ওর বাবা বলেছিলেন বলে একজন উকিলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। ও যেমন আর প্রশ্ন করে আমায় বিব্রত করতে চায়নি, আমিও নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখাটা শ্রেয় মনে করলাম।

এর মাসখানেক পরে শঙ্কিতার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে ও লিখেছিল, জানি সৌদীপ, তোমাকে কোনো কিছু বলার অধিকার আমার নেই। তবু একদিন তুমি বলতে পাপীকে নয়, পাপকে তুমি ঘৃণা কর। অপরাধ তার যত বড়ই হোক না কেন, এমন কি খুনিকেও তুমি ঘৃণা করতে পারবে না। আজ তাই ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে যা তুমি বল, তাকি তুমি বিশ্বাস কর? যদি কর, তাহলে আমার মতো মেয়েকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা সমাজে কেন তৈরি হয়নি। এরই মধ্যে অনেক জায়গায় চেষ্টা করেও বেঁচে থাকার মতো সামান্য একটা কাজও জোগাড় করতে পারিনি। দাদা বৌদিরা আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এর থেকে মৃত্যুদণ্ড মনে হয় ভাল ছিল।

বাবার মুখে শুনেছি, কেস চলার সময় তুমি নাকি প্রতিদিনই আদালতে গেছো। জানতে চাওয়া হয়তো অন্যায় হবে। তবু কেন যেতে তুমি? কি দেখতে যেতে? অথচ একবারও আমাকে দেখা দাওনি। আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি সৌদীপ এতটা নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো। একদিন তোমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে আঘাত দিতে চেয়েছিলাম। পেয়েছ কিনা জানি না, আজ আমি ভিক্ষে চাইছি। বাবা যে কদিন আছে একভাবে চলে যাবে। কিন্তু তারপর?

চিঠিটা নিয়ে ভেবেছি অনেক, কিন্তু উত্তর দিতে ইচ্ছে করেনি। কি ভেবেছে ও? ভালবাসি বলে তার অন্যায় দাবি মেনে নিতে হবে? তবু বেশ

কিছুদিন বুকের মধ্যে একটা ব্যথা চিনচিন করত। ওটা চলে যেতে চিঠিটার কথা আর মনেও পড়েনি।

বেশ কয়েক মাস পরে আজ আবার তার ফোন। কি বলতে চায় ও? কি এমন জরুরি কথা? তাছাড়া ওর কেন মনে হল যে ওর মুখের 'পরে আমি দরজা বন্ধ করে দেব? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আমি ওকে চিনতে চাইলাম না কেন? কেন এই মিথ্যে অভিনয়? কেনই বা এত রূঢ় ব্যবহার?

কিছুতেই ঘুম আসছে না। চোখ বুজলেই অতীত যেন তার শাণিত অস্ত্রে ধার দিয়ে আমায় ব্যঙ্গ করছে। সে যেন বলত চাইছে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে গেছে যে বন্ধন, জোর করে কি তা অস্বীকার করা যায়? ও বলেছে, সারা রাত ও জেগে থাকবে। তার মানে, আমি যতই তাকে অস্বীকার করি না কেন, শেষ পর্যন্ত ফোন আমাকে করতেই হবে। হায় রে বোকা পুরুষ, এড়িয়ে যাওয়ার পথটাও যে তোমার অজানা।

যা একে একে আড়ালে চলে গিয়েছিল, তাই আবার ফিরে আসে আজ। মনে পড়ে ওর চিঠির কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ওর বাবার মৃত্যুর কথা। হ্যাঁ আজই তো তার শ্রাদ্ধ। তার মানে কালই হয়তো তাকে পথে দাঁড়াতে হবে? সমাজ, রাষ্ট্রের করুণা সে নিশ্চয়ই আজও পায়নি। আর আমিও তাকে ফিরিয়ে দেব? এই কি আমার আদর্শবোধ? এই কি আমার ভালবাসা? তাহলে কোথায় আমি আলাদা? বিচারকও যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ লিখতে পারলেন না, আমার উপেক্ষায় তা লেখা হয়ে যাবে? আমিই সই করব সেই দণ্ডাদেশে? না, অসম্ভব। এত নিষ্ঠুর আমি কিছুতেই হতে পারি না। মনে পড়ে যায় সেই আপ্তবাক্য—'জীবন তো নিতে পারে অনেকে, দিতে পারে ক'জনে?'

মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে পড়ি বিছানা থেকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই ল্যান্ড ফোনটার দিকে। মনের মণিকোঠায় যে নাম্বার খোদাই হয়ে গেছে ভুলব কি করে তা। স্মৃতির পাতা উল্টে নাম্বার ডায়াল করতে ভেসে আসে এক রাতজাগা নারী কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো!!'

উপন্যাস

ফরমায়েশি গল্প

অরূপ পাঁজা

যাবার সময় হাতে ধরে অনেকবার-ই বলেছিল—সময় করে একবার যাস, অরূপ। আমার তো ওই একটি-ই মেয়ে। এমনিতে তো তোর আর যাবার সময় হল না। কতবার-ই বললি, খুব তো গেলি? আর তোকে কোনোদিন বলতে আসব না।

বুঝতে পারলাম, ইতি অনেক অভিমান থেকেই কথাগুলো বলল। আসলে, ওকে দোষ দেওয়া যাবে না। যাব-যাব করেও সময় করে উঠতে পারিনি। ওর মেয়ের অন্নপ্রাশনেও নিমন্ত্রণ করেছিল। যাওয়া হয়নি। আর সেই মেয়েরই আজ বিয়ে! মাঝখানে কতগুলো বছর গড়িয়ে গেছে। ভাবলে, অবাক লাগে!

ইতি বিশ্বাস—আমার স্কুলের বান্ধবী। মাধ্যমিক পাশ করে চলে গেল সালকিয়ায় মামার বাড়িতে। সেখানেই পড়াশোনা করে। তারপর গ্র্যাজুয়েট হল। হাইস্কুলে চাকরিও পেল।

আমার তখন টালমাটাল অবস্থা। সাংসারিক টানাপোড়েনে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে একটা বেসরকারি আর্থিক সংস্থায় কাজ করছি। মাইনে খুবই সামান্য। তবুও বেকার বসে থেকে সংসারের অন্ন ধ্বংস করার চেয়ে কিছু একটা করা ভালো। সংসারে চরম অর্থসংকট। দারিদ্র্যের সঙ্গে দস্তুরমতো যুদ্ধ চলছে।

ইতি যখন তার গ্রামে আসত, আমার সঙ্গে দেখা করতোই। সহানুভূতি দেখিয়ে বলত—অরূপ, তোকে দেখলে খুব কষ্ট হয়!

বলতাম—কেন?

—তুই, কী বাড়ির ছেলে, আর কী করছিস। তোর লোক খাটাবার কথা। আর তু-ই কিনা অন্য লোকের কাছে খাটছিস। বাইরের লোক না জানলেও আমরা তো জানি! জীবনটাই বুঝি এইরকম, বুঝলি? সুখ-দুঃখ ভরা। আমার কথাই ধর না! মাধ্যমিক পাশ করার পর বাবা-মা আর পড়াতে পারছিল না। মামার কাছে কান্নাকাটি করতে আমাকে নিয়ে গেল। আজ হয়তো আমি মাস্টারি পেয়েছি। কিন্তু মামা সেদিন ঠাঁই না দিলে জীবনটা হয়তো অন্যভাবে বইত। মামার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না। তুই তো জানিস? আমাকেও কম কষ্ট করতে হয়েছে! তবে আমি কোনোদিন ভেঙে পড়িনি। তুইও মনে সাহস রাখ! দেখবি, ঠিক সুদিন আসবে।

ইতি চলে যেত। ওর এই অনুপ্রেরণা আমাকে চলার পথে অনেক শক্তি জুগিয়েছে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। তারপর হঠাৎ একদিন ইতি এল। সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে নোয়া-শাঁখা। দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কিরে কবে বিয়ে ক'রে ফেললি? একটা খবরও দিলি না।

—নারে, সুযোগ পেলাম না। হঠাৎ-ই হয়ে গেল।

—ভালবেসে, না, মামা দেখে দিয়েছে?

ইতি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে-হাসতে বলল—ভালবাসা।

—কোথায় বাড়ি?

—রামরাজাতলায়।

—কী ক'রে আলাপ হলো, বল না?

—ও আমার স্কুলেই অঙ্কের টিচার হয়ে জয়েন করল। তারপর একসঙ্গে থাকতে-থাকতে যা হয়।

—খুব ভাল হয়েছে। তা বলে নিমন্ত্রণটাও করলি না।

—অনেক ইচ্ছা ছিল রে! বিয়েতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হইহই করব। কিন্তু কী হল জানিস তো? বিয়ের কথাবার্তা চলতে-চলতেই ওর বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। এরপর আনন্দ কী আর ভাল লাগে। রেজিস্ট্রি করেই বিয়ে সেরে ফেলতে হ'লো। একদিন আয় না বাড়িতে?

—যাব তো বটে। কিন্তু তোর বর কিছু মনে করবে না তো?

—কি যে বলিস! আমার সব বন্ধুর কথাই ওর কাছে গল্প করেছি। ও খুব ভালো। পরিচয় হলেই বুঝতে পারবি।

—রামরাজাতলার কোন্‌খানে বাড়ি?

—একেবারে স্টেশনের সামনেই। ট্রেন থেকে নেমেই উত্তর দিকে তাকাবি। একটা সাদা রং করা দোতলা বাড়ি দেখতে পাবি। ওটাই আমাদের।

—ঠিক আছে। তোর ছেলে-মেয়ে হোক! অন্নপ্রাশনে দেখবি, ঠিক যাব।

ইতির মেয়ে হল। অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতেও ভুল করল না। কী একটা জরুরী কাজে আটকে পড়ে আর যেতে পারলাম না। তারপর রাগেই হোক আর যাই হোক গ্রামে দু-চার বার এলেও আমার সঙ্গে আর দেখা করেনি। বাড়িতে এসেছে। মায়ের সঙ্গে গল্প করেছে। টেবিল থেকে আমার লেখা গল্প-কবিতার বইও নিয়ে গেছে।

প্রায় উনিশ বছর পর ইতির সঙ্গে আবার দেখা হল। আর তাকে না করতে পারলাম না। বলেছিলাম—তোকে অত করে বলতে হবে না। এবার ঠিক যাব। দেখে নিস?

তাই আজ বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম। বাগনানে গিয়ে পছন্দ করে একটা কাপড়ও কিনলাম। কেমন লাগবে কে জানে! ইতি তো বেশ সুন্দরী। তার মেয়ে

নিশ্চয় মায়ের মতোই হবে!

রামরাজাতলা পর্যন্ত একটা রিটার্ন টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেন চলতে শুরু করল। ঘণ্টাখানেকের পথ। দেখতে-দেখতে রামরাজাতলায় ট্রেন এসে থামল। নেমে পড়লাম। প্লাটফর্মের ঘড়িতে তখন রাত আটটা। উত্তর দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম একটা সাদা দোতলা বাড়ি আলোয় ঝলমল করছে। বুঝতে অসুবিধে হল না, ওটাই ইতির বাড়ি। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির সামনে গিয়ে দাড়ালাম। অদ্ভুত সুন্দর। নানারকম আলোয় বাড়িটা যেন একটা স্বপ্নপুরীর মতো দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে ভেসে আসছে বিসমিল্লা খান এর সানাইয়ের মূর্ছনা। ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। সবাই দৌড়ঝাঁপ করে নিজের-নিজের কাজে ব্যস্ত। বিয়েবাড়ি বলে কথা! কাজকর্ম কম! কিন্তু মুশকিল হল আমি কাউকে চিনি না। আমাকেও কেউ চেনে না। কী যে করব! এমন সময় ধুতি-পাঞ্জাবীপরা মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোক আমার সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—আমার বাড়ি চাকুর গ্রামে।

আমাকে একটু ভাল ক'রে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—আমি যদি ভুল না করি, তাহলে আপনার নাম—অরূপ পাঁজা।

বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন—বিয়ের পর থেকেই তো আপনার কথা শুনে আসছি। তারপর বইয়ে আপনার ছবি দেখে-দেখে একটা আই-সেট হয়ে গেছে। বাস্তবে আপনাকে চিনতে আমার কোনো অসুবিধেই হয়নি। আমি ইতির হাসব্যান্ড। আমার নমস্কার নেবেন।

ভদ্রলোক হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করলাম। বললেন—আসুন, ভিতরে আসুন।

আমার একটা হাত ধরে নিয়ে যেতে-যেতে ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে দেখে কিন্তু সাহিত্যিক বলে মনেই হয় না? স্যুট-প্যান্ট পরা আদ্যপ্রান্ত নিপাট ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। কী জানেন তো! আজকাল সব একটু-আধটু লেখালেখি করলেই দেখি—পাজামা-পাঞ্জাবী পরে, একমুখ দাড়ি রেখে, কাঁধে একটা ঝোলা-ব্যাগ নিয়ে এমন ভাব দেখায় যেন মস্ত বড় লেখক। এখানে-ওখানে আসরে যাচ্ছে, রাস্তাঘাটে আলোচনা করেছে। কী না কী একটা ব্যাপার! আসলে ওরা সাহিত্য বুঝুক আর না বুঝুক, সাহিত্য-বোদ্ধা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করতেই যেন বেশি তৎপর। কিছু মনে করবেন না মশাই! আজকাল সাহিত্যের নামে যেভাবে অশ্লীল যৌনতার অনুপ্রবেশ হচ্ছে, তাকে সাহিত্য না বলে পর্নোগ্রাফি বললেই ভাল হয়। কিন্তু আপনার লেখা মশাই অন্য ধরনের। আমার খুব ভাল

লাগে। শাশ্বত প্রেমের চিরন্তন আবেদনকে এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন যে, মন এক অনাবিল আনন্দে আপ্লুত হয়। এক স্বর্গীয় প্রেমের পরশে হৃদয় রেঙে ওঠে। যা এখনকার সাহিত্যে খুব একটা পাওয়া যায় না।

ভদ্রলোক আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম—না, না। আমি কিন্তু সাহিত্যিক নই। আর সাহিত্য-টাহিত্যও বুঝি না। ভালবাসি, লিখি। এই পর্যন্ত।

ভদ্রলোক একটা ঘরের সামনে এসে চিৎকার শুরু করে দিলেন—ইতি, দ্যাখো কাকে এনেছি।

ইতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তো অবাক!—তুই তাহলে শেষ পর্যন্ত এলি, আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না। আয়, ঘরে আয়।

ভদ্রলোক বললেন—দেখলে তো, তুমি পারলে না। আমি কিন্তু ঠিক নিয়ে এলাম।

ইতি বলল—ওঃ, উনি নিয়ে এসেছেন।

—তুমি অরূপবাবুকে জিজ্ঞাসা করো। রাস্তা থেকে ধরে আনলাম কি, না? বলেই ভদ্রলোক হাসতে লাগলো। ইতিও হেসে উঠল। আমিও হাসলাম।

—অরূপবাবু, আপনি তাহলে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন। ইতি, অরূপবাবুকে জলটল দাও। আমি একটু ও-দিকটা দেখি।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ইতি বলল—ওটাই আমার বর।

বললাম—আগেই পরিচয় হয়েছে।

—কেমন লাগল?

—খুব ভাল রে। একদম সহজ-সরল মানুষ। তুই সব দিক দিয়েই পূর্ণ। চল, আগে তোর মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

কনেকে সাজিয়ে মেয়েরা একটা ঘরে ঘিরে ধরে বসে আছে। ইতি পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে আমাকে কনের সামনে নিয়ে গিয়ে বলল—মানা, তোকে যে অরূপমামার কথা বলতাম, এই সেই অরূপ মামা।

মানা চেয়ার থেকে উঠে আমাকে প্রণাম করল। আমি তার হাতে কাপড়টা দিয়ে, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললাম—সুখী হও। শ্বশুরবাড়ির সবাইকে মানিয়ে চলার চেষ্টা করবে। দেখবে—সব ঠিক আছে। পরে এসে তোমার সঙ্গে অনেক গল্প করব। এখন তুমি একটু অন্য মুডে আছো। আসি, কেমন?

মানা হাসতে-হাসতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে, ইতি আমাকে ঘর-দোর দেখাতে-দেখাতে ওপরে নিয়ে এল। ওপরে ঘরের সামনে এসেই দেখলাম, একটা শাড়ি পরা মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কী একটা বই পড়ছে।

ইতি বলল—রিকি, ওঠ।

রিকি বই বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়াল। বিবাহিতা। বয়স খুব বেশি হলে, বছর তিরিশেক হবে। কপালের মাঝখানে একটা বড় সিঁদুরের টিপ। ছিমছাম গড়ন। বেশ সপ্রতিভ।

রিকিকে ইতি বলল—এ আমার স্কুলের বন্ধু অরূপ। অরূপ পাঁজা। সকাল থেকে যে গল্পগুলো পড়ছিস, সবই এর লেখা। তোর তো খুব লেখকের মুখোমুখি হওয়ার শখ। নে, এবার গল্প কর।

তারপর আমার দিকে চেয়ে ইতি বললো—এ রিকি। আমার মাস-শাশুড়ির মেয়ে। তুই এখানেই বোস। আমি সময় হলে ডেকে নিয়ে যাব।

ইতি আবার রিকিকে বলল—তুই আমার সঙ্গে একবার নীচে আয়।

রিকি আর ইতি চলে গেল। আমি ঘরে একাই রইলাম। পায়চারি করতে-করতে ছাদে এসে দাঁড়ালাম। মাথার ওপর খোলা আকাশ। দূরে-দূরে বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। প্ল্যাটফর্মটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঝিরঝির করে দখিনা বাতাস বইছে। ওপর থেকে বিয়েবাড়ির কোনো কোলাহল কানে আসছে না। মুখ বাড়ালে শুধু মানুষের দৌড়াদৌড়ি। আমি ছাদের কার্নিশে হেলান দিয়ে নিস্তব্ধ প্রকৃতির নিগূঢ় সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করতে লাগলাম।

—আপনি এখানে চলে এসেছেন। আর আমি ঘরে চারদিক খুঁজছি।

একহাতে জলের গ্লাস আর একহাতে মিষ্টির প্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে রিকি আবার বলল—নিন। এগুলো খেয়ে নিন তো?

আমি প্লেট থেকে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে বললাম—এগুলো নিয়ে যান।

—না, না। সব খেতে হবে। বৌদি আমাকে বলেছে, আপনি মিষ্টি খুব ভালবাসেন।

—বাবা, এর মধ্যে বৌদির সঙ্গে আপনার এত কথা হয়ে গেছে।

—আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমাকে অত আপনি-আপনি করবেন না তো। তুমি বলবেন। আপনি আমার দাদার মতো। এবার "আপনি" বললে আর একটা কথাও বলব না।

অভিমানে রিকির মুখটা ভারি হয়ে গেল। আমি আর কিছু না বলে, রিকির হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে মিষ্টিগুলো খেয়ে নিলাম। বললাম—খুশি হয়েছ তো?

রিকি ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ। একটু দাঁড়ান। এইগুলো নীচে রেখে আসি। আপনার সঙ্গে গল্প করব।

প্লেট-গ্লাস নীচে রেখে, রিকি ছাদে এলো। বললাম—বিয়েবাড়িতে সবাই কত আনন্দ করছে। তোমার ইচ্ছা করছে না।

—হুঁ। আপনাকে পেয়ে গেলাম তাই। নাহলে এতক্ষণ হইহইয়ে মেতে

যেতাম। জানেন তো, গল্প পড়তে আমি খুব ভালবাসি। সকাল থেকে তো আপনার বইয়েই মুখ গুঁজে পড়ে আছি। আমার মনে খুব কৌতূহল—লেখকরা কেমন হয়! আমাদের মতোই, নাকি একটু অন্যরকম। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে।

—আমাকে তো দেখছ, কী মনে হচ্ছে।

—তা দেখে তো আমাদের মতোই মনে হচ্ছে। তবুও আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক আলাদা।

—কী রকম?

—কী রকম মানে, আপনারা লিখতে পারেন। আমরা পারি না। আমরা শুধু পড়ি আর ভাবি! কী করে এত লেখেন। ভাবনাটা আসে কী করে। এই যেমন আপনার "ফুটবল" গল্পটা পড়লাম! প্রভাত-মালতী দুজনে দুজনকে কত ভালবাসে অথচ কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না। মালতী যতবারই জানতে চেয়েছে, প্রভাত বলে ফেলেও ফুটবলের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছে। তারপর মালতীর অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। প্রভাতের ওপর একরাশ অভিমান নিয়ে মালতী চলে গেল। মাঝখানে অবশ্য দু'জনের অনেক অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—যা এক কথায় অনবদ্য। আচ্ছা দাদা, প্রেমকে আপনি এত কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন কেন? আপনি তো পারতেন, প্রভাত-মালতীর মিলন ঘটাতে। তা না করে বিচ্ছেদ ঘটালেন কেন? উত্তরটা জানার জন্যে রিকি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম—দ্যাখো রিকি, প্রেমকে আমরা এখন একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু প্রেম—ছোট্ট এই দুটো অক্ষরের ব্যাপ্তি বিশাল!

রিকি ব'লে উঠল—ঠিক বুঝলাম না।

বললাম—ধরো, একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালবাসে। তারা বিয়েও করল। আর এখানেই ভালবাসা বা প্রেমের হল অপমৃত্যু। কেন জানো?

—কেন? রিকি বেশ অবাক হয়েই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

বললাম—বিয়ের পর তাদের মধ্যে আর প্রেম থাকে না। প্রেম পর্যবসিত হয় আদিম কামনায়। দৈহিক সুখভোগ আর সাংসারিক টানা-পোড়েনে জেরবার হয়ে ওঠে। জানি না, তোমার কিভাবে বিয়ে হয়েছে? যদি প্রেম করে বিয়ে করে থাকো, তাহলে একটু পিছনে তাকাও! বিয়ের আগে একটু চোখের দেখা দেখার জন্য যে আকুলতা তোমাকে ব্যাকুল করে তুলত—এখন আর তার কিছুই নেই। পাওয়ার পূর্ণতার প্রেম অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ দ্যাখো, গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণর প্রেম বা রাধার প্রেম। আজও আমরা আপ্লুত হই। কারণ, সেটা ছিল নিষ্কাম প্রেম। কৃষ্ণ যদি গোপিনীদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলত, তাহলে এই

প্রেম অমরত্ব পেত না। লীলা ব'লেও আমরা গুণগান করতাম না।

রিকি বললো—তাহলে, আপনার কথায় প্রেম করে বিয়ে করা ঠিক নয়।

বললাম—না, রিকি। তুমি ভুল বুঝলে। বিয়েটা অন্য জিনিস। বিয়ে তো করতেই হবে। নাহলে মানবজাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। নতুন প্রাণের সৃষ্টি হবে না। আসলে তোমরা যেটাকে প্রেম বলছ, ওটা মোটেই প্রেম নয়। শুধুমাত্র যৌনতার আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসা। আর তার জন্যে প্রেমকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। প্রেম তো অন্য জিনিস! যেখানে কোনো কামনা নেই—কোনো বাসনা নেই, রাগ নেই—হিংসা নেই, ঘৃণা-অবহেলা নেই, স্বার্থ নেই! পরার্থে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। সেই তো প্রেম! ভোগবাদে প্রেম থাকে না—স্বার্থ থাকে। ত্যাগের মধ্যেই থাকে প্রেমের সার্থকতা। যা সারাটা জীবন অমৃত দান করে।

রিকি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি ভারি অদ্ভুত কথা বলেন তো!

আমি বললাম—চেষ্টা করলে তুমিও বলতে পারো।

খানিকটা ভেবে রিকি বলল—বলতে হয়তো খানিকটা পারি। কিন্তু লিখতে একদম পারি না। জানেন তো! একটা গল্প লেখার কত চেষ্টা করেছি, আজ পর্যন্ত একটা লাইনও লিখতে পারলাম না। অথচ আপনার 'আশ্রয়' উপন্যাসে দেখলাম—রিমঝিম নামে একটা মেয়ে স্টেশনে আটকে পড়ল। আর সেটাকে নিয়েই আপনি গল্প লিখে ফেললেন। এসব ভাবনা, মাথায় কী ভাবে আসে বলুন তো?

—খুব সহজ ব্যাপার। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো, ঠাকুর গড়তে গেলে প্রথমে খড় দিয়ে একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে। কাঠামো তৈরি করার আগে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে—তুমি কী ঠাকুর গড়বে। কালীঠাকুর হলে চারটে হাত হবে। দুর্গাঠাকুর হলে দশটা হাত করতে হবে। মনে করো, কালীঠাকুর গড়বে। তাহলে, খড়-দড়ি দিয়ে চারটে হাত, দুটো পা বেঁধে ফেললে। সঙ্গে শিব, সাপ, শিয়াল প্রভৃতি তো রাখতেই হবে। তারপর ওই কাঠামোয় মাটি লেপে তাদের মূর্তি হল। তারপর শিল্পী, আপন মনে রঙের ছোঁয়ায় তাকে জীবন্ত করে তুলবে। তুমি ঠাকুর দেখতে এসে বলবে—বাঃ, ঠাকুরটা কী সুন্দর হয়েছে। গল্পটাও ঠিক সেই রকম। গল্প লেখার আগে গল্পের একটা ভাবনা বা কাঠামো তৈরি করে তাঁর নামকরণও করে ফেলতে হবে।

রিকি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—নামকরণ তো শুনেছি, লেখার পর হয়।

বললাম—তা জানি না। আমি যেভাবে করি, সেটাই বলছি।

নামকরণটা লেখার আগে করে ফেললে সুবিধেটা হচ্ছে যে ওই নাম লক্ষ্য

করেই কাহিনীর বিন্যাসটিকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে। তাহলেই তোমার গল্পের বুনোনি হবে খুব জমাট এবং নামের সার্থকতাও প্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। তারপর ঠাকুর রং করার মতো আপন মনে কালির আঁচড় কাটতে-কাটতে এসে যাবে নানা চরিত্র, নানা পরিবেশ আর ঘটনা। সব লেখা হয়ে গেল। এবার মূর্তিতে গর্জন তেল মাখিয়ে ঔজ্জ্বল্যতা বাড়াবার মতো গল্পটা পড়ে সংশোধন-সংযোজন ঘটিয়ে দিলেই ব্যস! একটা দারুণ গল্প হয়ে যাবে। এটা কী খুব কঠিন?

রিকি বলল—আপনি যাই বলুন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

আমি বললাম—তোমাকে আমি আরও সহজ করে দিচ্ছি। তুমি "আশ্রয়" উপন্যাসের কথা বললে। ওটা লেখার আগে আমার ভাবনাটা ছিল স্রেফ এইরকম—ট্রেনের গণ্ডগোলের জন্য একটা মেয়ে মাঝরাস্তায় আটকে পড়বে। সেখানে একটা ছেলের সঙ্গে পরিচয় হবে এবং পরে বিয়ে হবে। এই ছিল গল্পের কাঠামো। যেহেতু মেয়েটা বিপদের সময় একটা আশ্রয় পেল এবং শেষে আশ্রয়দাতার কাছে জীবনের আশ্রয় হল তাই নাম দিলাম "আশ্রয়"। লিখতে-লিখতে নানা ঘটনা এসে গেল এবং ঘটনার মধ্যে অবশ্যই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লোক আশ্রয় খুঁজে পেল।

রিকি বলল—বুঝতে তো পারলাম। কিন্তু মুশকিলটা কী জানেন, লিখতে বসলেই ভাবনাগুলো এমনভাবে জট পাকিয়ে যায়, আর ছাড়াতে পারি না। গল্পটা আমার নিজের দেখা। সব সময়ই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

বলতে বলতেই রিকি কেমন আনমনা হয়ে গেল। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। একটা নিশ্চল পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—রিকি, কী এত ভাবছ?

রিকি চমকে উঠে আমার দিকে অপলকে চেয়ে রইল। তারপর আমার হাতদুটো ধরে বলল—দাদা, দেবেন, আমার গল্পটা লিখে। একটা বোনকে খুশি করার জন্যে এইটুকু করতে পারবেন না?

আমি বললাম—গল্পটা না জেনে, কী করে বলি বলো তো!

—আমি আপনাকে গল্পটা বলব। একটা সাধারণ মেয়ের আটপৌরে জীবনের গল্প। যে সুখ চেয়েছিল, সংসার চেয়েছিল, সন্তান চেয়েছিল। কিন্তু কিছুই পেল না।

—ওইভাবে বললে তো হবে না। ডিটেলসে বলতে হবে।

—তাহলে শুনুন। রিকি গল্পটা বলতে লাগল। আমি শুনতে লাগলাম। এক নিঃশ্বাসে অনেকক্ষণ বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল—শুনলেন তো? বলুন, লিখে দেবেন।

বললাম—তুমি তো গল্পটা শেষ করলে না। কী করে লিখি বলো তো?

রিকি কেমন আক্ষেপের সুরে বলল—শেষটা তো দাদা, আমিও জানি না। তারপর বলল—শেষটা, আপনার মতো করে লিখবেন। আপনার কাছে দাদা, শুধু একটা অনুরোধ—গল্পের চরিত্র, স্থান আপনি যেমন খুশি লিখুন, আমার আপত্তি নেই। নায়িকার নামটা শুধু রাখবেন—মুক্তি। নামের সঙ্গে জীবনের কি অদ্ভুত মেল-বন্ধন, দেখুন! মুক্তি নাম নিয়েও জীবনে মুক্তির পথ খুঁজতে-খুঁজতে সে আজ ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। হয়তো বা আপনার কলম থেকেই তার মুক্তির পথ বেরিয়ে আসবে।

—তুমি তো খুব সুন্দরভাবে কথাগুলো বললে। কিন্তু অত সুন্দর করে কী আর লিখতে পারব। দেখি!

রিকি কিছু বলার আগেই ইতির গলার আওয়াজ ভেসে এল—রিকি, অরূপকে নিয়ে আয়। এইসময় জায়গা ফাঁকা আছে। ও তো আবার বাড়ি ফিরবে।

রিকি বলল—দাদা, চলুন। বৌদি ডাকছে।

বললাম—হ্যাঁ, চলো।

খাওয়ার জায়গায় দুটো সিটই ছিল। রিকিও আমার সঙ্গে খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া সেরে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ইতি বলল—বাড়ি তো চিনে গেলি। পরে একদিন আসিস।

তারপর রিকিকে বলল—রিকি, অরূপকে একটু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দে না।

—হ্যাঁ, বৌদি। যাচ্ছি।

রিকি আমার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এল। আমি বললাম—রিকি, তোমাকে আর আসতে হবে না। তুমি আবার একা ফিরবে। আমি তাহলে, আসি?

—দাদা, আপনার ফোন নাম্বারটা দেবেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আমার ফোন নাম্বারটা রিকিকে দিলাম। রিকি বলল—মাঝে-মাঝে আপনাকে ফোন করব। বিরক্ত হবেন না যেন।

—না, না। তোমার মনে হলেই ফোন করো।

প্ল্যাটফর্মে এসে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরলাম।

দিন সাতেক পরে সকালে বাড়িতে বসে আছি। আমার মোবাইলে রিং হতে লাগল। কলটা রিসিভ করে বললাম—হ্যালো, কে বলছেন?

ওপার থেকে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল—নমস্কার নেবেন দাদা। আমি রিকি বলছি।

—হ্যাঁ, বলো।

—ভালো আছেন তো!

—হ্যাঁ ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

—ওই আছি আর কী! থাকা না থাকার মাঝখানে। সেদিন বাড়ি ফিরতে আপনার কোন অসুবিধে হয়নি তো?

—অসুবিধে কিছু হয়নি। তবে একটু রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। একদিন এসো না বাড়িতে।

—অবশ্যই যাব। গল্পটা যেদিন লেখা শেষ হবে, পড়তে যাব। লিখছেন তো?

—না গো। একদম সময় করে উঠতে পারছি না। তবে মাথায় আছে।

—তবু ভালো। ভুলে যাননি। পরে আবার খোঁজ নেব। এখন রাখছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ভাল থেকো।

—আপনিও ভাল থাকবেন।

রিকি লাইনটা কেটে দিল। দিন দুয়েক পরে আবার ফোন করেছিল। সেই একই কথা। গল্পটা লিখছেন তো! আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ। এবার শুরু করব। আসলে, এইরকম ফরমায়েশি গল্প কোনোদিন লিখিনি। নিজের মন থেকে যা আসে, তাই লিখে এসেছি। কিন্তু রিকির যা তাগাদা! বারবার ফোন করছে। খারাপও লাগছে। তাই একদিন খাতা-পেন নিয়ে বসে গেলাম। স্মৃতির অন্দরে গল্পটা ঘোরাফেরা করতে লাগল। রিকি বলেছিল—গল্পের স্থান-চরিত্র যাইহোক না কেন, শুধু নায়িকার নামটা 'মুক্তি' রাখবেন।

ভাবতে ভাবতে লেখা শুরু করলাম :

কলকল শব্দ তুলে হেমাঙ্গিনী নদী বয়ে চলেছে, এই নদীর ধারেই প্রত্যন্ত একটা গ্রাম—কমলপুর। আর এই গ্রামেই কার্তিক সাপুইয়ের বসবাস। দুই মেয়ে নিয়ে ছোট্ট সংসার। বড় মেয়ে মালিনী আর ছোট মেয়ে মুক্তি। তিনজনের হতদরিদ্র পরিবার। কার্তিক সাপুই পেশায় দিনমজুর। নদীর চরে যে সামান্য জমিটুকু আছে, তাতেই চাষ-বাস করে। বাকি সময়টা অন্যের জমিতে কাজ করে। যা পায়—কোনোরকমে চলে যায়। মুক্তির জন্মের পরেই স্ত্রী স্বর্ণালী মারা যায়। আজ প্রায় ছ-বৎসর হয়ে গেল। বড় মেয়ে মালিনীর তাই আর লেখাপড়া শেখা হল না। তখন ওর বয়সই বা কত হবে। বড়জোর আট বৎসর! আত্মীয়-স্বজনরা কার্তিক সাপুইকে অনেক করে বুঝিয়ে ছিল—তুই আবার বিয়ে কর। মেয়েদুটোকে নাহলে মানুষ করবে কে? তোকে কে দেখবে? কার্তিক সাপুই রাজি হয়নি। মেজশালী চন্দনাকে নিয়ে এসে মাস তিনেক রেখেছিল। তার নিজেরও তো সংসার আছে! ভায়রা-ভাই সুশীল খুব ভাল ছেলে। শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাবার পর নিজে থেকেই বলল—কার্তিকদা, আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। চন্দনা এসে

কিছুদিন থাকবে'খন। মালিনীকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবে। তারপর আমি তো আছি। মাঝে-মাঝে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাব।

মালিনী, চন্দনার ছায়াসঙ্গী হয়ে গেল। মাসির সঙ্গে সব কাজেই হাত পাকালো। রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, এমনকি বোনকে চান করানো, খাওয়ানো—কোনো কিছুই বাকী রইলো না। মাস তিনেক পর হঠাৎ-ই চন্দনার শ্বাশুড়ির খুব শরীর খারাপ করল। সুশীল এসে চন্দনাকে নিয়ে গেল। কিছুই করার নেই। কার্তিক সাপুই পড়ে গেল মহাভাবনায়। মাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়তো সব কিছুই করত। কিন্তু একলা ওইটুকু মেয়ে সামলাতে পারবে কি? নিজে ঘরে থেকে যে একটু সাহায্য করবে, তাও কী হবার জো আছে! খাটতে না বেরুলে খাবে কী?

প্রথম দিন মাঠে যাবার সময় কার্তিক সাপুই তাই মালিনীকে বলে গেল মা—, আমি মাঠে যাচ্ছি। রান্নাবান্না পারলে করিস! নাহলে আমি এসে করব'খন। বোনটাকে মা সবসময় লক্ষ রাখিস।

মুক্তিকে কোলে নিয়ে আদর করে কার্তিক সাপুই মাঠে চলে গেল। মাঠে গিয়েও তার কাজে মন বসত না। একটা দুধের বাচ্চা নিয়ে মেয়েটা যে কী করছে! খানিকক্ষণ কাজ করে বাড়ি ফিরে এল। বাকিটা বিকেলে এসে করা যাবে'খন! ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে দেখল—দোরে বোনকে কোলে নিয়ে মালিনী দুধ খাওয়াচ্ছে। মুক্তি যত হাত-পা ছুঁড়ছে, মালিনী আদর করে বলছে—খেয়ে নাও সোনা, অমন করে না। তোমাকে মল গড়িয়ে দেব, দুল গড়িয়ে দেব। ওই দ্যাখো, পাখিটা তোমাকে দেখছে। আয় পাখি, তু-ই দুধটা খেয়ে যা। দেখছ তো, তুমি না খেলে এক্ষুনি পাখিকে খাইয়ে দেব।

ছোট্ট মুক্তি কিছু বুঝতে না পারলেও, চুপ করে শব্দগুলো শুনতে লাগল। আর তখনই মালিনী গোঁদলটা মুখে লাগিয়ে দুধটা গালে ঢেলে দিল। কার্তিক সাপুই অবাক হয়ে গেল। মায়ের কোলে বসে ওরই কোথায় খাবার কথা, তা না, বোনকে কোলে নিয়ে তাকেই মাতৃস্নেহে দুধ খাওয়াতে হচ্ছে। দুচোখ জলে ভরে গেল।

দুধ খাইয়ে, বোনকে শুইয়ে দিয়ে মালিনী মুখ তুলতেই বাবাকে দেখতে পেল। বলল—তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে, বাবা?

—কাজে মন বসাতে পারলাম নারে। তাই চলে এলাম। রান্না করার সময় পাসনি তো। তুই বোনের কাছে থাক, আমি রান্না বসাচ্ছি।

—আমি রান্না করে ফেলেছি। তুমি চান করে এসো বাবা। তোমাকে খাইয়ে তবে আমি খাবো। বোনকে চান করিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। ও এবার ঘুমোবে।

কার্তিক সাপুই চান করে এসে খেতে বসল। আসন পেতে, জল গড়িয়ে,

জায়গা করাই ছিল। মালিনী বাবাকে ভাত দিয়ে গেল।

খাওয়া হয়ে যেতে হাত-মুখ ধুয়ে কার্তিক সাপুই বললো—আমি বোনের কাছে বসছি। তুই এবার খেয়ে নে।

—না, বাবা, তোমাকে বসতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো। বোনকে তোমার কাছে শুইয়ে দিয়ে আমি খাব। ধোয়া-মোছা করতে অনেক সময় লাগবে। কার্তিক সাপুই শুয়ে পড়ল। মালিনী বোনকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাবার পাশে শুইয়ে দিল।

কার্তিক সাপুই আদর করে মালিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—তুই আমার মেয়ে নয় রে! আগের জন্মে আমার মা ছিলিস।

এইভাবে ছ'টা বছর কেটে গেল। মুক্তি এখন টু-এ পড়ে। মালিনী নিজে লেখাপড়া শিখতে পারেনি। কিন্তু বোনকে লেখাপড়া শেখানোয় তার কোন ত্রুটি নেই। সকাল-সন্ধে পাড়ার-ই দীপ্তিদি বাড়িতে বোনকে পড়াতে আসে।

মুক্তিও দিদি-অন্ত প্রাণ। মাকে চোখে দ্যাখেনি। দিদির স্নেহ-মমতাতেই বড় হয়েছে। দিদি-ই তার মা। যত অবদার দিদির কাছে। সাহসও। বাড়িতে কোনো অন্যায় করলে, বাবার বকুনির ভয়ে দিদির কোল-ই তার নিরাপদ আশ্রয়। ছুটে গিয়ে দিদির কোলে বসে পড়ত। বাবাও পিছনে-পিছনে গিয়ে নালিশ জানাতো—দ্যাখ মালিনী, পেনটা দাঁত দিয়ে কামড়ে কেমন ভেঙে ফেললো।

মালিনী বলত—ভাঙুক না। আর একটা কিনে দিলেই তো হয়। তার জন্যে ওকে অত বকার কী আছে! ওকে তুমি কোনোদিন বকবে না বাবা। ও অন্যায় করলে আমাকে বলবে।

তারপর মুক্তির গালে আদর করে বলত—যদি কিছু শাস্তি দিতে হয়, তা আমি-ই দেব।

মালিনীর বয়স চোদ্দ বছর। সে এখন প্রায় সাবালিকা। সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে মাঠে যায় বাবাকে সাহায্য করতে। মুক্তিও স্কুল থেকে এসে চলে যায় মাঠে, দিদির কাছে। দিদি বলল—তোকে মাঠে আসতে বারণ করেছি, আবার এলি?

মুক্তি বলল—তোমার সঙ্গে কাজ করব।

মুক্তিকে জড়িয়ে ধরে দিদি বলল—নারে সোনা, তোর দিদি যতদিন আছে, তোকে কোনো কাজ-ই করতে হবে না। তোর একটাই শুধু কাজ—পড়াশোনা। বন্ধুদের সঙ্গে তো খেলতে পারতিস।

—আমার ভাল লাগে না।

—তাহলে ওখানে বোসে-বোসে নদী দ্যাখ। জলের ধারে যেন যাস না। কুমির আছে, ধরে নিয়ে যাবে। দিদিকে, বাবাকে আর দেখতে পাবি না।

মুক্তি নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকে। আপন মনে নদী দ্যাখে। বড় বড় ঢেউ তুলে জল ছুটে চলেছে। ছলাৎ-ছলাৎ ক'রে এসে আছড়ে পড়ছে তীরে। নানা ধরনের পাখি উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। মাঝনদীতে নৌকো করে জেলে মাছ ধরার জাল পাতছে। জলের বুক চিরে, লোক নিয়ে, ভুটভুটি চলেছে ওপারে। মুক্তি আনমনা হয়ে যায়। শিশুমন উড়ে যায় ওপারের গঞ্জের ঘাটে। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—বোন চলে আয়, বাড়ি যাব।

দিদির ডাকে মুক্তি পা বাড়ায় ঘরের পথে। যেতে-যেতে দিদিকে বলে—নদীর জলগুলো কোথায় যায় গো?

দিদি বলল—ওদের ঘরে। সাগরে ওদের ঘর।

—ওর দিদি আছে।

—হ্যাঁ।

—তাদের নাম কী গো?

—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী।

—ও, ওর তিনটে দিদি। তাহলে তো খুব আদর পায়।

মালিনী, বোনকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—কেন! তোর একটা দিদি বলে বোধহয় আদর কম হয়?

মুক্তি দু-হাতে দিদির গলা জড়িয়ে বুকে মুখ গুঁজে দেয়।

মুক্তি বড় হতে থাকে। বাড়তে থাকে তার মন আর মননশীলতা। বিকেলের দিকে মাঠে আসা একবার তার চা-ই। নদী তাকে বড় টানে। দু'হাত গালে রেখে চেয়ে থাকে নদীর দিকে। এখন সে আর শুধু নদী দ্যাখে না। দেখতে পায় তার চলার অদম্য স্পৃহা। জীবনের উত্থান-পতনকে পিছনে ফেলে শুধু এগিয়ে চলা। গ্রামের পর গ্রাম। শহরের পর শহর। এক কূল ভেঙে এক কূল গড়ার আপন খেলায় সে মত্ত। তার সজল ধারাতে কোনো বিভাজন নেই,—না গরিব, না বড়লোক; না জাত, না ধর্ম। সব মানুষকেই তার শীতল স্পর্শে শিহরিত করতে সে বদ্ধপরিকর। মানুষের শত লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে মানুষের কল্যাণেই সে ব্রতী। নদীর এ এক অদ্ভুত সহনশীলতা!

নদীর বুকে ভাসমান নৌকো গঞ্জের ঘাটে ভিড়ুক, মুক্তি তা আর চায় না। ওই নৌকো ভাসিয়ে সে চলে যেতে চায় দূরে, অনেক দূরে। সীমাহীন জলে ভাসতে-ভাসতে অসীমের বুকে আবিষ্কার করতে চায় নতুন কোনো দেশ। যে দেশের রাজপুত্রের ভালবাসার ছোঁয়ায় তার মন রেঙে উঠবে। খুলে যাবে হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার।

মুক্তি এখন নাইনে পড়ছে। যৌবনের অলিন্দে পা রেখে দুচোখ ভরা তার

স্বপ্ন। হাজার প্রজাপতির পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে মন। অজানার আবেগে সে পুলকিত, রোমাঞ্চিত। স্বপ্নের ডানায় ভর করে মগ্ন হয়ে খুঁজে বেড়ায় মনের মানুষ। অনুভূতির আড়ষ্টতায় কখন যে বেলা গড়িয়ে যায় তার খেয়াল থাকে না। দিদির ডাকাডাকিতে ঘরে ফেরে।

দিদি, মানে—মালিনীর আপত্তি সত্ত্বেও দেখাশোনার তোড়জোড় চলছে। বয়স তো বাড়ছে! বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দেওয়া মা—বাবার কর্তব্য। মা বেঁচে থাকলে এতদিনে হয়তো বিয়ে হয়ে যেত। বাবা-কার্তিক সাপুই মালিনীকে বোঝায়—মা, আর তুই না করিস না। এতদিন তো সংসারের জন্য অনেক কিছুই করলি। মুক্তি এখন বড় হয়ে গেছে। সে-ই সব চালিয়ে নিতে পারবে। এবার তোর বিয়েটা দিতে পারলে খানিকটা নিশ্চিত হই। বয়সও তো হচ্ছে। আর ক'দিন-ই বা বল? তোকে সংসারী দেখে যেতে পারলে, নিশ্চিন্তে তবু মরতে পারি।

—আমার জন্যে অত ভেবো না তো বাবা! আমি চলে গেলে, তোমাদের কে দেখবে! বোনের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না? বোন পাশ করলে, বোনের বিয়ে দিয়ে তারপর তার কথা।

মালিনীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বাবা বললো—না মা, ও কথা বলে না। তোরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। বয়স তো হচ্ছে, না কী! তোর বয়সী মেয়েরা সব ছেলেপুলের মা হয়ে গেল। তোর মা থাকলে কী আর আমাকে এসব ভাবতে হত! আমাদের কপালটাই খারাপ রে মা! কার্তিক সাপুই গামছায় চোখ মুছল।

বাবাকে কাঁদতে দেখে মালিনী কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল—তুমি কেঁদো না বাবা। ঠিক আছে! বোন স্কুল থেকে আসুক। সে যদি সব সামলে নিতে পারে, তাহলে আমি আর না করব না।

মুক্তি স্কুল থেকে ফিরল। বই রেখেই বলল—দিদি, খাবার দাও।

—তুই হাত-মুখ ধুয়ে বাবার কাছে বোস। আমি খাবার আনছি।

মালিনী রান্নাঘরে এসে মুড়ি-তরকারী নিয়ে গিয়ে বলল—নে, ধর।

মুক্তি খেতে লাগল। কার্তিক সাপুই আদর ক'রে মেয়েকে বলল—মুক্তি, মা আমার, দিদি চলে গেলে তুই সংসারকে আগলে রাখতে পারবি না?

—দিদি কোথায় যাবে?

—দিদি কী চিরকাল এখানে থাকবে। বিয়ে হবে। শ্বশুরবাড়ি যাবে।

—খুব মজা হবে বাবা, খুব মজা হবে।

মালিনী বলে উঠল—তুই থাম তো। খুব মজা হবে, না? আমি চলে গেলে মুখের সামনে খাবার ধরে দেবে কে?

—কেন? আমি নিজে নেব। আমি কী আর ছোট আছি নাকি? তুমি কাজ করতে দাও না তাই। তোমার দেখে-দেখে আমি সব কাজ শিখে নিয়েছি। এই তো, সকালে উঠে ন্যাতাঝাঁটা দেওয়া। তারপর রান্না বসানো। খেয়ে-দেয়ে বাবার খাবার ঢাকা দিয়ে আমি স্কুলে চলে যাব। তারপর বিকেলে মাঠে গিয়ে বেগুন গাছের গোড়াগুলো দাউলি দিয়ে উসকে দেব। সন্ধেবেলা এসে রুটি করে পড়তে বসে যাব।

—সে না হয় করলি। কিন্তু রাত্রে একা শুতে পারবি তো? দিদিকে জড়িয়ে না শুলে ঘুম হবে তো?

একটু ভেবে মুক্তি বলল—হুঁ, সেটা হয়তো প্রথম-প্রথম একটু কষ্ট হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। বুঝলে?

—বুঝলাম। তুই এখন খুব বড় হয়ে গেছিস। দিদিকে তাড়াতে পারলেই বাঁচিস।

মুক্তির দু'চোখে জল এসে গেল। বোনকে জড়িয়ে ধরে মালিনী বলল—অমনি কান্না। তোকে তো আমি ইয়ার্কি করে বললাম। সত্যি, সত্যি নাকি। আমার সোনা বোন। চুপ কর্, লক্ষ্মীটি। আচ্ছা বাবা আচ্ছা। তোদের কথায় আমি রাজি। হল তো?

—না, হ'লো না।

—কেন?

—আমি যাকে জামাইবাবু হিসাবে পছন্দ করব, তাকেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

বোনের গালটা টিপে মালিনী বলল—খুব বদমাইশ হয়ে গেছিস! তাই হবে। তোর পছন্দই, আমার পছন্দ। দে, এবার বাটিটা দে। তুই হাত ধুয়ে ফ্যাল। দু'বোন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কার্তিক সাপুইয়ের মাথা থেকে একটা ভাবনা অন্তত গেল। মালিনীর বিয়ে হয়ে গেলে তার একটা সহায় সম্বল থাকবে। স্বামীর সঙ্গ তার মনের জোর বাড়াবে। মুক্তিকে তখন সবদিক দিয়ে আগলে রাখতে পারবে।

কার্তিক সাপুইয়ের শরীরটা আজকাল ভাল যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝেই বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হয়। ডাক্তারও দেখিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—আপনার হার্টের একটা ভাল্‌ব কাজ করছে না। তাড়াতাড়ি অপারেশন করিয়ে নিন। কার্তিক সাপুই বলেছিল—কী রকম খরচ পড়বে, ডাক্তারবাবু?

—তা ধরুণ, হাজার তিরিশেক তো বটেই।

শুনেই কার্তিক সাপুইয়ের অসুখটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। তিরিশ টাকাই নেই। আবার তিরিশ হাজার!

মালিনীকেও কোনোদিন সে কথা বলেনি। কার্তিক সাপুই জানে, মালিনী

শুনলে মায়ের গয়নাগুলো ঠিক বিক্রি করে চিকিৎসা করাত। কার্তিক সাপুই তা চায়নি। ওইগুলোই একমাত্র সম্বল। গয়না বিক্রির টাকায় ভাল হয়ে তার লাভ কী। উপযুক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে সে যে আরও ভীষণ যন্ত্রণা। বুকের যন্ত্রণা তবু দাঁতে -দাঁত চেপে সহ্য করা যায় কিন্তু সে যন্ত্রণা অসহ্য।

মালিনীর মত পরিবর্তনে কার্তিক সাপুই যারপরনাই খুশী। ঘটক একটা ছেলের কথা বলেছিল। রেলে চাকরি করে। ভগবান যদি মুখ তুলে চায়, তাহলে ভালই হবে। মেয়ের আমার কোনো অসুবিধে হবে না। বাপের ঘরে তো কষ্ট করেই কাটাল। স্বামীর ঘরে অন্তত একটু সুখ পাবে।

প্রথমে ছেলের মা-বাবা এসে দেখে গেল। মালিনীকে তাদের খুব পছন্দ। একদিন ছেলে মানে—সঞ্জয়কে ঘটক নিয়ে এল। মালিনীকে দেখল। জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পালা। মুক্তি জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। কার্তিক সাপুই বলল—এই আমার ছোট্ট মেয়ে, মুক্তি।

মুক্তি সঞ্জয়কে একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলল—নিন। এইগুলো একটু খেয়ে নিন। তারপর আপনার ছুটি।

আর দুটো প্লেট বাবা আর ঘটককে দিয়ে বলল—বাবা, তোমরা এগুলো খেয়ে নাও।

সবাইকে খাবার দিয়ে মুক্তি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। ঘটক বললো—তুমি দাঁড়িয়ে কেন মা। জামাইবাবুর সঙ্গে গল্প করো।

তারপর কার্তিক সাপুইকে বলল—চলো দাদা, আমরা বরং মালিনীর কাছে যাই। মেয়েটা একা আছে।

কার্তিক সাপুই আর ঘটক ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মুক্তিকে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সঞ্জয় বলল—কী হলো! আপনি বসুন।

—না, আমি বসব না। আপনার সঙ্গে কোনো কথাও বলবো না।

—কেন বলুন তো?

—'আপনি' করে কথা বললে আমি এক্ষুনি চলে যাব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, বোসো।

মুক্তি সঞ্জয়ের পাশের চেয়ারে বসল। সঞ্জয় বলল—তুমি কী করো?

—নাইনে পড়ছি।

—তোমার স্কুলটা কতদূর?

—ওই তো! আপনি যে স্টপেজে নামলেন, ওইখানেই।

—ও। মাঠের ওপর একটা স্কুল দেখলাম বটে। তাহলে তো সামনেই।

—হ্যাঁ। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবেন না তো।

—না, না। বলো না।

—দিদিকে কেমন দেখলেন?

—কী বলি বলো তো।

—কেন? যেমন দেখলেন, তেমনই বলবেন।

—দেখলাম আর কোথায়। তোমার দিদি সেই যে মুখ গোঁজ করে এসে বসল, একবারও মুখ তুললই না।

—তাই। আচ্ছা, আপনাকে ভাল করে দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু বসুন।

মুক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, দিদিকে টানতে-টানতে আবার ঘরে ঢুকল, মালিনী হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে-করতে বলল—এই, ছাড়? কী হচ্ছে কী!

মালিনীকে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মুক্তি বললো—নিন মশাই! আপনার জিনিস ভাল করে দেখে নিন।

মালিনী লজ্জা পেয়ে বলে উঠল—তুই একদম ফাজিল হয়ে গেছিস।

দু'বোনের এই খুনসুটি সঞ্জয়ের ভালই লাগছিল। তারপর মুক্তিকে বলল—মুক্তি, তোমার দিদিকে নিয়ে বোসো।

মুক্তি, দিদির হাত ধরে টেনে নিয়ে বিছানার ওপর বসল। সঞ্জয় মিষ্টির প্লেটটা মুক্তির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—তুমি একটা নাও। আর তোমার দিদিকে একটা দাও।

মুক্তি বলল—আমি আমার একটা নিয়ে নিচ্ছি। দিদির ব্যাপারে আমি নেই।

মালিনী বোনকে আস্তে-আস্তে বলল—আমি খাব না, ওকে খেয়ে নিতে বল।

—আমি বলব কেন? তুমি বলো।

সঞ্জয় বলল—কী হল। কী বলছে।

মুক্তি বলল—আপনি না খাইয়ে দিলে, খাবে না বলছে।

মালিনী বড়-বড় চোখ পাকিয়ে বোনকে শাসন করার চেষ্টা করল।

—ও। এই কথা। ঠিক আছে।

বলেই সঞ্জয় চেয়ার থেকে উঠে একটা মিষ্টি নিয়ে জোর করে মালিনীকে খাওয়াতে গেল। লজ্জা পেয়ে মালিনী বলে উঠল—নিচ্ছি, নিচ্ছি, একটা তুলে নিয়ে মালিনী বলল—হয়েছে তো! এবার খেয়ে নিন।

নানা গল্প করতে-করতে মিষ্টি খাওয়া শেষ হল। মুক্তি, সঞ্জয়কে বলল—এবার বলুন মশাই, কেমন দেখলেন?

সঞ্জয় বলল—হাঁ-এর মাপটা তো দেখলাম বেশ বড়ই। পাইকারি দোকান থেকেই চাল কিনতে হবে।

—শুধু হাঁ-টাই দেখলেন। আর কিছু নয়।

—না, সবই ভাল দেখলাম। তবে মুখটা একটা হাঁড়ি-হাঁড়ি মতো লাগল। বলেই সঞ্জয় হেসে উঠল। মুক্তিও হাসতে লাগলো। মালিনী হাসতে-হাসতেই সঞ্জয়কে ভেংচি কেটে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মুক্তি বলল—জানেন তো, আমার জন্মের পরই মা মারা গেল। দিদিই আমাকে মানুষ করেছে। দিদিকেই আমি মা বলে জানি। দিদি কোনো কষ্ট পেলে, আমার খুব কষ্ট হবে।

মুক্তি ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। সঞ্জয় একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেল।

এদের ফ্যামিলির ইতিহাস সঞ্জয়, ঘটকের মুখে সবই শুনেছে। মাও এসেছিল। সব জেনে তাকে বলেছে। মালিনী মুক্তিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। মুক্তিও মালিনীকে মায়ের মতোই ভালবাসে। আজ তা নিজের চোখেই দেখল। সস্নেহে বলল—মুক্তি, দিদিকে তো এত ভালবাসো! দিদি চলে গেলে তোমার খারাপ লাগবে না।

কাঁদতে-কাঁদতেই মুক্তি বলল—হ্যাঁ লাগবে। কিন্তু কী করব বলুন। সংসারের নিয়মই তো এই। মেয়েদের নিজের ঘর ছেড়ে একদিন শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে!

সঞ্জয় অবাক চোখে মুক্তির দিকে তাকিয়ে রইলা নাইনে পড়লেও সংসারের অভিজ্ঞতায় বুড়িদের মতো। আর হবেই বা না কেন? জন্মের পর মাকে হারিয়ে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সে বেড়ে উঠেছে। দিদি মায়ের মতো। কিন্তু মা তো নয়। মায়ের কোনো বিকল্প হয় না। সেই অবিকল্পের অভাবেই মুক্তির চেতনা বাস্তবতায় কঠিন অনুভবে সমৃদ্ধ। সঞ্জয়কে ভাবতে দেখে মুক্তি বলল—আমরা বিয়েতে খরচ করতে পারবো কিনা, ভাবছেন।

—ধরো, তাই যদি ভাবি, খুব কী অন্যায় হবে!

—না। আপনাদের কোনো অন্যায় নেই। গরিব হওয়াটাই আমাদের অন্যায়।

তারপর প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বলল—আপনি ছেলে। সরকারি চাকরি করেন। চাহিদা আপনার অনেক! আইনবিরুদ্ধ হলেও পণ চাওয়াটা সমাজস্বীকৃত। আর আইনসিদ্ধ হয়েও পণ না দেওয়াটাকে সমাজ এখনও স্বীকৃতি দেয়নি। কবে যে দেবে, সেই আশার অপেক্ষাতে থাকা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো পথ নেই। আপনি বসুন। ঘটককে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মুক্তি যাবার জন্যে উদ্যত হল।

সঞ্জয় বলে উঠল—একটু দাঁড়াও মুক্তি! আমার ওপর রাগ করলে?

—না, না। রাগ করব কেন! আপনার ওপর রাগ করার কী অধিকারই বা আমাদের আছে? আপনি অনেক বড়লোকের জামাই হতে পারবেন। তাই বলে আমাদের বাড়ির জামাই! স্বপ্ন ছাড়া, আর কিছু নয়।

—তুমি কি জানো মুক্তি! স্বপ্নও কখনও কখনও সত্যি হয়—ছোটবেলায়

আমি অনেক স্বপ্ন দেখতাম। চার ভাইবোন আর মা-বাবাকে নিয়ে ছ'জনের অভাবের সংসারে—সুখ আনার স্বপ্ন। বাবা কারখানার শ্রমিক। সামান্য যা পয়সা আনত, অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটত। আমার তিনটে দিদি লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। বাড়িতে বসে ঠোঙা তৈরি করতে শুরু করল। সেই ঠোঙা আমি দোকানে-দোকানে দিয়ে আসতাম। আমার বয়স তখন কতই বা হবে! নয় কিংবা দশ। ফোরে পড়ছি। বিকেলে সব বন্ধুরা যখন খেলায় মত্ত, দুহাতে দুটো ভারী ব্যাগ নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে আমি দোকানে ঘুরেছি। সন্ধের শাঁখ বাজলে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফিরতাম। যা পয়সা পেতাম, মায়ের হাতে তুলে দিতাম। অবসাদে, চোখে ঘুম নেমে আসত। আমি কিন্তু ঘুমোতাম না। দুচোখে জলের ঝাপটা মেরে, স্বপ্নগুলোকে তরতাজা করে বই নিয়ে পড়তে বোসতাম। এ লড়াইয়ে আমাকে জিততেই হবে। লেখাপড়া শিখে চাকরি একটা জোগাড় করতেই হবে। এইভাবেই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলাম। তারপর সকাল-সন্ধে টিউশনি জোগাড় করে কলেজে ভর্তি হলাম। গ্র্যাজুয়েট হলাম। পরীক্ষা দিয়ে রেলে চাকরিটাও পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের সংসারে কোনো অভাব নেই। তুমি ঠিক-ই বলেছ মুক্তি। আমি চাইলেই বড়লোকের জামাই হতে পারি। অনেক মেয়ের বাবা ঘটককে দিয়ে অনেক টাকার প্রলোভনও দেখিয়েছে। আমি কিন্তু কোনো প্রলোভনেই পা দিইনি। কেন জানো?

বিস্ময়ে মুক্তি বলল—কেন!

—আমি পড়তে-পড়তেই দুটো দিদির বিয়ে হল। দিদিদের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবার অবস্থা আমি দেখেছি। জামাইদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে জমিজমা বিক্রিই শুধু নয়, আত্মসম্মান বিকিয়ে আত্মীয়দের দোরে-দোরে হাত পাততেও হল। আমার খুব কষ্ট হত। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। বিয়েবাড়িতে যখন সানাই বেজে উঠত, আমি খুব চঞ্চল হয়ে উঠতাম। মনে হত ওটা সানাইয়ের সুর নয়। যেন কন্যাদায়গ্রস্ত এক পিতার করুণ আর্তনাদ। যে সর্বস্ব খুইয়ে মেয়ের সুখ কিনতে গিয়ে নিঃস্ব, রিক্ত। তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে যন্ত্রণার যে অব্যক্ত আলোড়ন—তা বিগলিত ধারা হয়ে আছড়ে পড়ছে সানাইয়ের মধ্যে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার এই হাহাকার তথাকথিত সমাজপতিরা কিন্তু অনেকদিন আগেই লক্ষ করেছিল—এই রে! এই সুর যদি একটানা বেজেই যায়, তাহলে তো সাধারণ মানুষের অনুভূতির দুয়ার হাট হয়ে খুলে যাবে। তারা তখন বুঝতে পারবে—এটা একটা অমানবিক প্রথা। একে বন্ধ করতে হবে। তারা সোচ্চার হবে, প্রতিবাদ করবে। মেয়ের বাবার পকেট কাটার কৌশলটাই তাহলে ভেস্তে যাবে। না, না। এটা হতে দিলে চলবে না। দাও এই সুরটাকে চাপা দিয়ে। বাজি, বাজনা, শঙ্খধ্বনি, হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া, বরযাত্রী, অতিথি—সব দিয়ে মেয়ের বাবার বুকফাটা

হাহাকারকে ঢাকা দেবার ব্যবস্থা হ'লো। শুধু এই ক'রেই ক্ষান্ত হ'লো না। মগজ ধোলাই করা হ'লো—একটা মেয়ের সারাজীবনের দায়িত্ব নেওয়ার খরচটা কী কম। সেই তুলনায় মেয়েকে বাবা আর কতটুকু দেয়? ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করে তুলতে ছেলের বাবাকে কম মেহনত করতে হয়েছে?

যে কথাটা বলা হল না—একটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করে তুলতে মেয়ের বাবাকেও মেহনত করতে হয়। তারপর শ্বশুরবাড়িতে মেয়েকে কেউ তো বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়ায় না। দস্তুরমতো সংসারে তাকে পরিশ্রম করতে হয়। স্বামীর জৈবিক চাহিদা মেটাতে হয়। সন্তানপালন করতে হয়। বাড়িতে একটা ঝি-চাকর রাখলেও মাসের শেষে পয়সা গুনতে হয়। আর তাঁর চতুর্গুণ কাজ করিয়ে, জীবন-যৌবন নিংড়ে নিয়ে একটা মেয়েকে দুবেলা শুধু খাওয়া-পরা দিলেই হবে। তার ওপর আছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার। কী না, স্বামী পরম দেবতা। তার সেবা করাই স্ত্রীর ধর্ম। এতে নাকি পুণ্য হয়!

আসলে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা আজও ভোগ্যবস্তু। আমার কিন্তু এই মতে বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় মেয়েরা ভাগ্যদেবী। যে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে আমার সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। বাড়িতে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, পয়সা দিয়ে কিনে আনতে হয়। আমি তোমার দিদিকে আমার বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করবো। বলো মুক্তি! তোমরা কী দাম চাও?

মুক্তি হতবাক। আবেগে শুধু ঠোঁটদুটো একটু কেঁপে, কণ্ঠ রুদ্ধ হল। না বলা কথা মুক্তোর মতো ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ল দুচোখে। তারপর সঞ্জয়ের পাদুটো জড়িয়ে ধরে বলল—আপনি মানুষ নন, দেবতা। আমাকে ক্ষমা করবেন।

সস্নেহে দু'হাতে মুক্তিকে তুলে ধরে সঞ্জয় বলল—তোমার কোনো দোষ নেই। তুমি যা দেখেছ, তাই বলেছ। কই, এবার বলো, তোমরা কী চাও!

—দেবতার করুণাধারা যাদের সঙ্গে আছে, তাদের আর কী দরকার। দিদি সুখে থাকলেই আমাদের সুখ।

—তোমার দিদিই শুধু সুখে থাকবে না। তোমাদেরও সুখে রাখবে। মালিনী তোমাকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেছে। বিয়ের পরও আমাদের কাছে তুমি আমাদের বড় মেয়ের মতোই থাকবে। আর কান্না নয়! এবার মুখ তোলো। একটু হাসো।

সত্যি-সত্যি মুক্তি হাসল। এমন পিতৃতুল্য জামাইবাবু পেয়ে মুক্তির হাসি আর ধরে না। যেমনটি চেয়েছিল, ঠিক তেমনটি! বিয়ের দিনও খুনসুটি করে বেড়াল। দিদি চলে গেলেও তার মনে এতটুকু খেদ রইল না!

সংসারে কাজকর্ম, পড়াশোনা সমানতালে চলল। বাবার যত্নেরও কোনো ত্রুটি রাখল না। দিদি যেমন-যেমন ভাবে সব করত মুক্তি সেইভাবেই সব করতে

লাগল। দিদি-জামাইবাবু এলে বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। দৌড়ঝাঁপ করে তাদের আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি রাখত না। মালিনী বরং বলত—তুই সর দেখি। একা তো হাত পুড়িয়ে খাচ্ছিস। আমি যখন আছি, তোকে কিছু করতে হবে না। যা, পড়তে বোস।

মুক্তি শুনত না। নিজের হাতে রান্না করে দিদি-জামাইবাবুকে খাইয়ে তবে তার শান্তি। পড়াশোনা না হয় একদিন বন্ধ হবে! এমন কিছু না। দিদি তো আর রোজ আসবে না।

এইভাবেই বছর ঘুরে গেল। মালিনীর কোল আলো করে এক কন্যাসন্তান জন্ম নিল। মুক্তিই তার নাম রাখল—সহেলী। মালিনী মেয়েকে নিয়ে মাসখানেক বাপের বাড়িতে রইল। মুক্তি ঘরে থাকলে সহেলীকে নিয়েই সময় কাটিয়ে দিত। চান করানো, খাওয়ানো—সব। দিদি প্রথম-প্রথম বলত—তুই খাওয়াতে পারবি না। আমাকে দে।

মুক্তি বলত—তুমি থামো তো। দাও, দুধটা দাও।

তারপর সহেলীকে কোলে শুইয়ে দিয়ে আদার করে ক'রে দুধ খাওয়াত। সহেলী বড় হ'তে লাগল। জাঁকজমক করে অন্নপ্রাশনও হল। এখন সে হামাগুড়ি দেয়। টলতে-টলতে গুটি-গুটি পা ফ্যালে। আধো-আধো কথা বলে।

মুক্তির টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। আর তিন মাস পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাবা-কার্তিক সাপুই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বুকের যন্ত্রণায় আছাড়-কাছাড় খেতে লাগল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দিদি-জামাইবাবু এল। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনদিনের মাথায় কার্তিক সাপুই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটতে মালিনী পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়িতেই আশ্রয় নিল। সঞ্জয় কোনো আপত্তি করল না। মুক্তিকে একলা ফেলে রেখে যেতে তারও মন সায় দিচ্ছিল না। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই এসেছে। মা বলেছিল—সঞ্জয়, তুই নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিস না। বৌমার ওপর ছেড়ে দে। যা ভাল বুঝবে, করুক।

—কিন্তু মা, তোমাদের কী হবে?

—আমাদের আবার কী হবে! ওখানে থেকে ডিউটি করতে তোর অসুবিধে হবে। শনিবার ডিউটি করে ওখানে চলে যাবি। রবিবার থাকবি। আবার সোমবার চলে আসবি। আমাদের ভাল-মন্দর দায়িত্ব যেমন তোর, তেমনি বাপ-মা মরা মেয়েটাকেও তো তোকে দেখতে হবে। তোরাই তো তার এখন অভিভাবক।

মুক্তি মাধ্যমিক পাশ করে ইলেভেন-এ ভর্তি হ'লো। দিদি-জামাইবাবুর

সান্নিধ্য মুক্তির মা-বাবার অভাব পূরণ করে দিল। সঞ্জয় প্রত্যেক শনিবার আসে। রবিবার থাকে। আবার সোমবার চলে যায়। এইভাবে আবর্তিত হতে থাকল মুক্তির জীবন।

মুক্তি বি.এ. পাশ করল। সহেলীও অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। এখন সে স্কুলে যায়। সকাল-সন্ধে মুক্তিই তাকে পড়ায়। স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা সবই মুক্তি করে। তার কাজ-ই বা এখন কী! দিদি তাকে কিছুই করতে দেয় না। সহেলীকে নিয়েই তার সময় কাটে। তাকে মনের মতো করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চায়।

মালিনী একদিন সঞ্জয়কে বলল—কী গো! মুক্তির জন্যে এবার একটা ছেলে-টেলে দ্যাখো। বয়স হচ্ছে তো!

—হ্যাঁগো, আমিও ভাবছিলাম। ঠিক আছে, ঘটক লাগাচ্ছি।

ঘটক বাড়িতে এলো। মুক্তির জন্যে কেমন ছেলে চাই—তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে মালিনী ঘটককে মুক্তির একটা ফটো দিয়ে বলল—আপনি একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করুন।

ঘটক বলল—চেষ্টা তো করব! কিন্তু আপনি যা-যা বললেন, ওইরকম ছেলের পিছনে তো অনেক টাকা লাগবে। পারবেন তো?

—সে দ্যাখা যাবে'খন। আপনি আগে নিয়ে আসুন।

ঘটক চলে যায়। একের পর এক ছেলে আনতে থাকে। কেউ বড় ব্যবসায়ী, কেউ ভাল চাকরি করে। কিন্তু তাদের চাহিদা আকাশছোঁয়া। মালিনী খুব ভাবনায় পড়ে গেল। যাকে-তাকে তো আর দেওয়া যায় না। লোকে বলবে কী? সবচেয়ে বড় কথা—মুক্তির কোনো কষ্ট তো মালিনী সহ্য করতে পারবে না। তাতে তার যতই কষ্ট হোক।

মুক্তিও খুব বিরক্ত হল। দুদিন ছাড়া সেজেগুজে একটা-একটা ছেলের সামনে বোসো। তারপর মণ্ডামিঠাই খেয়ে-দেয়ে বলবে—এই দাও, সেই দাও। কেন রে বাবা! তোদের তাহলে আমাকে পছন্দ নয়, টাকাকেই বেশি পছন্দ।

মুক্তি বুঝতে পারে, দিদির অসুবিধে। জামাইবাবুর একার ঘাড়ে দুটো সংসার। মাইনে যা পায়, সবই খরচ হয়ে যায়। এত টাকা পাবে কোথায়!

তারপর তাদেরও মেয়ে আছে। এতখানি স্বার্থপর সে হতে পারে না। তারা যা করেছে—সে ঋণই কোনোদিন শোধ করা যাবে না! আবার তার জন্যেই জামাইবাবুর ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপুক—ওটা মুক্তি কক্ষন-ই মেনে নিতে পারবে না।

তাই সে দিদিকে বলল—দিদি, আমার বিয়ে নিয়ে তোমাদের অত ভাবতে হবে না। আমি এখন বিয়ে করব না।

দিদি বলল—তুই বাজে বকিস না তো? মাও নেই, বাবাও নেই! ওরা থাকলে কী আমাদের মাথা ঘামাতে হত! ওরা নেই বলেই তো আমাদের ভাবতে হবে। তারপর তুই কি শুধু আমার বোন! তোর জামাইবাবু তো বলেই দিয়েছে—তুই আমাদের বড় মেয়ে। উপযুক্ত মেয়ে ঘরে থাকলে মা-বাবার যে কত চিন্তা, তুই তার কী বুঝবি! মা হলে বুঝতে পারবি—ভাবনাটা কেন!

—তুমি যাই বলো দিদি! আমি এখন বিয়ে করব না।

—আমি জানি না। তোর জামাইবাবুকে বল?

জামাইবাবু—সঞ্জয় পাশেই ছিল। মুক্তি বলল—জামাইবাবু, সব শুনেছেন তো।

সঞ্জয় বলল—শুনলাম। কিন্তু তোমার কথা শুনলে তো আমাদের চলবে না। তোমাকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দেওয়াটাই আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য। তোমার বাবা-মা থাকলে যা করতেন।

—আহা, আমি কী বিয়ে কোনোদিন করবো না বলছি।

—তাহলে তোমার আপত্তিটা কোথায়?

—আপনাদের ভাল ছেলেতে আমার আপত্তি। অর্থলোভী, নীচ, সংকীর্ণমনা ছেলেগুলোকে আপনি ভাল বলছেন! যাদের মনে এতটুকু সহানুভূতি নেই, সহমর্মিতা নেই, যারা শুধু টাকার নিক্তিতে একটা মেয়েকে বিচার করে—তারা কিসের মানুষ। আপনিও তো একটা ছেলে! কই, আপনি তো ওইভাবে দিদিকে দেখেননি। আপনি আপনার উদার হাত-দুটো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যে হাত ধরে দিদি, আমি—খুব নিশ্চিন্ত। এখানে কোনো চাওয়া নেই। শুধু পাওয়া—ভালবাসা, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা, সর্বোপরি, মানুষ হয়ে মানুষের জন্য কিছু করা। এইরকম সত্যিকারের কোনো মানুষ পেলে, আমার আপত্তি নেই।

—মুক্তি, তোমার কথাটা ঠিক। কিন্তু কী জানো! তোমার বিয়েটা আমাদের হাতে নেই। ছেলেপক্ষের উপর নির্ভরশীল। যেমন ধরো, আমার ছোটদিদির বিয়েতে আমাকেও কড়ায়-গণ্ডায় গুনে দিতে হয়েছে। অথচ আমি এর বিরোধী! আর আমার বিয়েটা সম্পূর্ণ আমার হাতে। তাই আমার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাতে কোনো অসুবিধে হয়নি। অনেক সময়, পরিস্থিতির চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে হয়। তোমার ওসব ভেবে কিছু কাজ নেই। ভাবনাটা আমাদের ওপর-ই ছেড়ে দাও।

মুক্তি ভাবনাটা ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু বছর ঘুরতে আবার ভাবতেই হল। কত ছেলে দেখে গেল। কোনোটা এদের পছন্দ হয় না। কোনোটা বা পছন্দ হলেও টাকার দিক দিয়ে পিছিয়ে আসে। তাকে নিয়ে যেন দড়ি টানাটানির খেলা। দিদি-জামাইবাবুর অবস্থাটা মুক্তি অনুভব করে। দুজনে যখন কথা বলে, মুক্তি গেলেই

চুপ করে যায়। বুঝতে পারে, তাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল। আর এটাই মুক্তিকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। যে মানুষ দুটো তার জন্যে এত করছে, সে কী করল। বোঝার ভার হয়ে তাদের সুখ-শান্তি নষ্ট করছে। এরা কিছু শুনতেও চাইছে না, বুঝতেও চাইছে না। সেই এক কথা—ভাল ছেলে দেখে তোর বিয়ে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি!

সহেলীকে স্কুলে দিয়ে মুক্তি বাড়ি ফিরছে। ঘটকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

ঘটক বলল—কোথায় গিয়েছিলে মা?

—বোনঝিকে স্কুলে দিয়ে এলাম।

—তোমাকে নিয়ে মা, খুব মুশকিলে পড়েছি। যেমন-তেমন ছেলে আবার তোমার দিদির পছন্দ নয়। নাহলে হাতে একটা ছেলে ছিল। পয়সা-কড়ি লাগত না।

—কী করে?

—চৈতন্যগঞ্জের রুটে বাস চালায়। বাপ-মা নেই। কাকার কাছেই মানুষ। লেখাপড়া বেশিদূর শিখতে পারেনি। আগে বাসে কনডাক্টারি করত। এখন ড্রাইভার হয়েছে। ঘর-দোর কিচ্ছু নেই। একলা, বাসেই পড়ে থাকে। বিয়ের পর কী আর ওইভাবে থাকবে। ঘরই করুক আর ভাড়াই নিক—যা হোক তো একটা উপায় করতে হবে। বৌকে নাহলে রাখবে কোথায়! তোমার দিদি শুনলে তো এক কথায় না করে দেবে।

মুক্তি একটু ভাবল, তারপর বলল—আপনি রবিবার সকালে বাড়িতে আসুন। জামাইবাবু থাকবেন। আমিও থাকব। কথা হবে।

ঘটক চলে গেল। মুক্তিও বাড়ি ফিরল।

রবিবার সকালেই ঘটক এল। সব শুনে মালিনী তো রেগে আগুন। ঘটককে বললো—আপনি কী করে এই ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। চাল-চুলো নেই। আপনাকে তো বারবার বলেছি—আমাদের সঙ্গে খাপ খায়, এমন ছেলে দেখুন।

ঘটক বলল—তা তো বলেছ মা। কত ছেলেই তো আনলাম। যা সব দাবি-দাওয়া! বাস চালালেও ছেলেটা ভালো। কোনো ঝামেলা নেই। স্বামী-স্ত্রীর সংসার হবে। মুক্তি মা সুখেই থাকবে। পছন্দ হ'লে, দেনা-পাওনারও কোনো ব্যাপারই নেই।

—নাই থাক। যারা গাড়ি চালায় মোটেই ভাল ছেলে নয়। রাত-বিরেতে বাইরে পড়ে থাকে। মদ খায়, জুয়া খেলে, খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায়। না, না। বোনের জীবনটাকে আমি নষ্ট হতে দেব না।

সঞ্জয় এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার বলে উঠল—হ্যাঁ, ঘটকমশাই, মালিনী

ঠিকই বলেছে। আপনার হাতে অন্য ছেলে যদি থাকে তো দেখুন।

মুক্তি বলল—জামাইবাবু, আপনিও দিদির কথায় কী করে হ্যাঁ করে দিলেন। গাড়ি চালালেই মদ খায়, কে বললে? ওই তো রায়পাড়ার সুবলদা বাস চালায়। সে কী মদ খায়! দিদি তো জানে। দেড়মাস-দু'মাস ছাড়া হয়তো সুবলদা বাড়িতে আসে, ঠিকই। কিন্তু ওদের মধ্যে কখনও অশান্তি শুনেছ। বৌদি তো বেশ সুখেই আছে।

তারপর ঘটকের দিকে চেয়ে মুক্তি আবার বলল—আপনি দেখুন তো ঘটক মশাই। আসুক না দেখতে। দেখলেই কী বিয়ে হয়ে যাচ্ছে! তোমরা কথা বলো, বোঝো, তারপর তো!

মুক্তির যুক্তিজালের কাছে দিদি-জামাইবাবু হার মানে। ঘটক ছেলেকে একদিন নিয়ে এল। নাম—সুদীপ কোলে। দেখাশোনা হল। মুক্তিকে সুদীপের খুব পছন্দ। মালিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুদীপকে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার তো মা-বাবা নেই বলছ। দেশে ঘরদোর-ও নেই। তুমি তাহলে থাকো কোথায়?

—একলা মানুষ। বাসের মধ্যেই পড়ে থাকি।

—আমার বোনও কী তাহলে বাসেই থাকবে?

—এটা কী বলছেন দিদি! বিয়ের পর তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। দেশে আর ফিরব না। চৈতন্যগঞ্জেই জায়গা কিনে নিজের বাড়ি করে নেব।

—সে তো পরের কথা। এখন বিয়ে করে রাখবে কোথায়?

—দিদি, ছোটবেলায় বাপ-মাকে হারিয়েছি। নিজের বলতে কেউ নেই। কাকা আমাকে মানুষ করেছিল। কিন্তু কাকিমার অত্যাচারে ঘর ছাড়তে আমি বাধ্য হই। চৈতন্যগঞ্জে এসে প্রথমে একটা চায়ের দোকানে কাজ নিলাম। ওই চায়ের দোকানে বাসের লোকেরা চা খেত। তারাই আমাকে একটা বাসে হেল্পারের কাজে লাগিয়ে দিল। তারপর কনডাক্টর হলাম। এখন বছর খানেক হল ড্রাইভারি করছি।

তারপর মালিনীর হাতদুটো ধরে সঞ্জয় বলল—আপনারাই এখন আমার একমাত্র আপনজন। অনাথ ভাইকে দিদির স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবেন? আপনার চরণে আশ্রয় পাবার যোগ্য কী আমি নই!

মালিনী বলল—তা কেন ভাই! তা নয়।

—তাহলে আমাকে একটু সময় দিন। বিয়ের পর মুক্তি এখন এখানেই থাক। তারপর একটা ঘর ঠিক করে, নিয়ে চলে যাব।

মালিনী আর না করতে পারল না। সত্যি, ছেলেটাকে দেখলে খুব মায়া হয়। এখানে যদি কয়েকমাস থাকেই! ক্ষতি কী। তারপর তো নিয়ে চলে যাবে বলছে। ছেলেটার কথাবার্তাও বেশ ভাল। অল্পক্ষণেই যেন মুখে 'দিদি' লেগেই আছে। মালিনীর অন্তরে সুদীপ, ভাইয়ের জায়গা করে নিল। কিন্তু মুক্তি! মুক্তির

তো একটা মতামত নেবার প্রয়োজন আছে।

মুক্তির মত পেতে কোনো অসুবিধেই হল না। দিদি-জামাইবাবুকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্ত করতে এই সুযোগ মুক্তি হারাতে নারাজ। সে তো মন থেকে এইটেই চাইছিল। তার কপালে যাই থাক।

সঞ্জয়ের মনে একটু 'কিন্তু' ছিল। কিন্তু মুক্তি-মালিনীর কথার ওপর সে আর কিছু বলল না। ব্যাপারটা "মায়ের চেয়ে মাসির দরদ"-এর মতো হয়ে যেত।

শুভদিন ঠিক করে সুদীপ-মুক্তির বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের কেউ নেই। মেয়ের ঘরে উঠে এসেই বিয়ে করতে হল। মালিনী কিন্তু কোনো কার্পণ্য করল না। বোনকে সাধ্যমতো সোনাদানা গড়িয়ে দিল। সুদীপকে আংটি দিল। পাড়ার লোকজনকে নিয়ে একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠানও করল।

মুক্তি দিদির কাছেই থাকে। সুদীপ মাসে এক-আধবার আসে। কোনো কোনো বার একদিন থাকে। নাহলে ভোরবেলাই চলে যায়। এইভাবে দিন কাটতে লাগলো।

সত্যি কথা কোনোদিন চাপা থাকে না। চৈতন্যগঞ্জের বাসের লোকেরা সুদীপের বিয়ের কথা জেনে ফেলল। তারা খুব অবাক হয়ে গেল। লালু বলল—কীগো সুদীপদা, লুকিয়ে-লুকিয়ে বিয়ে করে ফেললে। একবারও জানালে না। কেষ্ট বলল—কীরে, খুব তো ভাল দাঁও মেরেছিস, শুনলাম। মেয়েটা নাকি গ্র্যাজুয়েট। তোর গলায় কী করে মালা দিল বলতো?

—শুধু তাই নয় কেষ্টদা। বৌদিরা দু'বোন। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিও পাবে। বৌদির জামাইবাবু আবার রেলে চাকরি করে। সুদীপদাকে এখন ধরে কে! চায়ে চুমুক দিতে দিতে পার্থ বলল।

চা-দোকানদার ভজু বেরা সুদীপকে ছোটবেলা থেকেই চেনে। প্রথমে সে এই দোকানেই কাজ করত। তারপর কেষ্ট-ই ওকে গাড়িতে কাজে লাগাল। এখন ড্রাইভার হয়েছে। মদ্যপ, মাতাল। জুয়া খেলে আর মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ায়। যা রোজগার করে, ওসবেই ঢেলে দেয়। চারিদিকে দেনা। সেও তো পয়সা পাবে। রোজ চা খাচ্ছে। তবুও আজ দু'মাস কোনো পয়সা দেয়নি। নেহাত একসময় এই দোকানে কাজ করেছে, তাই! তার ওপর কেউ নেই। খুড়ো-খুড়ো করে। কোথাও যেন একটা দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। মাঝে-মাঝে ভাবে, আর চা দেবে না। কিন্তু যখনই সুদীপ এসে বলে—খুড়ো একটা চা দাও। ভঞ্জু বেরা চা-টা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—নে ধর। অনেক তো বাকি পড়ল। এবার পয়সাকড়ি কিছু দে।

—তুমি ও নিয়ে অত ভেবো না তো খুড়ো। সব দিয়ে দেব।

ব্যস। ভঞ্জু বেরা চুপ। আর কিছু বলতে পারে না।

একবারই শুধু ভঞ্জু বেরা খুব রেগে গিয়েছিল। সেদিন রাত্রে দোকান বন্ধ করবে। সুদীপ এসে বলল—খুড়ো, দোকানের চাবিটা আজ দিয়ে যাও না।

—কেন?

—দ্যাখো না, আমার মামাতো বোন বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিল। রাত্রি হয়ে গেছে। বাস নেই। আর বাড়ি যেতে পারেনি। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কী করি বলো তো?

একটু ভেবে ভঞ্জু বেরা বললো—তোর তো সাতকুলে কেউ নেই শুনেছি। মামাতো বোন আবার এল কোথা থেকে।

—ওই আর কী। দূর সম্পর্কের।

সুদীপের স্বভাব-চরিত্রের খবর ভঞ্জু বেরার কানে একটু-আধটু এসেছিল। ততখানি আমল দেয়নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারল, অধঃপতনটা কতখানি হয়েছে। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। যা খুশি তাই বলেছিল। সুদীপ একটাও কথা বলেনি। মাথা নীচু করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে সুদীপকে ভঞ্জু বেরা অনেক বোঝাল। কিন্তু কে কার কথা শোনে! একটা বাজে নেশায় পড়ে গেছে।

ওর যাই পারে হোক! ভঞ্জু বেরার ভাবনা হল বৌটাকে নিয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে। আবার শিক্ষিত! বাড়ির লোক ভাল করে একটু খোঁজ-খবরও নিল না। কুলাঙ্গারের হাতে মেয়েটিকে তুলে দিল। মেয়েটার কপালটাই খারাপ! ভাগ্যে কি যে আছে!

তাই বলে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। সুদীপকে ডেকে ভঞ্জু বেরা বলল—বিয়ে করেছিস, খুব ভাল কথা। এবার বদ নেশাগুলো ছাড়। বৌমা লেখাপড়া জানা মেয়ে! এসব কী মেনে নেবে! তারপর শ্বশুরবাড়ির লোকজনই কী ভাববে!

—তারা কোনোদিন জানবেই না। শ্বশুরবাড়ি কী আমি রোজ যাব? মাসে হয়তো একবার। ভাল ছেলের মতো যাব, থাকব, খাব, চলে আসবো।

—কিন্তু সেটা ক'দিন? বৌমা কী চিরকাল বাপের বাড়িতেই থাকবে? একদিন না একদিন তো তোকে আনতেই হবে। তখন?

—তুমি কী খেপেছ খুড়ো। সব হিসেব করেই বিয়ে করেছি। বাপ-মা-ভাই কেউ নেই। শুধু দু'বোন। সম্পত্তির চুল চিরে ভাগ ক'রে নেব। ব্যস। ভাগে তো একটা ঘর পাবই। চিন্তা কী! শুধু দেখে যাও খুড়ো। দেখে যাও।

খুড়ো অবাক হল না। ওর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু মেয়েটির জন্যে খুড়োর খুব কষ্ট হয়। ভদ্রঘরের মেয়ে। সারাজীবনটাই জ্বলে-পুড়ে মরবে!

মুক্তির বিয়ে দু'বৎসর হয়ে গেল। বাপের বাড়িতে পড়ে থেকে দিদির অন্ন ধ্বংস করতে তার আর মন চায় না। সুদীপ বাড়িতে এলেই বলত—ছ'মাস তো হয়ে গেল। এখনও একটা ঘর ভাড়া নিতে পারছ না? এখানে থাকতে আমার একদম ভাল লাগে না।

সুদীপ বলত—তুমি বাইরের অবস্থাটা বুঝতে পারছো না। ঘর পাওয়া খুব মুশকিল। কম চেষ্টা করছি! তোমাকে এখানে ফেলে রাখতে আমারও কী ইচ্ছা করে! কী করব বলো?

—তুমি তাহলে দিদির হাতে মাসে কিছু টাকা তুলে দাও। এমনি-এমনি খেতে আমার খুব খারাপ লাগছে। দিদি কী ভাবছে বলো তো!

—দিদি কী তোমাকে কিছু বলেছে?

—দিদি কোনোদিনও বলবে না। আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। বিয়ের আগে খেতাম, আলাদা কথা। এখন কী মানায়! তোমারও তো একটা সম্মান আছে।

—আমিও যে ভাবি না, তা নয়। কিন্তু কী জানো! দিদি আমাদের কত ভালবাসেন। টাকা দিতে গেলে যদি অন্যভাবে নেন। যদি ভাবেন—আমরা ওদের পর ভাবছি। খুব কষ্ট পাবেন। সেটা কী ভাল হবে?

—তা ঠিক। তবে তুমি যেভাবেই হোক একটা ঘরের ব্যবস্থা করো।

—হ্যাঁ দেখছি।

সুদীপ বারবার একই কথা বলে এড়িয়ে যেত। উপায়-ই বা কী! যা মাইনে পায় ফূর্তি করতেই শেষ। ঘরভাড়ার টাকা আসবে কোথা থেকে। নাহলে ঘর কী আর পাওয়া যায় না। তার ওপর আলাদা সংসারে খরচ চালাবে কী করে। তাই তাকে এই কৌশল নিতে হয়েছে। যখন শ্বশুরবাড়িতে আসে সহেলীর জন্যে নানারকম জিনিস কিনে আনে। দেখেই মালিনী বলে ওঠে— তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটা মেয়ে কত খাবে। এত হাত লম্বা হলে চলবে। সংসার করেছ। ভবিষ্যতের চিন্তাও তো করতে হবে।

সুদীপ বলত—ও আর এমন কী। সহেলী তো আমাদেরও মেয়ে। কী আর করতে পারছি। আপনাদের ঋণ কোনোদিনও শোধ করা যাবে না।

—এ নিশ্চয় মুক্তি তোমাকে বলেছে। আচ্ছা মুক্তি, তুই কী রকম মেয়ে। তুই সুদীপকে এসব কথা বলতে গেছিস কেন?

মুক্তি বলত—আমি কেন বলতে যাব। ও তো নিজেই দেখছে।

—না, সুদীপ। তুমি এভাবে টাকা নষ্ট ক'রো না। সঞ্চয় করে একটা বাড়ি করার চেষ্টা করো। আমাদের কাছে যতক্ষণ আছো, সব দায়িত্ব-ই আমাদের। সে

জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

সুদীপ কোনোদিন-ই ভাবে না। ভাবটা শুধু দেখায়। মুক্তি শুধু ঘর-ঘর করবে। কেন? ঘর দেখতে হবে কেন! এই সম্পত্তির অর্ধেক তো মুক্তিও পাবে।

একদিন ঘরের কথা উঠতে সুদীপ বলেও ফেলল—তুমি শুধু ঘর ভাড়া নেওয়ার কথা বলবে। জানো! বাইরে থাকা কত ঝামেলা। আমি সারাদিন থাকব না। তুমি একা। কতরকম বিপদ ঘটতে পারে।

মুক্তি বলল—বিপদ তো এসেই গেছে গো। ওই জন্যেই তো ঘরের জন্য তাড়া লাগাচ্ছি।

—বিপদ, মানে!

—আমি মা হতে চলেছি।

কথাটা শুনেই সুদীপের মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। তোমার মা হওয়া চলবে না। কারণ, আমি কারও বাবা হতে চাই না। কোনো বাঁধাধরা ছকে জীবনকে আমি বাঁধতে চাই না। আমি জীবনটাকে শুধু ভোগ করতে চাই। আর পাঁচজনের মতো তুমিও শুধু ভোগ্যবস্তু। কোনো সন্তান, সংসার আমার জন্যে নয়। তোমাকে বিয়ে করেছি শুধু অসময়ের জন্য। যখন কাছে পয়সা থাকে না, বিনাপয়সায় সম্ভোগের তুমি একটা উপায় মাত্র। তাই আমার কাছে তোমাকে রাখতে চাই না। প্রয়োজনে তোমার কাছে থাকি। তোমাকে যে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি, সেটাই তোমার অনেক ভাগ্য! তুমি কী ভেবেছ, স্বামীর দোহাই দিয়ে আমার পথ আগলাবে? কোনোদিনও পারবে না। কারো বাঁধা ধরা স্বামী হয়ে আসামীর মতো জেল খাটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। নিত্যনতুন সঙ্গিনীর সাহচর্য আমার বেশি ভাল লাগে। তুমি কী পারবে মেনে নিতে? পারবে না। তাই স্ত্রীর সামাজিক স্বীকৃতিটাই শুধু থাকবে। কোনো সন্তানের স্বীকৃতি নয়। আর বেশী বাড়াবাড়ি করলে, চরম পরিণতি হবে। কিন্তু এখন সন্তানটাকে তো নষ্ট করতে হবে। কী করা যাবে!

সুদীপকে চুপ করে থাকতে দেখে, মুক্তি বলল—কী হল! তুমি খুশি হওনি।

মনের ভাব গোপন করে সুদীপ বললো—হ্যাঁ।

—তাহলে চুপ করে কেন?

—আমি ভাবছি অন্য কথা। এখন তো তোমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই অবস্থায় তোমার কাছে সবসময় লোকের দরকার। দিদির কাছে থাকলে, আমি খুব নিশ্চিন্ত থাকব।

—কিন্তু আমি যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। দিদি আমাদের এত ঝামেলা পোহাচ্ছে। আর নতুন করে কোন দায় চাপাতে আমার মন চাইছে না। তারপর মাত্র দুটো ঘর। একটা ঘর আবার আমরা দখল করে আছি। সহেলী বড় হচ্ছে।

ওর পড়াশোনার জন্যে এখন একটা ঘর দরকার।

মুক্তিকে থামিয়ে দিয়ে সুদীপ বলল—দখল করে আছি মানে? দখল আবার কী! তোমার ন্যায্য পাওনা। এই সম্পত্তির অর্ধেক অংশ তোমার। তাই একটা ঘরও তোমার। ওদের ঘরের দরকার হলে আলাদা করে নিক। বেশি কিছু বললে, চুল-চিরে সম্পত্তির ভাগ করে নেব। তুমি শুধু ঠিক থাকো না।

—না গো। তুমি ওকথা বোলো না। ও আমি কক্ষনও পারব না। তাতে আমার যত কষ্টই হোক! তুমি যেমন-তেমন একটা ঘর দ্যাখো না। ঘর হলেই হবে। আমি আর কিছু চাই না।

—তোমার সেই এক কথা। ঘর, ঘর আর ঘর। ঠিক আছে। দেখছি।

ওই পর্যন্ত। সুদীপের মাথা থেকে ঘর উধাও। মুক্তির গর্ভের সন্তান-ই এখন তার মাথাব্যথা। ওকে পৃথিবীর আলো দেখতে দিলে হবে না। কী ভাবে? কোনো নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মুক্তি কী রাজি হবে? যা সতীপনা! সন্তানের স্বপ্নে একেবারে মশগুল। গা জ্বলে যায়! তাহলে? ভাবতে ভাবতে একটা উপায় বের হল—আচ্ছা, ঘর দেখানোর অজুহাতে যদি মুক্তিকে নিয়ে এসে কাজটা সেরে ফেলা যায়! তাহলে, আগে থেকেই নার্সিংহোমে কথা বলে রাখতে হবে। রাজি হোক না হোক, জোর করেই করতে হবে। তারপর যা হয় হবে। কোনোভাবেই অবাঞ্ছিত সাক্ষী রাখতে নারাজ।

মুক্তির কাছে সুদীপ একদিন প্রস্তাবটা দিয়েছিল। মুক্তি বলল—আমার যাবার দরকার নেই। তুমি দেখলেই হবে।

—তাই কী হয়। তোমারও তো একটা পছন্দ-অপছন্দ আছে।

—নাগো, তুমিই এখন আমার সব। তোমার পছন্দ-ই আমার পছন্দ। তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

সুদীপ হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ন্যাকামির কথাগুলো মনে পড়লেই সুদীপের এখনও গা রি-রি করে ওঠে।

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে সুদীপ ভাবনায় ডুবে গেল।

চা ছাঁকতে-ছাঁকতে খুড়ো বলল—কী রে, বৌমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছিস।

—না গো খুড়ো, ঝগড়া ঠিক নয়। দ্যাখো না তোমার বৌমা ওখানে আর থাকতে চায় না।

খুড়ো বলল—ঠিকই তো। বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে যায়। বাপের বাড়ী থাকবে কেন? তারপর বৌমা লেখাপড়া জানা মেয়ে। তারও তো একটা আত্মসম্মান আছে!

—শ্বশুরবাড়িই নেই, আবার শ্বশুরবাড়িতে থাকবে। ভাল বলেছ খুড়ো।

—শ্বশুরবাড়ি নাই বা থাকলো। একটা ঘর ভাড়া নে। বৌমাকে নিয়ে চলে আয়।

—হুঁ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুদীপ চুপ করে গেল।

—নে, চা ধর।

সুদীপকে চা দিয়ে খুড়ো বলল—আসলে, তুই ভয় খাচ্ছিস।

—কেন? ভয় আবার কীসের।

—বৌমা এলে, তোর কুকীর্তি সব জেনে ফেলবে।

—দূর। ওসব ভয় করি না।

—তাহলে নিয়ে চলে আয়। আর ওই নেশা-টেশা ছেড়ে দে।

—দেখি, কী করা যায়।

মুক্তির চাপাচাপিতে সুদীপ বাধ্য হল। বাধ্য হল ভোগের ফসল লোপাট করার জন্য। চৈতন্যগঞ্জ থেকে পায়ে হেঁটে মিনিট পনেরোর পথ—সেতার চক। সেখানে ঘর ঠিক করল। ছিটেবেড়ায় টালির ছাউনি দেওয়া একটা ছোট্ট ঘর। সামনে একফালি একটু দোর। ভাড়া মাসে একশো টাকা। তাই সুদীপের কাছে অনেক বেশি মনে হয়েছিল।

খবরটা শুনে মুক্তি খুব খুশি। এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন! খুশির খবর দিদিকেও শোনাল। দিদি বলল—তুই কী বল তো? এই সময় ঘর ছেড়ে কেউ বাইরে যায়। আমরা কী তোকে কোনোদিন কিছু বলেছি?

মুক্তি বলল—দ্যাখো না, তোমাদের জামাইয়ের কীর্তি। শুধু বলবে—আর কতদিন দিদির ঘাড়ে বসে থাকবে। দিদি ভাল বলে সব দায় তার ওপর চাপানো ঠিক নয়। আমি ঘর দেখছি। তোমাকে নিয়ে যাব।

—তুইও অমনি হ্যাঁ করে দিলি। সুদীপ আসুক। মুখে শুধু "দিদি-দিদি" করবে। আর বৌয়ের সঙ্গে গুজগুজ করে কাজ সারবে। কানটা একদম ছিঁড়ে দেব। দু'বোনে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। মালিনী সঞ্জয়কেও কথাটা শোনাল।

সঞ্জয় বলল—কী করবে, বলো? ওদের ভাল-মন্দ ওদেরই বুঝে নিতে দাও। পাশে তো আমরা আছি। অসুবিধে কী? তবে ওকে একলা ছেড়ো না। তুমিও সঙ্গে গিয়ে ডেরাটা দেখে এসো। সময়ে-অসময়ে তবু চলে যাওয়া যাবে। কবে যাচ্ছ?

—এই তো আগামী বুধবার।

—ঠিক আছে। তুমি মুক্তিকে একবার ডেকে দাও?

মুক্তি এল। সঞ্জয় বলল—তুমি তাহলে চলেই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, জামাইবাবু। বুধবার যাব। আপনার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না।

আমাদের বাড়িতে যাবেন। নাহলে আমি আর আসব-ই না।

—যাব তো অবশ্যই। শোনো, পয়সাকড়ির অসুবিধে হলে লজ্জা করবে না। তোমার দিদিকে বলবে।

তারপর মুক্তির হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে সঞ্জয় বলল—এই নাও, টাকাটা রেখে দাও। বাইরে থাকবে, কখন কী দরকার হয়। কাছে টাকা থাকলে, মনের জোর থাকে। সুদীপের সঙ্গে তো আর দেখা হবে না। তাকে বলো—আমার আশীর্বাদ রইল।

মুক্তি, জামাইবাবুকে প্রণাম করে বলল—আপনি যাবেন তো?

—নিশ্চয় যাব। আর শোনো, মালিনী তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। সবকিছু দেখে-শুনে আসবে।

বুধবার সকালে মুক্তি আর মালিনীকে নিয়ে সুদীপ চৈতনগঞ্জে এল। খুড়োর চায়ের দোকানে গিয়ে মুক্তিকে দেখিয়ে বলল—খুড়ো এই তোমার বউমা। আর এ দিদি।

মুক্তি নীচু হয়ে খুড়োর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। মুক্তির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে খুড়ো বলল—সুখী হও মা।

তারপর সুদীপকে বললো—কোথায় ঘর ঠিক করলি?

—সেতার চকে। কানাই পাল-এর ঘর।

—একটু দূর! তবে খুব একটা খারাপ হবে না। হ্যাঁরে সুদীপ, বৌমাকে তো নিয়ে যাচ্ছিস, ঘরের সরঞ্জাম সব রেখেছিস তো?

—আপাতত এখন চালিয়ে নেবার মতো করেছি। পরে-পরে সব হয়ে যাবে। খুড়ো, এরা এখানে রইল। আমি বাজারটা করে আনি। ততক্ষণ এদের চা দাও। সুদীপ একটা ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। খুড়ো, দুটো চা তৈরি ক'রে, চা-বিস্কুট মুক্তি আর মালিনীকে দিল। কিছুক্ষণ বাদে, সুদীপ ফিরে এসে বললো—চলো, এবার যাব। খুড়ো, আসি গো।

মুক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কাকাবাবু, আমরা আসছি।

—হ্যাঁ মা, এসো। কোনো চিন্তা নেই। অসুবিধে হ'লে এখানে চলে আসবে। আমি রাত্রি দশটা পর্যন্ত দোকানে থাকি।

তিনজনে দোকান থেকে বেরিয়ে ইটপাতা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে গেল। ঘর দেখেই তো মালিনী অবাক! বলল—সুদীপ, এ কী ঘর ঠিক করলে? এইটুকু একটা ঘর। একটামাত্র জানলা। গরমে তো পচে মরবে। তারপর শোবে কোথা? রান্না করবে কোথা? আমতা-আমতা করে সুদীপ বলল—এখন মেঝেতেই দিনকতেক শুতে হবে। এই তো,

মাদুর আছে, কাঁথা-বালিশও আছে। তারপর একটা তক্তপোষ কিনে নেব।

ঘরের কোণে জড়ো করা কাঁথা-বালিশ সুদীপ দেখাল। বাসের মধ্যে যার উপর সুদীপ শুত, সেগুলোই নিয়ে এসেছে। বাস থেকে রান্নার স্টোভ, হাঁড়ি-কড়াও নিয়ে এসেছে।

মালিনী বলল—রান্নাঘর?

—দোরেই এখন রান্না করতে হবে। তারপর এটা তো সাময়িক। ভাল ঘরের খোঁজে আছি। পেলেই উঠে যাব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দ্যাখো। যত তাড়াতাড়ি পারো এই ঘর ছাড়ার ব্যবস্থা করো।

সুদীপ ব্যাগ থেকে বাজার বের করে, স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেই রান্না করতে বসে গেল। মুক্তি বলল—সরো, সরো, আমি করছি।

—না, না। তোমরা দু'বোনে গল্প করো। দিদি আজ প্রথম এলেন। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব। আমাকে তো এতদিন রান্না করেই খেতে হত। আমার সব অভ্যেস আছে।

সুদীপ রান্না করতে লাগল। ঘরের মধ্যে দু'বোনে গল্পে মেতে রইল।

মালিনী বলল—মুক্তি, এইভাবে তুই থাকতে পারবি?

—ঠিক পারব। তারপর দেখো না, এসে যখন পড়েছি, ঘর একটা ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই কর। ভাল দেখে ঘর নিবি। পয়সার জন্যে পিছিয়ে আসবি না। যা লাগে, আমরা দেব। সুদীপকে কিছু বলতে হবে না। তোর জামাইবাবু এই ঘর দেখলে, তোকে কী রাখতো নাকি! বাড়িতে গিয়েও বলা যাবে না।

—না দিদি। জামাইবাবুকে এসব কিছু বলতে হবে না। জিজ্ঞেস করলে বলবে—ভাল-ই দেখলাম।

—তুই যে কী করে থাকবি! আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।

—তুমি অত ভেবো না তো। সব সয়ে যাবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে, বোনকে নানা পরামর্শ দিয়ে মালিনী বাড়ি ফিরে এল।

ভাড়া ঘরে মুক্তি থাকে। খুব কষ্ট হয়। থাকা-খাওয়া-শোয়া, সবেতেই। মুখ বুজে সহ্য করে। তবু তো নিজের সংসার। কষ্টের মধ্যেও এইটুকু সুখের অনুভূতি তাকে সব দুঃখ সহ্য করার শক্তি জোগায়। কিন্তু এই সুখও তার বেশিদিন সইল না। সুখ চলে গেল তার মন থেকেও। গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য সুদীপ রোজ-রোজ পীড়াপীড়ি করে। তর্কাতর্কি হয়। কথা কাটাকাটি হয়। মুক্তি রাজি হয় না। ইদানীংকালে সুদীপ প্রায়-ই রাত্রে বাড়ি ফেরে না। জিজ্ঞেস করলে বলে—

কাজ ছিল। রাত্রে একা থাকতে মুক্তির ভয় করে। তবুও থাকতে হয়। বাস চালানোর কাজ! মালিক কখন কোথায় পাঠিয়ে দেয় হয়তো। কিন্তু আজ তিনদিন সুদীপ বাড়ি ফেরেনি। মুক্তি অস্থির হয়ে ওঠে। অমঙ্গল চিন্তায় মন ছটফট করে। এমন কী হল। এতদিন তো বাইরে থাকে না। সকালেই চলে এল চৈতন্যগঞ্জে চায়ের দোকানে। মুক্তিকে দেখেই ভঞ্জু বেরা বলল—কী ব্যাপার বৌমা, সাতসকালে? খবর ভাল তো?

—দেখুন না কাকাবাবু। আপনার ছেলে আজ তিনদিন ঘরে যায়নি।

—সে কী! ক'দিন তো কই বাসওচালায় নি। আমি ভেবেছি—ছুটি নিয়ে হয়তো ঘরে আছে।

—না, না। ঘরে নেই।

বলেই মুক্তি কাঁদতে আরম্ভ করল। ভঞ্জু বেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলল—থামো, থামো। আমি দেখছি।

ভঞ্জু বেরা বাসস্ট্যান্ডের দিকে তাকাল। সুদীপ যে বাসটা চালায়, লোকজন তুলে এবার ছাড়বে-ছাড়বে করছে। বাসের কন্ডাক্টার চিৎকার করছে—চলে আসুন, চলে আসুন। মেথুলিবাড় ছেড়ে যাচ্ছে।

কন্ডাক্টারের নাম—বিষ্টু। ভঞ্জু বেরা ভালই চেনে। ডাকল—এই বিষ্টু শোন।

ছুটে এসে বিষ্টু বলল—তাড়াতাড়ি বলো ভঞ্জুদা। বাস ছেড়ে দেবে।

—তোদের বাস কে চালাচ্ছে?

—আজ তিনদিন তো ভবোদাই চালাচ্ছে।

—সুদীপ তাহলে কোথায়?

—আর বলো কেন। সেই মাগীটাকে নিয়ে দীঘা গেছে।

বলেই বিষ্টু ছুটে বাসের কাছে গিয়ে আবার চেঁচাতে থাকে— মেথুলিবাড়, মেথুলিবাড়। ছেড়ে গেল, ছেড়ে গেল।

ভঞ্জু বেরা খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। ব্যাপারটা এইরকম হয়ে যাবে, সে ভাবতে পারেনি। মুক্তিকে বলল—বৌমা, তুমি এখন বাড়ি চলে যাও। ছেলে-ছোকরারা যেমন বেড়াতে যায় আর কী। ও ফিরলেই পাঠিয়ে দেব। তুমি একদম ভেবো না।

—কাকাবাবু! ছেলেটা ও-সব কী বলে গেল।

—ছাড়ো তো! সব কথায় কান দিতে নেই। তুমি এখন বাড়ি যাও মা।

—কাকাবাবু, আপনার নিজের মেয়ে হ'লে এই কথাটা আপনি বলতে পারতেন?

ভঞ্জু বেরা ভাবল—আর কোনো ভাবেই চাপা দেওয়া যাবে না। সত্যি তো! কোনো স্ত্রী-ই তার স্বামীর ব্যভিচারকে মেনে নিতে পারে না। মুক্তি তো তার

মেয়ের মতোই। প্রথম দেখাতেই তাই কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। বারবার রুম্পার কথা মনে পড়ে। কত জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিলাম। একটাই মেয়ে। জামাই-ও খুব ভালো। তবুও কেমন করে সব তছনছ হয়ে গেল।

ভঞ্জু বেরা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেদিনের সেই দৃশ্য।

প্রসববেদনা নিয়ে রুম্পা হাসপাতালে ভর্তি হল। জামাই ভর্তি করেই খবর পাঠিয়েছিল। কালবিলম্ব না করে ভঞ্জু বেরা হাসপাতালে ছুটে গেল। বেডের ওপর রুম্পা তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। জামাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—ডাক্তার কী বলছে।

—ডাক্তার বললেন, চেষ্টা করছি। রোগীর কন্ডিশান খুব সিরিয়াস।

—না, না। আর এক মুহূর্ত দেরি কোরো না। এক্ষুনি ছুটি লিখিয়ে নাও। ওকে "সিস্টার নার্সিংহোমে" নিয়ে যাব।

"সিস্টার নার্সিংহোম"—এলাকায় সবচেয়ে নামকরা। ভাল-ভাল ডাক্তারও আছে। হাসপাতাল থেকে যখন রুম্পাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল, শুধু অসহায় কাতর দৃষ্টিতে বাবার হাত ধরে রুম্পা কয়েকটা কথা বলেছিল—আমি আর বাঁচব না বাবা।

ভঞ্জু বেরা চোখের জল আর ধরে রাখতে পারেনি। মেয়ের হাত দুটো ধরে শুধু কেঁদেছিল। কাঁদতে-কাঁদতেই বলেছিল—ভয় কী মা। আমরা তো আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুটা ঠিক হলেও সবটা ঠিক হল না। ডাক্তারবাবুদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সন্তানের জন্ম দিয়েই রুম্পা দেহ রাখল।

ভঞ্জু বেরাকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুক্তি বলল—কী হল কাকাবাবু! কিছু বলছেন না?

—হ্যাঁ মা, বলব। মেয়ের কথাই যখন তুললে, তখন আর লুকোব না। ছেলেটার স্বভাব-চরিত্র একদম ভাল নয় মা। মদ খায়। নষ্ট মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে। জুয়া খেলে। কী আর বলব! নিজের কানেই তো শুনলে। আমি কত বোঝাই। শোনে না। আচ্ছা মা, বিয়ের আগে কী তোমরা কোনো খোঁজখবর নাওনি। তোমার মা-বাবা নেই শুনেছি। দিদি-জামাইবাবু যে তোমাকে এত ভালবাসে, তারাও একটু খোঁজখবর করল না। তাহলে তোমার কপালটা এইভাবে পুড়ত না।

—দিদি-জামাইবাবুর কোনো দোষ নেই, কাকাবাবু। আমিই ওদের ওপর জোর করে আমার মতটা চাপিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বাপ-মা মরা ছেলে। কষ্ট করেই মানুষ হয়েছে। আর যাই হোক, খারাপ পথে যাবে না।

—দ্যাখো মা, আমরা তো পারিনি। তুমি যদি ওকে ফেরাতে পারো।

—আচ্ছা কাকাবাবু, আমি এখন আসি।

—হ্যাঁ মা, এসো।

মুক্তি বাড়ি ফিরে আসে।

এদিকে সেদিন-ই সন্ধের সময় সুদীপ চৈতন্যগঞ্জে ফিরল। দীঘায় ফুর্তি করে পকেট গড়ের মাঠ। তাই ভাবল, আজ আর বাড়ি যাবে না। গেলেই তো পয়সা চাই। তার চেয়ে কাল কাজ করে পয়সা নিয়ে তবে যাবে। হাতে পয়সা তুলে দিলেই মেয়েমানুষরা চুপ করে যায়। কোথায় ছিলাম, কেন ছিলাম—ওসব বেমালুম ভুলে যাবে। বরং সোহাগে গদগদ হয়ে ভালবাসার ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দেবে। ওই জাতটাকে সুদীপ ভালভাবেই চেনে। সে নাহয় হলো! কিন্তু লাস্ট-ট্রিপ নিয়ে বাস আসতে তো এগারোটা বেজে যাবে। এই সবে সাতটা। এই চারঘন্টা কাটবে কী করে? হ্যাঁ, নন্দাইবাজারে অনেকদিন যাওয়া হয়নি। ফুলকলি খুব খাসা জিনিস। তবে পয়সার কামড় বড্ড বেশি। রোজ সামর্থ্যে কুলোয় না। তাই তো পদ্মমণিকে ধরতে হল। হাতে যাই হোক কিছু দিলেও হ'লো। আবার বায়না কত! আমাকে বিয়ে করবে তো? পদ্মমণি আমার বিয়ের কথাটা যদি জানতিস! দেখে আয় বিয়ে করা বৌ চারদিন নিঢাল উপোস থেকে কেমন কৃষ্ণনাম জপছে।

চৈতন্যগঞ্জের কিছুটা দূরেই মাঠের ধারে একটা ছোট্ট বস্তি—নন্দাইবাজার। নিষিদ্ধ এলাকা। ভদ্রলোকেরা ভুলেও কেউ ও দিকে পা বাড়াবে না। যত ড্রাইভার, কন্ডাক্টার, খালাসি, ট্রলিওয়ালা, রিক্সাওয়ালাদের স্বর্গরাজ্য।

পায়ে-পায়ে সুদীপ ফুলকলির ঘরের সামনে এল। ঘরের মধ্যে ফুলকলি আর কুসুমকণা গল্প করছিল। সুদীপকে দেখতে পেয়েই কুসুম বলল—দ্যাখলো, তোর নাগর অনেকদিন পর এল। আমি এখন যাই।

—শোনো না?

তারপর কুসুমকণার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফুলকলি বলল—নাগর নাকি আবার বিয়ে করেছে।

—ছাড় তো ওদের বিয়ে। বৌকে ওরা আবার ভালবাসতে জানে নাকি?

—সে তো আমাদেরই মঙ্গল গো। বৌয়ের কাছে পড়ে থাকলে, আমাদের কী হত! না খেয়ে মরতে হত যে।

—তা যা বলেছিস।

কথাটা বলে হাসতে-হাসতে কুসুমকণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফুলকলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—এসো। দাঁড়িয়ে রইলে যে। লজ্জা পাচ্ছ বুঝি। নতুন বৌ পেয়ে তো আমাদের একেবারে ভুলেই গ্যাছো।

—না রে, ভুলিনি। তোদেরকে কী ভোলা যায়!

—তবু ভালো। মনে রেখেছ। এসো, ভেতরে এসো।

সুদীপ ভেতরে গিয়ে বসলো। বলল—নে, মদ ঢাল।

ফুলকলি গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল আর সুদীপ খেতে লাগল।

নেশাটা যখন বেশ জমে উঠেছে, ফুলকলি বলল—বিয়ে তো করলে। এবার বলো তো, বৌ না আমরা—কার ভালবাসা বেশি।

—তোদের। তোদের ভালবাসা বেশি। বৌয়ের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়া যায় না। পাওয়া যায়—সংসার আর সন্তান। আসলে কী জানিস। বৌ হল কাচের পুতুল। সাবধানে নাড়াচাড়া করো, পড়ে গেলেই ঠুস। আর তোরা হচ্ছিস লোহার পুতুল। যেমন খুশি ব্যবহার করা যায়। মচকাবিও না, ভাঙবিও না। সব সময়ই তাজা।

—তাহলে বিয়ে করলে কেন?

—করলাম নয়। করতে হল। দিনকে দিন ভালবাসার দাম তোরা যা বাড়াচ্ছিস, সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না। তাই অসময়ের জন্যে বিনা পয়সার একটা বিকল্প ব্যবস্থা।

এমন সময় ভবতোষ নন্দাইবাজারে ঢুকল। ফুলকলির ঘরের পরেই আনারকালির ঘর। ফুলকলির ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সুদীপকে দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল—কীরে সুদীপ, বৌয়ের ঝাঁটা খেয়ে পালিয়ে এলি তো!

জোর করে চোখ দুটোকে টেনে তাকিয়ে সুদীপ বলল—ভবোদা!

তারপর টলতে-টলতে বেরিয়ে এসে বলল—বৌ, না কী যেন বলছিলে?

—হ্যাঁ। বলছিলাম, বৌ ঝাঁটা মেরেছে তো?

—কেন? বৌ ঝাঁটা মারবে কেন? আমি, কী অন্যায় করেছি?

—আজ সকালে চৈতন্যগঞ্জে এসে তোর বৌ, তোর সব কীর্তিকলাপ জেনে গেছে। তাই বলছিলাম আর কী!

—জেনে গেছে তো কী হয়েছে। আমি কী কাউকে ভয় করি নাকি? কী করবে? আমি এক্ষুনি যাব। দেখি, কে কাকে ঝাঁটা মারে।

বলতে-বলতে টলতে-টলতে ফুলকলির ঘর থেকে নেমে সুদীপ বাড়ির পথ ধরল।

মুক্তি সারাদিন কিছু খেতে পারলো না। গলায় সব কাঁটার মতো আটকায়। যা শুনে এল! কী করবে এখন। চোখের জল আর বাধ মানে না। তার কপালে এই ছিল। সে তো বেশি কিছু চায়নি। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করতে

চেয়েছিল। এত কষ্টের মধ্যেও সেই আশাতেই বুক বেঁধে রেখেছিল। আজ সেই আশাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মুক্তি ঠাকুরের পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। কেন ভগবান! তোমার কাছে কী এমন অন্যায় করেছি। আমাকে এত বড় শাস্তি দিলে, আমার শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিলে। আমার আর কী রইল ঠাকুর। কী নিয়ে বেঁচে থাকব। কিসের জন্যে বেঁচে থাকবো। আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না, ঠাকুর! আমাকে মৃত্যু দাও ঠাকুর। আর আমি তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না।

ঠাকুরের সামনে বসে মুক্তি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ-ই ঘরের মধ্যে যেন একটা "মা" ডাক ভেসে বেড়াতে লাগল। মুক্তি খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। মাতৃত্বের আহ্বান তাকে বিচলিত করে তুলল। তার চোয়াল শক্ত হল। রঙিন স্বপ্নে চোখ চিকচিক করে উঠল। উঠে দাঁড়াল—না, তাকে বাঁচতেই হবে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেই তাকে বাঁচতে হবে, তার সন্তানের জন্যে। যে আসছে, তাকে সুস্থ-সবল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তার-ই। সে এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। নিজের সুখের জন্য সন্তানকে বলি দিতে পারে না। এক অনাগত সুখের স্মৃতিতে মুক্তি বিভোর হয়ে গেল।

এমন সময় বাইরে দরজায় ঠকঠক করে আওয়াজ উঠল। মুক্তি সচকিত হল। ভয়ে-ভয়ে বলল—কে?

জড়িয়ে-জড়িয়ে সুদীপ বললো—আমি।

সুদীপের গলা চিনতে মুক্তির ভুল হল না। কিন্তু কথাগুলো যেন কেমন-কেমন লাগল। মুক্তি ঘরের দরজা খুলে দিল। সুদীপ টলতে-টলতে ঘরে ঢুকল। মুক্তি বুঝতে পারল, সুদীপ মদ খেয়েছে। দেখেই তার গা-হাত রি-রি করে উঠল। বলল—তুমি আবার মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি। নিজের পয়সায় খেয়েছি। তোর সোহাগী দিদির পয়সায় তো খাইনি।

—তোমার এত অধঃপতন হয়েছে। কথাগুলো বলতে তোমার লজ্জা করছে না।

—কীসের লজ্জা। পুরুষ মানুষ হয়েছি, মদ খাই। মেয়েদের মতো হাতে চুড়ি তো পরে থাকিনি।

মুক্তি গর্জে উঠল—পুরুষ মানুষ? স্ত্রীকে দুবেলা খেতে দিতে পারো না, শুতে দিতে পারো না, সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করার ক্ষমতা নেই—তুমি আবার পুরুষ মানুষের বড়াই করছ। ছিঃ। তুমি পুরুষ জাতের কলঙ্ক!

—বেশি বড়-বড় কথা বলবি না। মেরে মুখ ভেঙে দেব।

—হ্যাঁ, মারবেই তো, মারবে না! আজ তিনদিন আমি তোমার চিন্তায় ছটফট

করছি। আর তুমি! দীঘায় মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করছ। তোমার সব চরিত্র আমার জানা হয়ে গেছে।

—বেশ করেছি। আমার যা ইচ্ছা, আমি তাই করব। কোনো শালা আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। তুই তো সামান্য একটা মেয়ে। যা, যা, যা পারিস করে নিবি।

—হ্যাঁ, করব তো। আমি পাঁচজনকে জানাব। তোমার মুখোশ আমি খুলে দেব।

—তোর এত বড় স্পর্ধা। পাঁচজনকে জানাবি। আমার মুখোশ খুলে দিবি। তবে রে শালী!

কথাগুলো বলে সুদীপ খুব জোরে একটা চড় কষিয়ে দিল মুক্তির গালে। তিনদিন না-খেয়ে, না-ঘুমিয়ে, চিন্তায়-চিন্তায় মুক্তির শরীর এমনিতেই দুর্বল ছিল। এই চড়, সে আর সহ্য করতে পারল না। মাথা ঘুরতে লাগল। চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। আছাড় খেয়ে পড়লো ঘরের চৌকাঠের ওপর। পেটে একটা শুধু অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলো। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, মুক্তি দেখল হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। ভাবতে চেষ্টা করল—কী হয়েছে। মনে পড়ল রাতের ঘটনা। সুদীপ চড় মারতেই সে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে কেন? নার্সকে ডাকল—সিস্টার, সিস্টার।

সিস্টার কাছে আসতেই মুক্তি জিজ্ঞাসা করল—সিস্টার আমার কী হয়েছে! আমি হাসপাতালে কেন?

—আপনি কাল জল আনতে গিয়ে বালতি নিয়ে ঘাটে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন। আপনার স্বামী আপনাকে ভর্তি করে দিয়ে গেছে। বারো ঘণ্টা পরে আপনার এই জ্ঞান ফিরল। এখন আর কোনো ভয় নেই। মুক্তি বেডের ওপর উঠে বসার চেষ্টা করলো। নার্স ধরে শুইয়ে দিয়ে বলল—আপনি ম্যাডাম, এখন বেশি নড়াচড়া করবেন না। এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। দিন তিনেক থাকতে হবে।

নার্সের হাতদুটো ধরে মুক্তি বলল—সিস্টার, আমার সন্তান ঠিক আছে তো?

মুক্তির মাথায় হাত বুলিয়ে নার্স বলল—ওসব নিয়ে এখন আর ভাববেন না ম্যাডাম। আগে নিজে সুস্থ হোন।

—বলুন না, সিস্টার! আমার সন্তানের কোনো ক্ষতি হয়নি তো?

—স্যরি, ম্যাডাম। পেটে জোর আঘাত লাগার ফলে আপনার সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে।

—সিস্টার!

মুক্তি জোরে শুধু একটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর নিষ্পলকে চেয়ে

রইল নার্সের দিকে। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

সান্ত্বনা দিয়ে নার্স বলল—ম্যাডাম, এত উতলা হবেন না। এটা একটা ভবিতব্য-ই বলতে পারেন। ভগবানের ওপর কারো হাত নেই। তবে, আপনার স্বামী খুব ভাল। ভদ্রলোক সারা রাত হাসপাতালের মাঠে বসেছিলেন। আপনি চোখ বোজান। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে।

সব ঠিক-ই হয়ে গেল। মুক্তি ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। বাড়িও চলে এল। কিন্তু একটা শূন্যতা তৈরি হল। মন থেকে ওই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। সুদীপকে দেখলেই মুক্তি শিউরে ওঠে। মনে হয়ও একটা খুনি। তার সন্তানকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। তার সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে। ওকে ক্ষমা করা যায় না। ও ক্ষমার অযোগ্য। দিদি-জামাইবাবুকে সব বলবে। আর তখনই মুক্তি কেমন নিস্তেজ হয়ে যায়। দিদি-জামাইবাবু শুনলে তাকে এখানে আর রাখবেই না। সেটা মুক্তি কখনই চায় না। তাই তো সে শত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও এখানে পড়ে আছে। দিদিকে কিছু জানায়নি। কোনোভাবেই সে আর দিদির বোঝা হতে রাজি নয়। মরতে হয়, এখানেই মরবে।

সুদীপও ওই ঘটনায় প্রথমটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যদি, ও দিদি-জামাইবাবুকে বলে দেয়। তারা তো ছাড়বে না। থানা-পুলিশ করবে। শেষকালে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। তাই নানাভাবে মুক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল। সুদীপের চাতুরি মুক্তি বুঝতে পারলো না। ভাবলো—কী আর হবে। যা হবার তো হয়েই গেছে। মানুষ ভুল থেকেই শিক্ষা নেয়। ও হয়তো ওর ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই অতীতকে মুছে দিয়ে মুক্তি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

তার স্বপ্ন যে, শুধুই স্বপ্ন—কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি সেটা টের পেল। সুদীপ আবার আগের মতোই আচরণ শুরু করলো। প্রায় রাত্রেই বাড়ি আসে না। আবার যখন আসে, মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে। কিছু বললেই মারতে যায়, ধরতে যায়। মুক্তির এসব এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। বলা ভাল—সইয়ে নিতে হয়েছে। স্বামীকে ঘিরেই তার বেঁচে থাকা। স্বামীর সংসার-ই তার অস্তিত্ব। নিজের অস্তিত্ব খুইয়ে কারও অনুগ্রহে সে বাঁচতে চায় না। মুক্তি বুঝতে পারে—তার চলে যাওয়াটাই সুদীপের এখন কাম্য। কিন্তু সে যাবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। তার শেষ সে দেখতে চায়।

কিন্তু মুক্তির এখন অন্য চিন্তা। দিদিকে অনেকদিন কোনো খবর দেওয়া হয়নি। দিদি বলেছিল—সাত মাস হলে খবর দিস। অনেক নিয়ম-কানুন আছে, করতে হবে। সাত মাস তো পার হয়ে গেল। কোনো খবর না পেলে, দিদি হয়তো চলেই আসবে। আর তখনই সব জেনে যাবে। পাড়ার তো সবাই জেনে

গেছে। কেউ না কেউ দিদির কানে ঠিক তুলে দেবে। তাদের আর দোষ কী! দুদিন ছাড়াই চিৎকার-চেঁচামেচি তো তারা শুনছে।

তার চেয়ে দিদির কাছে একবার যাওয়াই ভাল। দিদি হয়তো ভাবছে—স্বামী-সংসার পেয়ে তাদের ভুলে গেছে। কিন্তু গিয়ে বলবেটা কী! সাত-পাঁচ ভেবে, মনস্থির করে একদিন সকালে মুক্তি দিদির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

সকাল দশটা। সহেলী স্কুলে বেরুচ্ছে। মুক্তিকে দেখতে পেয়েই হাঁকডাক শুরু করে দিল—মা, ওমা। দ্যাখো, মাসি এসেছে। ও মাসিমণি, তুমি একা কেন? মেসোমশায়কে আনতে পারলে না।

—তুই স্কুল যাচ্ছিস। বাবা! শাড়ী পরতে তোকে কী বড় লাগছে।

মালিনী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—দিদিকে একদম ভুলেই গেলি, এ্যাঁ? একটা খবরও দিতে নেই? ক'দিন তো তোর জামাইবাবু প্রায়-ই বলে—মুক্তির তো কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি একদিন যাও না।

—জানি, তোমরা এই কথাই বলবে। কিন্তু কী করি বলো!

—তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। উঠোনে দাঁড়িয় না থেকে ঘরে আয়।

—মা আসছি। মাসিমণি বিকেলে এসে গল্প করব।

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ফিরিস। আমাকে আবার বাড়ি যেতে হবে।

—আচ্ছা।

সহেলী স্কুল চলে গেল, মুক্তি ঘরে ঢুকে বললে—সহেলী আজ কাপড় পড়েছে কেন গো?

—দ্যাখ না। স্কুলের স্পোর্টস আছে। খুব বড় লাগছে, না?

—আমি সেই কথাই তো বলছিলাম।

আলনা থেকে একটা কাপড় দিয়ে মালিনী বলল—নে, কাপড়টা এবার ছেড়ে ফ্যাল। ভাত খেয়ে নে। তারপর দুপুরে জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, সংসারের কাজকর্ম করে দু'বোনে শুয়ে-শুয়ে গল্প করতে লাগল। মুক্তি এ-কথা, সে-কথা, তুলে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল। মালিনী বলল—ছাড়তো ও-সব। এবার তোর কথা বল? সাতমাস তো হল! আমি তো খুব চিন্তায় ছিলাম। তুই এলি বলে তাই! নাহলে আমিই যেতাম। আচ্ছা তোর কী আক্কেল বলতো! তোকে অত ক'রে বলে এলাম একটা খবর দিস। শ্বশুরবাড়ির তো কেউ নেই! আমাকেই তো সব করতে হবে। সুদীপকেও কতদিন দেখিনি। তাকেও তো আনতে পারতিস? সে কী ভাবছে বলতো! দিদি আর বোনের খোঁজখবর নেয় না। তুই এটা একদম-ই ঠিক করিসনি।

—না গো, সে কিচ্ছু ভাবেনি। দিদির কথায় একেবারে গদগদ। একবার

যদি বলেছি, দিদিও তো আসতে পারে? আর যায় কোথায়! তুমি একদম বাজে বোকো না। দিদির সময় কোথায়। সহেলীর স্কুল আছে, টিউশনি আছে। এসব ছেড়ে দিদি আসবে কী করে। তোমারই একবার যাওয়া উচিত। তোমার সাত-জন্মের পুণ্য ছিল। তাই অমন দিদি পেয়েছ।

এই দ্যাখো না। আজ তো তোমার জামাই-ই জোর করে পাঠাল। নাহলে আমি তো ভেবেছিলাম রবিবার দেখে আসব। জামাইবাবুর সঙ্গেও দেখা হবে। শুনল কী? বলে—তোমার আর রবিবার কোনোদিনও হবে না। চলো, আজ-ই বেরিয়ে পড়ো। তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে তবে আমি গাড়ি ধরব।

—ঠিকই করেছে। নাহলে তোর আর সময় হত না। আর আমি এখানে চিন্তা করে মরতাম।

—জানো দিদি! ও এখন খুব ভালো হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত ঘরে থাকে না। কাজ, কাজ, আর কাজ! আমি রেগে গিয়ে বলি—তোমার কী একদিনও ছুটি নেই! রোজ-ই কাজ। ও কী বলে জানো?

—কী বলে?

—বলে, কাজ না করলে হবে! ঘর একটা আমাকে বানাতেই হবে। মুখ দেখেই বুঝেছি, এই ঘর দেখে দিদি সন্তুষ্ট নয়। দিদির মুখে আমি হাসি ফোটাবই। এই তো মাসখানেক আগে চৈতন্যগঞ্জে বাসস্ট্যান্ডের পাশে তিনকাঠা জায়গা কিনবে বলে তিরিশ হাজার টাকা বায়না দিয়ে বসে আছে। এক বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রি করতে হবে। তাই দিনরাত খেটে চলেছে। আমার কষ্ট হয় না! বলো দিদি?

—কী করবে বল! সব তো তোর জন্যেই করছে। সত্যি, ছেলেটা খুব ভাল। প্রথমে ভেবেছিলাম—গাড়ি চালায়। হয়তো মদ-মাতালে হবে। সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু তা তো নয়। তোকে তো খুব ভালবাসে।

—আর ওই জন্যেই তো আমার খুব কষ্ট হয়। আমার সুখের জন্য একজন মুখের রক্ত তুলে খাটবে। আর আমি বসে-বসে দেখব। স্ত্রী হিসাবে কী আমার কিছুই করার নেই! তাই তো সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিলাম।

মালিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কী সিদ্ধান্ত নিলি!

—বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিলাম।

—কী বলছিস মুক্তি! সুদীপও রাজি হল?

—না। সে রাজি হয়নি। রাগে আমরা সঙ্গে একমাস কথা বলেনি। কী করব বলো! ভাবলাম—লোকটা ঘরের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। এই সময় ওর পাশে দাঁড়ানো দরকার। নতুন করে আর কোনো বিপদ ডেকে আনা ঠিক নয়। মানুষ তো! কত আর সইতে পারবে। শেষকালে কী স্বামীকেই হারাবো। সন্তান গেলে আবার সন্তান আসবে। কিন্তু স্বামী হারালে আমি কোথায় গিয়ে

দাঁড়াব, বলো দিদি!

মুক্তি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে মালিনী বললো—দ্যাখ্ আমি আর কী বলবো, বল? তোরা বড় হয়েছিস। ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছিস। তারপর, তুই যে কোনো খারাপ কাজ করতে পারিস না, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। ঠিকই তো! স্বামীই মেয়েদের একমাত্র সম্বল। সব কিছু হারানো যায়—কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই স্বামীকে হারানো যায় না। তুই কোনো ভুল করিসনি।

তারপর বোনকে জড়িয়ে ধরে আদর করে মালিনী বলল—চুপ কর। স্বামীকে তো এত ভালবাসিস! কাঁদলে স্বামীর অমঙ্গল হবে না!

চোখ মুছতে-মুছতে মুক্তি বলল—তুমি জামাইবাবুকে একটু বুঝিয়ে বোলো। আমাদের ভুল না বোঝে।

—সে তোকে অত ভাবতে হবে না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

—ও আরো কী বলে, জানো?

—আবার কী বলে?

—তোমাকে কী বলব, সেই লজ্জাতেই তো আমি আসতে চাইছিলাম না। ও বলল—দোষ করেছ, স্বীকার করতে এত লজ্জা কেন! দিদির কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার ক'রে নাও। দেখবে; দিদি তোমাকে আশীর্বাদ-ই করবেন। নাহলে দিদি এসে যখন সব জানতে পারবেন, মনে খুব কষ্ট পাবেন। আমাদের ওপর অবিশ্বাস জন্মাবে। আমরা দিদির ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব।

—সুদীপ আমাদের এত শ্রদ্ধা করে!

—শুধু তাই! আসার সময় বারবার বলে দিয়েছে,—জায়গা কেনার কথা দিদিকে এখন একদম শোনাবে না। ঘর ফিনিশ করে দিদিকে নিয়ে এসে একেবারে চমকে দেব! একটা বছর তো, কোথা দিয়ে কেটে যাবে।

—সত্যি! ছেলেটার জেদ আছে বলতে হবে। তোর কপালটা খুব ভাল রে। তোর কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!

গল্প করতে-করতে বিকেল হল। মালিনী বলল—তুই তো আবার যাবি। নে, কাপড় পড়ে নে।

—দিদি, কই সহেলী তো এখনও এল না।

—সময় হয়ে গেছে। তুই কাপড় পরতে-পরতেই এসে যাবে।

মুক্তি যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগল। সহেলী বাড়ি ফিরেই মুক্তিকে বলল—মাসিমণি, এক্ষুনি চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁরে মানা। অতখানি যেতে হবে। তোর মেসোমশায় তো আবার আমার জন্যে বাসস্ট্যান্ডে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে থাকবে, না?

—মেসোমশায়কে বলে দেবে, আসেনি বলে আমি খুব রাগ করেছি। কথাই বলবানা।

—না সোনা, রাগ করতে নেই। মেসোমশায় তোমাকে কত ভালবাসে!

—ছাই ভালবাসে। তাহলে একবার অন্তত আসত।

এবার মালিনী বলল—মেসোমশায় গুরুজন। ওকথা বলতে নেই। তারপর দ্যাখ না! এক বছরের মধ্যেই মাসির নতুন ঘর হচ্ছে। তখন তো আমরা সবাই যাব। থাকব, খাব, বেড়াব—খুব মজা হবে।

—মাসিমণি, তাই!

—হ্যারে। তোর মেসোমশাই ঘর করে তবে এখানে আসবে। এখন আসি! দিদি, আসছি গো।

—হ্যাঁ, আয়। সাবধানে যাস্।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তি বাড়ী ফিরে এলো।

সতী-সাধ্বী দেশের মেয়ে। বাবার মুখে স্বামীর নিন্দে শুনে অপমানে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। সেই ধারা আজও বর্ত্তমান। মেয়েরা সব সহ্য করতে পারে। কিন্তু স্বামীর অপমান! নৈব নৈব চ । কখনই না। মেয়েদের এ এক অদ্ভুত সহনশীলতা। মারুক, ধরুক—যা পারে করুক। তবুও তো স্বামী। স্বামীর হাতে মরাও নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। তাই শেষমেশ ভ্যাগের উপর-ই মুক্তি ভরসা রাখল। দিদিকে সব সত্যি কথা বলবে, মনস্থির করেও—তা পারল না। শুধুমাত্র স্বামীর অসম্মানের কথা ভেবে। বানানো গল্প শুনে দিদির চোখে-মুখে যে তৃপ্তির ছবি মুক্তি দেখেছে—তাতেই তার সব কষ্ট মুছে গেছে। নিজের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে, সহ্য করেও চলেছে কিন্তু দিদির কোনো কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে না। দিদি মায়ের মতো। মায়ের স্নেহ-মমতায় কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে। মায়ের হাসিমুখ দেখলেই সন্তানের সুখ। কিন্তু দিদি যদি সত্যি কথাটা জানত, যদি জানত কী দুর্বিষহ দহন যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে তাহলে দিদি কান্নায় ভেঙে পড়ত। আর সেই কান্না শক্তিসেলের মতো মুক্তির বুককে ভেঙে খানখান করে দিত। ভালই হয়েছে। দিদি জানল বোন সুখেই আছে। বোন জানল—দিদিকে সুখ দিতে গিয়ে সমস্ত দুঃখকেই সে বাজি ধরেছে। স্নায়ুযুদ্ধে মুক্তি আজ জয়ী। কিন্তু এই জয়কে ধরে রাখতেও তাকে যে আরও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে—মুক্তি সেটা জানে।

তবে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। কয়েকদিনের মধ্যেই এক নির্মম পরীক্ষার মুক্তিকে অবতীর্ণ হতে হল। সেদিন রাত্রে মুক্তি শুয়ে আছে। সুদীপ না থাকলে আর রান্না করে না। খুব খিদে পেলে দুটো মুড়ি খায়। কোনোদিন আবার

তাও খায় না। সুদীপ রাত্রে বাড়ি এলে রান্না করে। অধিকাংশ দিন-ই জেগে থাকতে-থাকতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কখন ঘুমিয়ে পড়ে, কে জানে! পাখির কিচির-মিচির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আকাশ ফর্সা হয়েছে। ভরসা করে চোখ ফেরায় পাশে। সুদীপ আসেনি। প্রথম-প্রথম খুব কাঁদত। মন খারাপ করত। ভগবানকে জানাত। এখন আর সে-সব করে না। শূন্যতার মাঝে থেকে-থেকে পূর্ণতা শব্দটাই সে ভুলে গেছে। জীবনটাই তখন তার কাছে অর্থহীন। নিঃশব্দ প্রহর গুনে-গুনে শুধু কাল কাটানো। সেদিনও এইভাবেই কাল কাটছিল। হঠাৎ রাত্রি দশটার সময় সুদীপের আবির্ভাব। সঙ্গে পদ্মমণি। ঘরে ঢুকেই মুক্তিকে বলল—এই ওঠ। দু'কাপ আগে চা করে দে। তারপর ডিমের ঝোল আর ভাত রাঁধ। এই যে, ডিমদুটো ধর। পদ্মমণি খাবে। আমার দূর সম্পর্কের মামাতো বোন।

ডিমদুটো নিয়ে মুক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। স্টোভ জ্বেলে চা বসাল। ডুবে গেল ভাবনায়। মামাতো বোন আছে বলে তো কোনোদিন শুনিনি। বরাবরই ব'লে এসেছে, কেউ নেই। তাহলে, চোখ চলে গেল ডিমের ওপর। দুটো ডিম এনেছে। ওরা খাবে। আমি কী কেউ নয়। খেয়েছি কিনা একবার জিজ্ঞাসাও করল না। ঘরে যে আর একটা মানুষ আছে—মনেও পড়ল না। কেন গো! আমি যে তোমার জন্যেই বেঁচে আছি। তোমার জন্যেই দিনের পর দিন না খেয়ে বসে থাকি। আমারও তো ইচ্ছা হয়—স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাব। আমি কী এমন অন্যায় করেছি। তোমার সব অন্যায়ই তো আমি মুখ বুজে সহ্য করছি। তোমার সম্মানের কথা ভেবেই দিদির কাছে মিথ্যে কথা বলে এলাম। সন্তান হারানোর যন্ত্রণাকে আমি দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছি। তারপরেও বাইরের একটা মেয়ের কাছে আমাকে এভাবে অপমান করবে। তার চেয়ে তো আমাকে একেবারে মেরে ফেলতে পারো।

দুঃখে, অপমানে মুক্তি কাঁদতে লাগল। হঠাৎ-ই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা শব্দে মুক্তি কানখাড়া করে রইলে।

—সুদীপদা, ঘরে যে তোমার বউ আছে, কোনোদিন তো বলোনি।

—দূর। ও আবার বৌ নাকি?

—কে তাহলে?

—ওই আর কী। তুই না থাকলে, অসময়ের সঙ্গী। তুই ঘরে এলেই ওকে দূর ক'রে দেব।

—না। আগে ওর ব্যবস্থা করো। তারপর আমরা বিয়ে করব।

—আমাকে একটু সময় দে। ওর বন্দোবস্ত করছি।

—এত রাত্রে আমি এখন কোথায় যাব বলো তো?

—কোথায় যাবি। আমার কাছেই থাকবি।

—ডাইনিটাতো থাকবে। ও কোথায় শোবে?

—বাইরে পড়ে থাকবে। আমাদের পাহারা দেবে। পদ্মমণি! তু-ই আমার মনের মানুষ, তোকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

—আঃ, শুধু বদমায়েশি। এখন ছাড়ো। ডাইনীটা এখুনি এসে পড়বে।

শব্দগুলো মুক্তির কানে যেন বিষ ঢেলে দিল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় চোখ বুজে ঘন-ঘন ঢোঁক গিলতে লাগল। স্টোভের আওয়াজ ছাপিয়ে কথাটা তার চারপাশে বারবার ধরতে লাগলো—আঃ, শুধু বদমায়েশি। এখন ছাড়ো, ডাইনিটা এক্ষুনি এসে পড়বে।

নিঃসঙ্গ মনের অন্তর্নিহিত বেদনায় মুক্তি অসহায়ের মতো কেঁদে চলল। নিষ্পলক দৃষ্টিকে আঁচলে ঢেকে অন্তরের গভীর থেকে একটা শুধু অস্ফুট হাহাকার বেরিয়ে এল—দিদি!

ঘরের ভেতর থেকে সুদীপের গলা ভেসে এল—কী করছিসটা কী? এত দেরি হচ্ছে কেন?

মুক্তি চোখমুখ ভাল করে মুছে দুকাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। চা হাতে নিয়েই পদ্মমণি বলে উঠল—যা, ঝোলটা একটু ঘন করিস। আমি আবার ঝাল খেতে পারি না। লংকাগুঁড়োটা একটু কম দিস।

পদ্মমণির দিকে একবার তাকিয়ে মুক্তি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে শুনতে পেল, পদ্মমণি বলছে—বাবা, ডাইনিটা যেভাবে তাকাল যেন এখুনি আমাকে গিলে ফেলবে।

সুদীপ বললো—তোকে কে গিলে খাবে জানি না। তবে তুই যে আমাকে গিলে খেয়েছিস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—উঁ, দুষ্টু কোথাকার।

বলেই পদ্মমণি হেসে উঠলো। সুদীপও হাসতে লাগল।

রান্না করে, দুজনকে খাইয়ে, এঁটো বাসনগুলো দোরে বসে মুক্তি ধুতে লাগল। এমন সময় দড়াম শব্দে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মুক্তি একবার ফিরে তাকাল। তারপর বাসন ধুয়ে দরজায় এসে ধাক্কা দিল—ঘর খোল। বাসনগুলো রাখব তো? ভেতর থেকেই সুদীপ বলল—বাইরে রেখে দে।

—আমি শোব কোথায়?

—দোরেই শুয়ে পড়। বেশি বিরক্ত করিস না। অভ্যেসটা তৈরি কর। ভবিষ্যতে কাজ দেবে।

মুক্তি আর কথা বাড়ালো না। জানে, কোনো লাভ নেই। হতবুদ্ধি হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাসনগুলো দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে

রেখে, দোরেই বসে পড়ল। গালে হাত দুটো রেখে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। চোখদুটো ভিজে গেল। এখন সে কী করবে। কোথায় যাবে। নারীত্বের এই অপমান সে কী মুখ বুজে মেনে নেবে। না, কক্ষনো না। সে বিচার চাইবে। বিচার? আর তখনই মুক্তি কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাহলে সবাইকে তো বলতে হবে স্বামীর ব্যভিচারের কথা। সবাই জানবে। হাসবে, বিদ্রুপ করবে। সে তো আরও অসহ্য। স্বামীর মান-সম্মান তো তার নিজেরও সম্মান। সম্মানহানি হলে, আর তার কী থাকবে। সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে। তা সে কখনো হতে দেবে না। পাঁচজনকে জানিয়েই বা লাভ কী? তারা ওপর থেকে একটা প্রলেপ দেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ভিতরের দগদগে ঘা সারাবার ক্ষমতা তাদের নেই। কারো দয়া-দাক্ষিণ্য সে চায় না। সে চায় একটু ভালবাসা। ভালবেসে বাঁচতে চায়। স্বামী, সন্তান নিয়ে। কিন্তু বিপথগামী স্বামীকে সে ফেরাবে কী করে। মুক্তি পারে, স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার ব্যভিচারের জবাব চাইতে। জবাব চাইতে পারে—তার প্রতি অবহেলা, উদাসীনতার। ভয়টা শুধু লোক জানাজানির। তাই বুক ফাটলেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। আজকের এই ঘটনার পরও তাই সে নিশ্চল পাথর। সে কারো কাছে যাবে না। কোথাও যাবে না। এখানেই পড়ে থাকবে। স্ত্রীর দাবি নিয়ে। স্ত্রীর অধিকার নিয়ে। নষ্টামির শেষ দেখে সে ছাড়বে। আজ যা করল, এর বেশি আর কী করবে। বড়জোর পদ্মমণিকে বিয়ে করবে। করুক। তবুও এক ইঞ্চি জমি সে ছাড়বে না। বাইরে পড়ে থাকলেও সে-ই সুদীপের অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রী। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে, সপ্তপাকের বন্ধনে মুক্তি স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে। সেই মর্যাদাকে সে হারাতে নারাজ। তাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তার কর্তব্য। বারবার সুদীপের সামনে থেকে সে মনে করিয়ে দিতে চায়—সে-ই তার স্ত্রী। ওই নষ্ট মেয়েটা নয়। ওরা শয্যাসঙ্গী হতে পারে, কারোর স্ত্রী হতে পারে না। দুরন্ত যৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে শুধু পয়সা লুটে নেওয়াই ওদের কাজ। পয়সাও শেষ, ওরাও উধাও। সুদীপ এটা একদিন বুঝতে পারবে। আর সেই দিনটার অপেক্ষাতেই সে থাকবে।

মুক্তি কান্নায় ভেঙে পড়ল—দিদি গো! দেখে যাও, তোমার মুক্তি কী সুখে আছে! কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্তি-আর অবসাদে মুক্তি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরবেলায় ওদের কথাবার্তায় মুক্তি জেগে উঠল। হাসতে-হাসতে, গায়ে ঢলাঢলি করতে-করতে ওরা চলে গেল।

এরপর পদ্মমণি প্রায়ই আসত সুদীপের সঙ্গে। রাত্রে থাকত আর ভোর হলেই চলে যেত। একদিন পদ্মমণি একাই এল। মুক্তি বলল—নাগর তো ঘরে নেই।

—নেই, এসে যাবে। তোর অত চিন্তা কেন?

কথা বলতে-বলতে পদ্মমণি ঘরে ঢুকতে যেতেই মুক্তি দরজার পথ আগলে দাঁড়াল। বলল—দাঁড়াও, তুমি কার ঘরে ঢুকছ?

—কেন, আমার ঘরে।

—তোমার ঘর মানে? জানো, আমি সুদীপের স্ত্রী? স্ত্রী হিসাবে এই ঘরের সম্পূর্ণ অধিকার শুধু আমার। আর কারো নয়।

—তুই সুদীপের স্ত্রী। মানে—বউ। তাহলে আমি কে? তুই যদি তার বউ, তাহলে বাইরে পড়ে থাকবি কেন? আর তোর চোখের সামনেই সুদীপের সঙ্গে আমি রাত কাটাবো কেন! কে কার বউ ভাল করে ভেবে দ্যাখ।

—চুপ কর, নষ্ট মেয়েমানুষ। ওকথা বলতে তোর মুখে আটকাচ্ছে না। মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের ঘর ভাঙছিস। তার সুখ-শান্তি কেড়ে নিচ্ছিস।

—আমি কেন তোর সুখ-শান্তি কেড়ে নেব? বরং তুই আমার সুখের পথে কাঁটা হয়ে বাধা দিচ্ছিস। তোর জন্যেই সুদীপ আমাকে বিয়ে করতে পারছে না। আর নষ্ট মেয়ে বলছিস? তুইও কী খুব ভাল মেয়ে? সুদীপ আমাকে সব বলেছে।

মুক্তি হিংস্র বাঘের মতো হয়ে গেলে। ঝাঁপিয়ে পড়ে, পদ্মমণির হাত ধরে টানতে-টানতে বলল—বল, ও তোকে কী বলেছে? তোকে বলতেই হবে। পদ্মমণি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—চোরের মায়ের আবার বড় গলা।

—হ্যাঁ, বড় গলা তো হবেই। তোর মতো আমি তো কারো ঘর ভাঙতে যাইনি?

—ঘর ভাঙতে যাসনি, ঠিকই। তবে যৌবনের ঘরে রঙ লাগাতে গিয়েছিলিস। সুদীপ আমাকে সব বলেছে। তুই তোর জামাইবাবুর সঙ্গে থাকতিস। তোর পেটের সন্তান সুদীপের ছিল না। তাই তোর মুখে আর যাই হোক—নষ্ট মেয়ের কথা মানায় না। চালুনি আবার ছুঁচের বিচারে নেমেছে। তোর লজ্জা থাক্।

মুক্তি স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাকরুদ্ধ হল। এই কথা শোনার আগে তার মরণ হল না কেন? আকাশ কেন ভেঙে পড়ল না। টর্নেডো-টাইফুনের মতো বাতাস কেন সব লণ্ডভণ্ড করে দিল না। যে জামাইবাবুকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে, তাকে নিয়ে এত অশ্লীল কথা বলার পরেও পদ্মমণির জিভ কেন খসে পড়ল না। ধর্ম বলে কী কিছু নেই! দুরন্ত আক্রোশে আর অপমানে সজোরে একটা ঠাস করে চড় মারল পদ্মমণির গালে।

আর ঠিক সেই সময়েই সুদীপ ঘরে এল। সুদীপকে দেখতে পেয়েই পদ্মমণি কান্না জুড়ে দিল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল—দ্যাখো সুদীপদা, ডাইনিটা আমাকে চড় মারল। তুমি এর বিহিত যদি না করো, আমি আর কক্ষনো এখানে আসব না। তোমাকে ভালবাসি বলেই আসি। তাই বলে যে-সে আমাকে মারবে।

—চুপ কর পদ্মমণি। আমি দেখছি।

সুদীপ মুক্তির দিকে এগোতে লাগল। সুদীপের বীভৎস মূর্তি দেখে মুক্তি ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে-ভয়েই বলল—তুমি আগে কথাটা শোনো। ও তোমার নামে মিথ্যে কথা বলেছে। তুমি নাকি বলেছ—জামাইবাবুর সঙ্গে আমার অবৈধ সম্পর্ক আছে। বলো, তুমি একথা বলোনি। তুমি একথা বলতে পারো না। এসব ওর বানানো।

—আমি তোর কোনো কথা শুনতে চাই না। তোর জন্যে আমি শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তোর জন্যে পদ্মমণিকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে রাখতে হচ্ছে। তুই আমার দিন-রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিস। আর নয়! অনেক সহ্য করেছি। আজ-ই তোর শেষ দিন। পদ্মমণির গায়ে তুই হাত তুলেছিস। তোর আর বাঁচার কোনো অধিকার নেই। বলতে-বলতে সুদীপ, দুহাত দিয়ে মুক্তির গলাটাকে সজোরে চেপে বলল—মরার আগে শুধু জেনে যা, পদ্মমণিকে আমি বিয়ে করব। তাই তোকে সরে যেতে হবে। মুক্তি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। সুদীপের শক্ত হাতদুটো ফাঁসের মতো মুক্তির গলায় চেপে বসল। মুক্তির দম বন্ধ হতে লাগল। হাত-পা অবশ হতে লাগল। শরীর শিথিল হল। পড়ে গেল দোরে। হাতে একটা শক্ত কীসের ছোঁয়া লাগল। সেটাকে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তুলে ধরে সজোরে আঘাত করল সুদীপের মাথায়। আচমকা আঘাত পেয়ে সুদীপ দোরে লুটিয়ে পড়ল। পদ্মমণি চিৎকার শুরু করে দিল—ওগো, কে কোথায় আছো। এসো না গো। সুদীপকে মেরে ফেললে গো।

চিৎকার শুনে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। সুদীপের মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে? কে মারলে?

পদ্মমণি আঙুল বাড়িয়ে মুক্তিকে দেখিয়ে বলল—ওই যে, ওই ডাইনিটা। নোড়া দিয়ে মাথাটা একেবারে থেঁতলে দিয়েছে। আপনারা ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।

লোকেদের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হলো। মেয়েরা বলাবলি করতে লাগল—ছেলেটা তো একদম বাজে। বাস চালায়। মদ খায়, জুয়া খেলে। বাইরের মেয়েছেলে নিয়ে রাত কাটায়। আমরা তো সব দেখি। বৌটার ওপর কম অত্যাচার করে! বৌটা সব মুখ বুজে সহ্য করে যায়। তারও তো একটা সীমা আছে। তুই বৌয়ের সামনে নোংরামি করবি, কোনো বউ কী তা মেনে নিতে পারে।

সবাই পদ্মমণির দিকে তাকালো। বাঁকা চাউনি দেখে পদ্মমণি বুঝতে পারল—পরিস্থিতি তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপকে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল।

একজন বয়স্কা মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে গা?

কাঁদতে-কাঁদতেই পদ্মমণি বলল—আমি ওর মামাতো বোন। দেখুন না,

আমি কিছুক্ষণ আগেই এসেছি। টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া হতে-হতে বৌদি নোড়া দিয়ে দাদাকে মেরে দিল।

তারপর 'দাদা গো' বলে পদ্মমণি ডাক ছেড়ে কান্না শুরু করে দিল।

ধীরে-ধীরে মুক্তির চেতনা ফিরে এল, লোকজনের হই-হল্লা তার কানে গেল। বুঝতে চেষ্টা করল—ব্যাপারটা কী? মনে পড়ল সব ঘটনা। পাশের দিকে চেয়ে সুদীপকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এ্যাম্বুলেন্স এসে সুদীপকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। পুলিশ এসে মুক্তিকে নিয়ে গেল থানায়। পরের দিন সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক কাগজে খবর বের হল : চৈতন্যগঞ্জের কাছে সেতার চকে দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রী নোড়া দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ, স্বামী সুদীপ কোলে একটা মদ্যপ, দুশ্চরিত্র। চৈতন্যগঞ্জ রুটেই বাস চালায় রোজ রাত্রে মদ খেয়ে এসে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতো। এমনকি বাইরে থেকে মেয়ে নিয়ে এসে স্ত্রীর সামনেই ব্যভিচারে লিপ্ত হত। স্ত্রী প্রতিবাদ করায় স্বামী তাকে মারধোর করতে যায়। তখন আচমকা স্ত্রী শিলের নোড়া দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করে। পুলিশ স্ত্রী মুক্তি কোলেকে গ্রেপ্তার করেছে। হত্যার চেষ্টার অপরাধে, একটি মামলা রুজু করে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

অফিসে লোডশেডিং। সবাই গল্প-গুজবে মত্ত। কিন্তু নিতাই দত্ত একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন। সঞ্জয় বলল—কী দত্তদা, অত মনোযোগ দিয়ে কী এত পড়ছেন?

—তেমন কিছু নয়। ড্রাইভারের কীর্তিকলাপ আর কী! আচ্ছা সঞ্জয়, ড্রাইভার হলেই কী মদ খেতে হয়? দুশ্চরিত্র হয়? কয়েকজনকে তো চিনি। সবই একরকম।

সঞ্জয় বলল—না, দত্তদা। ঠিক তা নয়। হয়তো অনেকেই খারাপ পথে চলে যায়। তাই বলে সব ড্রাইভার-ই মাতাল, দুশ্চরিত্র হয়—এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আমার এক আত্মীয়ও তো গাড়ি চালায়। সে বৌকে যা ভালবাসে, আমরাও তা পারি না। খুব ভাল ছেলে।

—সে তুমি যাই বলো ভাই! এই তো দ্যাখো না, বৌয়ের সামনেই ব্যভিচার করছিল বলে, দিয়েছে নোড়া দিয়ে মাথা ফাটিয়ে। কোথায় চৈতন্যগঞ্জ আছে, সেখানকার ঘটনা।

—ও-সব ছাড়ুন। ভাল খবর কী আছে, বলুন?

—নাঃ, ভাল খবর আর কোথায়! আজ তেমন কোনো খবর নেই।

খুনোখুনির খবরেই ভর্তি।

বলেই নিতাই দত্ত আবার কাগজ পড়ায় মন দিলেন। সঞ্জয় চুপ করে গেল। হঠাৎ-ই তার মনে হল, দত্তদা চৈতন্যগঞ্জের ঘটনা বললেন। লোকটা ড্রাইভার। তাহলে কী সু-দী-প! না, না, কক্ষনো হতে পারে না। মুক্তি এসে মালিনীকে যা বলে গেছে, তাতে এরকম হতেই পারে না। তবুও যেহেতু চৈতন্যগঞ্জ, সঞ্জয়ের মনে একটা খটকা লাগল। খবরটা তো পড়তে হয়! সঞ্জয় বলল—দত্তদা পড়া হয়েছে? দিন, একটু দেখি।

—নাও ভাই।

নিতাই দত্ত খবরের কাগজটা সঞ্জয়কে দিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। খবরের কাগজ দেখতে-দেখতে সঞ্জয়ের চোখ এসে আটকে গেল ওই খবরে। পড়েই চমকে উঠল। হৃৎকম্পন শুরু হল। মুক্তি জেলে! এ কী করে সম্ভব। তাহলে মুক্তির সব কথাই মনগড়া। মুক্তি এটা করতে গেল কেন! মালিনী শুনলে তো সামলানোই দায়! কিন্তু তাকে তো জানাতেই হবে। এই দুঃসময়ে মুক্তির পাশে থাকা আমাদের একান্ত দরকার। তার আর আছেটা কে?

সঞ্জয় খাতাপত্র গুছিয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

দত্তদা বললেন—কী ভাই, এক্ষুনি চললে যে?

—শরীরটা ভাল লাগছে না, দত্তদা। বাড়ি চলে যাচ্ছি।

—আচ্ছা, এসো।

সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। স্টল থেকে একটা কাগজ কিনে ব্যাগের মধ্যে রেখে বাড়ি ফিরে এল। সঞ্জয়ের মা জিজ্ঞাসা করল,

—কীরে, আজ তাড়াতাড়ি চলে এলি?

—মনটা ভাল নয় মা। সোমবার আসায় সময় দেখে এলাম সহেলীর শরীরটা খারাপ। আজ তিনদিন কোনো খবরও পাইনি। মনটা ছটফট করছে। আমি একবার কমলাপুর যাব।

—যা না। কাল ফিরবি তো?

—দেখি। যদি ভাল থাকে চলে আসব। আর তেমন হলে ডাক্তার দেখিয়ে সব ব্যবস্থা করে তবে ফিরব। তাই দু-একদিন দেরি-ও হতে পারে।

—হ্যাঁ, তাই কর। সাবধানে যাস।

সঞ্জয় কমলাপুরের উদ্দেশে রওনা দিল।

সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে। মালিনী ধূপ-ধুনো জ্বেলে সন্ধে দিয়ে রাত্রের খাবারের তোড়জোড় শুরু করেছে। সঞ্জয় ঘরে এসে ঢুকল। মালিনী তো দেখেই অবাক। হঠাৎ অসময়ে! কার কী হল নাকি। ব্যস্তসমস্ত হয়ে মালিনী সঞ্জয়কে

জিজ্ঞাসা করল—তুমি আজ চলে এলে! ও-বাড়ির খবর সব ভাল তো?

—হ্যাঁ, সব ভাল আছে।

—তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, কিছু একটা হয়েছে। বলো না গো, কী হয়েছে? নাহলে সপ্তার মাঝখানে তো তুমি আসো না। তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

—হুঁ, আমার শরীর ঠিক আছে। সহেলী পড়তে গেছে?

—হ্যাঁ, গেছে।

তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মালিনী বলল—আসার সময়ও হয়ে গেছে। তুমি এখন খাবে কিছু?

—না, কিচ্ছু খাব না।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো? নিশ্চয় আমার কাছে কিছু লুকোতে চাইছ। কোনোদিন তো এমন করো না। কী গো, কী হয়েছে? তোমার অফিসে কোনো গন্ডগোল হয়েছে?

—না, অফিসে কিছু হয়নি। আচ্ছা মালিনী, ধরো, কোনো আপনজনের অস্বাভাবিক যদি কিছু ঘটে যায়! মানে—যেটা কোনোদিন ভাবা যায়নি, যেটা কোনোদিন হতে পারে না। তেমন কিছু! তাহলে সেটা মেনে নিতে পারবে?

—তুমি এসব কী বলছো বলো তো! কার কী হয়েছে?

—হ্যাঁ, মালিনী, আমাদেরই হয়েছে। আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।

—বলো না গো, কী হয়েছে। আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। তুমি এমন করে কথা বলছো কেন!

—ব্যাগটা দাও।

মালিনী টেবিল থেকে ব্যাগটা নিয়ে সঞ্জয়কে দিল। সঞ্জয় ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে মালিনীকে বললো—এই নাও। দাগ মারা খবরটা পড়ো।

খবরটা পড়েই মালিনী আর্তনাদ করে উঠল—না। এ হতে পারে না। তুমি আমাকে এ কী খবর দেখালে। এর চেয়ে যে আমার মরণও ভাল ছিল গো। ভগবান! আমাকে এত বড় শাস্তি তুমি দিলে কেন?

কাঁদতে-কাঁদতে বাবার ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল—বাবা, তোমার মুক্তির কী সর্বনাশ হয়েছে। তুমি দ্যাখো বাবা! তুমি বলেছিলে না—মালিনী, মুক্তিকে মায়ের স্নেহ দিয়ে বড় করেছিস। ওকে সারাজীবন মায়ের মমতা দিয়েই আগলে রাখিস। আমি পারলাম না বাবা। তোমার মুক্তিকে আমি আগলে রাখতে পারলাম না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে মালিনী ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল।

সস্নেহে মানিলীর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে সঞ্জয় বলল—কেঁদো না মালিনী! তোমার যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারছি। সন্তানের বিপদে মায়ের প্রাণ তো উতলা হবেই। আমাকে দ্যাখো। আমি তো ওর জামাইবাবু। তোমার সম্পর্কেই, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। নিজের অজান্তেই কখন ও, আমারও মেয়ে হয়ে গেছে। আমারও তো বুক ফেটে যাচ্ছে মালিনী। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে—ভগবান! আমাদের মেয়েকে তুমি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। আর তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না।

সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে-কাঁদতে মালিনী বলল—ও যে আমাকে কত ভাল-ভাল কথা বলে গেল গো। ওর যে এত কষ্ট, তা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। আমাদের হাসিমুখ দেখতেই যে ও সব যন্ত্রণাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখেছিল। মুক্তি! এ তুই আমাদের কী সুখ দিলি।

—চুপ করো মালিনী। বিপদে এত ভেঙে পড়লে চলবে? শক্ত হতে হবে। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আমরা ভেঙে পড়লে মুক্তি কার ওপর ভরসা রাখবে। আমরাই যে তার একমাত্র ভরসা। মা যখন হয়েছ, বিপদে সন্তানকে বরাভয় দিতে হবে। আমি তো তোমার পাশে আছি। তোমার ভয় কী? তারপর সহেলীর কথাও তো তোমাকে ভাবতে হবে। সামনেই ওর পরীক্ষা। ও এইসব কোনো ভাবেই না এখন জানতে পারে। ওঠো, স্বাভাবিক হও। দ্যাখো, যা ঘটবে—তা মেনে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখানে তো মানুষের কোনো হাত নেই। সহেলী কাল স্কুলে চলে গেলে আমরা জেলে গিয়ে মুক্তির সঙ্গে দেখা করে আসব। সে যে আমাদের পথ চেয়েই বসে আছে। সে জানে—লোকে যাই বলুক, যাই ভাবুক, দিদি-জামাইবাবু তাকে কোনোদিন ভুল বুঝবে না।

কথামতো পরের দিন সহেলী স্কুলে চলে যেতে, মালিনী আর সঞ্জয় থানায় গেল মুক্তির সঙ্গে দেখা করতে। দিদিকে দেখেই মুক্তি অনেক কাঁদল। মালিনী সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করিয়ে সব জানতে চাইলা মুক্তি সব ঘটনা দিদিকে বলল। মালিনী বলল—এত কিছুর পরও তুই বাড়িতে গিয়ে আমাকে হুবহু সব মিথ্যে কথা বলে এলি। কেন, দিদির ওপর তোর ভরসা নেই। তুই ভেবেছিস, বিয়ে দিয়ে দিদি তোকে পর করে দিয়েছে। তুই যে আমার সবচেয়ে আপন রে! তুই তো আমাদের বড় মেয়ে! মেয়ের কষ্টে মা-বাবা কী স্থির থাকতে পারে?

—জানি দিদি। আর সেইজন্যেই তো তোমাদের কিছু বলতে পারিনি। তুমি জানলে, তোমার কাছেই আমাকে রেখে দিতে। ছোটবেলায় তোমার কাছে অনেক অন্যায়, আবদার করেছি—ঠিক আছে। কিন্তু বিয়ের পরও তোমাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। তাছাড়া লোকেও তো নানা কথা বলবে। আমার

অপমান আমি সহ্য করতে পারি। কিন্তু তোমাদের কোনো অপমান আমি সহ্য করতে পারব না।

—মেয়ে বিপদের সময় মা-বাবার কাছে যাবে না তো, কোথায় যাবে। এতে আবার মান-অভিমানের কী আছে। চেয়ে দ্যাখ, কে এসেছে।

সঞ্জয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে মা-মেয়ের কথা শুনছিল। মালিনীর কথায় সামনে এসে দাঁড়াল।

—বিশ্বাস করুন জামাইবাবু, আমি ওকে মারতে চাইনি। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল। মুক্তি আবার কাঁদতে শুরু করল।

—তোমার কোনো অন্যায় নেই মুক্তি! বরং তুমি সব অন্যায়কে সহ্য করে অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছ। আমরা তোমার পাশে আছি। আমরা তোমাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। কেস লড়ব। বড়-বড় উকিল দেব। কোর্টে তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করে, তবে আমাদের ছুটি। তোমার কোনো চিন্তা নেই।

তাই হল পঁয়তাল্লিশ দিন পর মুক্তি ছাড়া পেল। দিদির কাছেই থাকে। প্রথম-প্রথম লজ্জায় বাইরে খুব একটা বেরুত না। সকাল-সন্ধে সহেলীকে পড়াত। বাকি সময় দিদির সঙ্গে সংসারের কাজে হাত লাগায়। মালিনী এখন আর বাধা দেয় না। ভাবে—করুক। কাজের মধ্যে থাকলে সাত-পাঁচ চিন্তা আর মাথায় আসবে না। মেয়েটা শান্তিতে থাকবে।

এইভাবেই এক বছর কাটল। কোর্টে কেস চলছে। দিন পড়লে মুক্তিকে সঙ্গে করে সঞ্জয় কোর্টে নিয়ে যায়। ব্যাপারটা ক্রমে-ক্রমে গ্রামের সবাই জেনে গেল। আর জানবেই না বা কেন? এ তো লুকিয়ে রাখার ব্যাপার নয়। তারপর সত্যি কোনোদিন চাপা থাকে না। একদিন প্রকাশ হবেই।

ও-সবে মুক্তির আর ভয় নেই। সে এখন আর ঘরে বন্দী থাকতে চায় না। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। ভুলে থাকতে চায় তার জীবনের দুঃস্বপ্নের অধ্যায়কে। দিদির কাছ থেকে বাইরের সব কাজগুলোই মুক্তি নিজের হাতে নিয়ে নিল। হাট-বাজার, দোকান-দানি, বিদ্যুতের বিল, টেলিফোন বিল—যাবতীয় কাজ এখন মুক্তিই করে। মালিনী সেই একই কারণে মুক্তির কোনো কাজে আর বাধা দেয় না। ও যাতে শান্তি পায়, তাই করুক। ওকে হাসি-খুশি দেখলেই মালিনীর সুখ। সব কিছু ভুলে ওর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাই মালিনীর এখন একমাত্র কাম্য।

ইচ্ছা করলেই সব কিছু ভোলা যায় না। মুক্তিও ভুলতে পারে না। সুদীপকে একবার দেখার জন্যে মনটা কেমন করে। সে জেলে থাকতেই শুনেছে—সুদীপ ভাল হয়ে হাসপাতাল থেকে চলে গেছে। এখন চৈতন্যগঞ্জেই আছে কিনা কে

জানে। ভাবনাটা বারবার আসে। অনুভূতির অন্দরে নড়াচড়া ক'রে।

একদিন বিকেলে 'বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি' বলে মুক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মালিনী বলল—যাবি তো, এত বেলা করলি কেন? বেশি রাত করিস না। তাড়াতাড়ি ফিরিস।

মুক্তি যখন চৈতন্যগঞ্জে এল, বিকেল তখন গড়িয়ে গেছে। মুক্তি জানে, সুদীপের গাড়ির নম্বর। আর সন্ধের সময়ই ওই বাসটা চৈতন্যগঞ্জ ছেড়ে যায়। ফিরতে সেই সাড়ে দশটা-এগারোটা। মুক্তি বাস থেকে একটু দূরে মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে। বাস ছাড়ার সময় হয়। সুদীপ গাড়িতে ওঠে। গাড়ি স্টার্ট দেয়। তারপর চলতে শুরু করে। বাস দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই মুক্তিকে দেখেই তো ভঞ্জু বেরা অবাক! বলল—এসো মা, এসো। সবই শুনেছি মা। কী আর করবে বলো। হতচ্ছাড়াটা পরে বুঝবে। তারপর থেকে আমিও আর দোকানে উঠতে দিই না। দূর-দূর করে বলেছিলাম—বেরো। অমন সুন্দর মেয়েটার জীবনটা তুই নষ্ট ক'রে দিলি। কক্ষনো আমার দোকানে উঠবি না। আমাকে খুড়ো বলেও ডাকবি না।

তারপর মুক্তিকে বলল—তুমি কোথায় এসেছিলে মা।

—এখানেই।

—কী দরকার?

মুক্তি কোনো কথা বলতে পারল না। নীরবে চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

ভঞ্জু বেরা, মুক্তির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল। বলল—ও। কিন্তু মা, তুমি যার কথা ভাবছ, সে কী তোমার কথা ভাবে? শুনছি তো পদ্মমণিকে আবার বিয়ে করবে। ভুলে যাও মা, ও-সব ভুলে যাও। কী লাভ বলো তো? তোমার মতো মেয়েকে যারা চিনতে পারল না, তাদের কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। ওর কী দশা করে, দ্যাখো না। পদ্মমণি বাইরে ঘোরা মেয়ে। ওরা কারো ঘরে চিরকাল বন্দী হয়ে থাকবে না। যতক্ষণ পয়সা পাবে, ততক্ষণ।

—আমি এখন আসছি কাকাবাবু। মাঝে-মাঝে এসে বিরক্ত করব। তাড়িয়ে দেবেন না যেন।

—না মা। তুমি যখন খুশি আসবে।

ভঞ্জু বেরাকে প্রণাম করে মুক্তি বাড়ি ফিরে আসে।

এইভাবে তিনটে বছর কেটে গেল। এসে গেল কোর্টের রায় ঘোষণার দিন। মুক্তি খুব কান্নাকাটি করল। মালিনী সান্ত্বনা দিয়ে বলল—অত ভেঙে পড়িস না। দেখবি, ভগবান ঠিক আছেন! তোর কোনো বিপদ হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে মালিনী, সঞ্জয়—মুক্তিকে নিয়ে কোর্টে হাজির হল। ওদিকে

সুদীপ আর পদ্মমণিও এসেছে। পদ্মমণির মুখে যেন একটা জয়ের হাসি। যেন বলতে চাইছে—জেলের ঘানি টেনে এবার মর। আমাদের পথটা পরিষ্কার হোক। সুদীপ, এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মুক্তিকে কোনোদিন চেনে-ই না। দেখিয়ে-দেখিয়ে পদ্মমণির হাত ধরে কোর্টের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। মুক্তির আর সহ্য হচ্ছে না। দিদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

যথাসময়ে বিচারপর্ব শুরু হল। বিচারক রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বললেন—সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে কোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, মুক্তি কোলে ওরফে মুক্তি সাপুই ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে দিদির কাছেই মানুষ। লেখাপড়া শিখিয়ে বিবাহের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে দিদি মালিনীদেবী উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গেই বোনের বিয়ে দেবার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু পাত্রদের লাগামছাড়া চাহিদার সঙ্গে মালিনীদেবী অর্থনৈতিক অবস্থায় পেরে উঠছিলেন না। মুক্তিদেবী, দিদির অসহায় অবস্থায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। আর ঠিক তখনই ঘটক সুদীপ কোলের সম্বন্ধ নিয়ে আসে। মালিনীদেবী রাজি হলেন না। কারণ, সুদীপবাবু বাসের ড্রাইভার। আর ড্রাইভারদের সম্পর্কে মালিনীদেবীর ধারণা একদম ভাল নয়। একমাত্র মুক্তিদেবীর জেদাজেদিতেই সুদীপবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। মুক্তিদেবী এই বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন কারণ পাত্রের কোনো দাবি ছিল না। দিদি, মুক্তিদেবীর কাছে মায়ের মতো। শুধুমাত্র মা-কে খুশি করার জন্যে, মা-কে দুশ্চিন্তা মুক্ত করার জন্যে অশিক্ষিত, চাল-চুলোহীন ড্রাইভার সুদীপবাবুকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন মুক্তিদেবী দিদির কাছেই ছিলেন। সুদীপবাবু কোনো টাকাপয়সা মুক্তিদেবীর হাতে দিতেন না। উপরন্তু সুদীপবাবুর শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ওপর লোভ বুঝতে পেরে মুক্তিদেবী দিদির বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার জন্যে সুদীপবাবুর ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেতার চকে একটা ঘর ভাড়া করে সুদীপবাবু, মুক্তিদেবীকে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। মুক্তিদেবী তখন চার মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা। ভাড়া ঘরে এসেই সুদীপবাবুর চরিত্রহীনতা মুক্তিদেবী টের পান। প্রায় রাত্রেই তিনি ঘরে আসতেন না। যখন বাড়িতে আসতেন মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন। মুক্তিদেবী কিছু বললেই গালিগালাজ করতেন, মারতে যেতেন। এইভাবেই একদিন মদ্যপ সুদীপবাবুর চড়ে মুক্তিদেবী বেসামাল হয়ে পড়ে যান। তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। মুক্তিদেবীকে হাসপাতালে ভর্তি করে সুদীপবাবু বলেছিলেন যে ঘাটে জল আনতে গিয়ে পড়ে গিয়ে নাকি এই ঘটনা ঘটেছে। মুক্তিদেবী শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনেক কিছুই করতে পারতেন। করেননি। শুধুমাত্র স্বামীর সম্মানহানির আশঙ্কায়। ভারতীয় নারীর এ এক সনাতন পতিভক্তি। এরপরও সুদীপবাবু বদলায়নি। এই কেসের মূল সাক্ষী পদ্মমণিকে নিয়ে মুক্তিদেবীর সামনেই ব্যভিচারে লিপ্ত হন। লাম্পট্যের এত

নির্লজ্জ উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় খুব একটা নেই, তাও মুক্তিদেবী সহ্য করেছিলেন। সহ্য করেছিলেন স্বামীর সুখের জন্যে, স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করার জন্যে। তারপরই ঘটলো এই ঘটনা। সেদিন সুদীপবাবু বাড়িতে ছিলেন না। পদ্মমণিকে একলা পেয়ে মুক্তিদেবী জানতে চান—কেন সে তার সংসারে আগুন লাগাচ্ছে? পদ্মমণি অশালীন ভাষায় মুক্তিদেবীকে অপমান করে আর তার জামাইবাবুর সঙ্গে মুক্তিদেবীর অবৈধ সম্পর্কের একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করে।

যে জামাইবাবুকে মুক্তিদেবী পিতৃজ্ঞানে ভক্তি করেন, তার প্রতি এই বদনাম মুক্তিদেবী সহ্য করতে পারলেন না। পদ্মমণির গালে একটা চড় বসিয়ে দেন। আর ঠিক সেই সময়েই সুদীপবাবুর আবির্ভাব। কোনো কিছু না বুঝে, পদ্মমণির কথায় সুদীপবাবু, মুক্তিদেবীর গলা টিপে মারতে যান। অসহায় মুক্তিদেবী বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে গিয়ে হাতের সামনে পাওয়া একটা নোড়া দিয়ে সুদীপবাবুর মাথায় আঘাত করেন।

এই ঘটনা প্রমাণ করে—সুদীপবাবুকে মারার কোনো পরিকল্পনা মুক্তিদেবীর ছিল না। বরং স্বামীর সব অন্যায়কে মেনে নিয়ে, তার সঙ্গেই সংসার করার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু পরিস্থিতিই মুক্তিদেবীকে এটা করতে বাধ্য করেছে। প্রত্যেক মানুষেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। নিরুপায় মুক্তিদেবীর সামনে সুদীপবাবুকে আঘাত করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। অন্যথায় তাকেই খুন করা হত।

তাই এই আদালত মনে করে—মুক্তিদেবী সম্পূর্ণ নির্দোষ। আর তাই স্বামী হত্যার অভিযোগ থেকে তাকে শুধু বেকসুর খালাস ঘোষণা করাই হচ্ছে না, সঙ্গে-সঙ্গে তার ত্যাগ ও সহনশীলতাকে সম্মান জানানো হচ্ছে। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস যেখানে তলানিতে এসে ঠেকেছে, সেই সময়ে মুক্তিদেবীর এই স্বামীপরায়ণতা স্বামীর প্রতি এই অবিচল ভক্তি—আদর্শ হিন্দু নারীর এক মূর্ত প্রতীক বলেই আদালত মনে করে।

বিচারের রায় শুনে মালিনী, সঞ্জয়—সবার চোখ-ই আনন্দে জলে ভরে গেল। মুক্তিও দিদিকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদল। জনতার বিদ্রূপ আর কটূক্তিতে পদ্মমণি আর সুদীপ মাথা নীচু করে আদালত থেকে বেরিয়ে গেল।

•

মুক্তি কাজ নিয়েই থাকে। সংসারের কাজ আর কতটুকু! বাকি সময় তার কাটতেই চায় না। তারপর সংসারে বসে-বসে খেতেও তার খারাপ লাগে। সহেলী বড় হচ্ছে। বিয়ে দেওয়া দিদির একটা বড় দায়িত্ব। তার জন্যে এরা কোর্টে কেস লড়তে গিয়ে জলের মতো টাকা খরচ করল। আর সে কী করছে! সে কী কিছুই করতে পারে না? লেখাপড়া জানে, দুটো টিউশিনি করেও তো নিজের হাত-খরচ চালাতে পারে। সেই তো দিদির কাছে হাত পাততে হয়। দিদিকে একদিন

কথাটা বলল। মালিনী বলল—কেন? তোকে ছেলে পড়াতে হবে কেন? তোর রোজগারের পয়সায় আমরা খাব—এটা তুই ভাবলি কী করে। তোর জামাইবাবু শুনলে কিন্তু খুব রাগ করবে।

মুক্তি বলল—তোমরা কথাটাকে ওইভাবে নিচ্ছ কেন? আমি কী টাকার জন্যে টিউশিনি করব বলছি।

তারপর দিদির গলা জড়িয়ে আদর করে বলল—তোমরা যতদিন আছ, আমার কোনো চিন্তা নেই। দ্যাখো না, সময় কাটতে চায় না। তুমি তো নিজেই সব কাজ করে ফ্যালো। যতটুকু জোর করে করি, তো করি। তাই ভাবছিলাম—টিউশিনি করলে সময়টাও কাটবে আবার লেখাপড়ার চর্চাটাও থাকবে। নাহলে তো সবই ভুলে যাব। সহেলীকে পড়াই বলে তবু কিছুটা মনে আছে। তুমি আর না কোরো না।

মালিনী আর না করতে পারল না। বলল—তাহলে এক কাজ কর।

—বলো।

—সিং পাড়ার, ঝুনুর মা একদিন বলছিল—দিদি, তোমার বোন তো ঘরেই থাকে। বলো না, যদি আমার ঝুনুকে পড়ায়। একটা ভাল দিদিমণি পাচ্ছি না। মুক্তি পড়ালে খানিকটা নিশ্চিন্ত হই।

—তাহলে ডেকে পাঠাও।

ঝুনুর মা এল। কথাবার্তা পাকা হল। সপ্তাহে তিনদিন রাত্রে বাড়িতে গিয়ে পড়াবে। ঝুনু, সহেলীর সঙ্গেই ক্লাস এইটে পড়ে। বেতনের কথা উঠতেই মুক্তি বললো—ও তোমরা বৌদি যেটা ভাল বুঝবে, দেবে।

ঝুনুর মা বলল—ঠিক আছে ভাই। তোমার দাদাকে তো চেনো। ওদিক দিয়ে কোনো অসুবিধে হবে না।

কথামতো মুক্তি পড়াতে যায়। প্রথম বছর ঝুনু ভালভাবেই পাশ করল। মাইনেও খারাপ দেয় না। মাসে তিনশো টাকা দিত। নাইন পর্যন্ত তাই চলল। টেন-এ উঠতেই দুশো টাকা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু মুক্তির এখন মুশকিল হচ্ছে ঝুনুর বাবা—নরেনদাকে নিয়ে। তার কথাবার্তা মুক্তির ভাল লাগে না। কেমন ধরনের বাজে-বাজে সব কথা বলে। ঘরে থাকলে সব সময় পড়ানোর কাছে বসে থাকবে। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকবে। মুক্তির খুব লজ্জা পায়। কোনো কারণে ঝুনু উঠে গেলেই, শুরু হয়ে গেল—তুমি কী সুন্দর মেয়ে। তোমার স্বামীটা কী পাষণ্ড বলো তো? এমন মেয়েকে কেউ কষ্ট দেয়!

মুক্তি মুখ নীচু করে বলে—কী করব বলুন! সবই কপাল।

আবার কখনো বলে—তোমাকে দেখলে খুব কষ্ট হয়।

মুক্তি বলল—কেন?

—এমন কাঁচা বয়স! স্বামী-সুখ থেকে বঞ্চিত। কী কষ্টেই আছ। চলো না, একদিন কোথাও ঘুরে আসি।

প্রথমটা মুক্তি বুঝতে পারেনি। বলল—বৌদি, ঝুনু যাবে?

—ওরা অনেক ঘুরেছে। তারপর ওরা থাকলে তোমার সঙ্গে বেড়ানোর মজাটাই মাটি হয়ে যাবে।

—বাড়িতে আমাকে একা ছাড়বে না।

—বাড়িতে জানবে কেন! বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়বে। তারপর দুজনে কাছে-পিঠে ঘুরে সন্ধের আগেই ফিরে আসব। কেউ জানবেই না।

কু-মতলবটা বুঝতে মুক্তির আর বাকি রইলো না। বেশ রেগে গিয়েই বললে—আমার বেড়াতে ভাল লাগে না।

বলেই বাড়ি আসার জন্য উঠে দাঁড়াল। ঝুনু রান্নাঘরে মায়ের কাছে জল খেতে গিয়েছিল। মুক্তিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে বলে উঠল।

—আন্টি, এখনও আমার অঙ্ক বাকি আছে।

—শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি চেষ্টা করো। না পারলে পরের দিন এসে দেখিয়ে দেব।

মুক্তি খুব ভাবনায় পড়ে গেল। কী করা যায়! প্রথম মাসে মাইনে পেয়েই দিদিকে দিতে গিয়েছিল। দিদি বলেছিল—তোর কী খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তোর পয়সা আমি হাত পেতে নেব, ভাবলি কী করে? আমার সহেলী যেমন, তুইও তেমন। তোর পয়সা, তুই রেখে দে।

মুক্তি জানত—পয়সা দিদি নেবে না। তবুও বলে মন থেকে খানিকটা স্বস্তি পেল। মুক্তি টাকা ব্যাঙ্কেই জমিয়ে রাখে। এই দু'বছরে অনেকগুলো টাকাই জমেছে। সহেলীর বিয়ের সময় কিছু টাকা তবু দিদির হাতে তুলে দিতে পারবে। মাসি হিসেবে তো একটা দায়িত্বও আছে। কিন্তু টিউশনিটা ছেড়ে দিলে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।

সাত-পাঁচ ভেবে মুক্তি অবশেষে ঠিক করল—না, এই বছরটা অন্তত তাকে টিউশনিটা করতেই হবে। ঝুনু মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে! মাঝপথে ছেড়ে দিলে ও খুব বিপদে পড়ে যাবে। এই কয়েকটা মাস নরেনদাকে যেমন করেই হোক সামলে নেবে'খন!

মুক্তি পড়াতে যায়। সেদিনও পড়াতে গেল। ঘরে ঢুকেই কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো। ডাকল—ঝুনু, এই ঝুনু।

নরেন সিং, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—এসো, এসো। বোসো।

মুক্তি ঘরে গিয়ে বসলো। জিজ্ঞাসা করল—ঝুনু কই, ডেকে দিন?

—এত অস্থির হচ্ছ কেন? একটু বসে জিরিয়ে নাও।

বলেই নরেন সিং ঘরের মধ্যে ঢুকে মুক্তির পাশে বসল। তারপর বলল—তোমার বৌদি, ঝুনুকে নিয়ে আজ বাপের বাড়ি গেছে। তুমি এসে ফিরে যাবে, তাই তো আজ সকাল-সকাল বাড়ি এসেছি।

মুক্তি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি তাহলে এখন আসছি। ঝুনু ফিরলে খবর দেবেন।

মুক্তির হাতটা ধরে টেনে বসিয়ে, নরেন সিং বলল—বোসো, বোসো, এত তাড়া কিসের? পড়ালে তা তোমাকে থাকতেই হত। তাছাড়া তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথাও আছে। তোমাকে তো ফাঁকাই পাওয়া যায় না।

মুক্তি একটু বিরক্ত হয়েই বলল—তাড়াতাড়ি বলুন।

—মুক্তি, তুমি আমাকে যাই ভাবো, আমি কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসি। তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত। তুমি রাজি থাকলে, বিয়েও করতে পারি। বিশ্বাস করো মুক্তি, তুমি ছাড়া এখন আর আমি কিছু ভাবতেও পারছি না।

—এ আপনি কী বলছেন, নরেনদা! ঝুনুকে আমি নিজের ভাইঝির মতোই দেখি। বৌদি আমাকে বোনের মতো ভালবাসে। এদের কোনো ক্ষতি আমি করতে পারব না। যে আগুনে আমার কপাল পুড়েছে, সেই আগুনে আমি অন্যের সংসারে আগুন লাগাতে পারব না। তারপর আমি আপনাকে দাদার মতোই শ্রদ্ধা করি। আপনি যা বলছেন, তা কখনোই সম্ভব নয়। আপনি ভুল করছেন।

—না মুক্তি! আমি কোনো ভুল করিনি। আমার মনের কথাই, আমি বলছি। এখানে একবর্ণও মিথ্যে নেই।

বলতে-বলতেই নরেন সিং দু-হাত দিয়ে মুক্তিকে জড়িয়ে ধরল। মুক্তি সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে-করতে বললো—ছাড়ুন বলছি।

—আজ তোমাকে ছাড়ব না, আমার সমস্ত কথাই তোমাকে শুনতে হবে। অন্তরের যে জ্বালা নিয়ে আমি ছটফট করছি—তা শুধু তোমার জন্যই। তুমি আমার সুখ, শান্তি—সব কেড়ে নিয়েছ। তোমার শরীরের পরতে-পরতে উপছে পড়া যৌবন—আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তুমি 'না' করো না, মুক্তি! বিয়েতে যদি আপত্তি থাকে, নাই হবে। এখন লিভ-টুগেদার তো আইনসম্মত। আমরা আইন মেনেই একসঙ্গে বাস করব। তোমার জীবনের সব দায়-দায়িত্ব আমি নেব। বলো মুক্তি! আমাকে ফেরাবে না।

অনেক চেষ্টার পর নরেন সিং-এর কবল থেকে মুক্তি নিজেকে মুক্ত করল। রাগে-অপমানে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। চোখে-মুখে ফুটে উঠল এক তীব্র ঘৃণা। বলল—আপনি এত নীচ। একটা অসহায় মেয়েকে একলা পেয়ে, অপমান করতে আপনার লজ্জা করল না! আপনি মানুষ—না জানোয়ার! আমি

আর পড়াতে আসব না। আপনারা মাস্টার খুঁজে নিন। পথ ছাড়ুন, বলছি? নাহলে চিৎকার করে আমি লোক জড়ো করবো।

নরেন সিং সরে দাঁড়ালো। দ্রুত পায়ে মুক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরল।

মুক্তি আর ঝুনুকে পড়াতে যায় না। দিদি জিজ্ঞাসা করলো—কীরে, আজ পড়াতে গেলি না। ওরা তো মামার বাড়ি থেকে চলে এসেছে।

মুক্তি বলল—আমি তো নরেনদাকে বলে এসেছি, আর পড়াব না।

—কেন?

—ওকে পড়াতে গিয়ে সহেলীর ক্ষতি হচ্ছে না? ওই সময়টা আমি সহেলীকেই দেখবো। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করতে না পারলে, কিচ্ছু হবে না। আমি নিজে ভুগছি। তাই সহেলীকে আমি ভুগতে দেব না। ওর রেজাল্ট ভাল করতেই হবে।

মালিনী আর কথা বাড়ায় না। জানে—বোন একটু জেদি। নিজে যেটা ভাল বুঝবে, তাই করবে।

এদিকে, একদিন পড়াতে না যেতে ঝুনুর মা ভাবল—হয়তো, ঠিকমতো খবরটা পায়নি, তাই আসেনি। তারপরেও দুদিন না যেতে ঝুনুর মা একদিন সকালেই মুক্তির বাড়িতে এল। মুক্তিকে বলল—তুমি ভাই, পড়াতে যাওনি কেন?

মুক্তি বলল—দাদা কিছু বলে নি? আমি দাদাকে তো সব বলে এসেছি। ঝুনুকে অঙ্ক, ইংরাজি পড়াতে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। কবে সেই পাশ করেছি, এখনও কী আর মনে আছে। আপনারা আমাকে এত ভালোবাসেন। তাই আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না। তারপর নিজের অক্ষমতার জন্যে ঝুনুর জীবনটা কেন নষ্ট করব? ও খুব ভালমেয়ে। আপনারা একটা ভালো মাস্টার দিন। দেখবেন, ও খুব ভাল রেজাল্ট করবে।

—সে তো ঠিক আছে। কিন্তু এই মাঝপথে মাস্টার পাই কোথায় বলো তো?

—আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনি গিয়ে শ্রীকান্তকে বললেই হবে। শ্রীকান্তকে চেনেন তো?

—শ্রীকান্তকে আবার চিনব না। ও হলে তা ভালই হয়। ঠিক আছে ভাই। এই নাও। এই মাসের টাকাটা রাখো।

ঝুনুর মা পাঁচশো টাকার একটা নোট মুক্তিকে দিতে গেল। মুক্তি বলল—না, না, টাকা লাগবে না। এই মাস এখনো শেষই হল না।

—নাই হোক। তুমি টাকাটা নাও। গুরুদক্ষিণা না দিলে আমার মেয়ের অমঙ্গল হবে। তুমি আর ভাই, না করো না।

মালিনী এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। এবার মুক্তিকে বললো—এত করে

যখন বলছে, নে না। ওদের আবার মনটা খচখচ করবে।

ঝুনুর মা বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন দিদি। নাও ভাই, টাকাটা ধরো।

মুক্তি টাকাটা নিল। ঝুনুর মাও খুশিমনে বাড়ি ফিরে গেল।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই মুক্তি, শ্রীকান্তকে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিল। মুক্তি জানে, পরীক্ষার সময় কেউ-ই নতুন করে পড়াতে চাইবে না। তাতে ঝুনু খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে। ভাল মেয়েটা, নষ্ট হয়ে যাবে। সে তো মুক্তির কাছে কোনো অন্যায় করেনি। অন্যায় করেছে ওর বাবা। বাবার পাপের ফল, মেয়ে কেন ভোগ করবে? পক্ষান্তরে সেটাই হতে চলছিল। সেটা যাতে না হয়, তাই আগে-ভাগেই মুক্তি এই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

এইভাবেই বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। সহেলী গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। এখন তার বিয়ের জন্য জোরকদমে দেখাশোনা চলছে। দুর্ভাগ্য কিন্তু মুক্তির পিছু ছাড়েনি। ইতিমধ্যেই বছর খানেক আগে সুদীপ ডিভোর্সের মামলা রুজু করেছে। মুক্তি শমনও পেয়েছে। কোর্টে কেস চলছে।

সে যা পারে হোক। মুক্তি নিজেকে নিয়ে আর ভাবে না। এখন তার ভাবনা সহেলীকে নিয়ে। দিদি-জামাইবাবুও সহেলীকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছে। এত দেখাশোনা হচ্ছে, একটাও ঠিক হচ্ছে না। কত ভাল-ভাল ছেলে এল। দিদি-জামাইবাবুর সবেতেই না। মুক্তি কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। দিদিকে জিগ্যেস করলে বলে—তুই ও-সব বুঝবি না। জেনে-শুনে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেব নাকি?

—কী বলছ দিদি। তাপস কী খারাপ ছেলে? ব্যাঙ্কে চাকরি করে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। নিজেদের দোতলা বাড়ি। জমি-জমাও আছে। তাছাড়া কথাবার্তা বলে তাপসকে আমার খুব ভালও লেগেছিল। ওদেরও তো সহেলীকে পছন্দ ছিল। মাঝখান থেকে তোমরা সম্বন্ধটা ভেঙে দিলে। কী বুঝলে, জানি না বাবা।

—আমরা ঠিক-ই বুঝেছি। তোকে ও-সব নিয়ে ভাবতে হবে না।

—কেন ভাবব না বলো তো? আমি তো ওর মাসি। ওর ভাল-মন্দ ভাবার অধিকার তো আমারও আছে। তোমাদের মেয়ে বলে, তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো না। সহেলীর দিকে তাকালে আমার খুব কষ্ট হয়! ওর মনের অবস্থাটা একবার ভাবো দেখি!

কথাগুলো বলে মুক্তি কাঁদতে শুরু করল।

বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে মালিনী বললে—পাগলী কোথাকার! এতে আবার কান্নার কী আছে। তুই একশোবার ভাববি। কেন ভাববি না! মাসি আর মা কী

আলাদা। আমরাও তো ভাবি রে! খুব ভাবি। কিন্তু কী করব বল?

তারপর মুক্তিকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল মুছে দিতে-দিতে মালিনী বলল—তোর অবস্থাই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। তাই খুব সন্তর্পণে আমাদের পা ফেলতে হচ্ছে। বাইরে থেকে যেটা তুই ভাল ভাবছিস, ভিতরে কিন্তু সেটা তত ভাল নয়। শেষ পর্যন্ত তাই আমরা পিছিয়ে আসছি। দেখা যাক, ভগবান কবে মুখ তুলে চান! চুপ কর বোন। আমরা ভেবে কী করব বল না। কথায় আছে না—জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—কার কবে হবে কেউ জানে না। সময় হলেই ঠিক ফুল ফুটবে। আমরা তো চেষ্টার কম করছি না।

দিদির স্নেহের পরশে মুক্তি সব অভিমান দূর হয়ে যায়।

সহেলীর দেখাশোনা সমানতালে চলছে আবার ভেঙেও যাচ্ছে। ইদানীংকালে মুক্তি লক্ষ্য করল—দিদি যেন তাকে কিছু লুকোতে চাইছে। দিদি-জামাইবাবু যখন কথা বলে, মুক্তি গেলেই চুপ করে যায়। তাদের চোখে-মুখে একটা অস্বস্তির ছাপ ফুটে ওঠে। মুক্তি বুঝতে পারে না। এর মানে কী? কেন-ই বা চুপ করে যায়? কী এমন কথা হতে পারে? পরক্ষণেই ভাবে—হয়তে সহেলীর চিন্তায়। পাছে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়, তাই হয়তো আমার সামনে ও-সব আলোচনা করতে চায় না। নাহলে কী আর হবে?

কিন্তু হয়ে গেল। সেদিন মুক্তি বাজার থেকে ফিরছে। বাজার করতে একটু বেলাও হয়েছে। মাথার ওপর গনগনে রোদ। একহাত ভারী ব্যাগ নিয়ে এক হাতে ছাতা ধরে হাঁটতেও মুক্তির বেশ কষ্ট হচ্ছে। মান্নাপাড়ায় আসতেই মান্না কাকিমা বললেন—কী গো মেয়ে! এত বেলায় কোথা থেকে?

—দেখুন না কাকিমা। বাজার করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।

—এসো না মা। সদরে বসে একটু জিরিয়ে নাও। ঘেমে একেবারে চান করে গেছ। এসো, এসো।

মুক্তি দেখল, কথাটা খারাপ নয়। একটু রেস্ট নেওয়াই যাক। সদরে উঠে, ব্যাগটা রেখে, ছাতা বন্ধ করে মান্না কাকিমার পাশে মুক্তি বসল।

এ-কথা, সে-কথা গল্প করতে-করতে মান্না কাকিমা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বোনঝির কোথাও ঠিক হল?

—না কাকিমা। দিদির একটাও পছন্দ হচ্ছে না।

—কে তোমাকে বলল? তোমার দিদি নয়, ছেলেপক্ষই না করে দিচ্ছে। গ্রামেরই সবাই তো তাই বলছে। যেদিন দেখতে আসবে তুমি বাবু অন্য কোথাও তো সরে থাকতে পারো। ওদের সামনে যাবার কী দরকার!

—কী বলছেন কাকিমা!

—হ্যাঁ মা, তুমি কষ্ট পাবে বলে হয়তো তোমার দিদি তোমাকে কিছু বলে নি। সব সম্বন্ধও তো তোমার জন্যেই ভেঙে যাচ্ছে।

—আমার জন্যে!

—তোমার বোনঝি তো দেখতে-শুনতে ভালই। লেখাপড়া শিখেছে। পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণ-ই নেই। কিন্তু ছেলে-পক্ষের কানে কেউ ঠিক তুলে দিচ্ছে—তুমি স্বামীকে মেরে জেল খেটেছ। তাই তো শেষপর্যন্ত ছেলের বাড়ির লোক পিছিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার লোকও তো ভাল নয়। পরের ভাল দেখলেই হিংসায় জ্বলে যায়। ও-সব কথা ছেলের কানে তোলার কী দরকার আছে। তাই বলছিলাম মা—তুমি যদি সামনে না থাকো, তাহলে তোমার কথাই আর উঠবে না।

মুক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে আর কথা সরছিল না। উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলল। কোনো রকমে বাজারের ব্যাগটা নিয়ে "আসছি কাকিমা"—বলে মুক্তি সদর থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

এ কী সে শুনল! এর চেয়ে যে মরণও তার ভাল ছিল। ওই জন্যেই সে কাছে গেলেই দিদি-জামাইবাবু চুপ করে যায়। পাছে সে সব জেনে ফ্যালে। মুক্তির একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দিদি! সত্যি কথা কোনোদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। এই তো জেনে ফেললাম। আমাকে সুখে রাখতে কী যন্ত্রণাই না তোমরা বয়ে চলেছ। এমনকি নিজের মেয়ের জীবনকেও বাজি ধরেছ। কেন দিদি! আমাকে এত ভালবাসো কেন? মা হয়েছ বলে! তুমি যদি আমার মা হও, তুমি তো সহেলীরও মা। একটা মেয়ের সুখ কিনতে গিয়ে আর একটা মেয়েকে কেন বলি দিচ্ছ! এ তুমি কেমন মা! এ-সুখ আমি কক্ষনো চাই না, কক্ষনো না।

মুক্তি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মনের মধ্যে এই দুরন্ত তুফানের আঁচ মুক্তি বাড়িতে কাউকেও বুঝতে দিল না। সারাটা দিন স্বাভাবিক ভাবেই কাটল। রাত্রেও খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ল। সহেলী মুক্তির কাছেই শোয়। রোজ জড়িয়ে ধরে সহেলীকে ঘুম পাড়ায়। আজ আর তা পারল না। মনে হল—তার ছোঁয়ায় বিষ আছে। সহেলী জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সে কী করবে এখন? তার কী করা উচিত? সে এখান থেকে চলে যাবে? কিন্তু যাবেটা কোথায়? তার সব পথ যে রুদ্ধ। হায় ভগবান! এ কী বিপদে ফেললে আমাকে।

মাসি রোজই জড়িয়ে ধরে ঘুম পাড়ায়। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে সহেলী বললো—কীগো মাসি, ঘুম পাড়াবে না?

নিজেকে সামলে নিয়ে মুক্তি বলল—না, মানা। তুমি তো বড় হয়েছ। দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি যাবে। তখন আমাকে কোথায় পাবে? বদ্ অভ্যেসটা পালটাও।

নিজে ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি তো তোমার পাশেই আছি।

গল্পটা এই পর্যন্ত বলেই রিকি থেমে গিয়েছিল। বলেছিল—আর সে জানে না। আমি এবার খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। এমন একটা ক্রিটিক্যাল জায়গায় এসে গল্পটাকে ছেড়ে দিল! আমি এখন কী করি? শেষ তো একটা টানতেই হবে। গল্পটাকে আবার প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত মনে মনে ভাঁজতে লাগলাম। বিচার-বিশ্লেষণ করে যা পেলাম, তা এইরকম—

মাসির এই অস্বাভাবিক আচরণের কোনো মানে সহেলী খুঁজে পেল না। ভাবতে-ভাবতে একসময় সহেলী ঘুমিয়ে পড়ল। মুক্তি বসে থাকে। নীরব, নিথর। নিঃশব্দ রাতের নিঃসঙ্গতা তাকে ছুঁয়ে যায়। অনুভূতির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অসহায়তা তাকে অবশ করে দেয়। নিজেকে খুব নিঃস্ব মনে হয়। পৃথিবীতে আজ সে বড় একা। সব পেয়েও, সব হারানোর বেদনায় তার চোখে জল নেমে আসে।

মুক্তি বিছানা থেকে নেমে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। জীবনে অনেক নিদ্রাহীন রাত সে কাটিয়েছে। প্রহর গুনেছে—আকাশের দিকে তাকিয়ে। আজও সে আকাশের দিকে তাকাল। শুধু তাকিয়েই রইল। কোনো প্রহর গুনল না। কেননা, প্রহর কাটলেই আকাশ ফর্সা হবে। আবার সকাল আসবে। সে আর সকাল দেখতে চায় না। অনন্ত আঁধারের মধ্যেই আজ যেন তার শান্তি। হাতড়ে বেড়ায় জীবনের সালতামামি। আবিষ্কার করে নিজেকে। মনে হল—তার জন্মটাই পাপ! নাহলে জন্ম দিয়েই মা চলে যাবে কেন? তার পাপেই মা মরেছে। সে মাতৃঘাতিনী! স্বামীকে আঁকড়ে ধরে সন্তান-সংসার নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কী পেল? স্বামীর সব অত্যাচার, ব্যভিচার মেনে নিয়েও স্বামীঘাতিনীর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। হায় রে কপাল! মাতৃস্নেহে যে দিদি তাকে বড় করে তুলল, আপদে-বিপদে ছায়া দিয়ে আড়াল করে রাখল, আজ তার জন্যেই দিদির জীবন বিপন্ন। সংসারের সুখ-শান্তি সব নষ্ট হতে চলেছে। শুধু সে-ই দায়ী। তার নিঃশ্বাসে বিষ। সে একটা অশনি সংকেত। যেখানেই তার ছায়া পড়ছে সব ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

মুক্তি জানলা থেকে সরে এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল। সহেলী ঘুমোচ্ছে। ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটার তো কোনো দোষ নেই। যৌবনের অলিন্দে পল্লবিত বসন্তের রঙিন স্বপ্নে ও বিভোর। সেই স্বপ্নকে সে ভেঙে দিতে পারে না। নিজের তপ্ত জীবনের দাবদাহে সহেলীর ফুটন্ত ফাগুনকে সে শুকিয়ে দিতে পারে না। কক্ষনো না, কক্ষনো না। এ যেন তার কাছে এক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জে তাকে জিততেই হবে।

মুক্তির চোয়াল শক্ত হল। চোখ বিস্ফোরিত হল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে

রইল সহেলীর দিকে।

কেউ চাক বা না চাক স্বাভাবিক নিয়মেই সকাল হয়। সকাল হল। দিদির সঙ্গে সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে মুক্তি স্নান সেরে বাজারের ব্যাগ নিয়ে দিদিকে বলল—দিদি, বাজারে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, আয়। বেলাতে যা রোদের তাপ। তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু।

মুক্তি বাজারে এল। বাজার ক'রে, ডাক্তার খানায় ঢুকল।

ডাক্তারবাবু বললেন—বলুন, আপনার কী হয়েছে?

—দেখুন না, এই কয়েকদিন হল ভাল করে ঘুমোতে পারছি না। শরীরের যেন কোনো বল নেই।

—দেখি, আপনার হাতটা দিন?

হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তারবাবু প্রেসার মাপার যন্ত্র দিয়ে প্রেসারটা দেখে বললেন—হুঁ, আপনার ব্লাড-প্রেসার তো খুব লো। আর কী অসুবিধে হচ্ছে?

—না, আর তেমন কিছু নয়। আমার মনে হয় ঘুমোতে পারলেই, আমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে। দেখা যাক। আমি এখন তাহলে আপনাকে অন্য কোনো ওষুধ দিচ্ছি না। একটা স্লিপিং-পিল লিখে দিচ্ছি। এটা কিনে নিয়ে যান। রোজ রাত্রে শোবার সময় একটা খেয়ে শুয়ে পড়বেন। এক সপ্তা পরে আসবেন। অবস্থা দেখে, ব্যবস্থা করা যাবে। কেমন?

ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশান লিখে মুক্তির হাতে দিলেন। মুক্তি ভিজিটের টাকা দিয়ে, ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে, ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরল।

মুক্তি সারাটা দিন হই-হুল্লোড় করে কাটাল। মালিনী খুব খুশি। ডির্ভোসের সমন পাওয়ার পর থেকেই মুক্তি কেমন চুপচাপ থাকত। কথা কম বলত। সব সময় কী যেন ভাবে। মালিনী বোঝে—তার মনের কষ্ট। কিন্তু কী-ই বা করার আছে। চাইলেই তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। ভাগ্যকে মানতেই হবে। এতদিনে যাইহোক ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। মেয়েকে হাসি-খুশি দেখলেই তো মায়ের শান্তি। মালিনী, মুক্তির এই পরিবর্তনে যারপরনাই খুব আনন্দ পেল।

রাত্রি হল। খাওয়া-দাওয়া করে সবাই শুয়ে পড়ল। মুক্তিও শুয়ে পড়ল। সহেলীকে জড়িয়ে ধরে আদর করে ঘুম পাড়াতে লাগল। মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে মুক্তি কেমন আনমনা হয়ে গেল। মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ঘনীভূত ভালবাসা আর বেদনার নিম্নচাপে চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল সহেলীর হাতে। গরম জলের ছোঁয়া পেতেই সহেলী চমকে উঠল—মাসী, তুমি কাঁদছ!

তারপর মাসিকে জড়িয়ে ধরে সহেলী আবার বললো—তুমি কাঁদছ কেন মাসি? তোমার কী হয়েছে?

—কী আবার হবে? বিয়ের পর তুই চলে যাবি—মনে হতেই কান্না পেয়ে গেল। মাসিকে আর মনে থাকবে!

—ঠিক থাকবে। দেখো, মাসে একবার অন্তত আমি এসে তোমাদের দেখে যাব। তারপর মন খারাপ করলে তোমরাও আমার বাড়ি চলে যাবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। নাও হয়েছে। এবার চুপ করে ঘুমোও দেখি।

সহেলী ঘুমিয়ে পড়ে। আস্তে-আস্তে সহেলীর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্তি বিছানা থেকে নামল। টেবিল থেকে ব্যাগটা নিল। ব্যাগ খুলে স্লিপিং পিলের পাতাটা বের করল। এটাই আজ তার চ্যালেঞ্জের মোক্ষম অস্ত্র। নিয়তির সব খেলা সে আজ শেষ করে দেবে। ভগবান, তুমি ভেবেছিলে—আমাকে শিখণ্ডি করে আমার সব প্রিয়জনকে তুমি কেড়ে নেবে। অনেক কেড়ে নিয়েছ। আমার মাকে কেড়ে নিয়েছ, আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছ। আমার দিদিকে আমি কেড়ে নিতে দেব না। শ্মশানের নীরবতায় আমার বুকে আগুন জ্বেলে তুমি অট্টহাসি হাসবে? তা আর হবে না। তুমি অনেক চাল চেলেছ। এবার আমার চালে তোমাকে কিস্তিমাত করে দেব।

ঘুমের বড়িগুলো হাতে নিয়ে মুক্তি থমকে গেল—সুদীপ, তুমি ডির্ভোসের মামলা করেছ না? তুমি কী আমাকে ডির্ভোস করবে? আমিই তোমাকে ডির্ভোস করে দিলাম। পদ্মমণিকে নিয়েই তুমি সুখে থাকো। চাইলেও আর কোনোদিনই আমার ধরাছোঁয়া পাবে না।

দিদি! এই হতভাগিনী বোনকে তুমি ক্ষমা কোরো।

সকালে ঘুম ভেঙেই সহেলী দেখল, মাসি পাশে নেই। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। দেখল—মেঝেতে মাসি পড়ে আছে। অনেক ডাকল। ঠেলাঠেলি করলো। মাসির কোনো সাড়া নেই। চিৎকার শুনে মালিনী এসে দরজায় ধাক্কা মারল—কী হয়েছে সহেলী? দরজাটা খোল?

সহেলী দরজা খুলে দিল। বলল—দ্যাখো মা, মাসি কোনো কথা বলছে না। মালিনী দেখল—মুক্তির সারা শরীর ঠাণ্ডা। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে না। বোনের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

লোকজন জড়ো হলো। ডাক্তার আনা হল। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন—এ-তো অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। তারপরে খাটের তলা থেকে স্লিপিং পিলের পাতাটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে বললেন—ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। টেবিল থেকে একটা চিঠিও পাওয়া গেল। তাতে লেখা আছে—পৃথিবী

আমার কাছে আর বাসযোগ্য নয়। তাই আমি চললাম—স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে।—মুক্তি।

গল্পটাকে এইভাবেই শেষ করলাম। ছাপতে দেবার আগে ভাবলাম—রিকিকে একবার পড়ানো দরকার। ওর কেমন লাগল বা ওর যদি কোনো মতামত থাকে। রিকিকে রিং করলাম। ওপার থেকে ভেসে এল—দাদা, কেমন আছেন বলুন। গল্পটা কতদূর এগোল।

বললাম—সেই কথাই তো বলছি। গল্পটা লেখা হয়ে গেছে। তুমি এসে একদিন দেখে যাও। তারপর ছাপতে পাঠাবো। বেশি দেরি করো না।

দেরি কী বলছেন দাদা! আমি আজই যাচ্ছি। থাকবেন তো?

এসো। বাড়িতেই আছি।

রিকি দুপুরেই এসে হাজির। আমি সেইমাত্র খেয়ে-দেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। বললাম—এসো।

রিকি ঘরে এসে বসল। আমি টেবিল থেকে গল্পটা দিয়ে বললাম—বেশ ভাল করে পড়বে। বিশেষ করে শেষটা। ওটা তো আমার মতো করে লিখেছি। পড়ে দ্যাখো। তোমার ভাল লাগে কী না?

রিকি মনোযোগ দিয়ে গল্পটা পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে বলল—দাদা, একটা কথা জানতে পারি!

—অবশ্যই। বলো, কী জানতে চাও?

—মুক্তির এছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না, না?

—না, উপায় ছিল না। মুক্তি একটা রুচিশীল, শিক্ষিত, ভদ্র মেয়ে। সে ছিল ভালবাসার কাঙাল। সমাজ তাকে যা দিল না, সে তা পেয়েছিল শুধু দিদির কাছ থেকে। আর একটু অশুভ গ্রহের মতো সেই দিদির সংসারেই তার ছায়া পড়ল। তার জন্যেই যে সহেলীর বিয়ে বারবার ভেঙে যাচ্ছে, দিদি তাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি। সমস্ত যন্ত্রণাকে বুক পেতে সহ্য করেছে, শুধু বোনের জন্য। পাছে মুক্তি না জানতে পারে।

কিন্তু মুক্তি জানতে পারল। আর জানতে পারল বলেই সে অস্থির হয়ে উঠল। জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্টকে সে হাসিমুখে সহ্য করেছে। কিন্তু দিদির কষ্ট—তার সমস্ত মনকে ভেঙে খানখান করে দিল। তার মনে হল—না। কোনো মতেই সে দিদির সুখ-শান্তি কেড়ে নিতে পারে না। দিদি তাকে সারাজীবন অনেক কিছুই দিয়েছে। মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেছে। বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিয়েছে। বিয়ের পরবর্তীকালে তার দুর্ভাগ্যের সাথী হয়েছে। অবধারিত সাজার

হাত থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত অপবাদকে মাথায় নিয়ে নিজের সংসারে ঠাঁই দিয়েছে। আর সে-ই কিনা তার দুশ্চিন্তার কারণ! মুক্তি জানে—দিদি তাকে কোনোদিন-ই মুখ ফুটে কিছু বলবে না। আর এটাই তার মনকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। তাকে ভালবেসে দিদি যদি এত কষ্ট সহ্য করতে পারে, তাহলে দিদিকে ভালবেসে সে কেন তার সুখ-শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তার পাপের ফল দিদির সংসারকে কেন তছনছ করে দেবে? এই ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়েই বা কী লাভ! যে জীবনের কোনো মানে নেই, যে জীবনের সংস্পর্শে সব ছারখার হয়ে যায়, সেই জীবন শেষ করে দেওয়াই ভাল। অন্তত একটা শান্তি সে পাবে—মাতৃসমা দিদির সে কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি। ওইটুকু সম্বল নিয়েই সে পারের খেয়ায় পাড়ি জমালো।

কথাগুলো বলে আমিও খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম। ঘরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা ঘুরে বেড়াতে লাগল। রিকিও একমনে কী ভেবেই চলল। অনেকক্ষণ পরে বললাম—কী রিকি, কী ভাবছ? শেষটা ঠিক মনের মতো হল না?

রিকি শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—না, না। ভাবছি, কী আশ্চর্য মিল!

—কোথায়?

—আপনার ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনার। জানেন তো, শেষটা ওইরকমই আমি ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু দাদা, বই ছাপা হলে আমি যেন একটা পাই।

—পাই মানে? প্রথম বইটাই আমি তোমাকে উপহার দেব। তোমার জন্যেই লেখা হল, তুমি পাবে না! এটা ভাবলে কী করে!

—ঠিক আছে দাদা, আমি তাহলে এখন আসি?

—হ্যাঁ, এসো।

রিকি চলে গেল। পরের দিন গল্পটা কোলকাতায় আমার প্রকাশকের কাছে দিয়ে এলাম। তারা বই ছাপার তোড়জোড় শুরু করে দিল।

দিন পাঁচেক পরের কথা। আমি সকালে চা-টা খেয়ে বসে আছি। হঠাৎ ইতি এসে ঘরে ঢুকল। চোখে-মুখে একটা উদ্বেগ। দেখে মনে হয় সারারাত্রি ঘুম হয়নি। বললাম—কী রে! এত সকালে। বাড়ির খবর সব ভাল তো?

—হ্যাঁ, বাড়ির খবর সব ভাল।

—তাহলে তোকে এত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন?

—মুক্তি কাল আত্মহত্যা করেছে।

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন মুক্তি!

আঁচলে চোখ মুছে ইতি বললো—ও, তুই বোধ হয় জানিস না। রিকির ভাল নাম মুক্তি। রিকি কাল রাত্রে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। টেবিলের ওপর তোর নাম লেখা এই চিঠিটা পাওয়া গেছে। এই নে ধর। আমি এখন

আসছি। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। আমি গেলে তবে দাহকার্য করবে।

আমার হাতে চিঠিটা দিয়ে ইতি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার যেন ঠক বিশ্বাস হচ্ছে না। রিকি, মানে রিকিই মুক্তি। আশ্চর্য! আমি একটুও বুঝতে পারলাম না। চিঠিঠা নেড়েচেড়ে দেখলাম। আমার নামটাই লেখা আছে—অরূপ পাঁজা। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম—দাদা, আমার প্রণাম নেবেন। খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন তো! আসলে যেটা বলেছিলাম, সেটা আমারই জীবনবৃত্তান্ত। ভাবুন তো, এইরকম একটা হতভাগিনী মেয়ের মৃত্যু ছাড়া আর কী উপায় আছে! এর জন্যে আপনার কোনো দোষ নেই। আমি সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলাম। ভাবছেন, তাহলে আপনাকে দিয়ে লেখালাম কেন? কী জানেন তো, আমার কথা আমি হয়তো সাজিয়ে-গুছিয়ে এইভাবে ঠিক বলতে পারতাম না। আপনি আমার জীবনকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। তাই আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার বই পড়ে লোকে জানুক—মেয়েরা সমাজে আজও কীভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত। কিভাবে একটা স্বপ্ন তিলে-তিলে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। তবে আমি কারও করুণা চাই না। আপনার কাছে দাদা, একটা অনুরোধ, বই যদি ছাপা না হয়ে থাকে তাহলে একটু লিখে দেবেন—মুক্তি কারো করুণা চায় না। আর কোনো মুক্তিকে সমাজ যেন এইভাবে চলে যেতে বাধ্য না করে, তাহলেই মুক্তির আত্মা শান্তি পাবে।—ইতি রিকি ওরফে মুক্তি।

প্রকাশককে ফোন করে, রিকির শেষ ইচ্ছাটা যোগ করে দিলাম। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। চিটিটা বারবার পড়লাম। রিকিই মুক্তি বা মুক্তিই রিকি—এই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে আমার অনেকখানি সময় লাগল। একটুও যদি বুঝতে পারতাম! তাহলে গল্পটাকে হয়তো অন্যভাবে শেষ করলেও করা যেতে পারত। বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দূরে কোথাও মাইকের গান ভেসে আসছে—"দুহাতে তোমার ওগো ধরে গেল সব কিছু, ধরল না শুধু এই স্মৃতিটা; রয়ে গেল শেষদিন, রয়ে গেল সেদিনের প্রথম দেখার সেই রেশটা।"

সত্যি। রিকি চলে গেল। পড়ে রইল তার স্মৃতি। বিয়েবাড়িতে প্রথম আলাপের সেই মুহূর্তগুলো আজ বড় বেশি করে মনে পড়ছে। তারপর যেদিন আমার বাড়িতে এল—সেটাই যে তার সঙ্গে শেষ দেখা, একটুও ভাবতে পারিনি। তাকে দেখে একটুও বোঝা যায়নি যে গল্পটা তার জীবনেরই। শেষ পরিণতির বিন্দুমাত্র ছায়াও তার চোখে-মুখে দ্যাখা যায়নি। কী নির্লিপ্ত আর নির্বিকার!

এক অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণায় আমি কাতর হয়ে পড়লাম। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মনে-মনে শপথ করলাম—আর যাই লিখি, কোনোদিন কারো ফরমায়েশ করা গল্প আর লিখব না।

বহির্বঙ্গ

প্রাণজি বসাক (দিল্লি)

বিছানায় জীবন পাতা

বিছানায় জীবন পেতে রেখে
আজ মাঝরাতে ঠ্যাং ঠ্যাংগা পায়ে উড়ালপুলে চাঁড়ি
অন্ধকার সরিয়ে আলোরা নাইট স্কুলে বসেছে
আমিও বসে পড়ি

প্রেয়ার লাইন সেরে নাম ডাকা জাবেদা খাতায় জীবন লিখি
আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড একটা ব্ল্যাকবোর্ড
তাতে চকমকা তারায় আঁকা তারা
দিদিমণির হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে মুছে যায়

আমার দেখাদেখি একটা নিশাচর পাখি এসে বসে রেলিং শেষে
গণিতে তার মুণ্ডু নেই বলে নামতা পড়ছে অনর্গল
তেনার বড্ড তেষ্টা পায় জল খেতে চায়
এখানে জল বলে কিস্‌সু নেই—যা আছে তা পানীয়
ছায়ারা হাসে

আমাকে সে ইশারায় ডেকে নেয় রেলিং পাশে
বলে—সারারাত তো অনেক পড়লে এখন ভোর হয় হয়
চল গাছে চড়বে গাছ থেকে ছাদে
ছাদ থেকে আসমানে অআসমানে

আইডিয়াটা মন্দ নয় তবে ওই অনন্ত আকাশে একা একা
বলি দাঁড়াও—বিছানায় জীবন পাতা আছে
তাকেও নিয়ে আসি সাথে।

কমলেশ রায় (উত্তরপ্রদেশ)

চির জীবতু ভবান

আমরা অনেকেই হয়তো থাকব না
সময় কিন্তু এগিয়ে যাবেই
তখন ২০৫৯ সাল।

এমনি করেই উনিশ উনষাটে
অনুর্বর লাল মোরাম মাটিতে
আমরা পুঁতেছিলাম
মায়ের বোলের সুরে, একটি রজনীগন্ধা।

আজ পঞ্চাশে পা দিল সে।

আমাদের রজনীগন্ধা এনেছে
বাংলা মায়ের মধুর ভাষার আবেশ!
ইস্পাতী আকাশ ভরেছে
ভাটিয়ালি কীর্তনের মনমাতানো সুরে
ভিলাই-এর বাঙালিরা কি ভুলে যাবে বাংলা!

বাঙালির ক্লাবঘর, কালীবাড়ি বেঁচে থাকবে
বেঁচে থাকবে আরও সমৃদ্ধ বাঙালি।
সেদিন কে তুমি পড়িছ বসি
অঙ্কুর-এর কবিতাগুলি শতবর্ষ পরে?
তোমরাই বাঁচিয়ে রাখবে
এই রজনীগন্ধাটিকে।

মাভৈঃ।
বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্থা
চির জীবতু ভবান।

সুকুমার চৌধুরী (মহারাষ্ট্র)

ভাঁড় ও ভবানী

বুড়ো বয়সে চমৎকার সব
বস্তুনিষ্ঠ পদ্য লিখেছিলেন সমর সেন।

বুড়ো হতে না হতেই আজ আমরা সেই
সব পদ্যের সকাম উৎকর্ষ ভালোবেসেছি।

যেমন ব্যবহৃত হতে হতে কখন যেন
আমরা বদলে ফেলেছি আমাদের ব্যবহারবিধি

উল্টেপাল্টে আর নেড়েচেড়ে আগেভাগেই
চেখে নিতে চেয়েছি অন্তসারশূন্যতার নিরিখ।

সংগোপন গেরিলা প্রগতির ঢের আগেই
দেখে নিতে চেয়েছি অন্যদিকের চোরাটান।

আর আমাদের সকল ভ্যানিটিব্যাগে রাশি রাশি
রেনকোট ছোট ছোট পাউচে খেলিয়ে রেখেছি।

বলা যায় না কখন কোথা থেকে
এডিস বা সোয়াইন ফ্লু অথবা কর্কট।

ভাউতন্ত্র নিয়ে অল্প লিটারেসি আর খুব
বেশি ভাউ খেলে ভাঁড়ে ঠেলে দিয়েছি ভবানী।

শঙ্কর ভট্টাচার্য (মিজোরাম)

নিসর্গ তোমার কাছে

তোমার কাছে অনেক দেনা কাঁচা গন্ধ ধানশিষ
ঋণের বোঝায় ক্লান্ত আমি বৃষ্টি বাদল কাজলা দিন
চোখের পাতায় ভরছে জল শূন্যতায় রাত্রি দিন
মধ্য যামে আগল খুলে উজাড় করে বক্ষচূড়া
জোছনা ওড়ে পাখির মত খোলস ছাড়া মেঘমালা
গন্ধ ছড়ায় চাঁপার কলি সবুজ ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে
ডাকছে যেন আকুল করে সোনাজঙ্ঘা কাস্তে চরা।

বারীন ঘোষাল (ঝাড়খণ্ড)

শোনাটা

নির্জন নদী আর নিনদী জল
একলানা
দিল মন নামী চিত্রগান
কপি করছে জলের শোনাটা

তার বাতাস চেরা আকুল বিকুল জিভ
রব রবি নাই নাই করা
ছায়াতলা বাড়ি
গুমগুমি গিরিবাজ
সিটি খেয়ে উঠেছে আর সেই উঠেছে

মনে মজায় বেশ্যাবাসী
ওংকারে মন্তর
নদী বদলে যাচ্ছে ক্ষীণে
ক্ষীণকলিটি তারা নোভায়
তারা আর আমাদের কথা শুনলো না

বোট ওশনের কাগজে বাহিনীর ছবি
খবর পড়ছে
চোখে
বৃক্ষ ফোঁটা ফোঁটা
তর্জনীর শব্দ
কেবল তর্জনীর শব্দ

জগত দেবনাথ (মহারাষ্ট্র)

অন্নকূট

তিনকাল কেটে গেল
দিব্যি ফ্যানে ভাতে
এককাল বাকি
আর কত কাল, কত কাল
নবান্ন খাব
ধানক্ষেতের আলে বসে?

এবার শুনেছি
সারা মাঠ জুড়ে বসবে
অন্নকূটের মেলা।
পরমান্ন পরিবেশন করবেন
স্বয়ং অন্নপূর্ণা
পেট পুরে খায় যেন
কচিকাঁচারা
বয়স হয়েছে আমাদের
কেটে গেল তিনকাল।

কচিকাঁচাগুলো যেন
খেতে পায় পেট পুরে
নজর রেখো কিন্তু।

আরতি চন্দ (ছত্তিশগড়)

আজ গোধূলি বেলায়

সেদিন ছিল গোধূলি লগন
কিশোরী হৃদয়ে
প্রথম ভালবাসার অনুভূতি
অজানা পুলকে ভাললাগার অনুভব।
নির্জনে নীরবে অকারণে
শুধুই ভাললাগা
আর ভালবাসার গুনগুন

আজ জীবনের গোধূলি বেলায়
সেই ভাললাগার ভালবাসার
অনুভব থেকে অনেক দূরে
এখন শুধুই অবসর।
ভালবাসার পাত্রের প্রিয় মুখটা
ম্লান সাদা-কালো ছবির মতো
আবছা অস্পষ্ট
অনেক কিছুই যে বলা হল না তাকে।
ভালবাসার না বলা কথা
জমে জমে পাথর হয়ে গেল বুকের ভেতর
আবার কোনদিন
তার সাথে হবে কি দেখা?
গোধূলি বেলায়
বলে যেতে পারব কি
সেই না বলা শাশ্বত কথাটি

'ভালবাসি শুধু তোমাকেই'।

দীপিকা বিশ্বাস (আসাম)

মানচিত্র

আমাদের বসার ঘরে 'দেশ' ও দেশের মানচিত্র
সাজানো গোছানো থাকে
ট্রলি-টেবিল স্ট্র-সমেত সরবত আসে
যে টেবিল ঠেলে আনে তাদের ঘরের একপাশে
দিনে একবারই আগুন জ্বলে
অন্যপাশে শুয়ে থাকে এক বেদনার শরীর ঘিরে
অপরিণত শিশুর জড়-বোধ
এসব কথা জেনেও সরবতে চিনি মেলাতে দেরি হলে
আমি তাকে যথেষ্ট চেষ্টা করি সহবৎ শেখাতে
বুঝতে চাই না সে তখন সরবতে সোহাগ মিশিয়ে
অতিথির চোখের কাচে
তাদের ঘরের বদলে-যাওয়া মানচিত্র খোঁজে।

সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (শিলচর)

ঈশ্বর

পথ চলে গেছে ধর্মনগরের দিকে,
এ পথ স্বর্গে গেছে কি না জানা নেই, কিংবা নরক,
এই পথের ধারে স্বর্গের বাগান
ঈশ্বরের হাতে তৈরি,
পাহাড়ের গায়ে ফুটে থাকা নাম-না-জানা ছোট্ট একটি ফুলে
তাঁরই শরীরের গন্ধ।
আমার দেখার মধ্যে দিয়ে তিনি দেখছেন নিজেকে, আবার
পথের পাশের টিনে ছাওয়া ছোট্ট কুটিরের দাওয়ায়
চাকমা রমণী হয়ে তিনিই রয়েছেন বসে,
আর তাঁরই বাসে আমরা কুড়িজন ঈশ্বর
ছুটে চলেছি ধর্মনগরের পথে।

বাসের বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে দেখতে পাই
একবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছেন তিনি সেগুনের জঙ্গলে,
আবার রোদ হয়ে হেসে উঠছেন নিজের মনে,
এ এক অদ্ভুত বিস্ময়।
যিনি মায়াধীশ তিনিই আবার মায়াধীন।

পেন্ডুলামে যেমন সময় দোলে
দুলছে তার ঢেউ।
আর তার ভিতরেই ওঠা পড়া
কখনও শ্রাবণের মেঘে বৃষ্টি
কখনও জ্যৈষ্ঠের রোদে খরা।

আর আমি বসে আছি তার ধারে,
একটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে,
হাতে জ্বলছে আগুন, আর,
বুকের ভিতরে ধোঁয়া।
বসে বসে তাকিয়ে দেখছি দূরে সূর্য ডুবছে,
মেঘে শেষ বিকেলের রঙের হুল্লোড়।

বসে আছি? না অপেক্ষা করছি?
কার অপেক্ষা?
তার, যিনি কাণ্ডারী?
নৌকা বেয়ে আসবেন তিনি আর দাঁড় বেয়ে
নিয়ে যাবেন নদীর ওপারে, তাঁর বাড়িতে,
যেখানে
অন্তহীন আনন্দ,
অন্তহীন সুখ,
শেষহীন শান্তি।

বিদেশ ও অনুবাদ

কেতকী কুশারী ডাইসন (ইংল্যান্ড)

চৈত্র পূর্ণিমা

আমাদের দুঃখ থেকে জন্ম নিল তোমার যে মুখ
সে মুখের ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা ভরে আছে মন,
অভিলাষ মাত্র তৃষ্ণা, তৃষ্ণা মাত্র উষ্ণ প্রস্রবণ,
চৈত্ররাতে হাওয়া দেয়, চতুর্দিকে প্রচ্ছন্ন অসুখ।

আজও অসমাপ্ত কাজ, আজও অব্যাহত অপচয়,
হঠাৎ কি মনে করে স্বচ্ছ দ্বার এঁটে হালকা খিলে
অনেক হয়রান হয়ে মূঢ়ের মতন খুঁজেছিলে
স্পর্শ লোভাতুর নীড়ে নিরুপায় মাথার আশ্রয়।

স্রোতের মতন আসে তালগাছে সমুদ্র মর্মর,
আমাদের মৃত্যু হবে এ রকম বসন্ত বাতাসে,
যখন স্বর্গীয় জ্যোৎস্না গাঢ়তম ইন্দ্রের আকাশে
তখন আসন্ন হয় তোমার আমার রূপান্তর।

আশ্চর্য এখনও শুনি তোমার অম্লান কর্মখ্যাতি,
অথচ সন্দেহ নেই একমাত্র ধ্রুব অভিশাপ,
ভাগ্যবান পিতৃগণ দায়মুক্ত, যত পুণ্যপাপ
একাই হিসাব করে ক্ষীণকায় হতবুদ্ধি নাতি।

টুকরো কথা কানে আসে, শেষতম ঠিকানা জানি না,
অনুমানে বোধ করি আজও আছো আপাত সচ্ছল,
দুর্ঘটনার মতো, চুরি গেল অমূল্য সম্বল,
নীরব ক্রন্দনে কাঁপে থরথর স্মৃতির রেটিনা।

আমাদের দুঃখ থেকে জন্ম নিল তোমার যে মুখ
সে মুখের ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা ভরে আছে মন,
অভিলাষ মাত্র তৃষ্ণা, তৃষ্ণা মাত্র উষ্ণ প্রস্রবণ
চৈত্র পূর্ণিমার হাওয়া, চতুর্দিকে প্রচ্ছন্ন অসুখ।

এম এইচ কবীর (জাপান)

শহিদ মিনার প্রাঙ্গণ

আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গীরণের মতোই জমাটবাঁধা কষ্টের চাপা কান্নাটি
বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় বুক থেকে।
প্রাণফাটা চিৎকারের মর্মস্পর্শী ধ্বনি
প্রকম্পিত করে দিতে চায় সমগ্র আকাশ বাতাস।

মাতৃভাষার শৃঙ্খলমুক্তির তরে এহেন আত্মদান—'ভাষা আন্দোলন'—
বিশ্বব্যাপী ত্যাগের ইতিহাসে এক নব নিদর্শন।
সেই ত্যাগী আত্মার সাক্ষ্যকে ঘিরে ঠায় দাঁড়িয়ে ওই
পবিত্র শহিদ মিনার প্রাঙ্গণ।

আত্ম-উৎসর্গের মহান স্মৃতিকে
মহিমান্বিত করার ছলে, খেলছি আজ আমরা কত বিচিত্র খেলা
কত না সুকৌশলে ন্যূনতম মানবতাবোধও যেন আজ নিঃশেষিত
দৃশ্য ও অদৃশ্য আততায়ীর আচরণের ফলে।

শহিদ মিনার যেন আজ আর নয়কো শুধু স্মৃতিচয়ন,
পুষ্পার্ঘ্য দান ও শ্রদ্ধা নিদর্শনের স্থান।
কত জীবন্ত তরতাজা প্রাণ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর হাতছানিতে
আজ অকাতরে সেখানে বাড়ে।

প্রাণসংহারকারী দানবের দল যেন
দন্ত বিকশিত করে খেলছে ওই শহিদস্মৃতির
বুকে চেপে বসে, হেসে
পৈশাচিক বিদ্রূপের হাসি।

নির্মল ব্রহ্মচারী (নরওয়ে)

রক্তাক্ত পদচিহ্ন

লোভাতুর স্বৈরতন্ত্রী গণতন্ত্রের
রণতন্ত্রী দানবদের
রক্তাক্ত পদচিহ্ন চিনে নাও
পদচিহ্ন চিনে নাও
দেশে দেশে ওদের ভক্ত শ্বাপদের
মানব-সমাজে নিষিদ্ধ কর
ওদের ঘৃণ্য অনুপ্রবেশ
কিংবা কবর খোঁড় সত্বর
দানবদের জীবন্ত সমাধি দিতে
নইলে মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হবে, শৃঙ্খলিত হবে
চোখের মণির মতো
অতি প্রিয়
তোমার স্বাধীনতা

রঞ্জিত চৌধুরী (সুইডেন)

নীরবতা

স্পন্দনহীন অস্তিত্বে জেগে থাকা
কোন কথা নয়, চুপ, সে আসবে নীরবে
কোন শব্দাবলীর প্রতিদ্বন্দ্বী করো না তাকে
শুধু চোখের ভাষায় যতটুকু বলা যায়
ততটুকুই কথা হোক।

শব্দ নয় শূন্যতায় ভাসাও তরী
দেখো, বাতাসও জেনে গেছে মৌনতার শব্দাবলী
সে জেনেছে শব্দহীন উচ্ছ্বাসের ধ্রুপদী বিন্যাস।

তাকে খেলতে দাও একাকীত্বে
শব্দ করো না যেন।

হ্যারল্ড পিন্টার (ইংল্যান্ড)—নোবেলবিজয়ী

মৃত্যু

কোথায় পাওয়া গিয়েছিল মৃতদেহটি
কে পেয়েছিল মৃতদেহটি?
মৃতদেহটি কি মৃত ছিল যখন পাওয়া গিয়েছে?
কেমন করে পাওয়া গিয়েছিল মৃতদেহটি?

কে ছিল এই মৃতদেহটি?
কে ছিল পিতা বা কন্যা বা ভাই
অথবা খুড়ো বা ভগ্নি, মা অথবা পুত্র?
এই মৃত এবং পরিত্যক্ত দেহটির?
দেহটি কি মৃত ছিল যখন পরিত্যক্ত?
দেহটি কি পরিত্যক্ত ছিল?
কে দেহটিকে পরিত্যক্ত করেছিল?
দেহটি কি নগ্ন ছিল অথবা ভ্রমণের পোশাকে?
কে কি বুঝে ঘোষণা করা হয়েছিল দেহটি মৃত?
তুমিই কি ঘোষণা করেছিলে দেহটি মৃত?
কতটুকু ভাল করে তুমি বুঝেছিলে দেহটি মৃত?
কেমন করে তুমি জানলে মৃতদেহটি মৃত ছিল?

তুমি কি ধুয়ে ছিলে মৃতদেহটি?
তুমি কি বন্ধ করেছিলে তাঁর দুটি চোখ?
তুমি কি কবর দিয়েছিলে দেহটি?
তুমি কি তা ফেলে এসেছিলে পরিত্যক্ত অবস্থায়?
তুমি কি চুমু দিয়েছিলে মৃতদেহটি?

অনুবাদ : গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

অ্যাডোনিস (আরব)

উপস্থিতি

আমি খুলে দেই পৃথিবীর দিকে একটি দরজা
আমি জ্বালিয়ে দেই উপস্থিতির আগুন
মেঘে যা পুনর্বিম্বিত অথবা পরস্পর অনুসৃত
সাগরে আর তাদের প্রেমাতুর ঢেউগুলিতে
পাহাড়ে আর তাদের বনানিতে
এবং উপলে
গর্ভবতী রাত্রিগুলির জন্য আমি তৈরি করি
একটি জন্মভূমি শৃঙ্খলের ভস্মে
গীতমালার প্রান্তরে বজ্র আর বিদ্যুতে
আমি পুড়িয়ে ফেলি যুগান্তরের স্মৃতি

অনুবাদ : গজেন্দ্রকুমার ঘোষ

জামশেদ মসরুর (উর্দু-পাকিস্তান)

বিধিমতে বিজ্ঞ

শহরে এক শিখের কাছে আমি যেতে চাই
তার আগে সামান্য পান করতেও চাই আমি
বাড়িতে আমি শুধুমাত্র তাঁর সুন্দরী মেয়েদেরকে দেখি
মিষ্টি সোনা তরুণী ওরা
আমি ওদের একটু আদর করতে চাই
যদি ওরা রাজি থাকে, খুবই ভালো।
শিখটি এসবে পাত্তা দেয় না
সে আইনকেও ভয় পায় না।
আসলে এই শিখটিই গতকাল প্রচার করছিল
যে মহিলারা আধা অবিশ্বাসী হয়।
প্রমাণ দিয়ে আমি দেওয়ালে রঙ ছুঁড়ে দিলাম
সঙ্গে নিলাম সব কাগজপত্র এবং
শিখটির সিন্দুক থেকে চুরি করলাম
তার পাগড়ি, ফতুয়া, চাবুক ও শাল।

অনুবাদ : কৌশিক রায়, নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ব্রহ্মচারী

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ফ্রান্স)

ফ্লাইট ১এ ৪৪০

(নীরব যোগী ভূপেশ দাসকে)

আকাশমুখো বুকজোড়াতে
পৃথ্বী-তেজস-অপ?
তৃতীয় আর চতুর্থ চোখ
জ্বলছে কি দপদপ
গান্ধারী তোর চূর্ণিতালে
'কফি না চা?' জানার ছলে
ঝলক হাসিস
কুণ্ডলিনী চমকিয়ে নন-স্টপ
নাভির নভে বিজলি ছোবল
খাচ্ছি ঝপাঝপ
মাটি মায়ের কুক্ষি ছেড়ে
উড়ছি অবিরাম...
অনাহতের সুরবিহারে
হঠাৎ ঘা খেলাম;
প্রাণভোমরা বেয়াদপে
মণিপীঠের চন্দ্রাতপে
হাজার কোরক সুখের লোভে
ভাঁজছে স্বরগ্রাম...
আজ্ঞাচক্র সামলে নিতেই
দু কাপ চা পেলাম।

কাসইনি অনিতা কউতসোভেলি (গ্রীক কবিতা)

আমার অধিকার আছে

আগামী দিনগুলির চোরাকুঠুরিতে
বেঁচে থাকে বেশ কিছু মানুষ
অতৃপ্তির শৈত্যে ঘিরে ধরে
তাদের সমস্ত সচেতনতা।
তাদের সাহসের গলায় আটকে যায়
দূষণের ভস্মধূসর ফাঁস
পার্থিব মৃত্যুসঙ্গীতখানি দূরে
বহুদূরে
ক্রমাগত বাজতে থাকে
বেহালার ফোঁপানো সুরের মতন।
পৃথিবীর সকল খুন, সকল ত্রাস।
তাকে পরিণত করেছে
এক শিকারি পশুতে,
এগিয়ে এসেছে বিধ্বংস।
আমার তো বাঁচার অধিকার আছে
আছে বাকস্বাধীনতা,
তবে আমি মুখ খুলব না কেন?
কেন থাকব এমন আহত হয়ে?
কোন মতবাদের
আমি কাঠপুত্‌লী নই।
তাই আমি, আমিই হবো
আমি কাসিয়ানি-ই হবো।

অনুবাদ : বিপ্লব মজুমদার

জাঁ পিয়ের দুপ্রে (ফরাসি কবিতা)

আমি ও আমার জীবনের মধ্যে

আমি ও আমার জীবনের মধ্যে জেগে উঠেছে এক নূতন
অজানা অস্বস্তিকর শরীর, চেপটে থাকে আমার সঙ্গে
তাকে বাস্তব বলা যায়
বিছানায় শুয়ে : স্বপ্ন দেখি—আমার বন্ধুরা মাথামোটা
আমার নির্জনতায় সহকর্মীরা অসহায়
নতুন জগতের চড়াই বেয়ে উঠি
প্রাচীন প্রস্তর ক্ষেপণের নির্দেশ দিই
আকাশের সামনে দাঁড়িয়ে শূন্যকে গ্রাস করি
কোলকাতায় আমার জাগ্রত শরীর নতুন খেলা খেলে
হারিয়ে যাই বহু বছরের প্রাকৃতিক নীরবতায়
আমার ম্যাজিক উড়িয়ে দেবে ভদ্রলোকের মুখোশপরা দানোদের
উন্মাদের মতো পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি।

পরে

দিশা মিলালে পরে দূরত্ব খুঁজে পাওয়া যায়
একে যে স্বপ্ন দেখে, তা অন্যেরও স্বপ্ন
একের মধ্যেই অন্যের বাস
অন্তিমে আগুন ছাড়া আলো নেই।
ধোঁয়ার মতো শুরু হয়ে
আদল নেয় শর্তহীন আগামীর।

অনুবাদ : প্রীতি সান্যাল ও ধৃতিব্রত ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ

নির্মলেন্দু গুণ

সর্বগ্রাসী, হে নাগিনী

আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা বলে ভ্রম করি।
রাজবন্দীর হাতের শৃঙ্খল আমার চোখের মধ্যে নারীর
শাঁখার মতো প্রেমের বন্ধন হয়ে কাঁপে—আমি ভ্রম করি।
যখন অগ্নির গ্রাসে এক-একটি সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যায়,
আমি সে ভস্মস্তূপের মধ্যে ঝলসে যাওয়া শিশুর নিষ্পাপ মুখ
কিম্বা সংসারের বিপুল বিনাশ দেখে আজকাল আঁতকে উঠি না;
শুধুই নারীর মৃত্যু সারাক্ষণ জুড়ে থাকে আমার হৃদয়।

এ কেমন নারী-গ্রাস?
এ কোন্ বিকৃত বোধ আজকাল পেয়েছে আমাকে?
জনৈক নারীর গর্ভে প্রথাসিদ্ধ কিছুটা সময় আমিও তো
করেছি যাপন, আমিও তো আপন বোনের পাশে একদিন
শয়ন করেছি—বসে বসে দেখেছি ধূলায় শিশুর উদ্বাহুনৃত্য
তারার শরীর ছুঁয়ে চোখে চোখে বেড়েছে বয়স।
তখন রমণী মানে আমুণ্ডুমন্থনযোগ্যা সর্বগ্রাসী নাগিনী ছিল না,
তখন রমণী মানে রক্ত কাঁপানো সুখে বুকে মুখে চুমু খাওয়া
অফুরন্ত বাসনা ছিল না, তখন রমণী মানে অন্যকিছু ছিল।
এ কেমন নারী-গ্রাস?
এ কোন্ বিকৃত বোধ আজকাল পেয়েছে আমাকে?
আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা বলে ভ্রম করি,
নারীর মৃত্যু ছাড়া কোনো মৃত্যু স্পর্শ করে না।
মাতা নয়, শিশু নয়, গণহত্যা নয়, কেবলই নারীর মৃত্যু
সারাক্ষণ জুড়ে থাকে আমার হৃদয়।

মহফিল হক

স্মৃতির খড়কুটো

শেষ যাত্রার আগে বেজে ওঠে ঘন্টার ধ্বনি
ঘটাং ঘটাং আমি কি বিমোহিত ছিলাম
ঘরের উঠোনে নিঃসাড় নিম গাছে
ঝুলন্ত বাদুড় উড়ে গেল
শঙ্কিত বুকে কাউকে কিছু বলতে পারি না।

পাতকুয়া তলে নিঃসাড় অন্ধকার
হাড়কাঁপানো মাঘের শীতে কুলবধূর শীর্ণবুক
ঈষৎ ভয়ে কম্পমান,
দূরগামী ট্রেনের চাকার ঘটাং ঘটাং
যেন পাথর ঠোকার শব্দ বুক জুড়ে
প্রবাসে ফেরা স্মৃতির চোরাতালা কে ঘাটে
অগোছালো তল্পিতল্পা।

শেষ যাত্রার আগে বেজে ওঠে
বাঁশির করুণ মিনতি
পুরুষের প্রব্রজ্যা খ্যাতি
মুখ বুজে থাকে শান্ত সমাহিত।

মাঠের মরীচিকা মাঘের নির্মল রোদ
সারা ঘরময় জেগে থাকে মরা শৈশব,
পুরোনো নকশা আঁকা জুয়েলারি
দিন শেষে ফুরিয়ে আসে
শৈশব বিশ্রুত ময়ূরের পেখম তলে।

বিমল গুহ

উৎসব

এখন নিঝুম রাত চারিদিকে বৃষ্টির উৎসব
মহাকৌতূহলের দীর্ঘ বৃষ্টির নাচ দেখে পড়শি রমণী;
জানালার শিকে তার ছায়া কাঁপে
আন্দোলিত বুকের নিঃশ্বাস গাঢ় বর্ষণের শব্দে মিশে যায়!
কৌতুক জলসায় কারা মেতে ওঠে মেঘের তাণ্ডবে?
ইলেকট্রিকের তারে সারিবদ্ধ কাকগুলি একটানা ভিজে সারারাত
পালকের ওম্ আহা—কারা যেন ভেঙে দিয়ে গেছে এই রাতে!

এই বর্ষণের রাতে সুড়সুড়ি দিয়ে কেউ জাগিয়ে দিয়েছে যৌবন,
বর্ষণের নৃত্যে সারারাত—বৃষ্টির গান শুনি স্বপ্নের চাদরমুড়ি দিয়ে!
স্বপ্ন-নায়িকা নাচে ব্যালকনির গহিন আড়ালে
বর্ষণের রাত যেন দীর্ঘরাত—বর্ষণের কাল বুঝি ক্ষণজন্মা
পৌরুষ-উৎসব।
এই বর্ষণের রাতে একটানা ভিজে
শাখাঁরিবাজারের বুড়ো দালানগুলি কাঁপে রুগ্‌ণ-শীতে!
মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে দীর্ঘ কালো ছাতার আড়ালে
কোন নায়রির আগমন আলো-আঁধারিতে বধুবেশে।
গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির কণা নুড়ি পাথরের ঘুম ভেঙে দিয়ে
যায় মাঝরাতে—
মনে হয় যৌবন পেয়েছে ফিরে শতাব্দীর-সাক্ষী লাল
ইটের দালান
জরাজীর্ণ কালের সাক্ষী হয়ে আছে—এই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রদর্শন;
বীর-গাথার বাংলাদেশে রূপকথার বধুবেশে বৃষ্টি আসে
প্রবল বর্ষণ আজ গৌরবের ছবি আঁকে ঊষর ভূমিতে রাতভর!

মধ্যরাতে বিজলি চমকে ভাঙে ঘুম
কদমের পুষ্ট ডালে বাহারি যৌবনের মেলা
রাত আর দিন যেন ব্যবধানহীন ঝর-ঝর বৃষ্টির উল্লাস;
এখন ঘুমের রাত্রি—কাঁথামুড়ি দিয়েছে যৌবন
এখন বর্ষণের কাল—তুমুল বৃষ্টির মাঝে স্বপ্নঘোর মিথুন উৎসব!

নাসির আহমেদ

বৃক্ষমঙ্গল : ৮

এখন রাখি না চোখ আর কোনো রমণীর চোখে
ঘুমিয়ে পড়েছে প্রেম, ক্লান্তির কবরে সেই কবে
দাফন করেছি তাকে।
লাস্যময়ী ঠোঁটের রহস্যময় জলতরঙ্গের সুরে সামান্য আগ্রহ নেই; সুন্দরীর সর্বনাশ
থেকে বহুদূরে
এসে আজ এই নিসর্গ প্রবাসে
হাতের তালুর গ্লানি, চোখের পাতার কালি
মুছে নিই শিশিরের ঘাসে।

ভুলে গেছি রাত্রিদের হলুদবাড়ির ছাদে সেই কবেকার
জলপাই রঙের বাঘ থাবা দিয়েছিল, তার
সেই ক্ষতচিহ্ন কিংবা কোনো স্মৃতি, হাহাকার
কিছু নেই। বরং গহনে এই বনের আড়ালে
প্রকৃত জ্যোৎস্নায় এসে হঠাৎ দাঁড়ালে
দেখি অম্লান হাসির কলস্বরে
জোনাকির টিপ-পরা তরুণী বৃক্ষেরা গল্প করে।

তারাদের নীল আলোয় নিমগ্ন গহন রেস্তোরাঁয়
সহসা সন্ধ্যার অন্ধকারে
জনৈকা কুমারী বৃক্ষ 'শুভসন্ধ্যা' বলে স্বাগত জানায়।
অনির্বচনীয় ভাষ্যে বুঝেছি কেবল অনুভবে
উত্তর-চল্লিশে আজ হবে।
পার হয়ে এসেছি বৃত্তের সীমা রান্নাঘরের ঝুলকালি
এমন সাফল্যে বুঝি বনভূমি জুড়ে পাতাদেরও মুগ্ধ করতালি।

দিলরুবা শাহাদৎ

ফাগুনের আলপনায় স্বপ্নরাশি

এই বসন্তে ফুল ফাগুনে আমি
জন্মেছি মাগো তোমার কোলে
রাতের গভীরে হৃদয় জুড়ে
নিশি বসন্ত তখন হাওয়ায় দোলে।
সুরের আগুনে বৃক্ষ আন্দোলিত হয়
ফাগুনের আলপনা সবুজের বুকে স্বপ্ন ছড়ায়।
তবু বুকে আমার অশান্তির আগুন, পুড়ে পুড়ে জ্বলে দ্বিগুণ
নিশি বসন্তের বুকে পলাশ শিমুলের কান্নায়
ভারি হয় রাত্রির বাতাস।
বন-মঞ্জরির সুরে বনফুলেরা হেসে ওঠে,
চমকে ওঠে উদাসী আকাশ
ফাগুনের বুকে বুনো বেদনার ঢেউ খেলে যায়।
অ আ ক খ অমানিশার আগুনে পোড়ে
একসময় দিনের আকাশে শিমুল পলাশ তমাল
রঙের আলপনায় ছেয়ে যায়
একুশ তখন কৃষ্ণচূড়ার বুকে আগুন ঝরায়।
বুকের গভীরে দিবাস্বপ্ন জেগে ওঠে একুশের সপ্তডিঙায়
সেই স্বপ্নের হাত ধরে, রাজপথ আন্দোলিত হয়।
রক্তে লেখা সেই একুশ, এখন সাত সাগর তের নদী পেরিয়ে
বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ফুলের তোড়া হাতে
সুখী জীবনের স্বপ্নরাশি দুহাতে বিলায়।

জুনান নাশিত

বাল্মীকি হৃদয়

ঘরোয়া মুহূর্ত থেকে ছায়াচ্ছন্ন ক্লান্তির ওপিঠ
তুলে রাখে দুঃখছড়া পাললিক অহংকারে
নিঃশব্দ বিলাসী ঢঙে স্মৃতিহীন তুচ্ছকণা
বায়বীয় উচ্ছ্বাসের দিনে লগ্নভুক্ত করে
ক্ষরণের তুমুল তল্লাট।

বাল্মীকি হৃদয় মোহনার শূন্য গন্ধ ছিঁড়ে
ভাসমান অক্ষরেখা তীরে ছুঁড়ে দেয় আয়ুর উজান
কান্না ডোবে।
পিয়ানো যুদ্ধের চেয়ে তীব্র শ্লেষে
রূপক সন্ধানে ছোটে নিশ্চিত পতন।

উপড়ানো তত্ত্ব ঝেড়ে লতানো সুস্থির পাপ
রেণুছন্দে গড়ে চক্রাকার ঢেউ
অনায়াসে আয়ত্তের সীমা মেপে
একধাপ
দুইধাপ
শতেক স্বল্পতা গুনে
গুনে
উঁকি মারে ঋতুগর্ভে ব্যবহৃত সর্বনাম।

মুশাররাফ করিম

দেখছে আমার অচতুর্থ চোখ

একটা কিছু হবে, একটা অসাধারণ নাটক
সহসাই হবে মঞ্চায়ন, অনভিজ্ঞরা টের পাবে না
টের পাবে তারা, যারা থাকে উইংসের আড়ালে।

সার্বভৌম এই মাটির লোকেরা বড়োই অদ্ভুত!
তার চেয়েও ঢের বিচিত্র তাহাদের দ্বৈত মনস্কতা।
বর্ষার আগে অস্থির থাকে বৃষ্টিমুখর দিনের লোভে
আষাঢ়-শ্রাবণে বসে যায় রোদের জন্যে দীর্ঘ রোদনে
সম্বছর তাদের প্রকৃতি মাটির মতো নরম
হঠাৎ-ই ঘটে মতিচ্ছন্ন, রূপ ধরে যেনো কঠিন প্রস্তর।
মনটা ভারি নরম যেনো তুন্দ্রাঞ্চলের শীতল বরফ
মুহূর্তেই অনুভূত হয় ফার্নেসের মতো গরম।
সার্বভৌম এই মাটির লোকেরা অতি নিখুঁত নাটকেও!

কি সুন্দর ধীর স্থির শান্ত, বসে আছে মৌনঘরে
কে জানে কখন কোমর বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়ে।
তারা একাধারে ভদ্র ও সজ্জন পক্ষান্তরে অতি দুষ্ট লোক;
একটা কিছু হবে, একটা অসাধারণ নাটক
সহসাই হবে মঞ্চায়ন, বাঁধা হয়েছে চমকপ্রদ স্টেজ।
বুড়ো বয়সের আলোতেও স্পষ্ট দেখছে আমার অচতুর্থ চোখ।

গাউসুর রহমান

গলে যায় দূরের পাহাড়

তোমার মেঘলা ললাটে স্পর্শ লেগে আছে আমার—
প্রেমের পাখি ডাকা চরে বেঁধেছি আমি ঘর
ভালোবেসে তুমি তবু হয়ে গেলে পর;
সান্নিধ্যের মধ্যরাতে এখন তুমি অন্য কারো
মিহি বাতাসে।
তোমার শরীরে কারা যেন খুঁজে পায়
রজনীগন্ধার স্পর্শ,
রোদ্দুরে, ছায়ায় এখন তুমি অন্য কারো
আদিরসাত্মক বইয়ের পাতায় পাতায়;
আমার ভালোবাসার ব্যাকরণ অশুদ্ধ জেনে
অন্য কারো নামের বানানে নিজেকে করেছ শুদ্ধ।
আমি তবু ভালোবাসার পরবিদ্যা
ভাসাইনি তোমার জ্যোৎস্নায়।
মূঢ় আমি দূর থেকে দেখি শুধু
তোমার স্তম্ভিত সবুজ।
কার রৌদ্রজলে হয়েছ তুমি তন্ময় আর মৃন্ময়—
নির্মেঘ আনন্দে থাকা তুমি কার বুকে
বাজাও আনন্দের ঘুঙুর;
এসব ভাবতে ভাবতে দেখি
গলে যায় দূরের পাহাড়—
ব্রহ্মপুত্রে ভেসে যায় বুঝি তোমার সুখের
সোনার কলস।

একদিন হরিণ ভক্ষণ

মোহাম্মদ আবদুল মাননান

বিলম্বই বিপত্তি—এমন কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু আজ কোনো বিলম্বই করিনি, তবুও চোখের সামনে নানা বিপাক-বিড়ম্বনা অপেক্ষা করছে যেন। গতকাল একটু দেরিতেই মেসেজ পেলাম। রাতে ভালো ঘুম হয়নি—এবার কি তাহলে পারব না! কেবল এই ভাবনায় শেষরাত কেটেছে, একদম শেষের দিকে ঘুম এসে থাকবে, টের পাইনি। এসবে—গেলে দু'বছরে আমার ব্যর্থতার রেকর্ড শূন্যের কাছাকাছি। বাসায় এই নিয়ে প্রায়ই কথা শুনতে হয়—বসদের কথায় ও কাজে যেভাবে জীবন দিয়ে দিচ্ছ; আমাদের কাজে একটু সিরিয়াস হলে অনেক লাভ হত, সেই কত করে বলেছি, কাউকে ধরে-টরে ঢাকার আশেপাশে যেতে, কিন্তু শুনলেই না। স্ত্রী আরও বলে, বসদের সঙ্গে তো সারাদিন, পারলে রাতটাও কাটিয়ে আসো, কই তারা তো কিছু করতে পারে না তোমার আগের বসতো ঠিকই ঢাকায় চলে গেল, অথচ তার জন্য কি করোনি। যদিও এসব কথা গা-সওয়া হয়ে গেছে, প্রায়ই জবাব-টবাব দেই না। কিন্তু নিভৃতে এসব মনে পড়ে না এমন তো নয়। ঠিকই, চাকরিতে এসে সরকারি কাজে কতটা সিরিয়াস জানিনে, তবে বসদের কথায় জীবনও দিতে পারি। মাঝে মাঝে মনে হয় এতটা সিরিয়াস না হলেও চলে, অন্যরা তো এতটা না করেই পার করে দিচ্ছে তাদের দিনকাল। তাদের আগে পদোন্নতি পেয়ে যাব, সুবিধাজনক পোস্টিং পাব, এমন নয়। ভাবি, লেখাপড়ায় এর কিছুটা সিরিয়াসনেস থাকলে আজ হয়তো এই জায়গায় থাকতে হত না। আবার প্রয়াত বাবার কথাও মনে পড়ে। বলতেন—বসদের কথার অন্যথা করা উচিত নয় তা সরকারি আইনের সাথে পড়তায় পড়ুক আর নাই পড়ুক। যদিও ছেলে-মেয়েদের নানাও সরকারি চাকুরে ছিলেন, তাঁর কথা আবার একদম আলাদা।

—দেখলাম তো সরকারি কাজে জীবন দেওয়ার কোনো মানে হয় না; ততটুকুই করা উচিত—যতটুকু করলে চাকরিটা বেঁচে যায়।

চাকরির শুরুতে শ্বশুরকে পেলে হয়তো একটু অন্যরকম হতে পারতাম এখনকার তুলনায়। তের-চোদ্দ বছরে এসে মনে হচ্ছে বাবারটা নয়, এসব জায়গায় শ্বশুরের আদর্শই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই সময়ে, এক ধরণের ধাঁচে চলে এসেছে, চাইলেই ফেরা যায় না। বাবার সিনসিয়ারিটি আর দেশপ্রেম এখন সরকারি অফিসে সেভাবে খুঁজে পাই না। আর আমার ডিপার্টমেন্টে সততা একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যেন। কেউ আর এটাকে কোনো ভালো গুণ বলে মনে করে না। সৎ অফিসার-কর্মচারীর দিকে অফিসের, এমনকি সমাজের অন্যরাও বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে—বেচারা কিংবা বেকুব। আমিও বেকুব হয়েছিলাম। সেই শুরুতে, চাকুরির দেড় বছরের মাথায়। অনেক তেল-ঘি পুড়িয়ে হাতিবান্ধা

থেকে নারায়ণগঞ্জ বদলি। তিনমাস পেরুতে না পেরুতেই গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল এমপির এক নিকটজন। ধাক্কাটা একটু কমজোরের ছিল হয়তো। পড়লাম নদীর ও প্রান্তে গিয়ে, মুন্সিগঞ্জ সদর। বদলি ভ্রমণ-ভাতার জন্য অফিসে ফর্ম পেলাম না। নেই। জেলা অফিসে খুঁজতে গিয়েই বেকুব বনে গেলাম। বড় সাহেবের কান অবধি পৌঁছে গেলো আমার নাম। জানা গেল—এসব ছোটোখাটো ভ্রমণ-ভাতা এ অফিসে নাকি অনেকদিন কেউ নেয়নি। ততক্ষণে আমার নাম বেকুবের তালিকায় পৌঁছে গেছে হয়তো—যদিও এখন আর আমি তেমন বেকুব নই, স্বীকার করছি এ কথা; এতে কোনো রাখঢাকও নেই আমার—ঝেড়ে কাশিই আমার পয়লা এবং বরাবরই পছন্দ।

আরও সকালে বেরুতে চাইছিলাম। কী করে জানি দেরি হয়ে যায়। ছুটির দিনের সকালে গা ছেড়ে দিয়ে শরীরটাকে একটু বেশি ফেলে রাখতে ইচ্ছে করে। সারাদিন তো দৌড়াদৌড়ি কম হয় না। কিন্তু এই জায়গাটাতে এসে প্রায় সব ছুটিই খেয়ে নেয় কোনো না কোনো ঝামেলায়। ঝামেলার অন্য নাম ভিআইপি—আরেক নাম মেহমান; আমার নয়, অফিসিয়াল, কখনও হাফ-অফিসিয়াল। পরেরটাতে বসদের আত্মীয়রাই বেশি। দু'বছরে একবার গিন্নির ছোটবোন আর ছোটবোনের জামাই এসেছিল বলে মনে আছে। বাকিটা? কেবলই ঝামেলা। এদের আবার নানা শ্রী। বসরা এখানে এলে প্রথমে আসে শ্বশুরপক্ষীয়রা এবং প্রায় পালা করে। এরপরে নিজের ভাই-বোন এবং সে-সম্পর্কীয়। এরপর বন্ধুজন-এর তালিকা একটু দীর্ঘতর। আর সবশেষে বন্ধুর বন্ধু, কুটুমের কুটুম। বসদের বন্ধু আর কুটুমের সংখ্যা একটু বেশি যেন। আমার ছেলের মা বলে, বড় পদে বসলে কত বন্ধু আর আত্মীয় বেরিয়ে যায় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমি এগুলো ঝামেলা হিসেবে নিতে পারি না। সেই আসার পর থেকে কী যেন আমার ঘাড়েই পড়েছে এসব। বন্ধের দিন হয়তো স্কুলের ছাদ ঢালাই রেখেছি, বললামও সে-কথা—না, দরকার নেই। আপনি স্যারের মেহমান সামলান, দেখি সমীরবাবুকে পাঠাতে পারি কিনা। মোবাইলে খবর পাই সমীরবাবু শ্বশুরবাড়ি চলে গেছেন, পাশের জেলায়, তবে লাগোয়া। ছুটির দিনে এই হচ্ছে সমীরবাবুর সুবিধে। অথচ স্ত্রীর চোখের চিকিৎসার জন্য সময় পাই না, ছুটি এমনকি স্টেশন লিভের অনুমতি পাই না আমি—প্রতিটি ছুটিতেই মেহমান নামের ঝামেলা থাকে। আর সিনসিয়ার লোক হিসেবেই এই মফিজ-দীন-ই একমাত্র ভরসা। বাবা-মা নামটাও কীভাবে এতটা জুতসই করে রেখেছে, মাঝে-মাঝে ভাবি তা। এদিকে আমাকে ছাড়াই ছাদ ঢালাই সেরে ফেলে ঠিকাদার, কী জানি কার্য সহকারী কতটা দেখেছে, আর পুরো সময় ছিল কিনা। এখন তো না থেকেই মোবাইলে জানিয়ে দেওয়া যায়—এই তো ঢালাইয়ের এখানে স্যার, আমরাও এমনটা করি না এমন নয়। দিন দশেক আগে জেলার বসই সে কথা বললেন আমি একটু যশোরের দিকে যাচ্ছি, কাউকে সেটা বলার দরকার নেই। এডিশনাল চিফের দুজন গেস্ট, কোনো সমস্যা হয় না যেন মফিজ সাহেব। অফিসের কাজের চেয়ে আজকাল বসরা তাদের

ফুটফরমাস কতটা পালন করছি তারই বেশি দাম দিয়ে থাকে। ফলে কেউ-কেউ তাঁবেদারিকেই শিল্প বলে মনে করছে। কিন্তু মফিজকে এর পাশাপাশি কাজটাও দেখতে হয়, আজ না হয় কাল-কাজ না দেখে সই দিতে পারি না। বাবাকেও এমনটা করতে দেখেছি; শিক্ষাটাও সেখান থেকে।

তার আগের কথা মনে নেই। স্কুলের সময়টা মনে করতে পারি। বাবাকেও এই এক কাজ করতে দেখেছি। তাঁর চাকরিটা বেশ ছোটই ছিল, কিন্তু অনেক বড় কাজ, ঝামেলা করতে হত তাঁকেই। বাবার ডিপার্টমেন্ট পানি উন্নয়ন বোর্ড। বড়সাহেবরা তদবির করেই দক্ষিণ দিকে পোস্টিং নিয়ে আসতেন। কিন্তু তাদের মেমসাহেব-ছেলে-মেয়েরা এসব জায়গায় থাকতেন না। আসতেন কালেভদ্রে। তখন সেবাটা বাবাকেই করতে হত। খুব কাছ থেকে দেখেছি তা। বরিশাল থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার আসবেন। ইন্‌পেকশন বাংলোর বদলে রান্না হত আমাদের বাসায়, মায়ের রান্না নাকি অনেক ভালো। বাবার বসরাই বলতেন সেসব। অথচ সরকারি নিয়ম মানলে এই রান্না নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসায় বা অফিসিয়াল বাংলোতে হওয়ার কথা—এ কথাও পরে শিখেছি। একবার কিছুদিনের জন্য মা রেহাই পেয়েছিলেন। ঢাকা থেকে কোন এক ডাইরেক্টর এসেছিলেন। নির্বাহী প্রকৌশলীও নতুন। পোলাও একটু নরম হয়ে গিয়েছিল। সে আর কোথায় যায়—সব দোষ বাবার, অতঃপর মায়ের। সেই নির্বাহীর সময়টা, তাও মাত্র এগার মাস। মাকে আর অফিসের রান্না করতে হয়নি, তবে সেটি কষ্টের ছিল। কিন্তু বাজারটা বাবাকেই দেখতে হয়েছে। খরচার ব্যাপার আছে যে। শুনেছি, বনেদি ডিপার্টমেন্ট এসব সিনিয়রদের প্রিভিলেজ। বাবার চাকরিতে ঠিক উল্টোই দেখেছি। ডিজি আসবেন, বরিশাল থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারও আসবেন সঙ্গে। চিফ বললেন নির্বাহী প্রকৌশলীকে, তিনি তার এসডিইকে। এসডিই তার সেকশন অফিসারকে—সেটা ঘুরে বাবার উপর; অনেক বাজার, ছ-সাতটা মাছের উপকরণ, নিদেনপক্ষে দুটো মাংসের পদ, আর কত কী! সবটাই বাবার ঘাড়ে—পানি নিচের দিকে গড়ানোর মতই। চাকরির গোড়ায় পুলিশে এমন জিনিসই দেখলাম। মুক্তাপুর ফেরিঘাটে জেলার সব কর্তা ব্যক্তিরা। আমার থাকার কোনো কারণ নেই। আমার নির্বাহী আছেন, ডিপি, এসপি ও সিভিল সার্জনও আছেন। উপমন্ত্রী হলেও আমাদেরই মন্ত্রী, জেলারও দায়িত্বে—আর এসবে ইউএনও-র সঙ্গে আমার উপজেলা অফিসার থাকবেনই। কিন্তু তার তো যানবাহন নেই, ভরসা আমার মোটরবাইক, স্যার আবার চালাতে পারেন না এই দ্বি-চক্র শকট। কখনও কখনও ইউএনও-র গাড়িতে জায়গা হলে আমি বেঁচে যেতাম—নয়তো পুরোদিনই ভি আই পি-র পেছনে পেছনে কেটে যেত। সবকটা ছুটির দিনেই এই দায়িত্ব পালন করতে হত বেচারা মফিজকে। মন্ত্রী তখনও এসে পৌঁছননি; ডিসি-এসপি একটু আগেই চলে এসেছেন ফেরিঘাটে।

ডাব চলবে নাকি? পাশে বসা ডিসিকে এসপি শুধালেন।

খাওয়া যায়।

এসপি ইশারা দিলেন অদূরে বসা এডিশনালকে। নিমেষেই এডিশনালের চোখ নিবদ্ধ হলো ওসির চোখে। ওসি ইশারায় আদেশ করলেন সাব-ইন্সপেক্টর হারিসকে—আমরা পাশাপাশি বাসায় থাকি উপস্থিত সবাই ভাবে আপ্যায়িত হলেন, তা গোটা পঞ্চাশেক হবে; কেউ কেউ আবার দুটো—খাওয়ালেন এসপি, বিল দিতে হল হারিসকে। তখনও এতটা বুঝিনি, হয়তো বোকার মতনই জানতে চেয়েছিলাম একদিন।

—পুলিশে এটাই রীতি, বুঝলেন ইঞ্জিনিয়ার।

একবার ইউএনও আর এসি ফিনান্সের সঙ্গে ঢাকায় সারাদিন ঘুরেছি; এসি সাহেব অনেকবার চেষ্টা করেও কোনো বিল দিতে পারেনি; না চায়ের, না দুপুরের খাওয়ার। ইউএনও-র একই কথা— ইটস এ সিনিয়র প্রিভিলেজ।

একবার মায়ের অসুস্থতার মধ্যেও অনেক কষ্টে তাকে ত্রিশজনের রান্না করতে দেখেছি। আমার ছোটবোনটা তখন মায়ের পেটে, বাবাও কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু অফিসের এই কাজে বাবা কোনোদিনই না বলতে পারেননি। বাবাকে ধার করেও এসব বাজার করতে দেখেছি। অথচ বাবার বিশেষ কোনো সুযোগ ছিল না—বাবার পদের নাম সার্ভেয়ার। শেষমেশ সেকশন অফিসার হয়েছিলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ, তাও আবার স্থায়ী নয়, চলতি দায়িত্ব। বাবাই একবার বলেছিলেন—চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন, খেতে-খেতেই রান্নার প্রশংসা করছিলেন নাকি। অতএব বাবার ডাক পড়ল। পদের নাম শুনে নির্বাহীর দিকে তাকিয়ে বললেন—এই নামে কোনো পদ আছে বলে এই প্রথম জানলাম। বাবার মতো আরও অনেকেই পদোন্নতির সময়ে ডিপার্টমেন্টের হেডও নাকি একই মন্তব্য করেছিলেন। বাবার ডিপার্টমেন্টের এই জায়গাটা—বরগুনা বিভাগ খুবই উর্বর বলে জেনেছি; আর এখন জানি, দেশপ্রেমের কতটা অভাব ছিল তাদের। আমার স্কুল জীবন কেটেছে আমতলীতে। এস.ও. দের অনেক জৌলুস দেখেছি তখন। প্রায় এস. ও.-দের হয় ঢাকায়, নয়তো বরিশালে বাড়ি আছে। এসডিইদের তো কথাই নেই। জানিনে, কী জন্য বাবা ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চেয়েছিলেন। বিকেলে পায়রার তীরে উঁচু বাঁধে বাবা আমাকে আর বোনটাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। বলতেন—এই বাঁধ আমাদেরই করা। হাজার হাজার একর জমির ফসল রক্ষা করছে এই বাঁধ। তখনই বলতেন—তুই ইঞ্জিনিয়ার হবি। কী জানি, আজীবন বস তথা ইঞ্জিনিয়ারদের ফুটফরমাস খেটে-খেটে বাবার মধ্যে এক ধরনের অভিমান, নয়তো ক্ষোভ জন্মেছিল। ছোট চাকুরেদের বকুনিও কম সইতে হয় না, হয়তো কোনো দ্রোহ ছিল বাবার মনে। আমি তখন বিশাল পায়রার দিকে তাকিয়ে বাবার কষ্টটা বোঝার চেষ্টা করতাম, ইলশে জালের দিকে তাকিয়ে থাকতাম—ছেলেরা কি কষ্ট করছে। অথচ এই মাছ ওদের ছেলে-মেয়েরা পাবে না, আমতলী হয়ে চলে যাবে বরিশাল, ঢাকায়, নয়তো আরও দূরে—আর জেলেরা দু'সের চাল নিয়ে বাড়ি ফিরবে। অথচ ওই যে নৌকাতেই বসে ওদের ছোট ছেলে, মাছ দেখছে। বাড়ি গিয়ে রাতে খাবে অন্যকিছু আর ব্যতিক্রম ছাড়া সেটা ইলিশ

নয়। কিন্তু বাবার ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারিনি—উচ্চমাধ্যমিকের পরে শেষ অবধি পলিটেকনিক করে বাবা যেখানে শেষ করেছেন আমি সেখান থেকে শুরু করেছি—সামনে কি আছে, জানিনে; আমাদের সবসুবিধে বড়দের জন্য। আমাদের উপরে ওঠার সিঁড়ি প্রথম থেকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে যেন—যেখানে প্রবেশ, ঠিক সেখান থেকেই বেরিয়ে যাওয়া। এসব জায়গায় কেউ কেউ সুযোগের অভাবে এসেছে—তারাও সুযোগ পেলে আরও উপরে যেতে পারে তা আর আমাদের ব্যাকরণে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আশাও তেমন কিছু নাই। তবে বাবা আর দেখে যেতে পারলেন না কোনো কিছুই।

অল্পের জন্য ছাগলটা বেঁচে গেল। কী জানি আমার পুরনো কিন্তু বেশ বিশ্বস্ত বাইকটা উল্টে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। জোরে ব্রেক চাপায় পেছন থেকে অফিসের পিওনটা কাত হয়ে পড়ে গেল, তেমন লাগেনি। শ্যামনগর উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার অফিসের এই পিওন—রউসুল এসব ভালো সামলাতে পারে, স্থানীয় আর অনেকদিন এক জায়গায় বলেও এর সুবিধা হয়। এসবে ও আমার সঙ্গেই থাকে। ছোটখাটো ব্যাপার হলে ওকে দিয়েই সেরে নেওয়া যায়। এ যাবৎ বহুবার সুন্দরবনে গেছে হেড অফিসের মেহমান নিয়ে, অনেক জায়গা-ই ওর চেনা এখন। অনেক কিছু ম্যানেজ করাও রউসুলের জন্য ডালভাতের মত।

গতকাল শেষ বেলায় আমার স্যার—উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার মোবাইলে জানালেন, এক্স-ইন স্যারের গেস্ট, আট-নজন হবে। স্যারের বাসা আর আমাদের হাউসে রাতে ছিলেন তারা। আমি বুঝতে পারি, বসের বাসায় কথাটা বলার অর্থই হল অতিথির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। আরও বললেন, স্যারই যেতেন তাদের সঙ্গে, কিন্তু কালতো যশোরে কনফারেন্স। আমাকে প্রোটোকল করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি দুদিন আগেই ছুটি নিয়ে খুলনায় আছি। পারিবারিক সমস্যা বুঝলেন, এস.ও সাহেব। তবে হেডকোয়ার্টারের নতুন এ.ই. সাহেব সঙ্গে থাকবেন।

সকালে বেরুতেই আমার স্যারের ফোন—সব ঠিক আছে তো, বুঝলেন ওটা কিন্তু জোগাড় করতেই হবে। কাল রাতে স্বয়ং বসও ফোন করেছেন।

উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার হয়তো বলেছে মফিজ। আমাদের এ্যাডিশনাল চিফের ক্লাশমেট, তার স্ত্রী, স্ত্রীর বান্ধবী আর চিফের ক্লাশমেটের ছেলে ও ছেলের বউ—ওরা আমেরিকায় থাকে; আমি এখানে আছি বলেই এ্যাডিশনাল স্যার এ জায়গা পছন্দ করেছেন। বুঝলেন তো, এই এ্যাডিশনাল স্যারই আমাদের পরবর্তী চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

গুরুত্ব বুঝতে বাকি থাকে না সকালে আমার স্যারও এসব বলেছেন মোবাইলে। তবে খবরটা গতকাল সকালে পেলে আমার সুবিধে হতো। বসদের নিয়ে এই হচ্ছে সমস্যা—একটা কিছু করে দিলেও জানতে চাইবেন না কীভাবে করেছি কিংবা করতে কেমন সময় লাগে, খরচার কথাও জানতে চাইবেন না। তাদের ধারণা বললেই হয়ে যায়।

রাতেই আসল ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি, জরুরি সময়ে সেই ভরসা

জোগায়। খুব কম সময়ের মধ্যে আগেও সব ব্যবস্থা করেছেন দুরমুজ খালির চেয়ারম্যান নানা সময়ে আমরা তার খেদমত নিয়ে থাকি। কিন্তু বিধি বাম—তিনি ঢাকায়। তিনি তার একজন মেম্বারের মোবাইল নাম্বার দিয়ে কথা বলতে বললেন। বললাম—স্যার, বলছেন তো, একদিন আগে বললে সহজ হত। চেয়ারম্যান সাহেবও নেই, দেখি স্যার কী করা যায়। আমি মেহমানদের গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু বারবার তার একই কথা—চেষ্টার ত্রুটি করব না স্যার।

কলবাড়ি থেকে বুড়িগোয়ালিনির রাস্তায় উঠতেই আবার বিপত্তি। দুধারে চিংড়ির ঘের—রাস্তার মধ্যে খানিকটা কাটা। আমার মোটরবাইক নিয়ে বিশেষ সমস্যা নেই। কিন্তু ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে স্যারের সেই মেহমানরা আসবেন। এ রাস্তা পেরুবেন কী করে? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে, এমন আশ্বাস শুনে আবার বাইকে স্টার্ট দিই।

একবার চারিদিকটা দেখি। চিংড়ির ঘেড়ে ছেয়ে আছে বিস্তির্ণ ভূ-ভাগ। আইলগুলো বাদ দিলে মনে হবে সমুদ্রের উপর দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে দূর-অজানায়। সিডর আর আইলার ধাক্কা সামলে এ জায়গার সবাই যেন আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে—তারই মহড়া চারদিক ব্যেপে।

বেরুবার সময় ভেবেছিলাম, নটা নাগাদ কৈখালি পৌছতে পারলে উপায় হতে পারে। কৈখালিতে আমার একজন মক্কেল আছে, ছোটখাটো ঠিকাদার। প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে এমন নয়; আমরাই ডেকে ডেকে কিছু কাজ দিই। ওর দ্বারা একবার কাজের কাজ হয়েছিল। সেবার বসের স্ত্রী সরাসরি ঢাকা থেকে ফোন করে চেয়েছিলেন—এই অন্তত কেজি দু-তিনেক হলেও চলবে। বসের শ্যালিকার মেয়ে যাবে বাইরে তারই প্রয়োজন হয়তো, তাঁর স্বামীর খুবই পছন্দ বলে কথা। তখন এই মতলুব কন্ট্রাকটারই যোগান দিয়েছিলেন মহার্ঘ বস্তুটির, সেবারও সময়টা অসময় ছিল। হরিণনগর আসতেই ফালিফালি করে সূর্য হাঁটু বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে দ্রুত, জেলেখালি যেতেই হয়তো নটা পেরিয়ে যাবে মনে হয়। নটার কাছাকাছিই ঘড়ির মোটা দাগ তখন কৈখালি। মতলুব আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু বিবর্ণ মুখ।—না, জোগাড় হয়নি, আরও আগে বললে হত।

জানতাম—এমন কথাই শুনতে হবে। এই বস্তুর জন্য আগেও নানা ঝামেলা হয়েছে। এখন পুলিশ-বিডিআর একটু খাতির করে, আবার সংবাদপত্রের লোকদেরও ম্যানেজ করতে হয়; কিন্তু মাঝে মাঝে এ দ্রব্য পেতেই সমস্যা হয়ে যায়, দুরমুজখালিতে চেয়ারম্যানের লোক দাঁড়িয়ে আছে। অপদার্থ। লোকটা বলে কী—পাওয়া যায়নি; অথচ তার চেয়ারম্যান কি করিতকর্মা। তবে মেম্বার কয়েকটি জায়গার নাম বলে দিলো। পই পই করে ঘুরলাম দুজনে, মিললো না। সবার এক কথা—গতকাল দুপুরের দিকে নদীতে জোয়ার ছিলো। কাল এই বস্তুর নাকি কোনো দেখাই পাওয়া যায়নি। বুকের মধ্যে চিনচিন করতে শুরু করলো, স্যারেরও বিশেষ অনুরোধ; তার স্যারেরও মানে আমাদের বসও বলেছেন বেশ

জোরেসোরে। আগামী দিনের ডিপার্টমেন্টাল চিফের নিকটজন আসছে। মাথায় কিছু কাজ করছে না। আসার পরে মোবাইলে উপজেলা-ভাবিও কিছুটা দেওয়ার জন্য বলেছেন।

আমার নিজের জন্য নয়। ভাই, ভগ্নি এসেছে নিউজিল্যান্ড থেকে ,পরশুই চলে যাবে, ওদের বায়না। আজ রাতেই ঢাকায় পাঠাতে হবে, হইলে মান থাকে না; অনেক গল্প করেছি তো, আপনার কথাও বলেছি ভাই। এই ধরেন, এক কেজি হলেও হয়, একটু টেস্ট করার ব্যাপার তো।

না, বিরক্ত হইনি। ছোট চাকুরি করি বিরক্ত হতে নেই। বাবাকে বিরক্ত হতে দেখিনি। স্যারের স্ত্রীকে আগেও দেখেছি আইনসিদ্ধ নয় এই হালাল বস্তুটি পেতে অনেক বেশি হাঁসফাঁস তার। যদিও এটি আমার একদম ভালো লাগে না। এখানে আসার পর গিন্নি কয়েকবার বলাতে একবার বাসায় নিয়েছিলাম। আমাদের দুজনের কারোই পছন্দ হয়নি। তবে স্ত্রী-পক্ষীয় মেহমান এলে স্ত্রীর এক ধরনের বায়না থাকে. বার তিনেক শুনে একবার ধমকে দেওয়ায় এই বস্তুতে বাসায় কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি আর। তবে প্রতিবারই উপজেলা-ভাবির কথা মাথায় রাখতে হয়। এবারও চিন্তা করেছি—এর মধ্যে ফোনে প্রয়োজনটা আরো শানিয়ে দিয়েছে যেন।

সাড়ে দশটার মধ্যেই নীলডুমুর থাকতে হবে। দুগাড়ি আকীর্ণ মেহমান রিসিভ করতে হবে। বনবিভাগের নৌযান রেডি আছে, তাতেই তাদের নিয়ে বেরুতে হবে সুন্দরবন দর্শনে। বনবিভাগের রেসকিউবোর্ডের ড্রাইভার, বাবুর্চি ভালোই সার্ভিস দেয়, সব গেস্টই যাওয়ার সময়ে সেকথা বলে। কিন্তু এর নেপথ্যে ফিজকে কত কত বকশিশ গুনতে হয় সেটা আর কারও জানা হয় না। এখানে বিডিআর রেস্টহাউসেও আছে, চুয়াডাঙ্গার সিও আসবেন। তাছাড়া ওই হাউজ পেতে কেবল মফিজের কথায় হবে না, নির্বাহী স্যারকে ব্যবস্থা করতে হবে।

গাবুরিয়া হয়ে চকবারার দিকে যেতে কয়েকঘর ধাঙরবাড়ি। নদীর পাড়ে জেগে ওঠা চরে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ ভেরিবাধে। অদূরেই নিস্তরঙ্গ নদী বেয়ে বেয়ে সুন্দরবন হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এখানে ওদের আদি পেশার ক্ষেত্র নেই তেমন। কেউ কেউ মাছ ধরে, আবার সামান্য আবাদ করছে কেউ। তবে চারপায়ী জন্তুটি এখানেও ওদের প্রিয়, কম-বেশি সবাই পুষছে তা। এখান দিয়ে যেতেই চোখে পড়ে সে-সব। মনে হল ভেতরে মনে কিছু কাটাকাটি হচ্ছে। বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই সন্দেহের মীমাংসা—ওদের নাকি অনুষ্ঠান আছে। চট করে মাথায় কী এল নিজেও বুঝতে পারলাম না, কেজি দুয়েক হবে, ব্যাগে পুরে নিলাম। রউসুল কিছু বলতে যাচ্ছিল, ইশারায় বারণ করলাম। এর আগে মতলব ঠিকাদার কানে কানে বলেছিল—সিও বিডিআরের বাসায় ফ্রিজে আছে

কিছু। শুনলাম কেবল—সিও-র বাসায় এই জিনিস পেতে মফিজের যাওয়া অসম্ভবেরও একটু বেশিই যেন। বোট থেকে ফরেস্টের রেস্ট হাউজে ফিরতে তিনটে বেজে গেল। সবার মুখ বলে দিচ্ছে ক্ষুধার কথা। আজ ফরেস্টের বাবুর্চি নেই আছে তার সহকারী। থাকলে বিপদ হতে পারত; বাবুর্চি বয়সী বলেই নয়, যতবার এসেছি নামাজ পড়তেও দেখেছি। তাকে দিয়ে আর যা হোক....। সবাই গোগ্রাসে আহার করলেন। মাছের চারটি পদ ছাড়াও শুটকি—বাবুর্চিই ব্যবস্থা করেছে। আমি কেবল মোবাইলে বলে দিয়েছি। মেহমানদের গাড়ি ছেড়ে দিলে খরচাও মিটিয়ে যাব, একটু বাড়তিই পেয়ে থাকে আমার কাছে। এখানে এলজিইডির মেহমান আসা মানে ওদের মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব চলে আসে, আর সেবাটাও ভালো হয়। টেবিলে মাছের পদ থেকে গেলো অনেকটাই। মাংসের ডিশটা নিমেষে শেষ হয়ে গেল। চিংড়িটাও বেশ টেনেছে কেউ কেউ। দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছিলাম সবার তৃপ্তি এক রকমের নয়। তখন আমার নাসারন্ধ্রে মাংসের গন্ধ এসে ধাক্কা দিচ্ছিল বারবার। এ গন্ধটা আমার কাছেও একদম ভিন্ন মনে হচ্ছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর...

নির্বাহী প্রকৌশলীর সম্মান বাঁচিয়েছি, যে ভাবেই পেরেছি। বেঁচে গেছে আমার চাকরিও। তখন মনে হয়নি কিছু, তবে এই তিনমাসের প্রান্তে এসে মনে হয়—ঠিক করেছি?

এদিকে এতকিছু করেও সম্পর্ক তিতে হয়ে আছে ইঞ্জিনিয়ার ভাবির সঙ্গে, তার ভাগ্নিকে সুস্বাদু দ্রব্যটি ভক্ষণের জন্য ঢাকায় পাঠানো যায়নি বলে। সে নিয়ে কত কথা। আমার বাসায় আসাও বন্ধ ছিল কিছুকাল। তার একই বাণী শুনতে হচ্ছে।

আপনি এত কিছু করেন, আর ভাগ্নিটাকে খাওয়াতে পারলাম না, ও তিনবছর পরে এই দেশে এল; আবার কবে আসবে কে জানে!

সরি ভাবি, সরি ভাবি, বলে বলেও নিস্তার পাইনি বিশেষ। আরও বহুবার ভাবির সেবায় লেগেছি, কিন্তু একদিনের ব্যর্থতার ক্ষত যেন শুকাচ্ছে না। সুযোগ হলেই খোঁচার মত শুনিয়ে দেন।

মাঝে মাঝে ভাবি, বলেই দিই—এটি হচ্ছে বেআইনি কিন্তু অসিদ্ধ নয়। আরেকটি হচ্ছে, আইনি কিন্তু আমাদের কারও কারও জন্য শুদ্ধ নয়। কিন্তু দুটো রয়েল বেঙ্গলের জন্য আইনি, আর সিদ্ধ। খাদকদের জন্যও এক জায়গায় মিল আছে; তা হল মানুষ আর পশু—সবার জন্য হয়তো সুস্বাদু তা।

কিন্তু কথাটা বলতে পারি না। মনের মধ্যেই রেখে দিতে হয়। এই জায়গা থেকে চলে গেলে, কিংবা আরও অনেক পড়ে রউসুল কাউকে বলে দেবে কিনা সে ব্যাপারে আর নিশ্চিত হতে পারি না।

কাগজে কলমে

তাহামিনা কোরাইশী

কোথাও এক চিলতে পরিমাণও ঐশ্বর্যের কমতি নেই। অভাব কাকে বলে আম্বিয়ার জীবনে আজ তা বিস্মৃত অতীত। এমনই এক বিলাসবহুল জীবন তার পায়ের কাছে লুটোপুটি করছে। মাঝারি গোছের সুন্দরী বলা যায় তাকে, অনিন্দিত সুন্দরী নয়। বয়সের ভারে কিছুটা ক্ষয়ে যাওয়া শরীরের যৌবন ঢলে পড়েনি তা অবশ্য ঠিক। অথচ তার ভালোবাসার মানুষটি কেন এতোটা বিমুখ ভেবে পায় না আম্বিয়া। কতোটা সময়ই-বা আম্বিয়াকে দেয় কলিমুল্লাহ্। ব্যবসায়িক কাজে দেশ-বিদেশে লাগাতার ট্যুর করতে হয়। নিউইয়র্কে পার্টনারশিপে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে। ছেলে দুটো বড় হয়েছে। ওরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশেই আছে। আম্বিয়াও গেছে বেড়াতে ওইসব দেশে। তবে থাকতে ভালো লাগে এদেশেই। অভিজাত এলাকায় আম্বিয়ার জন্য বিশাল বাড়ি, গাড়ি, চাকরবাকর। ডুপ্লেক্স বাড়িটির আর ফুলের বাগানের তদারকি করে সময় পার করে আম্বিয়া। ওতেই প্রাণে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা করে নিয়ে সে খুশি। অপার্থিব আনন্দ খুঁজতে চায় না সে। তেমন একটা অবস্থাপন্ন ঘরে জন্ম আম্বিয়ার নয়। তবুও কলিমুল্লাহ্র যোগ্যতার মেধা-মননে অনেক সুখ-শান্তি ওর হাতের মুঠোয়। তা না হলে ওর মতো লক্ষকোটি মানুষ কতো কষ্টেই না জীবন নৌকা পারাপার করছে। কী দারুণ ভাগ্য নিয়েই না জন্মেছিল আম্বিয়া। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দায় যেখানে, সেখানে অনেককে দৃঢ় অবস্থানে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছে আম্বিয়ার মতো অল্প শিক্ষিত নারী। এও কম কিসের। কারো জন্য কিছু করতে পারলে ওর ভালোই লাগে।

বেশ কিছুদিন আম্বিয়ার মা-বাবা মারা গেছেন। বড় ভাইটি তার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মোটামুটিভাবে ভালোই আছেন। সমস্যা ছোট্ট বোন সুরাইয়াকে নিয়ে। ভাবীর জ্বালাতনে সুরাইয়া একেবারে অতিষ্ঠ, অগত্যা বড় বোনের কাছেই অবস্থান। আম্বিয়া খুশি মনে বোনের দায়িত্ব নিয়েছে। সুরাইয়া রূপসী। লাক্স বিউটি কন্টেস্টে গেলে অবশ্য প্রথম হতে পারত। অপূর্ব সুন্দর মেয়েটি। ভালো স্কুল ও কলেজে পড়িয়ে যথার্থ মানুষ বানানোর চেষ্টা। দুই বোনের ভালোই কাটছিল সময়। ছোট বোনটি বয়সে আম্বিয়ার অনেক ছোট। ওর কোনো আবদারই ফেলতে পারে না আম্বিয়া। নিজ সন্তানের মতো সবকিছুই ওকে দিতে চেষ্টা করে। ওকে কিছু দিতে পারলেই আম্বিয়ার আনন্দ।

বড় বোনের কাছে আবদার, বিদেশে গিয়ে পড়বে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। নিউইয়র্কে একটা ভার্সিটিতে ভর্তির অ্যাপ্লাই করেছে। এই সেমিস্টার ধরতে পারবে কিনা বুঝতে পারছে না। ভিসা পেতে দেরি হবে। আম্বিয়ার কাছে এগুলো কোনো ব্যাপারই নয়। বিদেশ থেকে ওর স্বামী কলিমুল্লাহ্ কতোজনকে ইনভাইটেশন লেটার এনে দিয়েছে।

সুরাইয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—তোর দুলাভাই আসুক। একটা বুদ্ধি বের করা যাবে। এত চিন্তা করিস না তো। তুই লেখাপড়া করে বড় হবি এ তো আমারও স্বপ্ন। আমার মতো অশিক্ষিত হয়ে থাকতে হবে না তোর। তুই ভালো চাকরি করব কতো মানুষ তোকে মান্য করবে। আমার আর কী চাই, বল। সুরাইয়ার মনটা খারাপ হয়ে যায়।

বলে—আপা, তোমার কি মনে এখনও কষ্ট আছে? ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারো নাই বলে।

তোরা মানুষ হলেই আমি খুশি। দুঃখ তো থাকবেই। ছোট বয়সে মা মারা গেল বাবাও আর লেখাপড়া না করিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল। আর বড় ভাইও আপত্তি করল না। সে সারাজীবন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকল।

ওরা কথা বলছিল এর মধ্যে দুলাভাই বাসায় এল। তার কাছে গিয়ে দুবোন গলা জড়াজড়ি করে বসল।

কলিমুল্লাহ্ হাসিমুখে—কী হে শ্যালিকা, কোনো মতলব এঁটেছো না কি? দুবোন একেবারে গলায় গলায়।

আম্বিয়াই উত্তর দেয়—মতলব তো একটা আছেই। সুরাইয়া তোকে বলেছিলাম না, সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে আবার বলে, তোর দুলাভাই যেটাতে হাত দেবে সে কাজ হবে না, তা হবার জো নেই।

—বাব্বাহ্! এতো খোশামোদি? কী ব্যাপার বলেই ফেল। হাসি হাসি মুখ দুলাভাইয়ের।

সুরাইয়া বলে—দুলাভাই, নিউইয়র্কে একটা ভার্সিটিতে ভর্তির ব্যবস্থা করেই ফেলেছি। কিন্তু সমস্যা ভিসার। এতো তাড়াতাড়ি পাবো না মনে হয়। যা টাফ আজকাল।

আম্বিয়াও সায় দেয়। দেখ না, কী করা যায়।

সুরাইয়া আশা করেছে।

কলিমুল্লাহ্ একটু চুপ থাকে।

কী ব্যাপার চুপ করে আছ কেন? বল, কী করতে চাও—আম্বিয়া জানতে চায়।

কলিমুল্লাহ্ দুই বোনের দিকে নজর বুলিয়ে বলে—আমি যে প্রস্তাব দেব তা কি দু'বোনের পছন্দ হবে?

তোমরা তাড়াহুড়ো করছ তাই মাথায় একটা বুদ্ধি এল। টাইম দিলে অন্য ব্যবস্থা আছে।

সুরাইয়া বলে, না দুলাভাই, আমার তো তর সইছে না।

কলিমুল্লাহ্ আবার বলে—তোমরা আমার প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

আম্বিয়া বলল—এত ভনিতা না করে বলেই ফেল না।

কলিমুল্লাহ্ মুখটাকে একটু ভার করেই বলল—সুরাইয়া যদি আমার স্ত্রী হিসেবে যায় তবে তাড়াতাড়ি নেওয়া যাবে।

—দুলাভাইয়ের যতসব ফাজলামো কথা।

আম্বিয়া তবুও জানতে চায়—আবোল-তাবোল না বলে বুঝিয়ে বল, ঠিক কি করতে চাইছ।

—শোনো বলি, আমার তো ওই দেশে ব্যবসা আছে। মালটিপল ভিসাও থাকে আমার সব সময়। আমার স্ত্রী হিসেবে সুরাইয়াকে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। তাই বলছিলাম, ওকে পৌছে দিয়ে চলে এলাম। আমারও অফিসের কিছু কাজ আছে করে আসলাম। তোমাদের মর্জি। চিন্তা করো।

দুলাভাইয়ের কথা শুনে দুই বোন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। চোখে চোখে কথা হয়। বড়বোনের অনেক আস্থা ছোট বোনের ওপর। ছোট বোনটিরও অনেক বিশ্বাস দুলাভাইয়ের ওপর। কখনও চাইবে না বড় বোনের ঘর ভাঙতে। এতো আদর-যত্ন করে বড় বোন মানুষ করেছে ছোট বোনটিকে।

চিন্তায় পড়ে যায় আম্বিয়া, সুরাইয়া। প্রথমেই মুখ খোলে সুরাইয়া। আপু, তুমি দুলাভাইয়ের কথায় রাজি হয়ে যেও না। দেরি হোক অসুবিধা নেই। এর পরের সেমিস্টার ধরতে পারব। আমি এখানে তো কম্পিউটার সাইন্সে পড়ছি। না পারলে না যাবো, কিন্তু এমনভাবে না। ওই দেশে না গেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আম্বিয়ার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে বোনের প্রতি। কিন্তু পুরুষ মানুষটাকে নিয়ে একটু দোদুল্যমান। এদের বিশ্বাস নেই। যে কোনোস্থানে মুখ দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এতোটুকু তার ঝুলিতে সঞ্চয় তো আছেই। বিভিন্ন মুখে শুনেছে কতো কথা। তবুও মনকে বুঝিয়ে নিয়ে পরের দিন কলিমুল্লাহ্কে বলে—ওর জন্য কি করতে হবে বললে না তো।

কলিমুল্লাহ্ এবারে হাসিমুখে বলে—তোমরা ডিসিশন নিতে পারছিলে না। তাই আর কথা এগোইনি।

আম্বিয়া বলে—আচ্ছা শোনো, তোমার কাজ হল সুরাইয়াকে নিয়ে যেয়ে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যাওয়া আর ডরমেটোরিতে রেখে আসা। কলিমুল্লাহ্ যথার্থই ভালো মুডে ছিল। বলল—ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই। জো হুকুম মোহ্তারেম। এখন বিয়ের কাবিননামা আর যা কাগজপত্র পূরণ করার ব্যবস্থা করা দরকার। সবই যখন ঠিক হয়ে গেল তখন সুরাইয়ার এই বিয়েতে তুমি রাজি আছ? কাবিননামায় সুরাইয়া সাইন সবই লাগবে।

সবকিছু বুঝিয়ে দিল আম্বিয়া। ওর এক বান্ধবী আছে নিউইয়র্কের জামাইকাতে। ওর বাড়ির ঠিকানা ফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে ওর হাতে দিয়ে দেয় আম্বিয়া। বলে, তোর দুলাভাইয়ের কোনো ঠিক আছে! কখন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। তোকে কোথাও ফেলে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে। তুই মিতালীর সাথে যোগাযোগ করবি। আমার বান্ধবী, ওর ঠিকানা ফোন সব দিয়ে দিলাম। ওকে সাথে নিয়ে কাজগুলো সেরে নিস। ওর বাসায়ও মাঝে মাঝে বেড়াতে পারবি। ভালোই লাগবে। নিজের মানসম্মান নিজের কাছে। মনেপ্রাণে চেষ্টা করবি ভালো থাকতে। নিজে ভালো তো সব ভালো, যদিও আম্বিয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে চাইছে তবুও বোনকে কিছু বুঝতে দিতে চায়নি। দুলাভাই সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করে দেয়নি আম্বিয়া। সুরাইয়া বোনের গা ঘেঁষে বিড়ালের মতো আদর নিতে চায়। বলে—আপু তোমাকে না বললাম এভাবে যেতে চাইছি না। নিজের মতো করে যেতে পারলে যেতাম নতুবা না। আম্বিয়া বোঝায় বোনকে। এই ব্যাপারটা শুধু কাগজে-কলমে। মনেই আনবি না কিছু। আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানবে না। তুই আমার ছোট বোন, মাথায় সব সময় রাখবি। আর সব ভুলে যা। হঠাৎ কলিমুল্লাহ্ ঘরে ঢোকে। আচমকাই আম্বিয়ার গালটা টোকা দিয়ে বলে—আমার লক্ষ্মী সুন্দরী একটা বউ আছে না। কি দায় পড়েছে তোমাকে বউ বানানোর। তুমি কাগজের বউ বুঝেছ! এই বয়সেও কেমন এক শিহরণে লাজরাঙা হয়ে ওঠে আম্বিয়া। একটু মুখ বাঁকিয়ে আম্বিয়া বলে—হয়েছে হয়েছে, আর দেখাতে হবে না। সুরাইয়া মিটমিট হাসে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। সুরাইয়া কলিমুল্লাহ্‌র সাথে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হল এমিরেটের ফ্লাইটে।

এয়ারক্রাফটে পাশাপাশি দুজনা। দুলাভাই দুষ্টুমি করে। সুরাইয়া বলে—এখন থেকে দুষ্টুমি বাদ, আপনি আর আমি আলাদা।

কলিমুল্লাহ্ হঠাৎ করে একজন এয়ার হোস্টেসকে ডেকে বলে—She is my wife. How she is? Please take care of her.

লজ্জায় মরে যায় সুরাইয়া। কী হচ্ছে এসব?

এয়ার হোস্টেস মজা করে বলে—So beautiful she is, but so young.

প্রতি উত্তরে কলিমুল্লাহ্ বলে— She is my 2nd wife thats why.

এয়ার হোস্টেজ হাসিমুখে সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলে—Oh that's right. Madam anything? Any drink?

সুরাইয়া বলে—No, thanks.

দুলাভাই আমি মাইন্ড করব, এমন করলে।

কলিমুল্লাহ্ বলে—এই মেয়ে দুলাভাই দুলাভাই করছ কেন? কেউ জানতে পারলে কি ভাববে বলত। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চুপ থাকো। বুঝেছ।

সুরাইয়া একটু চুপ করে বসে। এই মজাগুলো সহজভাবে হাসিমুখে উড়িয়ে দেয়। অবশেষে নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে পৌঁছে যায় ওরা। লাগেজ নিয়ে ইমিগ্রেশন কাস্টমস শেষ করে বেশ রাতই হয়ে যায়। বেরিয়ে ট্যাক্সি নেয়। হোটেলের নাম বলে কবিমুল্লাহ্ ড্রাইভারকে। ছুটে চলে ট্যাক্সি। সুরাইয়া জানতে চায় আমরা কোথায় যাচ্ছি। আপু বলেছিল মিতালী আপুর বাসায় যেতে।

কলিমুল্লাহ্ রাগতস্বরে বলে—এত রাতে কারো বাসায় ডিসটার্ব করা কি ঠিক? সকালে চলে যাব। এখন যা বলছি শোনো।

হোটেলের চিন্তায় সুরাইয়ার মনে কেমন অশনি সংকেত।

তবুও নিজেই মনকে বুঝ দেয়। বাবার মতো জেনেছে যাকে তাকে নিয়ে আবোল-তাবোল ভাবাটাই অন্যায়। নিজেকে আরো ভয়হীন সাহসী করার চেষ্টা করে সুরাইয়া। দুলাভাই ওর মনের ভেতরে যেন ঢুকতে না পারে ওর চেহারা দেখে। ওর কথায় যেন সন্দেহের কিছু না পায়। নিজের মনকে নিজেই শাসন করে সুরাইয়া—ছিঃ ছিঃ, কী ভাববেন দুলাভাই। ওকে সহজ করার জন্য কলিমুল্লাহ্ বলে—কোন ভয় হচ্ছে? হোটেলের কথা শুনে ভয় হচ্ছে?

সুরাইয়া বলে—না না ভয় কিসের? আপনি বাঘ না ভাল্লুক?

—ভালো কথা, হোটেলে গিয়ে আবার দুলাভাই দুলাভাই করো না। বুঝেছ?

হোটেলে পৌঁছে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে যায় কলিমুল্লাহ্। পাসপোর্ট দুটো এগিয়ে দিয়ে রুম বুকিং এর কথা বলে। ওয়েটার রুমের চাবি নিয়ে লাগেজ ট্রলিতে করে নিয়ে রুমে পৌঁছে দেয়।

রুমে এসে সুরাইয়া বলে—দুলাভাই আমার রুম কোনটা?

তোমার রুম? স্বামী-স্ত্রী কি আলাদা রুম নেওয়া যায়?

—দুলাভাই ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

—কেন তুমি তোমার আপা আমি কতদিন এক বিছানায় ঘুমাইনি?

—হ্যাঁ ঘুমিয়েছি, তখন তো অনেক ছোট ছিলাম।

—এখন কি বেশি বড় হয়ে গেছ? দেখি কত বড় হয়েছ?

—দুলাভাই। দুষ্টুমি ভালো লাগছে না।

—আচ্ছা ভালো লাগতে হবে না। আর বারবার দুলাভাই দুলাভাই বলবে না তো। এই রাতটুকু কোনোরকম কাটিয়ে দিই।

—আরে দেখ না, এই যে দুটো বেড নিয়েছি সিঙ্গেল। ডাবল বেড একটা নিইনি তো। এবার চলো খেয়ে আসি। বেশ খিদে পেয়েছে।

লক্ষ্মী মেয়ের মতো দুলাভাই-এর সাথে খেতে যায়। কলিমুল্লাহ্ মনে মনে ভাবে রিসেপশনের কথাগুলো তো শোনেনি। আগেই রুম বুকিং দেওয়া ছিল। সুরাইয়াকে লাউঞ্জে বসিয়ে রিসেপশনে রুম চেকিং করছিল কলিমুল্লাহ্। ফ্লাইট বেশ রাতেই ল্যান্ড করবে তা তো কলিমুল্লাহ্র জানাই ছিল। তাই তার ব্যবস্থা সে করে রেখেছিল।

খেয়ে এসে রুমে ঢুকেই বাথরুমে সাওয়ার নিয়ে স্লিপিং স্যুট পরে শুয়ে পড়ে দুলাভাই। দুলাভাইয়ের এই ব্যবহারে বেশ আস্বস্থ হয় সুরাইয়া। নিজেও সাওয়ার নিয়ে কাপড় বদলে নেয়। বেশ আরাম করে নিজের বেডে ঘুমাবার চেষ্টা করে। ঘুম আসছিল না। কি সব আবোল-তাবোল ভাবছিল সুরাইয়া। দুশ্চিন্তায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। টেবিলে রাখা পানি গ্লাসে ঢেলে ঢকঢক করে গিলে বিছানায় এল। পানির শব্দে কলিমুল্লাহ্র তন্দ্রা ভেঙে যায়। বলে—কী ব্যাপার সুরাইয়া, ঘুম আসছে না? এসো ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ডিমলাইটের আলো আঁধারীতে সুরাইয়া চমকে ওঠে—দুলাভাই। শুধু দুষ্টুমি। আপনি এখনও ঘুমাননি। আমি তো ভেবেছি ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছেন।

—ঘুমিয়েই তো পড়েছিলাম। তোমার পানির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমারও পানির তৃষ্ণা লাগল।

কলিমুল্লাহ্ বিছানা ছেড়ে ওঠে। কলিমুল্লাহ্র মনে আজ এ কী ঝড়ের তোলপাড়। নিজেকে কোনো মন্ত্রেই বেঁধে রাখতে পারছে না। ঘুমের ভান করে পড়েছিল। অনিবার্য এক নেশায় মাতাল হয়ে উঠছে শিরা-উপশিরা। শরীর মন আর নিজের আয়ত্তে নেই। গলা শুকিয়ে আসছে এই বয়সে সেই নতুন যৌবনের কথাই মনে পড়ছে। একটু পরশেই সারা শরীর ভেঙে খানখান হয়ে যেত। নারী দেহের ভেতর অনুপম মাদকতা। আঁধারে এর রূপ কী অপূর্ব সুধা। শিহরণে গন্ধমের নেশা। ক্ষমাহীন তবুও মাতাল আজ কলিমুল্লাহ্। এগিয়ে যায় সুরাইয়ার বিছানার পাশে। এসো ঘুম পাড়িয়ে দেই।

একলাফে সুরাইয়া উঠে বসে। বলে—আপনার বিছানায় যান। কী করছেন দুলাভাই, মাথা ঠিক আছে তো?

—দুলাভাই দুলাভাই করছ কেন? তুমি আমার বিয়ে করা বউ। কাগজে কলমে আছে। তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

—আমি চিৎকার করব। মানুষ জড়ো করব।

—কিছুই তুমি করতে পারবো না। শুধু শুধু স্ক্যান্ডেল হবে। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। আরে তোমার বোন তো জেনেশুনেই আমার হাতে তুলে দিয়েছে তোমাকে। দেখ না, তোমার বোনের সাথে আমি থাকি কখনও ইদানীং?

সুরাইয়া ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে সরে যায়। বলে—না না না।

যতো সরে যায় ততোই কাছে আসে কলিমুল্লাহ্। অদ্ভুত এক যাদুতে ছুঁয়ে দেয় শরীর। হাত মুখ গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ঠোঁট। অমৃত লেহনে ব্যস্ত পুরুষ। শরীরে হাত বুলাতে বুলাতে সুউচ্চ মিনার। শিউরে ওঠে কলিমুল্লাহ্। মুখে শুধু তৃপ্তির শব্দরা ওড়াউড়ি করে। বহুদিন পায়নি এমন আস্বাদন। হাত মুখ ঠোঁট ডুবিয়ে মণিমুক্তার সন্ধান করে কলিমুল্লাহ্। নিজের বাহুতে পিষ্ট করে চলে ওই ছোট্ট সুডৌল দেহটি। আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে কলিমুল্লাহ্‌র শরীর সুরাইয়ার শরীরকে। বাধ্য হয়ে নিজেকে সঁপে দেয় সুরাইয়া অনুভূতির বেদীতে নিজের অজান্তেই। মোমের মতো গলে যায় কলিমুলাহ্‌র উত্তাপে। মহানন্দে ডুবে যায় বিন্দু থেকে বৃত্তের বিভাসে। এতটাই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আজ সে অনভিজ্ঞ চালককে উজার করে দেয় ভাণ্ডার।

কই এমনভাবে আম্বিয়ার শরীর ওকে টানে না আজকাল। একেবারে নীতিবান পুরুষ তো সে নয়। দেহের চাহিদার কাছে হার মেনে পয়সার বিনিময়ে অখাদ্য-কুখাদ্যেও মুখ দিয়েছে কয়েকবার। কিন্তু এমন রাজকীয় উপহার পায়নি কখনও। জীবনে আজ নতুন জীবনীশক্তির সঞ্চারণ হল। ভাবনার বেশ আমেজ সম্পৃক্ত হয়। অনুভূতির চাদরে জড়িয়ে মুখ বন্ধ করে নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে কলিমুল্লাহ্। নেশার ঘোর যদি কেটে যায় একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই সুরাইয়ার দিকে।

সুরাইয়া আপন মনে বলেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে—আমার বোনের সংসার আমি নষ্ট করলাম। আমি না আসতে চাইলে তো জোর করে পাঠাত না। এমন অন্যায় ঘোর অপরাধ হত না। কান্না আজ বাঁধ ভেঙেছে। বুকে তুফান কূলকিনারাহীন পাথারে উপায়ের সন্ধানে মনস্থির করতে পারছে না। জেগে থাকে রাত। ঘুম নেই। নিজ গৃহে নিজেই ধর্ষিতা। মহাসুখে ঘুমে নাক ডেকে পাশের বিছানায় কলিমুল্লাহ্। ঝড়-তুফান কিছুই আঁচ করার দায়িত্ব তার নয় যেন আজ।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় সুরাইয়া, আর নয় এই লোকের সাথে সঙ্গ দেওয়া। এই আঁধারই ওকে পথ দেখাবে যে পথ নিজেকেই নির্ধারণ করতে হবে।

হাতের ব্যাগটা খোলে সুরাইয়া। আপু তার বান্ধবীর ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে দিয়েছিলেন। ওটাই আজ সম্বল। তবুও মনে ভয়—ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে যায়। ওই গৃহে কোনো ভক্ষক অপেক্ষায় আছে নাকি রক্ষক হিসেবে। আম্বিয়ার জন্য করুণা হয়। কত বিশ্বাস নিয়ে গৃহকোণে অপেক্ষায় থাকে কর্মব্যস্ত ক্লান্ত স্বামী ফিরবে। কত আয়োজন কতটা সময় অপেক্ষা। কী তার ফল। সুরাইয়রা কান্না পায় এসব ভাবতে। সকালের জন্য অপেক্ষায় থাকে।

সকাল হতে না হতেই নিজের সহায় সম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মিতালী আপার বাড়ির ঠিকানায়। জামাইকাতে থাকে। ওই এরিয়াটাতেও ব্রুকলিন কুইন্সের মতো বাঙালি এবং এশিয়ানরা থাকে বেশি। আম্বিয়া আপাই বলেছিল—বিদেশের রাস্তায় ভয় নেই। সঙ্গী ছাড়া নিরাপদেই কোথাও যাওয়া যায়। ট্যাক্সিওয়ালা কোথায় নিয়ে গুম করে দেবে হাইজ্যাক করে টাকা-পয়সা লুট করে নেবে—এসব ভয় তো নেই। পথ চিনিয়ে দেবার পুলিশ বন্ধুরা তো আছেই। সুরাইয়ার মনে এ বিশ্লেষণটুকু, তবুও বিশ্বাস নামের বস্তুটিকে আর প্রশ্রয় দেবে না জীবনে। যতো প্রতিকূলতাই পড়ুক শক্ত হাতেই হল ধরবে সুরাইয়া মনে মনে ভাবে। প্রচণ্ড এই ধাক্কা তার অস্তিত্বকেই হরণ করতে চেয়েছে।

কিন্তু সে মনে মনে আরো প্রকাণ্ড ধাক্কার জন্য প্রস্তুত হয়।